সাহিত্য অঙ্গন

(साहित्य आंगन // Sahitya Angan)

ISSN : 2394 4889 Vol : X, Issue : XX, September 2024

Website : www.sahityaangan.com

মুখ্য সম্পাদক

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

(Chief Editor : Dr. Joygopal Mandal)

কার্যকরী সম্পাদক

ড. প্রণবকুমার মাহাতো

ড. সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

ড. উজ্জ্বল প্রামাণিক

প্রচ্ছদ : কৃষ্ণধন আচার্য

: প্রাপ্তিস্থান :

পাতিরাম, দে'জ পাবলিশিং, দে বুক স্টোর এবং ধ্যানবিন্দু

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

অভিষেক টাওয়ার, ৪র্থ তল, ফ্ল্যাট নং-২

কলাকুশমা, ডাক-কে. জি. আশ্রম, ধানবাদ-৩২৮১০০৯

SAHITYA ANGAN
An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual
Peer-reviewed Journal
ISSN : 2394 4889 Vol : X, Issue : XX, September 2024

Chief Editor :
Dr. Jaygopal Mandal

Working Editor :
Dr. Pranabkumar Mahato
Dr. Soumyabrata Bandyopadhyay
Dr. Ujjwal Pramanik

© Publisher

Cover : Krishnadhan Acharyya

Type Setting & Cover Disign :
Manik Sahu
Mob : 9830950380

Printing and Binding :
Granco Process
44, Biplabi Pulin Das Street
Kolkata - 700 009
Ph. : 9331801957

Price : 300.00

Published By :
Dr. Jaygopal Mandal
Abhishek Tower, Block-A.
4th Floor, Flat-2, Kalakushma
P.S. Saraidhela, Dhanbad-828127
Phone : 09830633202 / 7003488354
E-mail : joygopalvbu@gmail.com,
Website : www.sahityaangan.com

Advisory Board :

Prof. Dr.) Suman Gun, Assam University, Shilchar, Assam
Prof. (Dr.) Suranjan Middey, Department of Bengali, R.U. Kolkata
Prof (Dr) Prakash Kumar Maity, Department of Bengali, Banaras Hindu University, U.P.
Prof. (Dr.) Barendu Mondal, Jadavpur University, Kolkata
Prof. (Dr.) Prabir Pramanik, University of Kalyani, Nadia, W.B.
Amar Mitra, (Katha Sahityik : Sahitya Academy & Bankim Awarded)
Nalini Bera, (Katha Sahityik : Ananda & Bankim Awarded)
Sushil Mondal (Poet), Narendrapur, Kolkata
Tapas Roy (Poet & Kathasahityik), Kasba, Kolkata
Dr. Ritam Mukhopadhyay, Presidency University, Kolkata

Members from the other Countries :

Dr. Sudeepa Dutta (Chittagong Govt. College, Bangladesh) Afroza Shoma (Dhaka, Bangladesh)
Md. Majid Mahmud, (Writer), Greentouch Apt. Mahamudpur, Dhaka

Working Editor :

Dr. Pranab Kumar Mahato
Dr. Soumyabrata Bandyopadhyay
Dr. Ujjwal Pramanik

Working Editorial Board :

Dr. Samaresh Bhowmik, Yogmaya Devi College, Kolkata
Dr. Manaranjan Sardar, Dept. of Bengali, Bangabasi Evening College, Kolkata
Dr. Soma Bhadra Roy, Associate Professor, West Bengal State University, West Bengal
Dr. Sampa Basu, Associate Professor, Dept. of Bengali, Mahishadal College, Midnapure
Dr. Debashree Ghosh, Dept. of Bengali, Hiralal Majumder Memorial College, Dakshineswar, W.B.
Dr. Nabanita Basu, Assistant professor, Singur Govt. College, West Bengal
Tapas Koley, Boalia, Ujjaini (East), Garia, Kolkata-84
Panchanan Naskar, Scholar, Binod Bihari Mahto Koyalanchal University, Dhanbad
Swapan Kumar Paramanik, SACT, Magrahat College, 24 pgs. (South)
Swaraj Kumar Das, Fakir Chand Halder College, Diamond Harber

This issue made
as
conference
proceedings
of
One-day International Seminar
was organised on the occasion
of
10th years
of
SAHITYA ANGAN PATRIKA.
ISSN : 2394 4889
The seminar was organised by the
Department of Bengali & IQAC cell
of
Saltora Netaji Centenary College,
Bankura.

<u>বিশেষ ক্রোড় সংখ্যা</u>

সূচি

সম্পাদকীয় —৭

রবীন বসু—শতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য : প্রেমের কবি নজরুল—১৩

মানস আচার্য—নজরুলের বিপ্লবী চেতনার অপূর্ব আখ্যান : কুহেলিকা—১৬

দয়াময় রায়—নজরুলের গানে লোকমান লোকপ্রাণ—২২

জয়শ্রী মুখার্জী—প্রসঙ্গ 'মৃত্যুক্ষুধা'—নজরুলের জীবনাভিজ্ঞতার এক অনবদ্য প্রকাশ—৩০

লিপিকা সরকার—কবি নজরুলের সাম্যভাবনা : সাম্যবাদী কাব্যের আলোকে—৩৬

নাফিসা ইয়াসমিন—ছোটোগল্পকার নজরুল : এক অনন্য প্রতিভা—৪৪

মৌসুমী সাহা— প্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর : জীবনানন্দ দাশ—৪৯

পিয়াসা গাঙ্গুলি—হাজার বছরের নিসর্গ-পথিক : জীবনানন্দ দাশ—৫২

টিটু ঘোষ—'ধূসর পাণ্ডুলিপি' : জীবনানন্দ দাশের প্রকৃতি-চেতনা—৫৭

অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় আখ্যানের অবিনির্মাণ—৬৩

স্নেহাশিস সরকার—শতবর্ষের আলোকে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : কবিমানস ও কবিতার (নির্বাচিত) বিষয় অনুসন্ধান—৭১

চন্দন চৌধুরী—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় বিবেকী দর্শন—৭৮

দেবশ্রী ঘোষ বিশ্বাস—শঙ্খ ঘোষের কবিতা : প্রেক্ষিত সত্তরের দশক—৮৬

কারিমুল চৌধুরী—প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কবির প্রতিবাদী স্বরায়ন : শঙ্খ ঘোষের নির্বাচিত কবিতা—৯১

সম্প্রিয়া চ্যাটার্জী—কান্তিময় আলোর সন্ধানে উষালগ্নের অভিযাত্রী : শঙ্খ ঘোষের নির্বাচিত কবিতা—৯৭

স্বরূপ দে—'জীবনানন্দ : উত্তরাধিকার' : শঙ্খ ঘোষের অন্তর্লীন অনুভবে—১০৩

আবেশ মণ্ডল—শঙ্খ ঘোষের কবিতা : পুরাণের নবরূপায়ণ—১১১

শুভ কুমার পাত্র—সমকালীনতার দূরন্ত প্রচ্ছায়ায় শঙ্খ ঘোষের কবিতা—১১৯

সোমা মুখার্জি—গণেশ বসুর শেষের কবিতা—১২৮

নিখিল চন্দ্র মাহাতো—গণেশ বসুর কবিতায় মৃত্যু-চেতনা—১৩৫

তরুণ মুখোপাধ্যায়—দেবারতি মিত্রের কবিতা : 'এক কণা মুগ্ধ উষ্ণ স্বেদ'—১৪২

প্রীতম চক্রবর্তী—'ধূলায়-পড়া ম্লান কুসুম' : প্রসঙ্গ নারায়ণ সান্যালের সুতনুকা সিরিজ—১৪৮

ইন্দ্রাণী হাজরা—ছিন্নমূল জীবনে নারীর জীবন-সংগ্রাম : 'বল্মীক' ও 'মেঘে ঢাকা তারা'—১৫৬

দুর্গাদাস মিদ্যা—লেখক সমরেশ, মানুষ সমরেশ—১৬২
প্রণব কুমার মাহাতো— 'নয়নপুরের মাটি' : সমরেশ বসুর সংগ্রামী চেতনা—১৬৭
পারমিতা চ্যাটার্জি—গোয়েন্দা গোগল : সমরেশ বসু—১৭২
চন্দ্রিমা মৈত্র দুবে—সন্তানের চোখে সমরেশ বসু—১৭৬
বিভাস বিশ্বাস—শিকড়ের খোঁজে : সমরেশ বসুর উপন্যাসে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অস্তিবাদী দর্শন ভাবনা—১৮৪
তাপস মণ্ডল—'টানা-পোড়েন' উপন্যাস : শিল্প ও শিল্পীর একটি সমীক্ষা—১৯০
শুভেন্দু রায়—কালকূটের অরণ্য-ত্রয়ী উপন্যাসে আরণ্যক জীবন ও অরণ্য-চেতনার স্বরূপ—১৯৪
অবন্তিকা খাঁ—সমরেশ বসুর ছোটগল্পে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবিকা—২০০
বিবেকানন্দ হাঁসদা—প্রসঙ্গ সারন্দা বনভূমির আদিবাসী সমাজ-জীবন : সমরেশ বসুর 'দুই অরণ্য' উপন্যাসের প্রেক্ষিতে—২০৪

উজ্জ্বল শীল—দেবেশ রায়ের বৃত্তান্তমূলক উপন্যাস : জীবনসংগ্রামের গতিপথ—২১৪
মৌসুমী রক্ষিত—'জলের মিনার জাগাও' : জেগে রয়েছেন ব্যক্তি দেবেশ রায়—২২৪

নাজমা ইয়াসমিন—'বিধবাদের কথা' : রাজনীতি ও সামাজিক দর্পণে নারীর অবস্থান—২২৮
মানস চক্রবর্তী—দেশভাগ ও উন্মূল মানুষের জীবিকা সংকট : হাসান আজিজুল হকের গল্প—২৩৫
অনুময় মণ্ডল—হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্প : জীবনবোধ ও বাস্তবতা—২৪০
সংগ্রাম মাহাত—দেশভাগ ও ক্ষয়িষ্ণু মানবতার দলিল : 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ'—২৪৮
অমিত মুর্মু—হাসান আজিজুল হকের গল্পে নারী-চেতনা : উত্তরণের ছবি—২৫৩

মানসী কুইরী—রাজনৈতিক সংকটের ভিন্নরূপ : রমানাথ রায়ের 'কাঁকর' গল্প—২৬১
শাঁওলী মিশ্র—রমানাথ রায়ের ছোটোগল্প : শাস্ত্রবিরোধিতার উদবর্তন ও আধুনিকতায় পদার্পণ—২৬৮

সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় — সত্তরের সীমানা ও সম্ভাবনা : সুবিমল মিশ্রের গল্প—২৭৪
সুমিত চ্যাটার্জী—প্রতিবাদের আলোকে সুবিমল মিশ্রের ছোটগল্প—২৮২

উজ্জ্বল প্রামাণিক—নবারুণের গল্প : 'বড়লোকের গাড়ির টায়ার/ফুটো করে লাগাও ফায়ার...'—২৮৭

নবনীতা বসু—মনোজ চাকলাদারের গল্প : শূন্যপথে জীবনের গান—২৯৬

সম্পাদকীয়

এমন একটা সময় পত্রিকার দশম বর্ষ উদযাপন করতে চলেছি যখন সারা বাংলা ঘন তমসাচ্ছন্ন। পিতার হৃদয়ে অনন্তের জ্বালা, আর মায়ের বুকে পাথর চাপা। বোনের মৃত্যুর জন্য হাহাকার অগ্রজের, প্রেমিকের হৃদয় বিদীর্ণ, দিশাহীন। রাষ্ট্র শুধু নাটক নাটক খেলে, এ কোন্ দেশ? দু'বছরের শিশুর স্তন ছিঁড়ে খায় মানব-পশু। উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ—সর্বত্রই যেভাবে নারী-নিপীড়ন চলছে, সামাজিক ব্যধি নাকি রাজনৈতিক ওদাসীন্য কী বলব! নিরুপায় বিচারবিভাগ? এর চেয়ে কি ভয়ংকর ছিল বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষ? আবার কি প্রয়োজন কবি নজরুল ইসলামের? কিংবা সেই ধারার স্রষ্টাদের কণ্ঠস্বর! যাঁরা এখনও বিক্রি হননি তাঁরাই ভরসা। বাংলা কবিতার ধারায় পল্লবিত আছে জীবনের উত্তাল ঢেউ। সেই তরঙ্গমালার স্বাদ নতুন করে নিতে হবে এই অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের।

মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায় অজস্র প্রশ্নমালা—ওই মেয়েটা কী এমন দেখেছিল, কী এমন বলেছিল, অথবা তার রূপ যৌবন কি কেবল দায়ী? যে অগাধ নরপশুর দল মুখে কামড় বসিয়েছে, শরীরে আঁচড় দিয়েছে শতবার, নিশ্চিত বোঝা যায় এ নরকের কীটের দলে যেমন সহযাত্রী আছে, আছে দু'পে জানোয়ার। কী অনায়াসে বদলে দেয় ঘটনার চিত্রনাট্য। শক্তপোক্ত দেয়াল ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়, গুঁড়িয়ে গেছে মানুষের মেরুদণ্ড? এমন আওড়ান করে রেখেছে বুঝার উপায় নেই—কে করেছে দোষ, কে করেছে রাগ। খুকির নাকি দোষটা বেশি; ওর শরীরটা কেন হরিণ! ও হয়তো একবারে বাইশ হাত লাফাতে পারত, তার ওপর তার নাকি পাখির মতো ডানা হইছে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হয় ক্ষোভ। কেউ বলেন, নারীর মুক্ত পোশাকে বিপদ, কেউ বলেন, বহির্মুখী নারীর যে চেতনা—সেটাই সামাজিক অবক্ষয়ের নেপথ্য কারণ। কিন্তু শাসকের কি কোনো দায় নেই, কথাটা ঠিক এই যে ঘটমানতা তো আবহমান কালের। এর তো একটা সমাপ্তি চাই— কারণ এ সময় তো প্রগতির। ক্ষোভ প্রশমিত করলে বদহজম হচ্ছে। কী আর করা যাবে। বাংলা কবিতার শব্দ-ব্রহ্মে কিছুটা শুদ্ধ করা যাক।

আকাশের রৌদ্র এখনও রাত ফেড়ে বেরোয় এইটুকু আশা এখনও বজায়। আমাদের আছেন কবি নজরুল ইসলাম। তাঁর ১২৫তম জন্মবর্ষে এখনও শুনতে পাই বিদ্রোহী উচ্চারণ:

> "যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
> অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না
> বিদ্রোহী রর্ণ-ক্লান্ত
> আমি সেই দিন হব শান্ত।"

হে আপোষহীন সাম্যবাদী, মানবতাবাদী কবি আজও আমরা অত্যাচারিত স্বৈরাচারী শাসকের নখাগ্রে। তোমার বাণী যে আবার ধ্বনিত হয় আমাদের কণ্ঠে, বাজে সরস্বতীর

বীণায়। সেদিন তো ব্রিটিশ শাসকের বিবেক ছিল, তাই তোমার নির্ভীক ঘোষণায় বিচলিত হয়ে তোমাকে কারারুদ্ধ করে। তোমার 'আনন্দময়ীর গান' বিদেশি শোষকের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। ব্যান্ড করা হলো তোমার 'ধূমকেতু'। তুমি আপামর বাঙালির—গণ-জাগরণের দূত, তোমার উদাত্ত কণ্ঠ যেন আজও দেবতারা শুনতে পান। বাংলাদেশের বাউল জনগণ তোমাকে করেছে প্রাণের কবি, জাতীয় কবি। আর এপারে তোমারই ভাষায় তোমারই গানে পথ খোঁজে মানুষ। যেমন একই সুরে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'পারাপার' কবিতা লিখেছেন,

"ওপারে যে বাংলাদেশ
এপারেও সেই বাংলা
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে
থাকুক গে পাহারা।
দুয়ারে খিল
টান দিয়ে তাই
খুলে দিলাম জানলা।

এপারে যে বাংলাদেশ
ওপারে সেই বাংলা।"

এসব কি শুধুই অতীত! এই মরমী ভালবাসা আর নির্ভেজাল প্রতিবাদ কি শিকড়বিহীন? যে লড়াকু চেতনায় তোমার বিদ্রোহ বাঙালির অহংকার, সে কি ধূলায় গড়াগড়ি যাবে! ভঙ্গ প্রদেশের রাণী ভয় পায় না মানুষের বিক্ষোভে, উল্টে দমন পীড়ন তার ধর্ম। প্রান্তে প্রান্তরে যেভাবে ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে শাসনের চেলা-চামুণ্ডেরা, নারীর সুরক্ষা নিয়ে ছিনিমিনি করে, ধর্ষণের নানা ব্যাখ্যা তার ঝুলি থেকে বেরোয়— প্রশ্ন ওঠে তারা কি মানুষ না পশু? মা-মেয়ে-বোন-বধূ নেমেছে রাতের রাস্তায়। মনে পড়ে কবি জীবনানন্দ দাশের কথাও। তাঁরও ১২৫তম জন্মবর্ষ। কী নিদারুণ সত্য তিনি উপস্থাপন করেছিলেন, 'অদ্ভুত আঁধার এক'। কী সুস্পষ্ট ও অনির্বাচনীয় সত্য অনির্বাণ দীপ্তিতে প্রকাশিত :

"যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।"

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পার হয়েও এ আঁধার ঘোচেনি। 'বশীভূত' করে রেখেছে শিল্পী-সাহিত্যিকদের, বর্তমানে শাসকের পরম প্রিয় শব্দ 'বশীকরণ'—পুরস্কারের মন্ত্রে বশীভূতকরণ চলছে। মানুষ যতই বলে সে প্রগতিশীল, স্বাধীন গণতন্ত্রের নাগরিক, তবুও সে

যেন নিজের মুদ্রাদোষে শাসকের তালুতে বন্দি। অল্প ভিক্ষায়, স্বল্প শিক্ষায় যে নিজেকে ধন্য মনে করে, শাসকের অনুগ্রহ জীবনের পাথেয় ব'লে গর্ববোধ করে তারা কী করে নজরুল ইসলামের উত্তরসূরী দাবি করেন! শাসক যত কৌশলী, জনতা ততটাই বোকা। কেউ বলে আমরা জাতীয়তাবাদী, কেউ বলে প্রগতিবাদী, কেউ বলে আমরাই মা-মাটি-মানুষ। কবি জীবনানন্দ দাশের প্রত্যাশা ভুলে গেছে। এখনো যাঁরা আছেন মানুষ হয়ে তাঁরা কবির ভাষায় বলে, 'মানুষের মরুভূমি একখানা নীল মেঘ চায়', এখনো কেউ কেউ কবির ভাষ্যে সাহস পায় "সবার ওপর তোমার আকাশ প্রতীম মুখে রয়েছে /সফল সকালের রৌদ্র।"

সৃষ্টির এই অনাবিল সুখ, অমরকানন, সেই উল্লাসে বীতনিদ্র জনগণ পথে নামে নিত্য পীড়নের বিরুদ্ধে। একালের কবি নন, অথচ সজাগ নারী মঞ্জুশ্রী সরকার ঘোষণা করে, "ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে মেপে নেব/অধিকার সম্মান /সময় এসেছে বুঝিয়ে দেওয়ার/অসম্মানের দাম।"—এই তো বাঙালির ঐতিহ্য, বাংলা কবিতার গৌরব। যে রক্তনদী বেয়ে জীবনের চলমানতা—ভাই-বোন-মেয়ে হারানোর শোক-সমুদ্রে যুগে যুগে মানুষ যুদ্ধ করে; কবি জীবনানন্দ দাশের কাব্যভাষা সেখানে স্বপ্ন দেখায় "সাম্রাজ্য ভেঙে যায় /হেমন্তের মেঘের মতো মিলিয়ে যায় সম্রাটদের চিৎকার"। এই গভীর প্রত্যয়ে এখনো মানুষ সৈনিক, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে যোদ্ধাবেশে নারী-পুরুষ আপন সন্ততির স্বপ্ন রক্ষায় বদ্ধপরিকর; বাঙালির বিবেক কবি শঙ্খ ঘোষ যেমন বলেছিলেন, "আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক", তেমনি জনজাগরণে সেই আহ্বান ধ্বনিত হয় আকাশের বায়ুতে। কবি শঙ্খ ঘোষের কাব্যবাণীতে যে আশ্বাস সেই একই সুর বাজে বাঙালির চিত্তে চিত্তে :

"অনেক রাজার শাসন ভেঙে গেছে;
অনেক নদীর বদলে গেছে গতি;
আবহমান কালের থেকে পুরুষ-এয়োতি
এই পৃথিবীর তুলোর দণ্ডে সোনা" (এখন ওরা)

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন 'ওরা কাজ করে' কবিতায়—

"এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল,
এসেছে মোগল;
বিজয়রথের চাকা উড়ায়েছে ধূলিজাল,
উড়িয়াছে বিজয় পতাকা।
শূন্যপথে চাই, আজ তার কোনো চিহ্ন নাই।
নির্মল সে নীলিমায় প্রভাতে ও সন্ধ্যায় রাঙালো
যুগে যুগে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আলো।

আরবার সেই শূন্যতলে আসিয়াছে দলে দলে
লৌহবাঁধা পথে অনলনিঃশ্বাসী রথে প্রবল ইংরেজ,
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।

জানি তারও পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ-বেড়া জাল”

যুগে যুগে মানুষ যুদ্ধ করে, আবার শান্তি কামনার আগুনে শুদ্ধ হয়, তবুও পতঙ্গের মতো আবারও ছুটে যায় আগুনের মাঝে। সময়ের পরতে পরতে চড়াই উতরাই পেরিয়ে চলে জনজীবন। কবি সেখানে সমাজ-বিবেক, পথের সারথি। আবার এও দেখা যায় অর্থ লোভে, যশলোভে বহু কবি (সরকারি পরিভাষায়) পরেছেন রাজার বর্ম, হয়েছেন রাজসভাকবি। নাকি রাজভৃত্য। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্ম-শতবর্ষে তাঁরই চেতনায় দেখি কাকে বা কাদের বলা যায় কবি, কাকে সমাজ গ্রহণ করবে আর কার প্রতি ছুঁড়ে দেবে ঘৃণার অলংকার। ‘কবি যদি’ কবিতায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রব্রতী বলেছিলেন, “কবি যদি লোভী হয়, /তা হলে সে কবি নয়, / তা হলে সে পথের কাঙাল। /কখনও সবুজ পরে, /কখনও গেরুয়া ধরে, /কখনও বা টকটকে লাল। # কবি যদি লোভী হয়, /তা হলে সে কবি নয়, /তা হলে সে ব’সে ফুটপাথে /বলুক, ‘সোনা কি তাঁবা/যাই হোক দাও বাবা, /দাও এই কাঙালের হাতে।” (১৭ শ্রাবণ ১৪১০)

কী দুর্ভাগ্য। হে কবি, সেদিনের তোমার এই আশীর্বাণী এতটাই মনে ধরেছিল যে একালের পুরস্কার-প্রাপ্ত কবিরা রাজার অনুগ্রহে দিন যাপনে মগ্ন। কেউ বলছেন, চোখে ন্যাবা হয়েছে, কেউ বলছেন, কবি জীবনানন্দের ভাষ্যে সঠিক অবস্থান—অন্ধ হলেই তো বেশি চোখে দ্যাখে আজ। তাই অন্ধ সেজেছেন একালের প্রতিষ্ঠিত কবিগণ।

যখন নন্দীগ্রাম — সিঙ্গুর আন্দোলন চলছিল তৎকালীন শাসক আর বিরোধীদের নাটমঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে তুমি দেখেছিলে ‘সামনে আগুন পেছনে আগুন’ (অগ্রপশ্চাৎ/ শারদীয় গণবার্তা), তুমি হতাশায় ন্যুব্জ হয়ে ভেবেছিলে এই পরিণাম কি কোনো কর্মফলে! এমন সময় তোমার কণ্ঠে যেন উচ্চারিত হয়েছিল—

“বুঝি না যে, যা দেখি তা আমারই দৃষ্টির ভ্রম কিনা
কেন সবই ঝাপসা হয়ে যায়;
কেন কার কবেকার কর্মফলে কিছুই জানি না
দ্বিপ্রহরে আঁধার ঘনায়।” (দ্বিপ্রহরে অন্ধকার)

প্রিয় কবি, তুমি তো কলকাতার যিশু। পার হয়ে গেলে আঁধারের দিন—কোনও এক ২৫শে ডিসেম্বর (২০১৮)। তোমার শিশুরা আজ তিলোত্তমার রাজপথে নির্ভয়ে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে চিৎকার করে বলছে যেন—‘রাজা তোর কাপড় কোথায়’? রাজার নাটক ততটাই বৃদ্ধি পাচ্ছে, তিনি ভাবছেন তাঁর না-টক জনগণ খাচ্ছে ভালো। ভাবনাটা অমূলক নয়। এমন ধাঁধার উত্তর কে দেবে! এমন বিপণ্ণতায় যে মানুষ ছিল ‘স্বার্থপর, কৃপণ আর সংকীর্ণচেতা’ তারা আজ মানুষের পাশে। হয়তো এই মানবতাবাদ চরমতম সত্য। কবি শঙ্খ ঘোষের বাণী আজ বড় যথার্থ

“দেখেছি তো হঠাৎ নিরালা আবেশে
মানুষ এখনও কত বিসারী মেঘের মতো নেমে আসে মানুষের পাশে।”

(ঘুমন্ত জাগরী/ হাসিখুশি মুখে সর্বনাশ)

যে মানুষেরা বন্ধু বলে খেলার মাঠে ভিড় জমিয়েছিল, তুমুল বাহবা দিচ্ছিল জনার্দন জনতা—তাদের মধ্যে থেকে কিছু লোক ছিটকে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন মন্ত্রীদের পা, নানা পদে নানা মুটুকে নানা সাজে সমাসীন। পুরস্কার টুরস্কার পাবার আশায় রাণীর তৈরি মাকড়সা-জালে আবদ্ধ। স্বাধীনতা দিবসের পূর্ব-রাতের দখল নিয়েছে মেয়েরা, সাথে জাগ্রত জনতা—-ঝড় উঠেছে শহরে গ্রামে-গঞ্জে, তখনও বাংলা জুড়ে 'হামাগুড়ি' দেয় অভিনেতা-অভিনেত্রী, বুদ্ধিজীবীরা; যারা খেয়ে ফেলেছে রাণীর নুন, গুণ গাওয়া ছাড়া আর কী কম্ম থাকতে পারে! তবুও যখন মনে হয় তারাও মানুষ, তখন হামাগুড়ি দিয়ে খোঁজে নিজেকে। শঙ্খ ঘোষ দেখলেন এই ঝড়ের রাতের দৃশ্য :

"কী খুঁজছেন?
মিহি স্বরে বললেন তিনি : 'মেরুদণ্ডখানা'।
সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ ঝলকালো ফের। চমকে উঠে দেখি :
একা নয়, বহু বহু জন
একই খোঁজে হামা দিচ্ছে এ কোণে ও কোণে ঘর জুড়ে।" (হামাগুড়ি)

অন্যদিকে যাঁরা কোনোদিন রাজাকে মুগ্ধ করতে পারেন নি, কোনো পুরস্কারের জন্য অথবা অলংকারের প্রত্যাশায় রাষ্ট্রের পদলেহনী জীবন থেকে সযত্নে দূরে থেকেছেন, তাঁরা মুক্তচিন্তার দর্শনে অবিচল থেকে মানুষের পাশে থাকছেন, 'রাস্তাই একমাত্র রাস্তা'কে বেছে নিয়েছেন। যাদবপুর কফি হাউসে এসে ছ'য়ের দশকের কবি গণেশ বসু যেন এখনও বলছেন—

"পেছনেও নয়, মধ্যেও নয়, সামনের সারিতেই
আমি আছি, আমি সঙ্গে তোমার প্রিয়
গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা হলেও মানুষ, সবুজ ঘাস—
কেউ একা নয়, পাশে আছি জেনে নিয়ো।"(কবিতা সংগ্রহ তৃতীয় খণ্ড)

১৪ আগস্ট ২০২৪ মধ্যরাতে মানুষ স্বাধীনতার দাবিতে আবার রাস্তা দখল করে, বিচারের দাবিতে আগ্নেয়গিরি কলকাতার রাজপথে। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয় — "নবজাগরণ বুঝি এভাবেই ঘটে। দীর্ঘ দিন ধরে ক্ষমতার দাপটে অন্যায়, অবিচার, লাঞ্ছনা, নিপীড়ন সহ্য করতে করতে একদিন ছাইচাপা আগুন ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে দিগন্তের।"(৩০ শ্রাবণ ১৪৩১,কলকাতা)

কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতা-বিভাবে আমিও বলতে চাই :

"শান্ত একটা লণ্ঠন দাও। তার নিচে বানাব
অশান্ত চরিত্র।
দশ-বারোজন শয়তান দাও, গড়ব অমিতাভ
সংঘমিত্র।

নারী-নিবাসের মেট্রন দাও,

স্পর্শভীরু নিশিগন্ধাও,
এক মুহূর্তে গড়ব দুঃসাহসিক তথ্যচিত্র।” (বাজি /রক্তাক্ত ঝরোখা)

শিরদাঁড়া সোজা রাখার সময় এখন। হাতে নাও তীরের ফলার মতো শব্দচয়ন, মানুষের ভেতরে যে লাঞ্ছনা, বেদনা — গঞ্জনা — অপমান আছে, সেই সমিধই আমাদের মশাল। যখন পুড়তে থাকে মেয়ের শরীর, শকুনে ছিঁড়ে খায় তার স্বপ্ন; তখনও কি বসে থাকবে আত্মমগ্নতায়? আজ যে আগুনে মানুষ দিশেহারা, আর্ত— কাল সেই আগুনে পুড়বে তুমিও। কেননা—

“ওদিকে শিশুরা জানে দুপুরে ভূতেরা মারে ঢেলা
যুবাদল মেতে থাকে খাপখোলা ঝলকে, মাদকে
পাশেই নালার থেকে আচম্বিতে জেগে ওঠে ও কে?
ঈশ্বরীর ডান পাশে বসে আছে শয়তানের চেলা।”

(এ খেলার সবে শুরু /এও এক ব্যথা উপশম /শঙ্খ ঘোষ)

এখনো সময় আছে, ‘চিনে নাও যৌবন-আত্মা’, ত্রাসের চিহ্ন, দুয়ারে দাঁড়িয়ে চক্ষুহীন হিটলার-রাজা, মমতাহীন রাষ্ট্র; সমাজের যত্র-তত্র ছড়িয়ে মনুষ্যত্বহীন পুরুষের পাশবিকতা, রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ঔদাসীন্য, নাকি রাজনৈতিক নগ্নতা। অসহায় হতে হতে মানুষ আজ প্রান্তিক, “মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও”। (শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

এই পত্রিকা প্রকাশের মুহূর্তে আমরা শালতোড়া নেতাজি সেন্টেনারি কলেজে এক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে যুক্ত। পত্রিকার এই সংখ্যাটিও আলোচনাচক্রের অংশীদার হিসাবে যে সমস্ত গবেষক, অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক আত্মচিন্তায় সাহিত্য-শিল্পের বিনির্মাণ করেছেন তারই কার্যধারার সামগ্রিক ফসল। সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

জয়গোপাল মণ্ডল

শালতোড়া নেতাজি সেন্টেনারি কলেজ
বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ
সেপ্টেম্বর ২০২৪

র বী ন ব সু

শতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য : প্রেমের কবি নজরুল

দুখু মিয়া কবি। আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মেছিলেন। খুব শৈশবে বাবা -মাকে হারিয়ে অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর জীবন শুরু হয়। নানান প্রতিকূলতার মধ্যে লড়াই করে বড় হতে হয়, তাই গ্রামের লোক ডাকত 'দুখু মিয়া' বলে। হাতে সম্বল ছিল একটা বাঁশের বাঁশি। খিদে ভুলতে তাতেই সুর তুলতেন। মধ্যদুপুর অতিক্রান্ত বিকেলের বাতাস সে সুর বয়ে নিয়ে যেত বহুদূর। ঘাট থেকে ঘাটে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

চুরুলিয়া গ্রামের মক্তব থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে একদিন প্রিয় বাঁশিকে সম্বল করে ঢুকে পড়লেন লেটোর যাত্রাদলে। শুরু হল ভ্রাম্যমান জীবন। জনপদ মুখরিত হল তাঁর বাঁশির সুরে। সান্ধ্য আসরে মগ্ন হয়ে বাঁশি বাজাতেন। আসর গড়িয়ে যেত মধ্যরাত পর্যন্ত। পালার কাহিনী থেকে জীবনের পাঠ শিখে নিলেন। শুরু হল স্ব-শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন। লেটোর দলের ভ্রাম্যমান জীবন পরবর্তীতে নজরুলকে গড়ে তুলেছিল জীবন অন্বেষক কবি নজরুল।

তখন তিনি আসানসোলে একটা রুটির দোকানে কাজ করেন। ওখানেই এক বাঙালি পুলিশ অফিসারের নজরে পড়েন। লেখাপড়ার প্রতি নজরুলের আগ্রহ দেখে সেই অফিসার অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালে নিয়ে গিয়ে স্কুলে ভর্তি করে দেন। যখন তিনি দশম শ্রেণিতে পড়েন, এল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। নজরুল স্কুল ছেড়ে সেনাবাহিনীর হাবিলদার পদে যোগ দিলেন। ইং ১৯১৭-১৯২৩ সাল পর্যন্ত কবি ৪৯ তম বাঙালি রেজিমেন্ট ছিলেন। সেনাবাহিনীতে থাকার সময় নিজের চেষ্টায় তিনি আরবি শিখেছেন। ফারসি শিখেছিলেন করাচি সেনানিবাসে এক পাঞ্জাবী মেজরের কাছে।

নিজেই ব্যঙ্গ করে লিখেছেন একসময় 'বিলেত ফেরনি? প্রবাসী-বন্ধু ক'ন 'এই তব বিদ্যে ছি!'

ছিঃ, ছিল তাঁর সারাটা জীবন। হিন্দুরা বলেছেন 'নেড়ে', মুসলমানরা বলেছেন 'কাফের'। অথচ তাঁর মতো উদার সর্ব-মানবিক আর সংস্কারমুক্ত সত্যিকার সাম্যবাদী মানুষ বিশ শতকে কমই জন্মেছেন।

"গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!"

নারী-পুরুষে সমানাধিকার চেয়েছিলেন। "আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোন ভেদাভেদ নাই!"

কুলি-মজুর, শ্রমিক, চাষী সবাইকে শোষিত মানুষ হিসেবে দেখেছিলেন। তাদের শোষণের অবসান চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন সাম্য।

"প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশকোটী মুখের গ্রাস / যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ !"

সর্বহারা মানুষের দুঃখে প্রাণ কাঁদত। কেননা নিজেও তো ছিলেন এক দুঃখী বঞ্চিত আর ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষ। সখেদে বলেছিলেন, "আমি কবি হতে আসিনি, শিল্পী হতে আসিনি; আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম। পেলাম না বলে নীরব অভিমানে প্রেমহীন পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলাম।"

অদ্ভুত এক সমাপতন-এর পরই কবি চির মূক পৃথিবীতে চলে গেলেন, তখন তিনি 'নবযুগ' পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজ করছেন, একই সঙ্গে বেতারেও কাজ করছিলেন। এমন সময় ইং ১৯৩৭ সালে কবির মধ্যে প্রথম কিছু অসংলগ্নতা ও অসুস্থতা প্রকাশ পায়। এর আগে অবশ্য তাঁর স্ত্রী প্রমিলাদেবী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই আঘাত থেকে কিংবা কবির নিজস্ব অসুস্থতার জন্য রাত্রে ঘুমাতে পারতেন না। সারারাত গুন গুন করে গান গাইতেন। হঠাৎ করে কালী সাধনা শুরু করলেন। গেরুয়া রঙের পোশাক পরতেন। মাথায় গেরুয়া পাগড়ি। গ্রামোফোন কোম্পানিতে গান রেকর্ড করতে গিয়ে সুরে ভুল করে ফেলতেন। তখন সবাই তাঁর মানসিক বৈকল্য হয়েছে ধরে নিলেন। কিন্তু ইং ১৯৪২ সালে জুলাই মাসে কবি পুরোপুরি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এবং বাক্‌শক্তি হারালেন। পরিবারের লোকজন তখন তাঁকে চিকিৎসার জন্য বিহারের মধুপুর ও শেষে রাঁচিতে নিয়ে গেলেন। কিন্তু কোনও লাভ হল না। চৌষট্টি দিন পর কলকাতায় ফিরে এলেন। কবি নীরব।

কবি নজরুলের চিকিৎসক ডাঃ অশোক বাগচীর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, ইং ১৯৫২ সালে ভিয়েনা থেকে দেশে ফিরে তিনি কবির পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। এবং কবির চিকিৎসা শুরু করেন। তার আগে ডাঃ বাগচীর একটু পরিচয় দিই। তখনকার দিনে নিউরো সাইয়েন্সে ভিয়েনা বিশ্বে এক নম্বর ছিল। ডাঃ অশোক বাগচী সেখানে ডাক্তারি পড়তে যান। এবং সাফল্যের সঙ্গে পড়া শেষ করে তিনি বিখ্যাত নিউরো সার্জন হিসাবে ভিয়েনাতে প্র্যাকটিশ শুরু করেন। কিন্তু হঠাৎ ১৯৫২ তে তিনি দেশে ফিরে আসেন। আর কবির চিকিৎসার ভার নেন। এই সময় ডাঃ বাগচী তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের পরামর্শ নেন। তিনি কবিকে পরীক্ষা করে বলেন, মানসিক বৈকল্য নয়, নজরুলের আসলে স্নায়ু বৈকল্য হয়েছে। ১৯৫৩ তে ডাঃ অশোক বাগচী নজরুলকে নিয়ে ভিয়েনা গেলেন। সেখানে কবির মস্তিষ্কের নানা পরীক্ষা করা হয়। যে বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসকরা যৌথভাবে সেদিন নজরুলের মস্তিষ্কের প্রথম আধুনিক পরীক্ষা করেছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন— ভিয়েনার বিখ্যাত নিউরোলজিস্ট স্যর রাশেল ব্রেইন, নিউরো সার্জন ড. ওয়েলি ম্যাসিসক এবং বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ড. উইলিয়াম সার্জেন্ট। আর ছিলেন ডাঃ অশোক বাগচী স্বয়ং। এই আধুনিক পরীক্ষায় ধরা পড়ে কবির ব্যাধি মানসিক বৈকল্য নয়। আগের চিকিৎসা ভুল ও ব্যর্থ ছিল। কবি আসলে স্নায়ু বৈকল্যের শিকার। যা ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়

আগেই বলেছিলেন। আর এর ফল অনিবার্য পরিণতি আল-ঝাইমার্স। ১৯৪২-১৯৭৬ এই দীর্ঘ ৩৪ বছর ফুলের জলসায় কবি নীরব বাক্যহারা হয়ে থাকলেন। এক সময়ের প্রাণময় আমাদের দুখু মিয়া কবি।

আমার কাছে নজরুলের বিদ্রোহী কবি-সত্তা, তাঁর স্বাধীন সংগ্রামী সত্তা, সামাজিক সত্তা, গীতিকার- সুরকার সত্তার চেয়ে প্রেমিক সত্তা বেশি আদরের—ধূমকেতুর কবির অগ্নি-বীণার ঝংকারের চেয়ে ব্যক্তি-কবির নীরব অশ্রুমোচন বেশি দামি বলে মনে হয়। আজীবন দুঃখের সঙ্গে লড়েছেন, আত্মভোলা সংগীত-পাগল কবিকে এক বোতল সুরা আর এক ডিব্বা পান দিয়ে সারাদিন ধরে গান লেখানো, সুর দেওয়া, আবার সারারাত ধরে সেই গান শিল্পীর গলায় তুলে দেওয়ার মত শ্রমসাধ্য মহড়াও দিতে হয়েছে গ্রামোফোন কোম্পানীর কর্তাদের কথায়।

অসুস্থ পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্ত্রী প্রমীলাদেবীর চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতে কবি যখন দিশেহারা, তখন খুব কম টাকায় সমস্ত বই ও গানের কপি রাইট কিনে নিয়ে ছিলেন ডি এম লাইব্রেরির মালিক। স্ত্রীর সুস্থতা তখন তাঁর কাছে একমাত্র কাম্য ছিল, আমরা দেখলাম এক চিরকালীন প্রেমিক নজরুলকে।

সুন্দরের পূজারি ছিলেন তিনি সত্য আর ন্যায়ের সাধক—আকাশের মত উদার আর নির্মল। ঠিক যেন আর এক লালন। জাতিভেদ, বর্ণভেদ, উঁচু-নীচু—এসব তিনি মানতেন না, নারী-পুরুষ ভেদ করতেন না। 'মিথ্যে বলিনি ভাই/এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো/মন্দির কাবা নাই।' খোদা ভগবান সব তাঁর কাছে একাকার। লিখেছেন, 'শাস্ত্র না ঘেঁটে ডুব দাও সখা সত্য সিন্ধু জলে!"

সারাটা জীবন দুঃখের সাথে লড়াই করে শেষে বাক্যহারা নীরব হল বাঁশি। সুর কিন্তু হারালো না। হাজার হাজার কবিতা আর গানে সে সুর অক্ষয় করে গেলেন।

বড় ভালবাসতেন রবীন্দ্রনাথ দামাল এই কবিকে। বুকে আগলে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বড়ই চঞ্চল আর সুদূরের পিয়াসী ছিলেন নজরুল। আজন্ম বোহেমিয়ান, তাকে বাঁধবে কে? তাঁর কবিতার ছন্দে পাই কবির সেই উন্মত্ত দামাল প্রকৃতির ছোঁয়া। এমন মানবিক, এমন সংস্কারমুক্ত সুরেলা কবি রবীন্দ্রনাথের পরেই তিনি।

নজরুল যেমন বিদ্রোহের, প্রতিবাদের, মানবতার, ঔদ্ধত্য আর প্রবল ভাঙনের কবি। তেমন প্রেমের কবি, কাঙাল কবি, সুন্দর আর সত্যের কবি, ফুল আর গুলবাগিচার কবি। আমাদের নজরুল দুখু মিয়া কবি!

মা ন স আ চা র্য

নজরুলের বিপ্লবী চেতনার অপূর্ব আখ্যান : কুহেলিকা

বাংলাসাহিত্যে নজরুল ইসলামের আবির্ভাব একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ঊনবিংশ শতকের শেষ বা বিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের উত্তাল রাজনৈতিক পটভূমিতে তাঁর আগমন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের অনিশ্চয়তা সামাজিক ক্ষেত্রে অন্যায়, অসাম্য, পরাধীনতার যন্ত্রণা এবং তা থেকে উত্তরণের ইচ্ছা—এই রকম এক সন্ধিক্ষণে—মূর্ত বিদ্রোহ, পৌরুষের ভাষ্যকার হিসাবে তিনি পদার্পণ করলেন সাহিত্যের পৃষ্ঠভূমিতে। তাঁর এই বিদ্রোহ মূলত গভীর মানব প্রেম থেকেই জাত, তাঁর এই বিদ্রোহ মূলত নির্যাতন শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে এবং মানবিকতার বিনষ্টিতে। তিনি এই বিদ্রোহের মাধ্যমে প্রধানত শোষিত মানব মনের পৌরুষকে জাগাতে চেয়েছিলেন। কবিতা দিয়েই তার সাহিত্যজীবন শুরু। 'বিষের বাঁশী', 'বিদ্রোহী', 'ধূমকেতু'—প্রভৃতি কবিতায় তার বিদ্রোহীসত্তার উচ্চকিত প্রকাশ ঘটেছে। কাব্যগ্রন্থ হিসাবে দেখলে 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থ তিনটির মূল সুর হল স্বাধীনতা আন্দোলন এবং 'শাত- ইল-আরব', 'কামাল পাশা' প্রকৃতি কাব্যগ্রন্থে রয়েছে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়। তিনি মূলত কবি ও গীতিকার। কিন্তু তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তাটি বিশেষ আলোচিত না হলেও, স্বল্প সময়ের সাহিত্যজীবনে কবিতার পাশাপাশি তিনটি উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছেন ভিন্নতার ছোঁয়া। তাঁর তিনটি উপন্যাস হল 'বাঁধনহারা' (১৯২৭), 'মৃত্যুক্ষুধা' (১৯৩০) এবং 'কুহেলিকা' (১৯৩১)। উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা, অসাম্প্রদায়িকতা, জাতীয় চেতনা এবং বৈপ্লবিক চিন্তা চেতনার পরিচয় পাই।

মহাযুদ্ধোত্তর বিভিন্ন আন্দোলন কবিকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি নিজে কিছু কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্ফর আহমেদ তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। এই দলের অনেক দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা স্বভাবতই তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র মত পোষণ করতেন। তাই আমরা তাঁকে কমিউনিস্ট দলের সদস্যতা গ্রহণ করতে দেখিনা। এ সব ভাবনা তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও লেখক জীবনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি নিজে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লববাদী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে সন্ত্রাসবাদীদের বিপ্লবাত্মক প্রয়াসকেই উপযুক্ত পথ তাঁর বলেই মনে হয়েছিল। স্বাধীনতা বলতে তাঁর কাছে ইংরেজদের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করে তা ধনিক সাম্প্রদায়ের হাতে তুলে দেওয়া, কিম্বা ব্যবসায়ীদের আরও বেশী মুনাফা লাভের পথকে প্রশস্ত করা, বা জমিদারদের শাসন ক্ষমতা লাভ বা মধ্যবিত্তের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির কথা মনে হয়নি। স্বাধীনতা তাঁর কাছে মেহনতি মানুষের প্রাপ্য অধিকার এবং শোষিত নিপীড়িত মানুষের

মুক্তি। তিনি স্বপ্ন দেখতেন এক শোষণ মুক্ত সমাজের, শৃঙ্খলমুক্ত মানুষের। তাঁর সেই উদারনৈতিক মানবতাবাদের বীজ রোপিত হয়েছিল ১৯১৭ সালে সিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলের শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটকের কাছে। তিনি কেবলমাত্র শিক্ষক ছিলেন না। তিনি ছিলেন নজরুলের রাজনৈতিক দীক্ষা গুরুও। তিনি স্কুল জীবনে 'নিখিল ভারত' বিপ্লবী সংগঠনের কর্মী ছিলেন। তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে তাঁর মাসিমা প্রথম নারী বিপ্লবী দু-কড়িবালা দেবী। এ হেন শিক্ষকের সান্নিধ্য ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কিশোর কবির অন্তরে স্বাধীনতা ও বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত হয়েছিল।

সিয়ারশোলের পরের অধ্যায় নজরুলের সৈনিক জীবন। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একপক্ষ মিত্র-বাহিনী, তার সদস্য ব্রিটিশদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে করাচিতে পৌঁছিলেন। তাঁর এই সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার পেছনে কাজ করেছিল এক রাজনৈতিক মনস্কতা। সেখানে তিনি অবসরে পড়তেন বিপ্লবী পত্র-পত্রিকা, রাজদ্রোমূলক কাগজ আনাতেন, আনাতেন সরকার নিষিদ্ধ পত্রিকা, সংবাদ রাখতেন আইরিশ বিপ্লব ও রুশ বিপ্লবের। কাগজের তলায় চাপা থাকত 'সিডিশান কমিটির রিপোর্ট'। এই সবের মধ্যে দিয়েই আমরা নজরুলের রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় পাই। আসলে সময়টাই ছিল রাজনীতির। এই সময় কালে যে কয়েকটি কর্মকান্ড তরুণদের রাজনীতিমুখী করে তুলেছিল সেগুলির মধ্যে অন্যতম ১৯০১ সালে তরুণ বিপিনচন্দ্র পালের ইংল্যান্ড থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন এবং রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়া। ১৯০২ সালে 'অনুশীলন' দলের প্রতিষ্ঠা। এই ব্রিটিশ বিরোধী সংগঠনে এসে যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রীরা স্বদেশমুক্তির স্বপ্ন দেখতে থাকে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-রাজনীতিতে এক অন্য মাত্রা যোগদান করে। এই সময় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে এক অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। ঠিক এর পরের বছরে প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম লীগ'- যারা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে সোচ্চার হয়। অন্য দিকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠল। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ বিরোধী দল 'যুগান্তর। ১৯০৭ সালে স্বাদেশিকতার বাণী প্রচারক পত্রিকা বন্দেমাতরম' প্রকাশিত হতে শুরু করে। ১৯০৭ সালে বোমা মামলায় অরবিন্দ ঘোষের বিচার, ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রোধ, ১৯১২ সালে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তর, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪-১৯১৮, ১৯১৭-র রাশিয়ার সামাজতান্ত্রিক বিপ্লব—এই সব কিছুই নজরুলকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৯২০ সালে সৈনিক জীবন ত্যাগ করে নজরুল ফিরে এলেন কলিকাতায়। তিনি মনোনিবেশ করলেন সাহিত্য চর্চায়। 'মোসলেম ভারত', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'উপাসনা' প্রভৃতি পত্রিকায় একের পর এক তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে লাগল। এবং প্রশংসিত হল। কবি ও সাহিত্যিক মহলে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ল, পাঠক মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। এরকম পরিস্থিতে তিনি লক্ষ্য স্থির রেখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বন্ধু মুজফফর আহমেদকে বলেছিলেন—"রাজনীতি যদি না করব তো যুদ্ধে গিয়েছিলাম কেন?" ১৯২০ সালে এ কে ফজলুল হকের সম্পাদনায় প্রকাশিত দৈনিক 'নবযুগ' নজরুলের জীবনে নতুন

মোড় এনে দিয়েছিল। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নজরুলের সাংবাদিক জীবন। ওই বছরই 'মুহাজিরীন হত্যার জন্য দায়ী কে?'-প্রবন্ধ লেখার জন্য পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত হয় এবং শুরু হয় কবির উপর নজরদারি। তবুও তিনি দমলেন না। বরং এই সূত্রে অন্যান্য রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিকদের সংস্পর্শে এসে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তব পরিস্তিতির সঙ্গে আরও বেশি করে পরিচিত হন। এবং নিজে ১৯২২ সালের ১২ই আগস্ট 'ধূমকেতু' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সশস্ত্র বিপ্লব-বাদের প্রচার ও প্রসারে জনমত গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে পত্রিকাটির বিশেষ অবদান রয়েছে। এই পত্রিকাকে আশীর্বাদ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ—নজরুলকে লিখেছিলেন—

"কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েসু,
"আয় চলে আয়রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধ-চেতন।"

'ধূমকেতুর উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে বিদ্রোহী কবি লিখলেন—"সর্ব প্রথম ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝি না। কেননা এ কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের সমস্ত দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসন ভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোন মোড়লি করবার অধিকার টুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে মোড়লি করে দেশকে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করেছেন। তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে বোচকা — পুটলি বেঁধে সাগর পারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনও। আমাদের এই প্রার্থনা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে। পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে। সকল কিছু নিয়ম-কানুন বন্ধন শৃঙ্খল মানা —নিষেধের বিরুদ্ধে। আর বিদ্রোহ করতে হলে সকলের আগে আপনাকে চিনতে হবে। বুক ফুলিয়ে বলতে হবে আমি আপনারে ছাড়া করিনা কাহারে কুর্নিশ। বলতে হবে সে যে যায় যাক, তাতে আমার হয়নি লয়।"

এরপর তিনি ব্রিটিশ পুলিশের নেকনজরে পড়ে গেলেন, বাইশে সেপ্টম্বর প্রকাশিত হল কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে', অক্টোবরে প্রকাশ পায় 'অগ্নিবীণা' ও 'যুগবাণী' প্রবন্ধ গ্রন্থ। 'আনন্দময়ীর আগমনে' রাজনৈতিক কবিতা হওয়ায় 'ধুমকেতুর' ৮ই নভেম্বর সংখ্যাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সরকার। ২৩ শে নভেম্বর বাজেয়াপ্ত করা হয় 'যুগবাণী'। কুমিল্লায়

গ্রেপ্তার করে কবিকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। বিচারের নামে শুরু হল প্রহসন। তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। তাঁর এক বছরের সশ্রম কার দন্ড হল। বিদ্রোহী কবি অনশন শুরু করলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নলিনীকান্ত সরকার, কুমুদরঞ্জন মল্লিক এমন কি গর্ভধারিণী মায়ের কথাতেও ঊনচল্লিশ দিনের অনশন ভঙ্গ করেননি। অবশেষে বিরজা সুন্দরী কুমিল্লা থেকে এসে তাঁর অনশন ভঙ্গ করাতে চাইলে তিনি সে দাবী ফেরাতে পারেননি। ১৯২৩ সালের ডিসেম্বরে ছাড়া পান। সরকার একের পর এক গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করতে শুরু করল। প্রকাশের পর পরই 'বিশের বাঁশী', 'ভাঙার গান' ও 'প্রলয় শিখা' বাজেয়াপ্ত হল। 'প্রলয়শিখার' জন্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্টেট কবিকে ছয়মাসের কারাদণ্ড দিয়েছিলেন, কিন্তু হাইকোর্টে জামিন পেয়ে যান। পরে গান্ধী-জি আরউইন চুক্তি হবার ফালে সরকার পক্ষ আপত্তি না করার তিনি মুক্তি পেয়ে যান।

দেশ জুড়ে তখন আইন অমান্য আন্দোলনের জোয়ার। ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বরে মহাত্মা গান্ধী এলেন হুগলিতে। এই আইন অমান্য আন্দোলনের পুরোহিত মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে নজরুল লিখলেন—

"এ কোন পাগল পথিক ছুটে এল
বন্দিনী মরব আঙ্গিনায়
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ হরণ
গান গেয়ে তার সঙ্গে যায়
পণ করেছে এবার সবাই
পর দ্বারে আর যাব না ভাই
মুক্তি সে তো নিজের প্রাণে
নাই ভিখারির প্রার্থনায়।"

গান্ধীজিকে নজরুল প্রথমদিকে খুবই ভালবাসতেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন গান্ধীজি অহিংস আন্দোলনের ডাক দেন তখন নজরুল সে পথ থেকে সরে আসেন। তিনি উপলব্ধি করেন গান্ধীজীর প্রদর্শিত আন্দোলনে দেশে স্বাধীনতার পথ সুগম হবে না। তার মতে একমাত্র বিপ্লব বাদ অর্থাৎ সশস্ত্র বিপ্লব ভারতবাসীকে তার কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা এনে দিতে পারে। এমনকি যখন ভগৎ সিং এর ফাঁসির জন্য গান্ধীজি সই করেছিলেন তখন নজরুল তার সমালোচনা করতে ছাড়েনি। গান্ধীজি চান স্বরাজ অর্থাৎ স্বাধীনতা নয় স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু নজরুল চান ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। আর সেই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আসেন ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্যপদ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে।

নজরুলের মতই গান্ধীজির আন্দোলনের পথে দেশবাসী আকৃষ্ট হলেও বাংলার তরুণদের প্রাণে তার আবেদন ততখানি প্রবল হয়নি। বাংলার তরুণেরা অহিংসা পথ অবলম্বন না করে দেশের মুক্তির জন্য বিপ্লবের ও সন্ত্রাসের সহিংস পথ বেছে নিয়েছিল। এ যুগের মানস চাঞ্চল্য অস্থিরতা ও বেদনাকে যুগের চারণ কবি হিসেবে নজরুল তার কাব্য গানে মুখরিত

করে তুলেছিলেন। আর তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসে এঁকেছিলেন এ যুগের জীবন্ত প্রতিরূপ। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তার নজরুল স্মৃতিকথায় বলেন “এক সময় বোধ হয় তিনি কোন ভূতপূর্ব বৈপ্লবিকের সহিত পরিচিত হন এবং তাহাদের অতীত কার্যের কাহিনি শ্রবণ করেন। এই সময় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পথের দাবী’ প্রকাশিত হয়। এই সময়েরই পুস্তক হইতেছে কবির ‘কুহেলিকা’। এই পুস্তক অতি উচ্চস্তরের সাহিত্য। এই নভেলের লেখক তথাকথিত হিন্দু সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিকের সহিত মুসলমান যুবকের ও দেশপ্রেম জনিত ত্যাগের অতি উচ্চাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রমত্যদার নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতার জন্য জমিদারের পুত্র জাহাঙ্গীরের প্রাণ বিসর্জন পর্যন্ত করতে দৃঢ় সংকল্প ও শেষে দ্বীপান্তর গমন, এই বর্ণনা গঙ্গা যমুনার মিলনের ন্যায় সুমহান হইয়াছে।” উপন্যাসটি উৎকৃষ্ট শ্রেণির হয়েছে কিনা সে কথা বলা যায় না। তবে এর মধ্যে দিয়ে নজরুলের রাজনৈতিক জীবন দর্শন রূপায়িত হয়েছে— বিভিন্ন চরিত্রের এবং তাদের দেশ মাতৃকার মুক্তিপণের জন্য জীবন বলিদানে একথা বলাই যায়।

১৯৩৪ সালে আষাঢ় মাসে মাসিক ‘নওরোজ’ পত্রিকায় কুহেলিকা উপন্যাসের প্রথম অংশ প্রকাশ লাভ করে। পরে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলে ‘সওগাত’ পত্রিকায় সম্পূর্ণ উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৩১ সালে গ্রন্থাকারে উপন্যাসটি প্রকাশ পায়। উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয় তরুণ কবি হারুনের মেসে তাঁর রচিত ‘নারী কুহেলিকা’ নামক কবিতা নিয়ে বিতর্ক দিয়ে। নারী সম্পর্কে যে যার মত ব্যক্ত করলেও জাহাঙ্গীর যার প্রকৃত নাম (উলঝলুলক) নারী সম্পর্কে নেতিবাচক মত পোষণ করেন। সেই এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। পড়াশোনার জন্য কলিকাতায় থাকলেও তাদের জমিদারি ছিল কুমিল্লাতে। যে কারণে বিপুল জমিদারের উত্তরাধিকারী সে। পিতার মৃত্যুর পর তার মা জমিদারীর দেখাশোনা করেন। “জাহাঙ্গীর যখন জননী জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া সবেমাত্র শ্রদ্ধা নিবেদন করতে শিখিয়াছে সেই সময় অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সে শুনিলো তাহার মাতা কলিকাতার একজন ডাকসাইটে বাঈজি এবং তাহার পিতা চিরকুমার। সে তাহার পিতামাতার কামজ সন্তান। সেই দিন হইতে তাহার চোখে সুন্দর পৃথিবীর রং বদলাইয়া গিয়াছে। মানুষের জীবনের অর্থ নূতন করিয়া বুঝিবার সাধনা করিতেছে।”

তখন স্বদেশি আন্দোলন দিকে দিকে সংগঠিত হচ্ছে। এরকম অবস্থায় শিক্ষক প্রমত্তদা কিছুটা নিয়মের বিপরীতে গিয়েও জাহাঙ্গীরকে বিপ্লববাদের মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। তাদের সকলের অধিনায়ক বজ্রপাণি মহাশয়কে তারা ভগবানের মতো শ্রদ্ধা করতেন। তার নেতৃত্বেই চলত তাদের গুপ্ত বিপ্লবী কর্মকাণ্ড যার কাছে জাত-পাত নয় মানবতাই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমরা প্রমত্তদার ভারত অন্বেষণটি তারই বক্তব্যে পাই। তিনি বলেন—“আমার ভারত এ মানচিত্রের ভারতবর্ষ নয় রে অনিল। আমি তোদের চেয়ে কম ভাবপ্রবণ নই, তবু আমি শুধু ভারতের জল-বায়ু-মাটি-পর্বত অরণ্যকেই ভালোবাসিনি! আমার ভারতবর্ষ ভারতের এই মূক দরিদ্র, পদদলিত তেত্রিশকোটী মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ ইণ্ডিয়া নয়, হিন্দুস্থান

নয় গাছপালার ভারতবর্ষ নয়—আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন তীর্থ। কত অশ্রু সাগরে চড়া পড়ে পড়ে উঠল আমার এই বেদনার ভারতবর্ষ। ওরে এ ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানদের মসজিদের ভারতবর্ষ নয়; —এ আমার মানুষের মহা-ভারত।" —এভাবেই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে জাহাঙ্গীরের ভারত অন্বেষণ শুরু হয়। গ্রীষ্মের ছুটিতে বন্ধু হারুণের বাড়ি সিউড়িতে গিয়ে পরিচয় হয় হারুণের বড়ো বোন ভূণী (তহমিনা)র সঙ্গে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তারা জড়িয়ে পড়ে অদৃশ্য বাঁধনে। জাহাঙ্গীর তাকে ভালোবাসলেও বিয়ে করতে অপরাগ। কারণ বিপ্লবীদের বিয়ে করতে নাই। এক দিকে প্রেম, অপরদিকে নানা বৈপ্লবিক নানা গুপ্তকর্মকাণ্ড। পুলিশের চোখে ধুলা দিয়ে গুপ্ত খবর পাচার, অস্ত্রসস্ত্র পাচার, গুপ্ত বৈঠক চলতে থাকে। পরিচয় হয় বিপ্লবী জয়তীদির সঙ্গে। তিনি জাহাঙ্গীরকে সন্তানসম মনে করে মাসিমা বলার অনুমতি দিয়েছিলেন। অন্যদিকে মা সন্তানকে গৃহী করতে চায় চম্পার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে। কিন্তু সব কাহিনি অসমাপ্ত থেকে যায়। সংবাদপত্রে ঘটনাটি প্রকাশ পায়। বিপ্লবীদের ভীষণ জার্মান ষড়যন্ত্র প্রকাশ পেয়েছে। পুলিস সারা দেশ ব্যাপী জাল ফেলে শত শত যুবককে কারারুদ্ধ করেছে। সংবাদপত্রে ঘটনাটি প্রকাশ পায়। বিপ্লবীদের ভীষণ জার্মান-ষড়যন্ত্র প্রকাশ পেয়েছে। পুলিশ বজ্রপাণি প্রমত্তদা এবং জাহাঙ্গীর (ছদ্মনাম স্বদেশকুমার)-এর দ্বীপান্তর হয়; জেলের গেট বন্ধ হয়ে যায়—বাইরে তখনও তিন নারী দাঁড়িয়ে থাকে অনন্ত প্রতীক্ষায়।

আমরা আগেই বলেছি 'কুহেলিকা' উপন্যাসটিতে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি'র প্রভাব রয়েছে প্রমত্তদা ও বজ্রপাণী যথাক্রমে এম এন রায় এবং বাঘা যতীনের চরিত্র অবলম্বনে রচিত। প্রমত্ত চরিত্র নির্মাণে নজরুল স্কুল শিক্ষক নিবারণ চন্দ্র ঘটকের প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। তরুণ বিপ্লবীদের কাছে বিনোদবালা ছিলেন মাতৃসুলভ চরিত্র। তিনি ছিলেন বিপ্লবীদের শ্রদ্ধা, আশ্রয়-প্রশ্রয় ও সাহসের নির্ভয়স্থল। জয়তীর চরিত্র সৃষ্টিতে নজরুলের অবচেতন মনে বিনোদবালা দেবীর ছায়া পড়ে থাকতে পারে। তিনি ছিলেন বাঘা যতীনের দিদি। বাঘাযতীন এম এন রায় প্রমুখেরা জার্মানি থেকে অস্ত্র নিয়ে এসে ভারতকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করেছিলেন। এ বিষয়ে জার্মানির সঙ্গে কিছু আলোচনাও হয়েছিল। 'কুহেলিকা' উপন্যাসে এ বিষয়টিও রয়েছে। সুতরাং অগ্নিযুগের পুরোপুরি রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবে 'কুহেলিকা' নজরুলের বিপ্লবী চেতনার অপূর্ব উপাখ্যান—একথা বলাই যায়।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। নজরুল বীথিকা- কবি নজরুল ইসলাম, সাহিত্যম, কলকাতা।
২। নজরুল স্মৃতিমাল্য, সম্পাদনা- হরিপদ ঘোষ, কামিনী প্রকাশনালয়, কলিকাতা।
৩। রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল - আসরফী খাতুন, এবং মুশায়েরা, কলিকাতা।
৪। নজরুল সাহিত্যে সমাজভাবনা-ড. কমলচন্দ্র মণ্ডল, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা।

দ য়া ম য় রা য়

নজরুলের গানে লোকমান লোকপ্রাণ

কাজী নজরুল ইসলাম আজ থেকে একশ' পঁচিশ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক কুঁড়ে ঘরে অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত এক দুর্বল পরিবারে। বাবা কাজী ফকির আহমদ, মায়ের নাম জাহেদা খাতুন, নজরুলের ডাকনাম 'দুখুমিঞা' ও 'তারাখ্যাপা'। অল্প বয়সেই পিতার মৃত্যুজনিত কারণে রাণীগঞ্জে বাবুর্চিগিরি, আসানসোলে রুটির দোকানে চাকুরি, ১৯১৭ সালে ৪৯ নং বাঙালি পল্টন বিভাগে চাকুরি, হাবিলদার পদে উন্নীত হন। ১৯২০ সালে বাঙালি পল্টন বিভাগ ভেঙে ফেলে দেওয়া হয়। ১৯২২ সালে আনন্দময়ীর আগমনকে ও ভিন্ন একটি রচনার জন্য কুমিল্লায় গ্রেপ্তার হন। ১৯২৩ সালের জানুয়ারি মাসে এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড। ১৯৩০ সালে 'প্রলয়শিখা' রচনার জন্য ছ'মাসের কারাদন্ড কিন্তু কার্যকর হয়নি। ১৯৪২ সালে অসুস্থ হন, লুম্বিনীপার্ক, রাঁচির ফেটাল হাসপাতাল হয়েও সুস্থ হননি। ১৯৫৩ সালে প্রথমে ইংল্যান্ড পরে জার্মানিতে চিকিৎসা কিন্তু রোগ সারানো দূর-অস্ত। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে গমন এবং জাতীয় কবির স্বীকৃতি প্রদান অবশেষে ১৯৭৬ সালের ২৯ শে আগস্ট কবি প্রয়াত হন।

১৯২১ এর বিদ্রোহী কবিতা রচনা থেকে ১৯৪২ সাল এই একুশ বছর বয়সে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা মহাজীবনের সৃষ্টি। কবি নজরুল, সংগীত শিল্পী-সংগীতকার নজরুল, সুরের রাজা নজরুল, মানুষের কবি-বিদ্রোহী কবি নজরুল, সাংবাদিক নজরুল, অনুবাদক নজরুল, বহুভাষাবিদ নজরুল। চারণ কবি নজরুল, বিজ্ঞাপন রচয়িতা নজরুল, বেতার শিল্পী নজরুল, সিনেমা শিল্পে নজরুল, ছোটগল্পকার নজরুল, সাধক কবি নজরুল—এ রকম বহুবিধ অভিধায় ভূষিত নজরুল বিদ্রোহের, বিপ্লববাদের সমর্থক কবি নজরুল জীবনের উত্তাল দিনে নেমে পড়েছিলেন পথে। ধর্মের গ্লানি, জাতির হানি, মনুষ্যত্বের যা কিছু পীড়ন তার বিরুদ্ধে গান-কবিতা লিখে কর্ম সম্পাদন এবং সশরীরে অংশগ্রহণ করেন।

নজরুলের কাব্য সাধনার সাধারণত তিনটি স্তর—

১) জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। ২) সাম্যবাদী চিন্তা ভাবনা ৩) সংগীত প্রধান কাব্যকৃতি।

নজরুলের গান তন্মধ্যে তাঁর জীবনের একটি উজ্জ্বলতম দিক রূপেই চিহ্নিত। লেটোগান দিয়েই কবির গানের জগতে প্রথম পদার্পণ ঘটে করিম চাচার অনুপ্রেরণায়। তিনিই কিশোর নজরুলের মনে লেটোগানের জগতে নিয়ে আসেন। লেটো গান পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষতার আদলে গড়া। বন্দনা দিয়ে যে গান শুরু—আল্লার কাছে দোয়া প্রার্থনার সাথে সাথে হিন্দু দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হতো। লেটো গান রাঢ়ের এক অনন্য সম্পদ। লেটো পালাগান নিয়ে নজরুলের সম্পৃক্ততা সুগভীর—তিনি পঁচিশটা লেটোপালা রচনা করেন।

দেখ রুস্তম আলি লেটো দলের শিল্পী, মলিন্দ বাউরি লেটো দলের অভিনেতা, চাকরা গোদা এবং সর্বোপরি রজলে করিম এঁরা সকলেই নজরুলকে লেটোগানের দলে যুক্ত করেন। তিনি অভিনয়ে অংশ নিতে থাকেন, পালাগান লিখতে থাকেন, এভাবেই শকুনি-বধ, চাষার সঙ্, মেঘনাদবধ, আকবর বাদশা, দাতাকর্ণ, কবি কালিদাস, বিদ্যাভূতম ইত্যাদি প্রায় পঞ্চাশটি পালার তিনি রচয়িতা। লেটোগানের পালায় প্রথম দিকের গানগুলি সেই মনের না হলেও ধীরে ধীরে এ ব্যাপারে প্রচুর উন্নতি ঘটান—

১. ‘আয় পাষন্ড যুদ্ধ বদ তুই
দেখব তোরে।’
প্রত্যেকবারের পরাজয়ে লাজ নাই অন্তরে?

২. কবির রসাত্মক শকুনিবধ পালায় লেখেন—
‘শিবা হয়ে পরাজিতে পশুরাজে সাধ?
জ্ঞান নাই কি তোর কান্ডাকান্ড
হয়েছিস উন্মাদ।’

৩. ‘সিন্ধু বধের সঙ’- পালায় সুন্দর ছন্দের মাধুরীতে লিখেছেন অমর পালা—
‘বুকেতে বান মারিল, পরান জ্বলে যায়।
পরান জ্বলে যায় গো আমার, মরিবেদনায়।।
কে মারিল জ্বলন্ত বান,
হারাইব এবার পরাণ,
অন্ধ পিতামাতা আছে, কে দেখিবে তায় গো—
কেঁদে খিবে তায়।
ওরে নিষ্ঠুর বাঁধিলি প্রাণ।
কিশোর মেরে পাবি না ত্রাণ, দয়া কি তোর নাই।
দুখুকাজী ভেবে বলে,
লেটোর এই আসর তলে,
জল তরনের শব্দ তুলে, মরলে তুমি ভাই।

(চুরুলিয়া ও নজরুল কথার নানা প্রসঙ্গ, অমর চট্টোপাধ্যায়, শচীনন্দন পাল, যোধন প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-৫৫-৫৭/১১ই জ্যেষ্ঠ, ১৪২৫)।

কাজী নজরুল ইসলাম গান নিয়ে চর্চা করেছেন অকৃত্রিম অধবসায়ে সুগভীর আবেগ মিশ্রিত ভালোবাসায়—কবিতা এবং সংগীত এই দুই ধারায় সমানভাবে দক্ষতা দেখিয়েছেন—কবি যেন ‘আমি ছেড়ে বাঁশি ধরলেন।’ তাঁর গানের সুর, ভাষা, রাগ, বৈচিত্র্য অনন্য সাধারণ।

হয়তো লেটো গান থেকে গজল গান এই তাঁর সূত্রধার। গানের ক্ষেত্রে তিনি দেশ-দেশপ্রেম-প্রকৃতি, গণমুক্তি-সংগ্রাম ইত্যাদি বিভিন্ন মনোভাবকে প্রকাশ করেছেন নজরুল। মুটে-মজুর, শ্রমিক সাধারণ সহ মানুষের জীবন সংগ্রামের কথা, আস্থা বিশ্বাসের কথা লিখতে পেরেছেন বলেই গানগুলি এত সমাদর লাভ করেছে। এছাড়া কোরাম গানের ক্ষেত্রেও তিনি চূড়ান্ত সফল। যেমন, নজরুলের মার্চ সংগীত অত্যন্ত সমাদর লাভ করে—

১. ‘উর্দ্ধে গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরনীতলা।

২. ‘টলমল টলমল
পদভরে বীরদল চলে সমরে।’ —ইত্যাদি গান অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

আবার নিম্নলিখিত গানগুলি জন সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়, যেমন—

১. ‘বাচিগায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসলে আজি দোল’

২. ‘নহে নহে প্রিয়, এ নয় আখিঁজল।’

৩. ‘এত জল ও কাজল চোখে পাষাণী আনলে বল কে?’

৪. ‘আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী।’

৫. ‘চেয়ো না সুনয়না, আর চেয়ো না ওই নয়ন পানে।’

৬. ‘কেন আন কুলডোর আজি এ বিদায় বেলায়।’

ইত্যাদি গানগুলি গেয়েছেন দিলীপ কুমার রায়, ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া, শচীন দেব বর্মন প্রমুখ শিল্পীরা।

আর কি গান তিনি লেখেননি ইসলামী সংগীত, নবীর গান, ছাদ-পেটানো গান, ঝুমুর গান, ভাটিয়ালী গান, শ্যামা সংগীত, চিনা সংগীত, লাডানগীত, আরবী সংগীত, দ্বীপের গান কি-ই না তিনি লিখেছেন। অন্যদিকে বাংলা গানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যেমন দেশী ও বিদেশী গানের সুর মিলিয়ে সংগীতের নতুন জগত নির্মাণ করেন, কাজী নজরুল ইসলাম সেই ধারাতে মধ্যপ্রাচ্যের সুর-সংগীতকে যুক্ত করলেন। সুরা ও সাকী, প্রচন্ডরোধের সাথে খেজুর গাছের প্রসঙ্গে যুক্ততা বাঙালির স্বাদ বাড়িয়ে তুলেন। যেমন - নজরুলগীতি।

১) ‘দূর দ্বীপবাসিনী চিনি তোমারে চিনি।’

২) ‘হে আমারই বাংলাদেশ।’

৩) ‘রুম ঝুম্ ঝুম্ খেজুর পাতার নূপুর বাজা য়ে কে যায়।’ (আরবী সুর)।

৪) ‘শুকনো পাতার নূপুর পায়ে।’

৫) ‘মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে।’ (মিশরীয় সুর) ইত্যাদি গানগুলির মধ্যে নতুনত্ব ধারা বলেই মনে করেন সংগীত বিশারদ গান। (কাজী নজরুল ইসলামের পুত্র কাজী অনিরুদ্ধের লেখার তার সাক্ষ্য মেলে।)।

প্রখ্যাত সুরকার সংগীত স্রষ্টা সলিল চৌধুরী অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই তুলে ধরেছেন— ‘গানের ভূবন নজরুল ভরিয়ে তুলেছিলেন স্বরচিত গানে আর সুরে। সঙ্গীতের প্রতিটি বিভানেছিল তার অবাধ পদসঞ্চার। তাঁর ভক্তিমূলক শ্যামা সংগীত, ইসলামী গান, দেশাত্মবোধক, মার্চ-সংগীত আর পল্লী- বাংলার শ্যামলতা মাখানো বাউল-ভাটিয়ালী ঝুমুর কীর্তন প্রভৃতি গীতির কথা ভুলবার নয়।’ (নজরুলের হাসির গান’-সলিল চৌধুরী) (পৃষ্ঠা-১৪৮)

কাজী নজরুল ইসলাম যেহেতু আসানসোল কয়লাখনি অঞ্চলের মানুষ। সেকারণেও ঝুমুরভূম মানভূমের তার একটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কেননা লোক গীতি অর্থাৎ লোক সংস্কৃতির প্রতি নজরুলের একটা অদ্ভুত ভালোবাসা জড়িয়ে রেখেছিল। সাধারণতভাবে বাউল গান, সারী গান, ঝুমুর গান, ভাটিয়ালী গান আবহমান কাল থেকে লোক কবিতাকে লোক ধর্মকে লোক শিল্পকে জাগরুক করে রেখেছে। নজরুল সেই ধারার কবি বা শিল্পী না হয়েও স্থির প্রতিভার জোরে লোকগীতিতে একটা বৃহৎ জগত গড়ে তুলেছেন। এবং সেরূপ গানের সংখ্যাও প্রায় ১৫০র মতো। অর্থাৎ নজরুল বৈচিত্র্যময় সংগীত রচনা করেছেন। তিনি বেদে বেদিনীদের গান বা ঝাপানোর গান রচনা করেন। দেহবাদী ঈশ্বর সাধনার অধ্যাত্ম সংগীত সাধনার অধ্যাত্মসংগীত বাউল গান রচনা করেন বিল কিছু। ভাটিয়ালী বেশ কিছু গান রচনা করে ময়মন সিং, সিলেটের বা নদীকেন্দ্রিক মাঝি মাল্লদের জীবনের যে গান সে রকমও অনেক গান রচনা করেন। এ সব গানের উদাহরণ দিলে ধারণাটি ঈরও সুস্পস্ট হতে পারে-ভাটিলায়ী গান—

১) ‘একূল ভাঙে ও কূল গড়ে নদীর খেলা।’
২) ‘পদ্মার ঢেউরে।’
৩) ‘আমার গহীত জলের নদী।’
৪) ‘কূলভাঙা নদীরে...’।
৫) ‘আমার সাম্পান যাত্রী না লয়...।’
৬) ‘বন বিহঙ্গ যাও রে উড়ে....।’
৭) ‘ওরে মাঝি ভাই ....’।
৮) ‘কুচবরণ কন্যারে তো....।’
৯) ‘কোন বিদেশের লইয়া।’
১০) ‘শ্যামা নামের ভেলায় ...’।

ভাটিয়ালী সুর লক্ষ্য করা যায়।

আবার ভাওয়াইয়া গানো তিনি লিখেছেন।

বাউল গানের সুর আত্মস্থ করেছেন নিম্নোক্ত গানে—

১) 'আমি বাউল হলাম ধূলি পথে ....।'

২) 'আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল....।'

৩) 'মোর লীলাময় লীলা করে ....।'

৪) 'তুমি দুঃকের দেশে এলে বলে ....।'

৫) 'ভবের এই পাশা খেলায় ....।'

৬) 'বেরুয়া রঙ মেঠো পথে বাঁশরি বাজারে কে যায়।' প্রভৃতি।

সাঁপুড়েদের বা বেদে বেদেনীদের গান লিখেছেন, 'সাপুড়ে, ছবিতেও তার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়—

১) 'হলুদ গাঁদার কুল....।' ২) 'কল কইবে না।' ৩) 'আকাশে হেলান দিয়ে।' কিংবা

১) 'আয়লো বনের বেদেনী।'

'ওঠাও ডেরা এবার দূরে যেতে হবে।'

২) 'কলার মান্দাস বানিয়ে দাও গো শ্বশুর সওদাগর।'

৩) 'চিকন কালো বেদের কুমার।'

৪) 'ছন্নছাড়া বেদের দল'

৫) বেদে বেদিনীর ছুটে আয়।

৬) 'ঝাপুড়িয়ারে বাজাও' ইত্যাদি গানে তাদের জীবন চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

অন্যদিকে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা লোকগানের ধারায় বিভিন্ন শাখায় নানান গান রচনা করে লোক সংগীতের জগতকে দৃপ্তময় করে তুলেছেন। সেই জগতে ঝুমুর গান একটা চড়ো জায়গা দখল করে আছে—

ঝুমুর গানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থেকেই এই গানের ধারায় তিনি প্রবেশ করেন। ঝুমুর এক ব্যতিক্রম গানের ধারা-সেই ধারায় বাঁশি মাদলের সহযোগে সাধারণ মানুষের জীবন কথা, প্রেম কথা, রাধাকে প্রেম বিষয়ক গান, প্রকৃতি নির্ভর কবিতা বা গান রচনা করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

১) 'এই রাঙা মাটি পথে লো ......।'

২) 'পিয়ে ঝুমঝুম ঝুমরা নাচ ....।'

৩) 'কালো জলও ঢালিতে ....।'

৪) চুড়ির তালে নুড়ির মালা ....।'

৫) ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছে গাছে...।'

৬) 'চোখ গেল পাখির।' ইত্যাদি গানে নজরুম ঝুমুরের সুর-তাল-লয় মান রাগ রাগিনীর ব্যবহার করেছেন। (সূত্রঃ-লোকগীতির ধারায় কাজী নজরুলের গান।'- কল্যানীবানী।

এছাড়া অনেক কবিতার নামকরণই গান সংক্রান্ত—

১) ছাত্র সংগীত—

'জাগো রে তরুণ জাগোরে ছাত্রদল স্বতঃ উৎসারিত ঝর্ণা ধারার প্রায় - জাগো প্রাণ চঞ্চল।'

২) তরুণের গান—

'যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বগ্র শিরে ধরি'
ঝড়ের বন্ধু, আধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙাতরী।'

৩) ছাত্রদলের গান—

'আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মুর্ছে বিমান
উর্দ্ধে বিমান ঝড় বাদল
আমরা ছাত্রদল।'

৪) মোহান্তে মোহ-অন্তের গান—

'জাগো আজ দন্ড হাতে চন্ড বঙ্গবাসী।
ডুবাল পাপ-চন্ডাল তোদের বাংলা দেশের কাশী।
জাগো বঙ্গবাসী।'

৫) বন্দনা গান—

'শিকলে যাদের উঠেছে বাহিয়া ধীরের মুক্তি তরবারি।
আমরা তাদেরি ত্রিশকোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীত তারি।'

৬) মুক্তি সেবকের গান—

'ও ভাই মুক্তি - বেবক দল!
তোদের কোন্ ভায়ের আজ বিদায়-ব্যথায় নয়নি ছলছল?

৭) শিকল পরার গান—

'এই শিকল পরাজল এ শিকল-পরাছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবরে বিকল।

৮) বিজয় গান—

'ঐ অভ্রভেদী তোমার ধ্বজা
উড়ল আকাশ পথে।
মাগো, তোমার রথ-আনা ঐ
রক্ত সোনার পথে।

এছাড়া নজরুলের অন্যান্য আরও অনেকগুলি গানের কথা উল্লেখ করতে পারি—

১) 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল।
আজো তার ফুল কালদের ঘুম টুটেনি তন্দ্রাতে বিলোল।।

২) 'নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখী জল
মলিন হয়েছে ঘুমে চোখের কাজল।

৩) 'এত জল ও কাজল চোখে, পাষানী আনলে বলকে।
টলমল জল-মোতির মালা দুলিছে ঝালর-পলকে।'

৪) 'আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদি।
খুলে দাও রং মহলার তিমির-দুয়ার ডাকিলে যদি।

৫) 'চেয়োনা সুনয়না আর চোয়নোনা এ নয়ন পানে।
জানিতে নাইকো বাকি, সই ও আঁখি কি যাদু জানে।'

৬) 'কেন আন ফুল জের আজি বিদায়-বেলা।
মোছ মোছ আঁখি চলার যদি ভাঙিল মেলা।'

১) 'দূর দ্বীপ বাসিনী চিনি তোমার চিনি।
দারুচিনির দেশের তুমি বিদেশিনী গো, সুমন্দ ভাষিনী।'

২) 'হে আমারই বাংলাদেশ।'??

৩) 'রুম ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম ঝুম্ ঝুম খেজুর পাতার নূপুর বাজায় কে যায়।
ওড়ল তাহার ঘূর্নি হাওয়ায় বদালে।

৪) 'শুকনো পাতার নূপুর পায়ে। লাগিছে ঘূর্নি ঝড়
জলতরঙ্গে ঝিলঝিল ঢেউ তুলে সে চায়।'

৫) 'মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে। নেচে যায—
বিবেল চঞ্চল পায়।।'

আসলে নজরুলের কবিতাই তাঁর জীবন, জীবনই তাঁর কবিতা, আর সেই জীবন বৃহৎ জীবন, মহৎ জীবন, যার প্রত্যয় গড়ে উঠেছে পরাধীনতার নাগপাশ, সামাজিক দীনতার, ধর্মীয় নীচতার, অর্থনৈতিক বেভ বুদ্ধির দুঃখ দুর্ভর অভিশাপ অনিয়মের গর্ভ থেকে । তাই তিনি বিদ্রোহ, বিপ্লবীর আদর্শ নিয়ে চারণ কবির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে গেয়েছেন গান। সে গান মুক্তির দূত রূপে, ভক্তির ধূপ রূপে, শক্তির ভূপ রূপে আদৃত হয়েছে মানবের কল্যাণে। মানুষের হৃদয়াবেগ যত তীব্র হবে নজরুলের গান। কবিতা ততই জীবন্ত হবে। সব ধারার সকল মানুষের জন্য সেই হৃদয়াদি গানে গানে প্রাণে প্রাণে উচ্চারিত হবে। লোক ভাবনার অনুষহরে গানগুলি, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, বাউল, ঝুমুর সারা গানের যে স্রোত তা লোক মানসের হৃদয় ভূমিকে আদ্র করে, সঞ্চিত করে মন্ত্রিত করে মোহিত করে স্পন্দিত

করে নন্দিত করে, ছন্দিত করে প্রতি মুহুর্তেই। ফলে যুগের এবং এ যুগের নয় সব যুগেই তার লোক প্রিয়তা, অস্বাদ্য প্রাণতা জাগরুক থাকবে এ কথা নিশ্চিত ভাবেই বলা যেতে পারে- 'সপন ভেঙে নিশুত রাতে জাগবে হঠাৎ চমকে / কাহার যেন চেনা ছোঁয়ায় উঠবে ও বুক ছমকে।'

তথ্য সূত্র ঃ

১। কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি কথা, মুজফফর আহ্মদ ।

২। নজরুলের জীবনও সাহিত্য, ড. সুশীল ভট্টাচার্য, ইনস্টিটিউড অভ্ এডুকেশনাল রিসার্চ এন্ড ইভ্যালুয়েশন, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৯।

৩। চরুলিয়া ও নজরুল কথার নানা প্রসঙ্গ, অমর চট্টোপাধ্যায়, শচীনন্দন পাল, যোধন প্রকাশনী, ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫।

৪। বিদ্রোহী বাংলা, কাজী নজরুল ইসলাম, সাহিত্যম সংকলন ও সম্পাদনা, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ।

৬। কবি নজরুল ও সঞ্চিতা, সম্পাদনা, দেবকুমার ঘোষ, শিলালিপি, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, ১৯৯৩।

জ য় শ্রী মু খা র্জী

প্রসঙ্গ 'মৃত্যুক্ষুধা'— নজরুলের জীবনাভিজ্ঞতার এক অনবদ্য প্রকাশ

বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলামের পরিচয় মূলত কবি হলেও তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। কবিতার সাথে রচনা করেছেন গান, দিয়েছেন সুর। লিখেছেন ছোটগল্প। ঔপন্যাসিকরূপে সাহিত্য জগতে তাঁর আবির্ভাব কল্লোলের কালে। বিশ শতকের দুইয়ের দশকে কল্লোল, কালিকলম, উত্তরা, প্রগতি প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এ যুগের তরুণ লেখকগোষ্ঠী সাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর যুগের সূচনা করতে চেয়েছিলেন। মূল লক্ষ্য ছিল বিদ্রোহ—চিরাচরিত মূল্যবোধ, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা, যা কিছু পুরাতন, জীর্ণ সব কিছুর বিরুদ্ধে। নৈরাশ্য, অবিশ্বাস, সংশয়ের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত তরুণ প্রজন্ম সেদিন হারিয়েছিল তার শুভচেতনা, বিশ্বাসের স্বাভাবিক প্রবণতা। আসলে "কল্লোলের সে যুগটাই ছিল সাহসের যুগ, যে সাহসে রোম্যান্টিসিজমের মোহ মাখানো।"[১] যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম রোমান্টিকতা। হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত বাঙালি যুবচিত্ত অনিশ্চয়তা, অস্থিরতার মধ্যেও জীবনের নতুন দিগন্ত সন্ধানের প্রেরণা লাভ করেছিল এই রোমান্টিকতা থেকে। কল্লোলপন্থীরা হলেন যৌবনচেতনার সেই শিল্পী যাঁরা ধ্বংসের উপর দিয়ে অনির্দেশ্য সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। উদ্‌ভ্রান্ত বিহ্বলতার মধ্যেও স্বপ্ন দেখেছেন তাঁরা সৃষ্টির। কাজী নজরুল ইসলাম যৌবনচেতনার এমনই এক শিল্পী।

'বাঁধনহারা'(১৯২৭), 'মৃত্যুক্ষুধা'(১৯৩০), 'কুহেলিকা'(১৯৩১) মাত্র তিনটি উপন্যাস রচনা করে নজরুল ইসলাম স্মরণীয় হয়ে আছেন বাংলা উপন্যাসের জগতে। মুসলমান সমাজের চিত্র বর্ণিত উপন্যাসগুলিতে। পরাধীন ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থান, তাদের মূল্যবোধ তথা চিন্তা-চেতনার দিকটি অনেকটাই পরিস্ফুট। বিশেষত 'কুহেলিকা' ও 'বাঁধনহারা' উপন্যাসদুটিতে। তবে জীবন যন্ত্রণার উপলব্ধিতে 'মৃত্যুক্ষুধা' শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। নিম্নবিত্ত মুসলমান সমাজের শ্রমজীবি মানুষগুলির কঠোর জীবন সংগ্রাম খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন নজরুল। কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত চাঁদ-সড়ক এলাকার শ্রমজীবী খ্রিস্টান ও মুসলিমদের নিয়ে রচিত 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার ফসল। ১৯২৬-এ তিনি কৃষ্ণনগরে আসেন ও চাঁদ সড়ক এলাকায় বসবাস শুরু করেন। ১৯২৯ পর্যন্ত এখানে ছিলেন। অশেষ দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কেটেছে চাঁদ সড়কের দিনগুলি। জীবনের নিত্য অভাব-অভিযোগের সাথে আপোষ করে, লড়াই করে কোনক্রমে নিজ অস্তিত্বটুকু বজায় রেখে চলা এই অঞ্চলের খেটে খাওয়া মানুষগুলির জীবন-যন্ত্রণা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। চরম দারিদ্র্যের চাপে নিষ্পেষিত মানুষগুলি একটু একটু করে মরে প্রতিনিয়ত। অথচ কী অসীম আগ্রহ বেঁচে থাকার! খ্রিস্টান মিশনারীরা ধর্মান্তরিত করে

তাদের অসহায়তার সুযোগে, তোলে ভেদের প্রাচীর। কিন্তু অনন্ত দুঃখ-যন্ত্রণার কাছে বুঝি তা বালির বাঁধের মতই ভঙ্গুর! দুঃখ-দুর্দশার অকূল পাথারে ভাসমান বিপন্ন মানুষগুলি তাই একে অপরের দিকে বাড়িয়ে দেয় সাহায্যের হাত। খ্রিস্টান-মুসলমানের কোন পার্থক্য নেই সেখানে। এই না ভোলা দুঃখের পাথারে এরা যেন চর-ভাঙা গাছের শাখা ধরে ভেসে চলেছে। জীবনের প্রতিকূলতায় আসে কাছাকাছি, আবার বিপর্যয়ের স্রোত সব বন্ধন ছিন্ন করে কোথায় নিয়ে যায় কে বলতে পারে! চাঁদ-সড়কের ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষগুলিকে নিয়ে যেন পুতুল নাচের ইতিহাস রচনা করেছেন ঔপন্যাসিক নজরুল।

প্যাঁকালে-মেজবউ-রুবি-আনসারের খেলাঘর রচনার ব্যর্থ প্রয়াস পুতুল খেলার কৃষ্ণনগরে। চাঁদ-সড়কের গজালের মায়ের সংসারে পোষ্য অনেক কিন্তু রোজগেরে মাত্র একজন। জোয়ান ছেলেদের মৃত্যুতে পরিবারের একমাত্র ভরসা প্যাঁকালে। বৃদ্ধা মা, রুগ্ন ভাবী ও প্রায় বারোজন ক্ষুধার্ত ভাইপো-ভাইঝির গ্রাসাচ্ছাদনের দায়িত্ব তারই। রাজমিস্ত্রির কাজ করে সে যেটুকু পায় কোনক্রমে সংসার চলে। অনাহারে, অর্ধাহারে অতিবাহিত প্রতিটি দিন যেন পরিবারের মানুষগুলির অটুট জীবনীশক্তির সাক্ষ্যস্বরূপ। ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করে ছোট্ট শিশু, সেজবউ বিনা চিকিৎসায় মরণাপন্ন, কোলের শিশুটি তার একফোঁটা দুধের অভাবে তিলে তিলে মরে। আবার এরই মাঝে জন্ম নেয় নতুন এক প্রাণ। জন্ম-মৃত্যুর চক্রাকার আবর্তন যেন এখানে বড় বেশি স্পষ্ট। গজালের মায়ের ছোট মেয়ে পাঁচি জন্ম দেয় এক পুত্র সন্তানের। নবজাতকের আগমন ক্ষণিকের জন্য নিরন্ন মানুষগুলির মনে আনন্দ আনে। সাদরে অভ্যর্থনা জানাতে না পারলেও খুশির আমেজে মেতে ওঠে সবাই। মুসলমান পাঁচির সন্তান জন্ম নেয় খ্রিস্টান ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এ এক নবরূপ!

মুসলমান সমাজের চিত্র নজরুল ইসলাম তাঁর উপন্যাসে এনেছেন অথচ কোনরকম গোঁড়ামি বা বিদ্বেষ আমরা লক্ষ্য করি না। মিলনের সুর সর্বত্র। লোভ দেখিয়ে দরিদ্র, নিরক্ষর মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ যেমন জানিয়েছেন তেমনি গর্জে উঠেছেন মুসলমান সমাজের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে। একমুঠো অন্নের জন্য করুণ আর্তনাদ শুধুমাত্র মুসলমান সমাজের নয়, ইংরেজ শাসনে পিষ্ট হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীর ছিল সেদিন। ক্ষুধার্ত শিশুর মুখে দারোগা মির্জা সাহেবের বাড়িতে বেড়ালে না খাওয়া দুধটুকু তুলে দিতে দ্বিধাবোধ করে না মেজবউ। সে দুধের সাথে ক্ষুদগুঁড়া মিশিয়ে তৈরি ক্ষীর অনাহারে জীর্ণ শিশুগুলির কাছে অমৃততুল্য। "লবণ সংযোগে শিশুদের সেই অপূর্ব পরমান্ন খাওয়া দেখে চক্ষে জল এল শুধু মেজ-বৌর।"[২] অর্থই যে সংসারের মূল চালিকা শক্তি, অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপায় দারিদ্র্যের চাপে নিষ্পিষ্ট ছোট্ট শিশুরও তা বুঝতে বাকী থাকে না। জীবিকা অন্বেষণের প্রচেষ্টায় বিনষ্ট তাদের শৈশব —

"আমিও কাল থেকে দারোগা সায়েবের খুকির গাড়ি ঠেলব — হুঁ হুঁ! আমায় সায়েব তিন ট্যাকা করে মাইনে দেবে বলেছে! দু'আনা লয় — তিন ট্যাকা। আমিও তখন ছোট্-চা'কে দিয়ে জিলিবি আর মেঠাই আনাব।"[৩]

নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের নজরুলের শৈশব অতিবাহিত অমানুষিক কৃচ্ছ্রসাধনে। দারিদ্রের কঠিন চালনায় মাত্র এক টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আটার কলে কাজ গ্রহণ করতে হয়েছে, আর্থিক অনটনের জন্য স্কুল ছেড়ে দিয়ে সামান্য মক্তবে মাষ্টারী করতে হয়েছে।[৪] গরিবির যন্ত্রণাকে এতটা কাছ থেকে দেখেছেন তিনি। তাই বোধহয় মানুষের প্রতি দরদের অন্ত ছিল না। জীবনের প্রতিটি বাঁকে ছিল তাঁর অভিজ্ঞতার উপকরণ। উপন্যাসের উপাদান সংগৃহীত সেখান থেকেই। তিনি মনে করতেন —

"চাষারাও আয়না রাখে, নিজেদের চেহারা যদি তার মধ্যে দেখতে পায় তবে যত্ন করে রাখবে...তাদের মত ক'রে, তাদের কথা, তাদের গল্প বলুন। তারা তা বুঝতে পারবে...বাহির থেকে দরদ দেখালে তারা বিশ্বাস করে না! তাদেরই একজন হতে হয়।[৫]

এই বাস্তবপ্রবণতা ছিল সে যুগেরই ফসল। কল্লোল পর্বের লেখকরা উচ্চবিত্তের সংসার থেকে ক্রমে সরে আসেন কয়লাকুঠি, বস্তি, ফুটপাতে থাকা অবহেলিত, অবজ্ঞাত মানুষের ভিড়ে। তাদের দারিদ্র্য কঠিন জীবনের—বর্ণনাই ছিল সেই যুগের সাহিত্যের মূল উপজীব্য। তবে এই জীবনকে কতটা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন এই তরুণ লেখকগোষ্ঠী, সংশয় প্রকাশ করেছেন সমালোচকগণ। এই বাস্তবতা তাঁদের মতে মধ্যবিত্তের রোমান্টিক ভাবাবেগ।[৬] বস্তি জীবন এলেও বস্তি জীবনের বাস্তবতা আসেনি এমন অভিযোগ কল্লোল পর্বের লেখকদের সম্পর্কে করা হলেও নজরুলের ক্ষেত্রে বোধহয় তা বর্তায় না। সর্বহারা মানুষের জীবনকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত চাঁদ-সড়ক এলাকায় বসবাস করেছিলেন ঔপন্যাসিক। সে অঞ্চলের মানুষগুলির দুর্দশার সাথে ভালোভাবেই পরিচয় ছিল তাঁর। পারস্পরিক রাগ-বিদ্বেষ, নৈতিক অধঃপতন, চারিত্রিক দুর্নাম সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছে দুমুঠো অন্নের তীব্র চাহিদা। জীবনের এই চরম সত্যটি তিনি অনুভব করেছিলেন। আত্মোপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে উপন্যাসে —

"ক্ষুধিত মানুষ — অভাব-পীড়িত মানুষের মত সকল দিক দিয়ে অধঃপতিত আর কেউ নয়! ক্ষুধা আছে বলেই ওরা কেবলই পরস্পরের সর্বনাশ করে। দু-মুঠো অন্নের অভাবে ওদের আত্মা আজ সকল রকমে মলিন...ওদের অভাব কত অতল অসীম, ওদের দুঃখ কত অপরিমেয়!...ক্ষুধার জ্বালায় মা তার ছেলের হাত থেকে কেড়ে খাচ্ছে...নিজের ছেলেমেয়েকে নরবলির জন্য বিক্রি করছে দু-মুঠো অন্নের জন্য।"[৭]

রাহুগ্রস্থ সূর্যের মতো চাঁদ-সড়কের মানুষগুলির বিড়ম্বিত ভাগ্য। মৃত্যু ও ক্ষুধার করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পায় না। উপযুক্ত চিকিৎসা ও খাদ্যের অভাবে মৃত্যু হয় 'সেজবউ' ও তার নবজাত শিশুটির। মৃত্যুর পূর্বে সেজবউ-এর শেষ খেদটুকু যেন সমস্ত বঞ্চনা, দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদ।

"কিছু না। আর এখন কোন কিছু পেতে ইচ্ছে করে না মেজ-বু! কাল পর্যন্ত আমার

মনে হয়েছে, যদি একটু ভালো খাবার-পথ্যি পেতুম — তাহলে হয়ত বেঁচে যেতুম। খোকার মুখে তার মায়ের দু-ফোঁটা দুধ পড়ত।"[৮]

এ তো সেজবউ এর অন্তিম ইচ্ছা নয়! জীবনের প্রতিকূলতার সাথে লড়াইয়ে ক্লান্ত, বুভুক্ষু মানুষগুলির হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে থাকা ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস। আপন দুর্ভাগ্যকে, বিপন্ন সময়কে জয় করার সৌভাগ্য তাদের হয় না। তাই পরাজিতের মত আত্মসমর্পণ করে নিয়তির নিষ্ঠুরতার কাছে। বেশি কিছু নয়, দু-বেলা ঠিকমতো খেতে পাওয়ার লোভে ধর্মান্তরিত হয় মেজ-বৌ ও তার ছেলেমেয়ে। তার খ্রিস্টান হওয়াটাকে মেনে নিতে পারে না মুসলিম সমাজ। 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' মসজিদের মোল্লা সাহেব প্যাঁকালের মাকে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেয়। শেষ সম্বল কয়টি ছাগল বিক্রি করে খরচ জোগায় সে। নইলে সমাজে যে পতিত থাকবে! এ যেন মুসলিম সমাজের রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ নজরুলের। যে সমাজে খাদ্যের অভাবে মানুষ মরে, নষ্ট হয় শৈশব, গৃহছাড়া গৃহের বধূ সেখানে এহেন গোঁয়ার্তুমিকে বিদ্রুপ করতে ছাড়েন না তিনি —

"ঘোড়ার ডিম! মেজ-বৌ হল খ্রিস্টান, লাভ হল পীর আর মওলানা সাহেবদের।"[৯]

খ্রিস্ট ধর্মে প্যাঁকালে ও কুর্শিও দীক্ষিত হয় জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে। মেজবউ এর সাথে বরিশাল পাড়ি দেয় তারা। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পিয়ন প্যাঁকালের বেতন মাসে পনেরো ও মিশনারি মেমদের ফাইফরমাস খেটে কুর্শি পায় মাসে কুড়ি টাকা। একপ্রকার হেসেখেলে চলে তাদের জীবন। চাঁদ সড়কের সেই যন্ত্রণাদগ্ধ জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছে। প্যাঁকালে-কুর্শির প্রেমজ সম্পর্ক পরিণতির কোন দিশা খুঁজে পায়নি। নিত্য দারিদ্র্যের চাপে পিষ্ট সম্পর্কের মধুরতা। আঠার-উনিশ বছরের প্যাঁকালের যৌবনের রঙিন দিনগুলি কাটে মৃত্যুক্ষুধার দুঃস্বপ্নে। স্বপ্ন পূরণ না হওয়ার যন্ত্রণাটা হয়ত পীড়াদায়ক, কিন্তু পরিবারের বুভুক্ষ মানুষগুলির করুণ আর্তনাদ আরো বেশি স্পষ্ট, তীব্র বাস্তব। প্যাঁকালে রোজের পয়সা থেকে চার আনা আলাদা করে রাখে, আর মনে করে আজ একটা আয়না কিনবেই। কিন্তু যেই বাড়িতে এসে বাজার করতে গিয়ে দেখে, ছ'আনায় সকলের উপযোগী চালই হয় না, তখন লুকানো সিকিটাও বের করতে হয় কোঁচড় থেকে।[১০] মুসলমান সমাজের এই চিত্র ইংরেজ শাসনাধীন সমগ্র ভারতবর্ষের চিত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত বাংলার প্রতিচ্ছবি।

কঠিন বাস্তবের মধ্যে স্বপ্নাতুর রোমান্টিকতার জাল বুনেছেন ঔপন্যাসিক। আদর্শবাদী বিপ্লবী আনসার দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ। জীবনের একদিক তার নীরস কর্তব্যে পূর্ণ। দেশের প্রতি, দশের প্রতি। কিন্তু অন্তর্জীবনে সে নিঃসঙ্গ প্রেমিক। রুবির ভালোবাসা তার কর্তব্যের পথে প্রেরণা সঞ্চার করে অথচ মিলনে অজস্র বাধা। দেশের মুক্তির জন্য নীরবে প্রত্যাখ্যান করে সে রুবিকে। অপ্রকাশিত ভালোবাসা এক মধুর বেদনা সৃষ্টি করেছে উপন্যাসে। যুগের হতাশা ও অবক্ষয়ে আর্ত আনসার রোমান্টিক জগতে আশ্রয় খুঁজেছে বারবার। তাই রহস্যময়ী মেজবউও তার স্বপ্নজগতের আশ্রয়দাত্রী হয়ে ওঠে। সহসা তার মনে হয় এই

পৃথিবীতে দুঃখ বলে কিছুই নেই, ও-যেন আনন্দেরই একটা দিক। সুন্দর সবকিছু, আকাশ-বাতাস, প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ। "মনে পড়ল অমনি সুন্দর-তরো চেয়ে সুন্দর রুবিকে— মেজবউকে। তার দুই চোখে দুই তারা— প্রভাতী তারা, সন্ধ্যাতারা— রুবি আর হেলেন...।"[১১] অন্যদিকে রুবির মতো মেজবউও আনসারের প্রতি সমর্পণ করে প্রাণ-মন। নায়কের নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা উপশম হয় নারীর প্রেমের স্পর্শে।

জীবনের শুভবোধের প্রতি আস্থা হারাননি ঔপন্যাসিক। প্রেমের জয়গান গেয়েছেন উপন্যাসে। মৃত্যুশয্যায় শায়িত আনসারের সাথে রুবির মিলন ঘটিয়েছেন। মৃত্যুকে করেছেন জয়যুক্ত। রুবির প্রেম স্পর্শে আনসারের ক্ষীণ হয়ে আসা জীবন-প্রদীপটি শেষবারের মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আনসারের শুধুমাত্র ভালোবাসা নয়, তার ভিতরে লালিত মারণ রোগটিকেও স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে রুবি। মৃত্যুর মধ্যে রচিত হয় তাদের মিলনগাথা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ' এ বলেছিলেন "এই সময়টা আমরা মৃত্যুর প্রেমে পড়িয়াছিলাম।"[১২] মৃত্যুর অতলান্তিক রহস্যময়তার সাথে প্রেমের গভীরতার সাদৃশ্য অনুভব করেছিলেন। নজরুলের অশান্ত প্রেমিক হৃদয় যেন মৃত্যুর মধ্যে খুঁজেছে শান্তির শীতলতা। তাই মৃত্যু-ভয়াল জীবনের প্রতি এক অমোঘ আকর্ষণ অনুভব করেছেন তিনি। আনসার ও রুবির নীড় রচনার স্বপ্ন পূর্ণতা যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে লাভ করেছে, অন্যদিকে সন্তানের মৃত্যু মেজবউকে মাতৃত্বের খোলস থেকে দিয়েছে মুক্তি।

উপন্যাসে মেজবউকে আমরা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে চলে যেতে দেখি বরিশালে। আনসারের প্রতি ব্যর্থ প্রেম সংসার থেকে ছিন্ন করে। কিন্তু পরিপূর্ণ বন্ধন-মুক্তি তখনও ঘটেনি তার। ভালোবাসার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তিলে তিলে গ্রাস করে। দূর প্রবাসে নিজ সন্তানের দুশ্চিন্তায় শঙ্কিত হয়ে উঠেছে বারবার। অথচ সংসার ত্যাগের পুর্বে সে যে মা, সে কথা সেদিন সে ভুলে গিয়েছিল। ক্ষণিকের সেই বিস্মৃতি চির অভিশাপ রূপে নেমে আসে তার জীবনে। আদরের খোকাকে হারাতে হয় তাকে। যন্ত্রণার আগুনে তিলে তিলে দগ্ধ মেজবউ হয়ে ওঠে খাঁটি সোনা। পূর্ণতায় উদ্ভাসিত। সন্তান হারানোর বেদনা নতুন রূপে জন্ম দেয় তাকে। "এ যেন তার আর এক নতুন জন্ম! সে যেন নবজন্মের নতুন লোকের নতুন মানুষ।"[১৩] ধর্মীয় কোন গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। ভালোবেসে যত বেদনা সে পেয়েছে তা যেন মাতৃহৃদয়ের স্নেহসুধারূপে শতধারায় উচ্ছ্বসিত আজ। হারানো খোকাকে সে নিরন্ন সর্বহারা শিশুদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে। তাদের বুকে টেনে নিঃস্ব, রিক্ত মেজবউ লাভ করেছে পরম শান্তি। কোন পরিচয়, বন্ধনের ডোরে তাকে আর আবদ্ধ করা যাবে না। সে যে মা! বিশ্বজননীকে প্রত্যক্ষ করি আমরা তাঁর মধ্যে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনেরই জয়গান গেয়েছেন ঔপন্যাসিক নজরুল।

উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে নায়ক-নায়িকার দুটি চিঠির মধ্য দিয়ে। রুবির বন্ধন-অসিষ্ণুতা ও আনসারের জীবন-তৃষ্ণা চিঠি দুটিকে দিয়েছে আলাদা মাত্রা। উপন্যাসকে করে তুলেছে

কাব্য সুরভিত। দুঃখ-জীর্ণ বাস্তবতাকে রোমান্টিক আবেগের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন ঔপন্যাসিক। তাই উপন্যাসের শেষে স্বপ্নভঙ্গের বেদনার সুর আচ্ছন্ন করে আমাদের। বস্তুতপক্ষে কল্লোল-পর্বের বৈশিষ্ট্যই হলো তাই। তা থেকে বিচ্যুত হননি ঔপন্যাসিক। যৌবনোচিত আবেগ তাঁকে দেশের অসহায় মানুষগুলির অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। তবে মুসলিম সমাজের যে বাস্তবনিষ্ঠ চিত্র 'মৃত্যুক্ষুধা'তে আমরা পাই তা নিজ ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি লেখকের দুর্বলতা নয়। কোনোরূপ ধর্মীয় সংকীর্ণতায় তাঁকে আমরা আবদ্ধ করতে পারি না। দ্বিধাহীন অসাম্প্রদায়িকতার জন্য তাঁর উপন্যাসের দ্বার সর্বশ্রেণির পাঠকের কাছে অবারিত। কোনো ধর্মের মানুষকে তা আঘাত করে না। যুগে যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দনধ্বনি স্পর্শ করেছিল তাঁর হৃদয়। অনুভব করেছিলেন পরাধীন নিরন্ন-পদদলিত তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীর পুঞ্জীভূত বেদনা। তাদের অসহায়তা, দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা ব্যথিত করেছিল তাঁকে। তারা হিন্দু নয়, মুসলিম নয়, খ্রিস্টানও নয়। ভারত মায়ের সন্তান। তাদেরই একজন হয়ে ঔপন্যাসিক নজরুল রচনা করেছেন পরাজিত এই জাতির বেদনার ইতিহাস, স্বপ্নভঙ্গের ইতিকথা। জীবনাবেগের অনবদ্য প্রকাশে তাঁর 'মৃত্যুক্ষুধা' তাই আজও স্মরণীয়।

সূত্রনির্দেশ :

১. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য, কলকাতা : দে'জ, ২০১৪, পৃ. ১৭৭
২. নজরুলের উপন্যাস সমগ্র, ঢাকা : নজরুল ইন্সটিউট, ২০১৬, পৃ. ১৩৭
৩. তদেব, পৃ. ১৩৯
৪. রাজিয়া সুলতানা, কথাশিল্পী নজরুল, ঢাকা : নজরুল ইন্সটিউট, ২০০০, পৃ. ৪১
৫. তদেব, পৃ. ৪০
৬. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭
৭. নজরুলের উপন্যাস সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫
৮. তদেব, পৃ. ১৬৩
৯. তদেব, পৃ. ১৮৩
১০. তদেব, পৃ. ১২৮
১১. তদেব, পৃ. ১৯১
১২. গোপীকানাথ রায়চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫
১৩. নজরুলের উপন্যাস সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

লি পি কা স র কা র

কবি নজরুলের সাম্যভাবনা : সাম্যবাদী কাব্যের আলোকে

"গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহিয়ান!
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।"[১]

এই মহানবাণী যাঁর চেতনা থেকে উৎসারিত হয়েছিল, তিনি আমাদের সকলের প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। কবি নজরুলের এই চিন্তা-চেতনার আলোচনা আজকের দিনে বোধ হয় খুব বেশি প্রাসঙ্গিক। 'সাম্যবাদী' কাব্যের প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯২৫। প্রকাশকালে কাব্যে ১১টি কবিতা গ্রন্থভুক্ত ছিল। 'ঈশ্বর', 'মানুষ', 'পাপ', 'চোর ডাকাত', 'বারাঙ্গনা', 'মিথ্যাবাদী', 'নারী', 'রাজা-প্রজা', 'সাম্য', 'কুলিমজুর' ইত্যাদি এই কাব্যের কবিতা। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই কাব্যের প্রথম কবিতা কাব্যের নামানুসারী, 'সাম্যবাদী'। কবিতায় কবি দেশের সকল শ্রেণির মানুষদের সসম্ভ্রমে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কবি নজরুল জাতপাতের বিভাজন মানতেন না। উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ এসবের বিভাজন তাঁর কাছে তুচ্ছ অতি। গোটা কাব্যের প্রতিটি কবিতার একইসুর জাতনয়, মানুষ-মানুষই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো। তাই কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে তিনি সেই মানুষের জয়গান গেয়েছেন।

এত পড়াশোনা, এত বিদ্যাশিক্ষা, এত ধর্মগ্রন্থ পাঠ কবি মনে করেন এসবই বৃথা পরিশ্রম, যদি বিবেকবোধ ও মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ না ঘটে। মানুষই সেই শুভ শক্তির আধার, যাকে আমরা ঈশ্বর বলে জানি এবং মানি। আমরা বৃথা ঈশ্বরকে বাইরে খুঁজে বেড়াই। নজরুলের ভাবনা, সকল দেবতার ঠাঁই এই হৃদয়ে। চারিদিকের এত বিভেদ-বৈষম্য দেখে কবি চুপ করে থাকতে পারেননি। কবি প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করেন, 'কেন খুঁজে ফেরো দেবতা ঠাকুর মৃত পুঁথি কঙ্কালে/হাসিছেন তিনি অমৃত হিয়ার নিভৃত অন্তরালে।'[২] আমরা কত তীর্থ দর্শনে যাই। অথচ সব তীর্থই যে আমাদের অন্তরে রয়েছে, সেটা ভেবে দেখি না। কিন্তু নজরুল জানেন, গয়া-কাশী-বৃন্দাবন, মন্দির-মসজিদ-গির্জা, মক্কা-মদিনা সকল তীর্থ এই হৃদয় ভুমিতে বিরাজিত। আপন হৃদয় থেকে সাড়া পেয়ে শাক্যমুনি মানুষের দুঃখ মোচনের জন্য রাজ্য সুখ ত্যাগ করে ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন। তাই নজরুল বিশ্বাস করেন, এই হৃদয় হল সবচেয়ে বড় মন্দির, এবং তিনি ঘোষণা করেন, "মিথ্যা শুনিনি ভাই,/এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কাবা নাই।"[৩]

পূর্ববর্তী কবিতার ঈশ্বর ভাবনার সুর 'সাম্যবাদী'র 'ঈশ্বর' কবিতাতেও ধরা পরেছে। আমরা জলে-জঙ্গলে, আকাশে-বাতাসে, পাতালে-পর্বতে, দেশে-বিদেশে ঈশ্বরকে খুঁজে ফিরি। তাঁকে এইভাবে খুঁজে ফেরার দৈন্যদশা দেখে কবি আক্ষেপের সুরে বলেন, "...আঁখি

খোলো, দেখো দর্পণে নিজ-কায়া,/ দেখিবে, তোমারই সব অবয়বে পড়েছে তাঁহার ছায়া।”[৪] বলা হয় ভগবান নিজের মতো করে মানুষ তৈরি করেছেন। আসলে মানুষই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের রূপ, মানুষের যেমন আকৃতি ঈশ্বর তাই।

ঈশ্বর অনুসন্ধানে উদ্ভ্রান্ত স্বামী বিবেকানন্দকে রামকৃষ্ণদেব ভগবান দর্শন করিয়েছিলেন, কবি যেন সেইভাবে আমাদের ঈশ্বরের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানাতে চাইলেন। তিনি আসলে বাইরের কোনো বিশেষ বস্তু নয়, মানুষের মধ্যেই অবস্থিত এক অপরিমেয় শক্তি। যে শক্তিবলে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। স্বামীজী যেমন মনে করতেন, যে নিজের সেই অপরিমেয় শক্তিকে বিশ্বাস করে, সম্মান করে, সে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে। তাই স্বামীজী মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সেবার তৃপ্তিলাভ করেছেন। ঈশ্বর বাইরে নেই, তিনি আছেন প্রতিটি মানুষের মধ্যে। ঈশ্বরকে চোখে দেখা যায় না, অনুভব করা যায়, অনুভব করা যায় নিজের শুভবোধে, নিজের কর্মে, নিজের ধর্মে। কবি নজরুলের ভাষায়, “সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি!/আমারে দেখিয়া আমার অদেখা জন্মদাতারে চিনি!”[৫]

‘সাম্যবাদী’ কাব্যের ‘মানুষ’ কবিতায় কবি সব বিভেদের ঊর্দ্ধে গিয়ে মানুষকে রাখলেন সবার ওপরে। অথচ ঈশ্বর-সৃষ্ট পৃথিবীতে সুবিধাভোগী মানুষ ধর্মভেদে, বর্ণভেদে মানুষের বিভাজন করেই চলেছে। শ্রেণিবৈষম্য সমাজে মানুষ মানুষকে অবহেলা করছে, মানুষ মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে। ‘মানুষ’ কবিতায় মানুষরূপী অমানুষকে আমরা চিনে নিতে পারি অতি সহজেই। মন্দিরের পূজারি, মসজিদের মোল্লা অভুক্ত ভিখারিকে মন্দির-মসজিদের ভেতর থেকে দূর দূর করে বার করে দেয়। একমুঠো খাবারের আশায় ভিখারি ঘাড় ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে যায়। একটু প্রসাদ পায় না নিরীহ-নিরন্ন ভিখারি। পূজার দিনে পূজারি দরজায় কড়ানাড়া শুনে খুশি হয়ে ভেবেছিল প্রাপ্তিযোগ আছে। কিন্তু সেটা যখন হয় না, বাইরে বেরিয়ে এসে ভিখারিকে দেখে পূজারি রেগে যায়। ‘জীর্ণ-বস্ত্র, শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ’- ভিখারি তখন খাবারের আশায় মসজিদে এসেছে। মসজিদের মোল্লা বিরক্ত হয়ে ভিখারিকে বলে, ‘ভুখা আছো মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে!’

নর যদি নারায়ণ হয়, তবে কেন সেই নারায়ণরূপী মানুষের প্রতি মানুষের এই অন্যায় আচরণ? মানুষের মধ্যেই যদি ঈশ্বর থাকেন, তাহলে তিনি ধনীর মধ্যে থাকবেন, দরিদ্রের মধ্যে থাকবেন না, এমনটি তো হতে পারে না। মানুষকে ঘৃণা করে, মানুষকে ক্ষুধায় অন্ন দান না করে ঈশ্বর লাভের চেষ্টা বৃথা। কবি পরিষ্কার করে বলেন, “কাহারে করিছ ঘৃণা তুমি ভাই, কাহারে মারিছ লাথি?/হয়তো উহারই বুকে ভগবান জাগিছেন দিবারাতি!”[৬] জীবন্ত শরীরে ভগবানের বাস, তাই কবি মনে করেন, “...জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়/ওই একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়!” কাজেই যারা ভাবেন, মানুষকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে ঈশ্বর লাভের মহা আয়োজনে মত্ত হয়ে উঠবেন, সেটা ভুল। ঈশ্বর কোনো

আয়োজনের মধ্যে থাকেন না, থাকেন মানুষের আত্মিক অনুভূতির মধ্যে।

মানুষকে কষ্ট দিয়ে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। মুচি, মেথর, ডোম-চণ্ডাল, চাষা প্রভৃতি সর্ব মানুষে ঈশ্বর রয়েছেন। এখানে কেউ বড়ো নয়, কেউ ছোটো নয়, কারো প্রতি কারো ঘৃণা থাকা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিত মোল্লা যদি সবার উপরে হতো, তাহলে রাখাল বালক শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ভগবানরূপে পেতাম না, কেননা, তিনি তো অব্রাহ্মণ। কাজেই ব্রাহ্মণ ভগবানের দূত, আর অব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল তা নয়, এ ধারণা ভ্রান্ত। আর যারা মন্দির-মসজিদ থেকে প্রসাদ প্রার্থীকে প্রসাদ না দিয়ে তাড়িয়ে দেয় তারা একরকম দেবতাকেই খেদিয়ে দেয়। যারা মন্দিরে পুজো করে তারা ধার্মিক আর যারা মানুষের সেবা করে তারা নিজেরাই দেবতা একথা স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং বলেছেন। অথচ মানবসেবা না করে যারা নিজেদের স্বার্থ, লোভ চরিতার্থ করছে তাদের সচেতন করতে নজরুল বলেন, "বন্ধু, তোমার বুক ভরা লোভ দুচোখে স্বার্থ-ঠুলি, /নতুবা দেখিতে, তোমারে সেবিতে দেবতা হয়েছে কুলি।"[৭]

জগৎ-সংসারকে নজরুল পাপের কারখানা হিসেবে দেখেছেন। এমন কেউ নেই যে পাপ করেনি। 'পাপ' কবিতায় নজরুল মনে করেন, শুধু মানুষ নয়, তেত্রিশ কোটি দেবতা পাপে টলোমলো ছিল বলেই সেই পাপ পথ দিয়ে অসুরের দল স্বর্গে প্রবেশ করতে পেরেছিল। কবির ভাবনা, 'বিশ্ব পাপস্থান/অর্ধেক এর ভগবান, আর অর্ধেক শয়তান!'[৮] মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড আমাদের মনের কতগুলো স্তর আবিষ্কার করেছিলেন, চেতন, অচেতন...ইত্যাদি নানা স্তর। ফ্রয়েডের সেই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় না গিয়েও আমরা সহজ করে বলতে পারি, মানুষের মধ্যে শুভ ও অশুভ দুটো ভাব রয়েছে। কবি বলেন, "কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর/মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক মানুষের মাঝে সুরাসুর।"

দেবতা ও অসুরের সহাবস্থান মানুষের মধ্যেই রয়েছে। মানুষের শুভ বোধ মানুষকে দেবতা বানায়, আর মানুষের ভেতরের অশুভ শক্তি মানুষকে অসুর তৈরি করে। পাপ, বঞ্চনা, অভিশাপ ভরা পৃথিবীতে মায়া-মোহ, কামনা-বসনার টান। সেই টানে মানবজাতি প্রাণ ভরে পান করে 'মদিরা', স্বর্গের দেবতারা মর্তে এলে তারাও ডুবে যায় বসুন্ধরার এই মদিরার নেশায়। কাজেই যে যত বড়ই মুনি-ঋষি হোক কেউই সম্পূর্ণ মুক্ত নয়, অন্তত কবি নজরুলের সেরকমই ভাবনা। তাই কাউকে তাচ্ছিল্য করে নিজেকে নিষ্পাপ প্রমাণ করার চেষ্টা বৃথা, অন্তত কবি সেরকমই ভেবেছেন, "মানুষের কথা ছেড়ে দাও, যত ধ্যানী মুনি ঋষি যোগী/আত্মা তাঁদের ত্যাগী তপস্বী, দেহ তাঁহাদের ভোগী!"[৯] এটাই যদি হয়, তবে কাউকে কাউকে দাগিয়ে দিয়ে লাভ নেই। সবার সব পাপের দায়ভার শুধু ব্রাত্য- অবহেলিত-বঞ্চিতদের ঘাড়ে কেন চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের সাধু প্রমাণের চেষ্টা। যাদের অসাধু বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়, সেইসব সর্বহারা মানুষের জন্য কবি বেদনা অনুভব করেন, "সাম্যের গান গাই/যত পাপীতাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই।"[১০]

'চোর-ডাকাত' কবিতাতেও কবি সাধারণ চোর-ডাকাতদের পক্ষে সওয়াল করেছেন।

চারিদিকে যখন চোরডাকাতে দেশ ছেয়ে গেছে, তখন কে কার বিচার করবে। যেখানে প্রজার রক্তে রাজার প্রাসাদ নির্মিত হয়, বহু মানুষের ভিটে বাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়ে ধনীর অট্টালিকা, ধনীর কারখানা গড়ে ওঠে, সেখানে বিচারের আর কি বাকি থাকে? যারা ফসল উৎপন্ন করে, তাদেরই বিপন্ন করে মহাজন-জমিদার নিজেদের ভুঁড়ি বাড়িয়ে চলে। বণিক, বৈশ্যরা তাদের উপার্জিত অর্থে সমাজের কল্যাণ না করে সেই অর্থ বেশ্যালয়ে ব্যয় করছে, তাদের দ্বারা সমাজের মঙ্গল সাধিত হচ্ছে না, বরং তারা স্বয়ং নিজেদেরও সর্বনাশ করে চলেছে। এই মানুষগুলোকে দেখেই কবি বলেন "অন্ন, স্বাস্থ্য, প্রাণ, আশা, ভাষা, হারায়ে সকল কিছু/দেউলিয়া হয়ে চলেছে মানব ধ্বংসের পিছু পিছু।"[১১]

কবি দেখেছেন মানুষ কেমন অর্থ পিশাচ। প্রহরী সে নিজেই ডাকাত আর, 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই', 'ঠগে ও ঠগে স্যাঙাত', সকলের যখন এই অবস্থা তখন যারা শুধুমাত্র 'পেটের দায়ে টাকা ঘটি বাটি' চুরি করছে, তাদেরই জন্য কেবল শাস্তি বরাদ্দ। এরা তো নিজেরা শুধু পেটের জ্বালা মেটাতে চুরি করছে, আর যারা দেশ লুঠ করছে, দেশের মানুষকে শোষণ করছে তাদের জন্য বিচার কোথায়, শাস্তি কোথায়? যারা পেটের দায়ে চুরি করে, তারা কারো হৃদয়ে ছুরি বসায় না, অথচ এরাই শাস্তি পায়। তাই তারা তস্কর হলেও কবি তাদের অমানুষ বলতে নারাজ। পরিস্থিতির কতখানি বদল হয়েছে, প্রশ্ন বোধহয় থেকেই যায়। চোর ডাকাতের প্রতিযোগিতা চলছে, কে কার থেকে বড়ো চোর, কে কার থেকে বড়ো ডাকাত, সেটাই দেখবার। বাকিরা নীরব দর্শক, যেখানে সুবিধা সেখানে গড়িয়ে পড়া, সুবিধাটা পেলেই হচ্ছে। আমরা সযত্নে বড়ো বড়ো চোরকে প্রশ্রয় দিই। যাদের সমাজে কোনো আধিপত্য নেই, সেই চোর-ডাতদের কবি 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করেছেন। বরং ওপর তলায় আসীনদের দিকে তাকিয়ে নজরুল প্রশ্ন করেছেন, "চোর-ডাকাতের করিছ বিচার কোন সে ধর্মরাজ?/জিজ্ঞাসা করো, বিশ্ব জুড়িয়া কে নহে দস্যু আজ?"[১২] যিনি বিচারকের আসনে বসে আছেন, এ প্রশ্নের জবাব হয়তো তিনিই দেবেন। 'চোর-ডাকাত' কবিতায় কবি নজরুল একজন দার্শনিকের মতোই যেন সমাজকে দেখার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন, যা ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক বলে আমাদের মনে হয়, "যারা যত বড়ো ডাকাত-দস্যু জোচ্চোর দাগাবাজ।/তারা তত বড়ো সম্মানী গুণী জাতি-সংঘেতে আজ।"[১৩]

'বারাঙ্গনা' কবিতায় কবি নজরুল বারাঙ্গনাকে 'মা' সম্বোধন করে বলেছেন, "...তোমরা মাতা ভগিনীরই জাতি;/তোমাদের ছেলে আমাদেরই মতো তারা আমাদের জ্ঞাতি;/আমাদেরই মতো খ্যাতি যশ-মান তারাও লভিতে পারে,/ তাদেরও সাধনা হানা দিতে পারে সদর স্বর্গ-দ্বারে!"[১৪] তারাও একদিন যশমান লাভ করে খ্যাতির চরম শিখরে উন্নীত হতে পারে। তিনি পৌরাণিক কাহিনির অবতারণা করে দেখিয়েছেন স্বর্গের বেশ্যা ঘৃতাচির সন্তান মহাবীর দ্রোণ, কুমারীর ছেলে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, কানীন-পুত্র কর্ণ, এদের খ্যাতি সকলেই জানা। গঙ্গা পুত্র ভীষ্ম, জবালা পুত্র সত্যকাম, মেরীপুত্র যীশু এরকম প্রচুর উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে। তাই

নজরুল বলেন, "শোনো মানুষের বাণী, জনমের পর মানব জাতির থাকে নাকো কোনো গ্লানি!" দেবতা যদি পাপ করেও তার দেবত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে বারাঙ্গনাদের বেলায় তা হবে না কেন? সেই সঙ্গে নজরুলের মনে হয়েছে, এই বিশ্বের দেড়শ কোটি সন্তানের পিতা-মাতা প্রত্যেকে তপস্যা করে সন্তান জন্ম দেয়নি। অথবা সন্তান লাভের জন্য কয়জন মা-বাবা ধ্যান বা তপস্যা করে, এ প্রশ্ন নজরুলের রয়েছে। কাজেই আলাদা করে গর্ব করার কিছু নেই। পৃথিবীর সব সন্তান সমান, নজরুল জারজ সন্তান বলে আলাদা কিছু মানতেন না। সব সন্তানই কামনা-বাসনার ফসল। সুতরাং পৃথিবীর কোনো সন্তানের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। আর বারাঙ্গনার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কাছে কবির সাফ জবাব, "অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজপুত্র হয়।/অসৎ পিতার সন্তান তবে জারজ সুনিশ্চয়।"[১৫]

'মিথ্যাবাদী' কবিতার প্রথমেই কবি বলে দিলেন, "মিথ্যা বলেছ বলিয়া তোমায় কে দিল মনস্তাপ?/সত্যের তরে মিথ্যা যে বলে স্পর্শে না তারে পাপ।"[১৬] মিথ্যার তাহলে একটা মহোত্তম দিক রয়েছে। সত্যের জন্য বা সত্য রক্ষার জন্য মিথ্যা বললে পাপ লাগে না, বরং তাতে কল্যাণ হতে পারে। যদিও সত্য-মিথ্যা ব্যাপারটা আসলে ভীষণভাবে আপেক্ষিক। জীবনে মিথ্যে বলেনি, এমন মানুষ আছে বলে নজরুল মনে করেন না। তবে কেউ কম, কেউ বেশি, কেউবা মিথ্যাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে ধরে নেয়। মানুষ অবশ্য এখন সত্যের ধার দিয়েও যায় না। কারো মিথ্যে বলতে বোধ-এ আটকায়। তবে মিথ্যাচারে দেশ ছেয়ে গেছে। মিথ্যার স্রোতেই মানুষ জীবন-ভেলা ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। সত্য যদিও মাপা যায় না, এর কোনো বাটখারা নেই, অথবা সত্য বস্তায় পুড়ে বাঁধাও যায় না। তাই হয়তো বেপরোয়াভাবে 'ঝুট' বলাই মানুষের প্র্যাকটিস হয়ে গেছে। যদিও সত্যমিথ্যা বাছাই করা একটা কঠিন ব্যাপার। আর বৃহত্তর ভালোর জন্য বা সত্য রক্ষার জন্য একটু আধটু মিথ্যে বললে পাপ হয় না বলেই কবির ধারণা। আসলে সত্য দূরবীণ দিয়ে দেখা যায় না, তুলাযন্ত্রে মাপা যায় না, এর ব্যবহার বিধি নির্ধারণ করে দেওয়া সম্ভব নয়, সত্যনিষ্ঠা প্রকৃতপক্ষে মনের বিষয়, প্রাণের তাগিদ। সত্য তাই প্রাণ-সম্পদ।

আমাদের সমাজে নারী জাতি চিরদিনের ব্রাত্য। প্রাচীনকালে নারীদের পুরুষের সমকক্ষ হয়ে ঘরে বাইরে কাজ করতে দেখা যায়। নারীরা কোনো এক সময় কর্মে ও ধর্মে খুব সুনাম অর্জন করেছিল। তারপর পরিস্থিতির চাপে তাকে পর্দানশীন হতে হয়েছে। আধুনিক যুগের নারীরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দূরদর্শিতা ও কর্ম প্রচেষ্টায় পর্দার ভেতর থেকে বাইরে আসতে শুরু করেছিল। বাইরের জগতে নারীর চলাচল পুনরায় তখন থেকেই শুরু হয়। সেখানেও বিভেদ ও অসাম্যের শেষ নেই। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে যত রাজ্যের যত নিয়ম তৈরি হয়েছে শুধুমাত্র নারী জাতিকে অবদমিত করে রাখার জন্য। কিন্তু সেই নিয়মের নিগড় ভেঙে পুরুষের সহায়তায় নারীর জাগরণ ঘটলো।

পাখি যেমন তার দুটি ডানার সহায়তায় আকাশের বুকে স্বচ্ছন্দে ভেসে বেড়াতে পারে,

তেমনি আমাদের সমাজরূপ পাখির দুটি ডানা একটি নারী, একটি পুরুষ। যার সহায়তায় সমাজ অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। অথচ নানারূপ বৈষম্যজনিত কারণে নারীকে দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টা অনবরত চলছে। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে নজরুলের লেখনি, "সাম্যের গান গাই/আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।/বিশ্বের যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর।/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"[১৭] নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসে সৃষ্ট সম্পদের একাধিক উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন। যত অভিযান, যত যুদ্ধবিগ্রহ সব জায়গায় পুরুষের জয় দেখা যায়, নজরুল বললেন, মাতা-ভগিনী-বধুর কথা সেখানে উহ্য থাকে, তাদের ত্যাগের পুরস্কার তারা পায় না। 'নারী' কবিতায় এভাবেই কবি নজরুল নারীজাতিকে সম্মানিত করেছেন। বরং পুরুষদের উদ্দেশ্যে কবির মনোভাব, "পুরুষ হৃদয়হীন,/মানুষ করিতে নারী দিল তারে আধেক হৃদয় ঋণ।"[১৮]

এই হৃদয়হীন পুরুষের নারীর প্রতি যে অন্যায় অবিচার, তার বিরুদ্ধে নজরুলের লেখনী কথা বলেছে। এতকাল ধরে নারীকে দাসী-বাঁদী বানিয়ে রেখেছিল পুরুষ। কোনোকালে পুরুষ যদি নারীর দাস না হয়, তাহলে নারীকে কেন পুরুষের দাসী হতে হবে? এই প্রশ্নের উত্তর নেই। আজও সমাজের ব্রাত্য নারীগণ অত্যাচারিত-লাঞ্ছিত। কাজেই যে পুরুষ নারীকে দুর্বল ভেবে তার উপর অত্যাচার করে চলেছে, তার প্রতি নজরুলের সাবধান বাণী এইরকম, "যুগের ধর্ম এই/পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই!/ শোনো মর্ত্যের জীব!/অন্যেরে যত করিবে পীড়ন নিজে হবে তত ক্লীব!"[১৯] তবে আশাবাদী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্বাস করেন, এমন একদিন আসবে, যেদিন নারী পুরুষের সমান মূল্য পাবে এবং এই পুরুষের সাথে নারীরও জয়গান গাওয়া হবে।

রাজা-প্রজার যে বিভেদ তাও কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। অদ্ভুত এক সম্পর্ক, জীবন যেখানে যন্ত্রণাময়, মৃত্যু যেখানে অনিবার্য, কয়েকদিনের জন্য মানব জন্মে ভেদাভেদ চূড়ান্ত। একজন রাজা একজন প্রজা, প্রজা আছে বলেই রাজা। সুতরাং রাজাকে প্রজা সৃষ্টি করেছে। সেজন্য তো প্রজাদের প্রতি রাজারই কৃতজ্ঞ থাকার কথা অথচ প্রজার দুর্দশার শেষ নেই। প্রজার কষ্টে কবি একাত্ম হয়ে বলেন, "আপনার পুরুষত্ব অন্যে সঁপিয়া কী পেনু দাম?/আগলাতে রাজা-রাজ্য-হারেম হয়েছি খোজা গোলাম!"[২০] যাদের হাত ধরে রাজার রাজ্যপাট, যাদের সততায়-পরিশ্রমে রাজার সুখ সমৃদ্ধি, তারাই সর্বশ্রান্ত গোলাম। প্রজার পরিশ্রমের ফল ভোগ করে রাজা। যারা ঘর বানায় তাদের ঘর নেই, যারা চাষ করে তাদের পেটে খাবার নেই। সুতরাং রাজার রাজত্বকে প্রজাই ধরে রাখে। বিষয়টা কিছু অন্যরকম, যে যখন লঙ্কায় যায় সেই তখন রাবণ হয়। রাজা অত্যাচারী, প্রজা অত্যাচারিত। এখানেও কবি প্রত্যাশা করেন, মহাকালের রথের চাকা একদিন ঘুরবে। সেদিন হয়তো এই প্রজাদের অবদান স্বীকৃত হবে। রাজাই হয়তো প্রজার জয়গান গাইবে।

জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে একটা হাইফেন। জীবনের দৌড় ওই হাইফেন পেরিয়ে মৃত্যু

পর্যন্ত। আর মৃত্যুর পর সবার স্থান মাটিতে। বর্ণভেদে, বা সাদা মানুষ কালো মানুষের জন্য আলাদা কোনো গোরস্থান নির্মিত হয় না, সেখানে কোনো স্বর্গ-নরকের বিভাজন নেই, সেখানে সবাই এক হয়ে মিলে যায়। এখানে কোনো ধর্মের ভেদ নেই, শাস্ত্রের মতান্তর নেই। আর এখানে 'স্রষ্টার ভজনা-আলয় এই দেহ এই মন,'। মনকে যদি অল্পেতে খুশি করা যায়, দেহকে ভজনালয় বানিয়ে মনকে ঈশ্বর স্বরূপ তৈরি করা যায়, সেখানে কোনো অসাম্য কোনো ভেদাভেদ থাকে না, যেমন থাকে না মৃত্যুর পরে।

'সাম্যবাদী' কাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা 'কুলি মজুর'। সমাজে এই মানুষগুলোর অবস্থান আমাদের অজানা নয়। এরা সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করে। অথচ এদের সাথে বাবুদের ব্যবহার মেলানো যায় না। সেই ব্যবহারের একটা দৃষ্টান্তের সাক্ষী হয়ে আছেন কবি। এরা সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী, সবচেয়ে বেশি পরিশ্রমী, অথচ এরা ততটাই অসহায় ততটাই দুর্বল। এরা কারণে-অকারণে বাবুদের মার খেয়ে মরে। যাদের হাত দিয়ে রেল পথ তৈরি হয়, তারাই রেলে চাপা পড়ে। যাদের শরীরের ঘাম ঝরিয়ে বিশাল অট্টালিকা নির্মিত হয়, তারা কিন্তু সেই অট্টালিকার মালিক হয় না, বরং বলা যায় যাদের হাত দিয়ে তৈরি হয় এগুলো তাদের ঠাঁই হয় পথের প্রান্তে। ঝড়-বৃষ্টির জল বিদ্যুতে তারা পিষ্ট হয়। আর বাবুরা আরামে তাদের তৈরি ঘরে বাস করে। বাবুদের সেবা দিতে দিতে কুলি মজুরদের শরীর ধুলোয় ভরে যায়। কবি অত্যন্ত ভালবেসে, অত্যন্ত শ্রদ্ধায় এই মানুষগুলোর পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিয়েছে। কেননা, এদেরই প্রকৃত মানুষ বলে তিনি দাবি করেছেন, "তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান, তাদেরই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।" এই উত্থান যেমন কাঙ্ক্ষিত তেমনি তাদের অবস্থার পরিবর্তন কবি আশা করেন। তারা শুধু পড়ে পড়ে মার খাবে না আর জীবন মরণ এক করে পরিশ্রম করবে না। তাদেরও অন্ন-বস্ত্র বাসস্থানের সংস্থান দিতে হবে, দিতে হবে তাদের পরিশ্রমের ও সততার সম্মান, এই দাবি কবির।

"মহা-মানবের মহা-বেদনা/আজি মহা-উত্থান, উর্দ্ধে হাসিছে ভগবান,/নীচে কাঁপিতেছে শয়তান।"[২১] শয়তান কখনও ভগবানকে ছাপিয়ে যেতে পারে না। মানুষের অন্তর একদিন শুভ বোধে সমৃদ্ধ হবে, সেদিন চাপা পড়বে তার যত অশুভ বুদ্ধি, সেদিন হয়তো মানুষের কোনো প্রভেদ থাকবে না। মানব সেই শুভ ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক, কবির এই প্রার্থনা। একই মানুষের মধ্যে যে দ্বৈতসত্তা, একজন মহামানবের মতোই কবি তার মূল্যায়ন করেছেন, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি তিনি দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন। সেইসাথে সকল বৈষম্যের ঊর্দ্ধে উঠে তিনি মানবতার যে জয়গান গেয়েছেন, তাতে কবির গভীর মানবিক বোধের পরিচয় মেলে। সকল প্রকার বৈষম্যের তমানিশা ঘুচিয়ে ভোরের আলোর বিচ্ছুরণ ঘটবে, কবির প্রত্যাশিত দৃষ্টি সেই ভোরের আলোর দিকে। মানুষের ভিতরে-বাইরে সেই আলো প্রবেশ করুক, মানুষ হয়ে উঠুক সকলপ্রকার বৈষম্যমুক্ত ও বিবেকবান।

তথ্যসূত্র :

১। কাজী নজরুল ইসলাম, রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা-৭৪
২। তদেব, পৃষ্ঠা-৭৩
৩। তদেব, পৃষ্ঠা-৭৪
৪। তদেব।
৫। তদেব।
৬। তদেব, পৃষ্ঠা-৭৬
৭। তদেব, পৃষ্ঠা-৭৭
৮। তদেব।
৯। তদেব।
১০। তদেব
১১। তদেব, পৃষ্ঠা-৭৯
১২। তদেব
১৩। তদেব
১৪। তদেব, পৃষ্ঠা-৮০
১৫। তদেব, পৃষ্ঠা-৮১
১৬। তদেব
১৭। তদেব, পৃষ্ঠা-৮২
১৮। তদেব, পৃষ্ঠা-৮৩
১৯। তদেব
২০। তদেব, পৃষ্ঠা-৮৫
২১। তদেব, পৃষ্ঠা-৮৮

না ফি সা ই য়া স মি ন

ছোটোগল্পকার নজরুল : এক অনন্য প্রতিভা

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা সাহিত্যের একজন সব্যসাচী লেখক, যিনি সাহিত্যের সকল শাখায় অবাধে বিচরণ করে সর্বাত্মক সাফল্যমণ্ডিত হয়েছেন। তবে কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতি সর্বোচ্চ হলেও তাঁর গল্পকার প্রতিভাকে অস্বীকার করা যায় না। বাংলা ছোটোগল্পের বৈচিত্র্যময় ভুবনে তাঁর উপস্থিতি অনুজ্জ্বল হলেও শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্যে তিনি সমুজ্জ্বল। জীবনের তীব্র আবেগ ও মানবীয় উত্তাপে তাঁর গল্পের বুনন হয়েছে আত্মচিহ্নিত। পাশাপাশি সমাজ অনুষঙ্গ এবং নরনারীর মনোময় হৃদয়বৃত্তির উদ্ভাসে তাঁর ছোটগল্প-গুচ্ছ হয়েছে বর্ণিল। আসলে নজরুল ইসলামের গল্পসমূহে আবেগ ও উচ্ছ্বাস কাব্যময় রূপ লাভ করেছে। তিনি কাব্যের আবেগময় পরিমণ্ডলে ছিলেন স্বপ্রতিভ ও সৃষ্টিশীল। বলাবাহুল্য তাঁর গল্পগুলিও সেই গীতিময় তথা আবেগময় সত্তারই বহিঃপ্রকাশ।

'ব্যথার দান' (১৩২৮), 'রিক্তের বেদন' (১৩৩১) এবং 'শিউলি মালা' (১৩৩৮) গ্রন্থের আঠারোটি গল্পে নজরুলের গল্পকারের দৃষ্টিভঙ্গির শিল্পসম্মত আন্তরিক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। একদিকে নজরুলের ঐকান্তিক আবেগ আর অন্যদিকে অন্তরঙ্গ জীবনানুভবে তাঁর গল্পগুলি ঋদ্ধ হয়েছে। বলাবাহুল্য বিষয় বৈচিত্র্য অপেক্ষা প্রেম তথা প্রেমের বিচিত্র রূপায়নে তাঁর গল্পগুলি পেয়েছে আবেগ-সঞ্চারী অন্যমাত্রা। 'ব্যথার দান' এবং 'রিক্তের বেদন' গ্রন্থের গল্পসমূহে আবেগ-উচ্ছ্বাস-ভাবালুতাই প্রধান হয়ে উঠেছে। সাধারণ নরনারীর আবেগময় প্রেম-ভালোবাসাই এর মূল উপজীব্য। নায়ক-নায়িকার স্বগতোক্তি এবং উত্তম পুরুষে কাহিনি বিন্যস্ত হওয়ায় স্বভাবতই তা হয়ে উঠেছে মনোময়, আবেগঘন এবং কল্পনাপ্রবণ।

বিদ্রোহীকবির কৈশোর কেটেছে রাঢ় ও পূর্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলে, যৌবনের প্রারম্ভ অতিক্রান্ত হয়েছে উপমহাদেশের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সেনানিবাসে এবং যৌবন অতিবাহিত হয়েছে কলকাতা নগরীতে। ফলত তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সৃষ্টিতে। সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্বের বেশ কয়েকটি গদ্যরচনা নজরুল করাচির সেনানিবাস থেকেই করেছিলেন, যেমন 'বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী', 'স্বামীহারা', 'হেনা', 'ব্যথার দান', 'মেহের নেগার', 'ঘুমের ঘোর' ইত্যাদি। এই রচনাগুলি প্রথমে কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং পরে 'ব্যথার দান' ও 'রিক্তের বেদন' গ্রন্থে সংকলিত হয়। গল্পগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম প্রকাশিত গল্প হল—'বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী' (১৩২৬)। ছোটোগল্প হিসাবে এটি আবেগ ও বর্ণনাধর্মী মাধুর্যে পূর্ণ একটি স্তম্ভ। চঞ্চলমতী কিশোর ও তার ছন্নছাড়া জীবনকে গল্পাকারে প্রকাশ করেছেন। বাঙালি পল্টনের এক বওয়াটে যুবকের জীবন কাহিনি আঁকার পাশাপাশি নজরুল এখানে এমন কিছু তথ্যকে তুলে ধরেছেন যেগুলি পাঠকসমাজকে বিস্মিত করে। পাশাপাশি আমরা গল্পটিতে সমগ্র সমাজের চঞ্চলমতী

কিশোরদের আদর্শগত বৈশিষ্ট্যের দিকটিও দেখতে পাই। তাই গল্পটি বিশেষ শিল্পমানে উন্নীত না হলেও, সামাজিক অভিঘাতপূর্ণ। বলাবাহুল্য 'বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী' স্মৃতিনির্ভর কিশোর নজরুলের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশিত গল্প হল 'স্বামীহারা'। এই গল্পে আজিজ ও বেগমের আবেগময় দাম্পত্যজীবন ও স্বামীর মৃত্যুর পর বেগমের একনিষ্ঠ প্রেম কাব্যময় ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপে গ্রাম বাংলার সাধারণ অসহায় মানুষের ট্রাজেডি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার :

"বিধাতার অভিশাপ যেন কলেরা আর বসন্তের রূপ ধ'রে আমাদের ছোট্ট শান্ত গ্রামটির উপরে এসে পড়েছিল, আর ওই অভিশাপে প'ড়ে কত মা, কত ভাই-বোন, এই যে দিঘির গোরস্থান, আর এই যে হাজার হাজার কবর, এগুলো কি তবে... আমাদেরই গাঁয়ের একটা নীরব মর্মন্তুদ বেদনা অন্তঃসলিলা ফল্গুনিঃস্রাব — জমাট বেঁধে অমন গোর হয়ে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে? না কি আমাদের মাটির মা তাঁর এই পাড়াগাঁয়ে চির-দরিদ্র জরাব্যাধিপ্রপীড়িত। ছেলেমেয়েগুলোর দুঃখে ব্যথিত হয়ে করুণ প্রগাঢ় স্নেহে বিরামদায়িনী জননীর মতো মাটির আঁচলে ঢেকে বুকের ভিতর লুকিয়ে রেখেছেন?"[১]

'ব্যথার দান' এবং 'রিক্তের বেদন' গ্রন্থদ্বয়ের গল্পগুলি নজরুলের সাহিত্য জীবনের প্রথমদিকের রচনা। অধিকাংশ গল্পগুলির মূল উপজীব্য হল প্রেম। 'ব্যাথার দান' গল্প গোলেস্তানের রূপকে দেশপ্রেমের অকৃত্রিম রূপ ফুটে উঠেছে। মা থেকে মাতৃভূমিকে ভালোবাসার অনুভূতি নজরুলের অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন—

"গোরস্তান! অনেকদিন পরে তোমার বুকে ফিরে এসেছি, আঃ মাটির মা আমার, কত ঠাণ্ডা তোমার কোল! আজ শূন্য আঙিনায় দাঁড়িয়ে প্রথমেই আমার মনে পড়ছে জননীর সেই স্নেহবিজড়িত চুম্বন আর অফুরন্ত অমূলক আশঙ্কা, আমায় নিয়ে তাঁর সেই ক্ষুধিত স্নেহের ব্যকুল বেদনা... সে মা আজ কোথায়?... মাকে হারিয়েছি বলেই মাতৃস্নেহের ওই মস্ত শিকলটা আপনা হ'তে ছিঁড়ে গিয়েছে বলেই আজ মার চেয়েও মহীয়সী আমার জন্মভূমিকে চিনতে পেরেছি।"[২]

পাশাপাশি গল্পের কাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে দারা-বেদৌরা-সয়ফুলমূলকের আবেগময় স্বগত কথনে। প্রেম-বিরহের টান টান উত্তেজনায় গল্পটি হয়েছে অনন্য। ব্যর্থ প্রেমিক দারার মহানুভবতা-ত্যাগ-উদারতা, বেদৌরার একনিষ্ঠ প্রেম এবং সয়ফুলমূলকের অনুশোচনাবোধ গল্পের বুননকে করেছে মজবুত। নজরুলের 'হেনা' গল্পটিতেও দেশপ্রেম ও মানব-মানবীর প্রেমের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। নায়ক সোহরাব বার বার প্রেম নিবেদন করে নায়িকা হেনার কাছে 'না' বাচক উত্তরে প্রত্যাখাত হয়েছে, কিন্তু মলিন হয়নি তার ভালোবাসা। অন্যদিকে হেনার মনেও উঁকি দিয়েছে সোহরাবের প্রতি প্রেমময় রঙিন অনুভূতি। হেনা প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসে সোহরাবকে। কিন্তু হেনার কাছে সোহরাবের প্রতি প্রেম অপেক্ষা

দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা বেশি। তাই সে বার বার সোহরাবের প্রেমে সায় থাকা সত্ত্বেও ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যখন সে শুনেছে সোহরাব দেশের জন্য যুদ্ধে যাচ্ছে, সেদিন সে সোহরাবকে প্রেরণা জুগিয়েছে এবং প্রেম-আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠেছে। হেনার উক্তি—"সোহরাব প্রিয়তম ! তাই যাও ! আজ যে আমার বলার সময় হয়েছে, তোমায় কত ভালোবাসি !"[৩]

এভাবেই শত বিরহের মাঝেও ধ্বনিত হয়েছে, প্রেমের জয়গান। 'ঘুমের ঘোরে' গল্পেও প্রেম ও কর্তব্যের বিপ্রতীপ দ্বন্দ্বে জীবনের ট্রাজিক বিনষ্টি উপস্থাপিত হয়েছে। গল্পে বিবাহিতা পরী কিছুতেই তার প্রাক্তন প্রেমিক আজহারকে বিস্মৃত হতে পারেনি। একদিক প্রেম ও অন্যদিকে সমাজভীতি—এই দ্বৈত টানাপোড়েনে পরী চরিত্রটি ক্ষতবিক্ষত। তবে নরনারী মনস্তত্ত্ব ও প্রেমের বৈচিত্র্যময় রূপায়নে গল্পটি উল্লেখযোগ্য। 'রিক্তের বেদন' গল্পে মানবীয় প্রেমের বেদনাময় ইতিবৃত্ত উপস্থাপিত হয়েছে। একদিকে শহিদা-হাসিনের অপ্রাপনীয় প্রেম, অন্যদিকে যুদ্ধক্ষেত্রের পটভূমিকায় হাসিনের গুলিতে গুলের মৃত্যু মানবীয় বেদনায় আর্দ্র হয়েছে। প্রেমের আরও এক রূপ নজরুল সৃষ্টি করেছেন তাঁর 'মেহের নেগার' গল্পে। গল্পে দেখা যায় নায়ক য়ুসোফ খাঁ তার স্বপ্নপ্রিয়া মেহের নেগনরের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে বাঈজী কন্যা গুলশনের সাথে পরিচিত হয়। পরিচয় থেকেই শুরু হয় গভীর প্রেম। কিন্তু দুজনের মিলনে বাধার সৃষ্টি হয় গুলশনের অশুচি জন্ম পরিচয়। এই সমাজ বিকৃত আত্মপরিচয়ের গ্লানি বহন করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত গুলশন আত্মহননের পথ বেছে নেয়। প্রেমে সফল না হলেও যুদ্ধে যাওয়ার আগে গুলশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তার কবর দেখে য়ুসোফ অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। কবরের মর্মর ফলকে লেখা ছিল: "অপবিত্র জঠরে জন্ম নিলেও, ওগো পথিক আমায় ঘৃণা কর না!... কিন্তু পবিত্র ভালোবাসা আমার এই বুকে তার পরশ দিয়েছিল।"[৪]

এখানেই প্রেম যেন অপূর্ণতার মাঝেই পূর্ণতার সন্ধান খুঁজে পায়। নজরুলের 'শিউলি মালা' গ্রন্থের চারটি গল্পের মধ্যে অন্যতম হল 'পদ্ম গোখরো'। গল্পটি অতিপ্রাকৃত অনুষঙ্গে গল্পের বুনন পক্ত হলেও এক মানবীয় সংকটের আত্মবিদারী হাহাকার গল্পটিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে। মানব ও সর্পযুগলের যে ভালোবাসা এই গল্পে ফুটে উঠেছে, তা আমাদের 'আদরিণী' ও 'মহেশ' গল্পের স্মরণ করিয়ে দেয়। বিষাক্ত দুই গোখরো সর্পযুগল গল্পের কাহিনিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। গল্পে জোহরা চরিত্রের মধ্য দিয়ে অতৃপ্ত মাতৃত্বের হাহাকার ও প্রত্যাশা প্রতিবিম্বিত হয়েছে। পদ্ম গোখরো যুগলের প্রতি মৃতবৎসা এক গ্রাম্য নারীর যে প্রেম গল্পকার দেখিয়েছেন, তা একান্ত মানবিক রসে পূর্ণ। স্বামী আরিফ যখন ঐ বিষধর সর্পযুগলকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখন জোহরার মাতৃস্নেহ প্রকট হয়েছে গাঢ় হয়েছে। সে বলেছে, "ওরা আমার ছেলে। ওরা তো কোনো ক্ষতি করে না, কাউকে কামড়াতে জানে না তো ওরা।"[৫]

জোহরাব এই আন্তরিক অভিব্যক্তিপূর্ণ আকুতিতেই বিষধর সর্পযুগলের প্রতি তার ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে। একইভাবে পদ্মগোখরো যুগল ও জোহরার অনুগত, অন্যদিকে অন্যদের প্রতি বিরূপ ও আক্রমণাত্মক। যদিও নিদ্রিত জোহরার বুকে সর্পযুগলের আশ্রয়, জোহরার সাপের স্বপ্ন দেখা, স্বামীকে নাগলোকের অধীশ্বর এবং নিজেকে নাগমাতা মনে করা এসব কিছুটা অতিরঞ্জিত হলেও, গল্পের সমাপ্তিকে গল্পকার নাটকীয়তায় মুখরিত করতে সক্ষম হয়েছেন—"ভোর হইতে না হইতে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, মীর সাহেবদের সোনার বড় এক জোড়া মরা সর্প প্রসব করিয়া মারা গিয়াছে।"[৬]

এখানেই গল্পের অন্তিম নাট্যরস ঘনীভূত হয়েছে। 'অগ্নি-গিরি' গল্পে সবুর চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে নজরুল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। সুশীল যুবক সবুরের ছাত্রী নূরজাহানের তিরস্কারে প্রতিবাদী হয়ে ওঠা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে শিল্পনিপুণ। 'শিউলিমালা' গল্পে কোলকাতার তরুণ ব্যরিস্টার আজহার ও শিউলির বিয়োগান্ত প্রণয়-কাহিনি স্থান পেয়েছে। মূলত আজহারের আত্মকথনেই উন্মোচিত হয়েছে গল্পের অবয়ব। 'জিনের বাদশা' গল্পটিতে কল্পনা ও অবাস্তবতার সংমিশ্রণ থাকলেও চরিত্র চিত্রণে নৈপূণ্য এবং আঙ্গিক বিন্যাস কুশলতা লক্ষ্যণীয়। বিশেষত চান্‌ভানু চরিত্রটি নজরুলের এক সফল সৃষ্টি।

আগেই বলেছি নজরুলের গল্পসমূহ তাঁর আবেগ-উচ্ছ্বাসময় কবি-চৈতন্যেরই ফসল। তাঁর 'বাদল-বরিষণে', 'অতৃপ্ত কামনা', 'রাজবন্দীর চিঠি' প্রভৃতি গল্পে বেদনাজীর্ণ স্মৃতিময় কবি-চৈতন্যই মুখরিত হয়েছে। 'বাদল-বরিষণে' গল্পটির নামকরণটি যেমন কাব্যিক, তেমনি নায়িকা কৃষ্ণকায় কাজরিয়ার নিজের রূপ নিয়ে দ্বিধা, মনন সঙ্কট এবং কার্যকারণহীন মৃত্যু ভাবালুতায় আচ্ছন্ন এবং আবেগময়। তাছাড়া নজরুলের একাধিক গল্পে সাংগীতিক উপস্থাপনা লক্ষ্য করা যায়, যা তাঁর ছোটোগাল্পিক শিল্পরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর একাধিক গল্পেই গানের ব্যবহার দেখা যায়, এমনকি গল্পের চরিত্রগুলির মনোভঙ্গি, আবেগ-উন্নত এবং বেদনা-যন্ত্রণা প্রকাশিত হয়েছে গানের মাধ্যমে। পাশাপাশি নজরুলের গল্পের অধিকাংশ নায়ক চরিত্রের মধ্যে লেখকের আত্মজৈবনিক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ গল্পের নায়ক চরিত্রে বাউণ্ডুলেপনা, দুরন্তভাব, কর্তব্যপরায়ণতা এবং প্রেমকে উপক্ষা করে দেশমাতার মুক্তিতে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা প্রত্যক্ষ করা যায়, যা নজরুলের সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ। বলা বাহুল্য মননশীলতা অপেক্ষা বিপুল আবেগময়তায় তাঁর গল্পগুলি হয়েছে কাব্যময়। তবে ভাষা ব্যবহারে নজরুল আবেগময়তার পাশাপাশি ধ্বনিময় ব্যঞ্জনাকেও প্রকট করেছেন, ফলত চরিত্রের অনুভূতি অনুসারে ভাষায় একপ্রকার সংগীতময়তার দ্যোতনা সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও ভাষার ব্যবহারে আঞ্চলিক ও স্থানিক পরিচয় বিধৃত হয়েছে। তাঁর 'রাক্ষুসী' গল্পে বীরভূম অঞ্চলের কথ্য ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। অশিক্ষিত বাগ্দী বিন্দির সপরিমার্জিত আঞ্চলিক সংলাপে নজরুলের শিল্পনৈপুণ্য প্রকটিত হয়েছে। আবার 'অগ্নিগিরি' গল্পে ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে নূরজাহানের কণ্ঠে—

"আপনি আর কইবেন না আব্বা, হে ঘরে বইয়া কাঁদে আর আপনি হাসেন! আমি পোলা অইলে এইদুন একচটকনা দিতাম রুস্তম্যারে আর উই ইবলিশা পোলোপানেরে, যে, ওই হ্যানে পইর‍্যা যাইত উৎকা মাইর‍্যা। উইট্যা আর দানাপানি খআইবার অইত না !"[৭]

বলা বাহুল্য নজরুলের প্রথম পর্যায়ের গল্পে আবেগ-তারল্য-ভাবালুতা পরবর্তী পর্যায় অনেকটা সংহত ও পরিমার্জিত রূপ লাভ করেছে। নজরুলের গভীর দ্যোতনমণ্ডিত শব্দচয়নে চরিত্রের মনোজ্ঞ হয়েছে ব্যঞ্জনাময়। চলিত শব্দ, তৎসম শব্দ, উপমা-উৎপ্রেক্ষা অলংকারের সাবলীল ব্যবহার তাঁর গদ্য রচনার বিশিষ্টতার দ্যোতক। তবে সব ক্ষেত্রেই নজরুলের গল্পগুলি শিল্পসংহত হয়ে ওঠেনি। আসলে গল্পের আঙিনায় তাঁর আবির্ভাব বাংলা ছোটোগল্পের গঠন পর্যায়ে, যখন রবীন্দ্রনাথের অবিনাশী প্রতিভায় রচিত হয়েছে ছোটোগল্পের আদর্শ। তাই ছোটোগল্পকার হিসাবে নজরুল বাংলার সাহিত্যে কোনো স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করতে সক্ষম না হলেও, তাঁর স্বল্প সংখ্যক গল্পের মধ্যেই নিজস্বতার প্রতিকৃতি গঠনে সক্ষম হয়েছেন এখানেই তিনি হয়েছেন অনন্য।

তথ্যসূত্র :

১। কাজী নজরুল ইসলাম। কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা, ভারত : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০১। দ্বিতীয় সংস্করম, মার্চ ২০০৫। রিক্তের বেদন। স্বামীহারা। পৃ. ৩৬৩

২। তদেব। ব্যথার দান। ব্যথার দান। পৃ. ২৪৯

৩। তদেব। ব্যথার দান। হেনা। পৃ. ২৭১

৪। তদেব। রিক্তের বেদন। মেহের-নেগার। পৃ. ৩৪৮

৫। কাজী নজরুল ইসলাম। কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র (পঞ্চম খণ্ড)। কলকাতা, ভারত : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। প্রথম প্রকাশ, মে ২০০৪। শিউলিমালা। পদ্ম-গোখরো। পৃ. ৩৯৫

৬। তদেব। পৃ. ৪০৩

৭। তদেব। শিউলিমালা। অগ্নিগিরি। পৃ. ৪২১

মৌ সু মী সা হা
প্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর : জীবনানন্দ দাশ

জীবনানন্দ দাশ প্রথমত রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের কথাসাহিত্যের জগতে কবি, যিনি কবিতায় বিষয় ও কবিতা-শিল্প নির্মাণে ব্যতিক্রম এবং তাঁর সচ্ছন্দ প্রকাশ। সারাজীবনে অজস্র কবিতা লিখেছেন, কবিতার মতো গল্পগুলিও তাঁর একান্ত মন্ময় চেতনার ফসল। মানুষের মন-মনন জীবনানুভব—অভিজ্ঞতা, এসবকিছুই অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে অবলোকন করেছেন, যার ভাবতরঙ্গে গল্পগুলি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। জীবনানন্দের সমস্ত অনুভবেই ব্যক্তি ও সমাজ অথবা বক্তির অন্তঃস্বত্তা ঘিরে সমাজের অস্তিত্ব। জীননানন্দ নির্জন প্রকৃতির মানুষ। তাঁর গল্পের উপজীব্য সমাজের নারী-পুরুষের সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে অনালোকিত পথে জীবনরহস্য সন্ধানের উৎকণ্ঠা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। কবির অন্তর্দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ণ, জীবন সম্পর্কে তাঁর অনুভব অর্জিত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। এবার তাঁর লেখা গল্পগুলির কথা ভেবেই গদ্যশিল্পী হিসাবে তাঁর অন্তর-চেতনার পরিচয় উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করবো।

'পৃথিবীটা শিশুদের নয়' গল্পটিতে বাৎসল্যের বিচিত্র মধুরিমার প্রকাশ ঘটেছে বলা যেতে পারে, নির্ভার রচনাশৈলীর সার্থক দৃষ্টান্ত হিসেবে গল্পটির একটি অংশ উল্লেখ করছি—

"সবই ঠিক আছে তাহলে। রাত ন'টা। শীতের রাত বেশ শান্ত, সুন্দর, ঈশ্বর রয়েছেন। এই ভাব নিয়ে চোখ একটু বুজতেই বাইরে অনেক লণ্ঠনের আলো ও কোলাহল শুনতে পাওয়া গেল, বুঝতে পারা গেল বাবা খুড়োরা এসেছেন। এ পৃথিবীটা আমাদেরই, শিশুদের নয় তাদের এখন বিদায় নিতে হবে।"

লেখকের বিশেষ বক্তব্যের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাই এখানে। গল্পের বর্ণনায় লেখক জানিয়েছেন—পথে পড়ে থাকা একটি চার বছরের ছোটো ছেলেকে ঘরে তুলে এনেছিলেন। কিন্তু সামাজিক বিধি-নিষেধের দায়ে শিশুটিকে বিদায় দিতে হয়েছিল। শিশুটি তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও বক্তার কাছে বেশ ভালই ছিল, ফিরে যাওয়ার কোনো প্রবণতা ছিলই না, কিন্তু যাকে জোর করে ধরে রাখার কোনো উপায় নেই, শেষপর্যন্ত তাকে তো যেতে দিতেই হয়। এই দ্বন্দ্বই শেষপর্যন্ত মানবিক করে তুলেছে লেখককে।

'নক্ষত্রের বিরুদ্ধে মানুষ' গল্পটি একটি অনবদ্য গল্প। ভাষা-শৈলী চমৎকার। দৃঢ়, বলিষ্ঠ ভাষায় ব্যঙ্গের নির্মাণ যৌবাল গল্পটিতে অভ্রান্ত লক্ষ্যে পৌছেছে।

কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল অনাদির যক্ষ্মা হয়েছে, প্রথম যক্ষ্মা, যক্ষ্মার প্রথম অধ্যায়ে ভালো করে চিকিৎসা করালেও চেঞ্জে গেলে অনেকসময় তাও সেরে যায়। কিন্তু নিঃসঙ্গ-নিরুপায়ের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে সে নাকি আজকাল খুব নিস্তব্ধ হয়ে আছে।

অন্যদিকে দেখতে আসে তার বন্ধু নিখিল। কিন্তু অনাদি নিজেকে এ পৃথিবীর ঘৃণ্য জীব

ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারে না। অনাদির মনে হয় সে মরেও যেন মরেনি। আর শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রী যখন তার একমাত্র আদরের সন্তানকে, তার কাছ থেকে সরিয়ে নেয় তখন মনে মনে খুবই কষ্ট পায় সে। আবার অনাদির স্ত্রী যখন নিজেকে আলতা-সিঁদুরে রাঙিয়ে তুলতে চায় তখন বিমর্ষ মুখে অনাদি তার বন্ধুকে জানায়—

"মৃতের চেয়েও মৃত্যুকে বহন করতে হবে যার, সেই স্ত্রীলোকের জীবনের তামাশা এ। দুঃখ কীরকম দেখতে পেলে?"

শেষপর্যন্ত অনাদির মত মানুষের মৃত্যু হয়। জোর করে বাঁচার লড়াইয়ে সামিল হয়েও প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে একমাত্র সন্তানকে রেখে বিদায় নিতে হয়। লেখক তার বন্ধুর খোঁজ নিতে গিয়ে উপলব্ধি করেন—

"মেয়েটাই শুধু রাজ্যভ্রষ্ট কোনো নিঃসহচর মহিমার মতো অসীম বিষণ্ণতায় আমার দিকে তাকিয়ে রইল। যেন বলিতে লাগিল—আচ্ছা তোমরা যাও, আমি চেষ্টা কারে দেখলাম ঢের, কিন্তু নক্ষত্রের বিরুদ্ধে মানুষ তো পারে না। ইহাতে আমার বিবেকের আস্বাদ হয়তো আমি দিতে পারব।"

জীবনের মর্মান্তিক পরিস্থিতিতেও অনাদি বাঁচতে চেয়েছিল, তার সন্তান হয়তো স্বপ্নেও ভাবেনি পিতৃশোক এভাবে সহ্য করতে হবে। বাস্তবিকই, আশা আর স্বপ্ন দিয়ে গড়া তার জীবনের এই অন্তঃসারশূন্যতা সত্যিই মেনে নেওয়া যায় না। গল্পটির আবেদনের দিকটি খুবই মর্মস্পর্শী।

জীবনানন্দ সবসময়ই চিরনতুন ও চিরআধুনিক। তাঁর প্রতিটি গল্পই প্রায় নামকরণের দিক থেকে অভিনব। গল্পগুলির মধ্যে জীবনের বিচিত্র বোধের বিস্তার, যা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। যেমন, 'কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়' গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র বিদোন, যে "নিজের জীবনের একটা গল্প লিখছে।.....নিজের জীবনের কথাই, নামগুলো মাত্র বদলে দিয়ে লিখতে শুরু কহেরছে সে"। মাত্র তিনটি মূল চরিত্র নিয়ে গল্পটি বিস্তৃত।

হিমাংশুর কাছে ভালবাসা একটা দ্বিধার জিনিষ ছিল, যদিও সে জানত অরুণা যদি এ পৃথিবীতে কাউকে ভালবেসে থাকে, তাহলে তাকেই। কিন্তু নানা কারণেই অরুণাকে বিয়ে করা অসম্ভব। জীবনের প্রকৃত প্রয়োজনের দিকে তাকালে অরুণাকে নিয়ে তার ভালোবাসার যে কটা বছর কেটেছে, তা তার কাছে নিরর্থক মনে হয়। শুধুমাত্র ভালবাসার কুয়াশা নিয়ে একটা জীবন কাটিয়ে দেয়া আর জীবনের মাত্রা ঠিক করে চলা যেন তার পক্ষে অসম্ভব। জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে জীবনকে খুঁজতে গিয়ে তার মনে হয়েছে—

'যে ভালবাসা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছয় না, যেমন বিবাহে বা বিবাহ বা বিবাহহীন দাম্পত্যেও, জীবনকে তাও অভিজ্ঞ করে বটে জীবনের কোনো এক সময়ের প্রয়োজনও মেটায়, পরিতৃপ্তিও বোধ করা যায়, কিন্তু কাকের কালো পাখনার ভিতর থেকে—যে ময়ূরকণ্ঠী রঙ ফুটে বেরোয় তেমনি ক্ষণিকের এ জিনিশগুলো, জীবনের শাদাশিদে প্রচার প্রয়োজনের

সম্পর্কে একেবারে অবান্তর।”

জীবনের যাত্রাপথে ঘুরতে ঘুরতে এসবই হিমাংশু কিছুদিন থেকে বুঝে আসছে। কিন্তু তবুও, শিগগিরই বিয়ে করতে যাচ্ছে হিমাংশু যদিও সে বিবাহিত জীবনের আগাগোড়াকে ভালো করে ধরতে পারছে না। কখনো সে সম্পদের জিনিশ বলে সেটাকে মনে করছে, কখনো কর্তব্যের, কখনো বোঝার। না, পারছে না সে জীবনের প্রয়োজনীয় প্রেমটাকে ছেড়ে দিতে বা অরুণার ভালবাসাকে।

জীবনানন্দের বেশীরভাগ গল্পের উপজীব্য নারী-পুরুষের সম্পর্ক এবং তাকে কেন্দ্র করে প্রেম-অপ্রেম। বিশেষ করে সমাজ-অনুমোদিত সম্পর্কের ভিতরেও যে ভালবাসার ঘ্রাণ থাকে না বরং পুরনো সম্পর্কগুলো মনে করে যেন “জীবনটা মাঝে মাঝে নরম হয়ে ওঠে, মধুর হয়ে ওঠে পৃথিবীর শীতের খেতগুলোর মত।” বিশেষ করে “গড়বার সময় যাদের শেষ হয়েছে। বাড়বার সময়, সঞ্চিত মিষ্টত্বকে কুয়াশার ভিতর শুয়ে শুয়ে অনুভব করবার সময় এসেছে যাদের,—তারপর কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়”।

জীবনানন্দের গল্পগুলি যেন তার মগ্ন চৈতন্যের ফসল। বাস্তবতা ও মন্ময় ভাব-কল্পনার মধ্যে কবিসত্তারই আত্মপ্রতিফন ঘটেছে গল্পদেহে। তাই বলা যেতে পারে এই গল্পগুলি তাঁর নিভৃত ভাবনার নির্যাস।

‘ভালবাসার সাধ’ গল্পটিতে জীবনানন্দ যেন অন্যমাত্রায় ধরতে চেয়েছেন জীবনকে। তিল-তিল করে গড়ে তোলা মানুষের জীবন নিছক স্বপ্ন নয়, প্রতি পদে পদে বাস্তবের কঠিন হাতছানি আলোড়িত করে তুলেছে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রকে। এককথায় আধুনিক জীবনযন্ত্রণা ও অধিবাস্তব জীবনের সুবাস—সব মিলিয়ে মানুষের জীবন ও সমস্যার গ্রন্থিভেদ করে নতুন জীবনবোধে উত্তরণের প্রয়াস এক অর্থে ছোটগল্প-শিল্পের ধারায় এক অনন্য সংযোজন বলা যেতে পারে।

পিয়াসা গাঙ্গুলি

হাজার বছরের নিসর্গ-পথিক : জীবনানন্দ দাশ

কবি জীবনানন্দ দাশের প্রকৃতি সখ্যতা সর্বজনবিদিত। এই প্রকৃতির কোলেই তার সুপ্রাচীন পথে নিত্য যাওয়া আসা, আবহমান কাল ধরে। তার প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায় আমরা দেখতে পাই প্রকৃতির সাথে তিনি যেন অচ্ছিদ্ধ বন্ধনে যুক্ত, মনে হয় তার সমস্ত প্রেম যেন প্রকৃতির সঙ্গেই। জীবনানন্দ দাশ... মৃত্যু চেনতায় ভরা, প্রকৃতি-র প্রতিটি রন্ধ্রে নিজের সত্তা-কে মেলে দেওয়া এক নাম। যিনি রূপসী বাংলার কবি, নির্জনতার কবি এবং ধূসরতার কবি হিসেবে পরিচিত।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্গত বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলায় কবি জন্মগ্রহণ করেন। বাবা সত্যানন্দ দাস ও মাতা কুসুম কুমারী দেবী। পরিবার ছিল সাংস্কৃতিক ও শিক্ষিত। তাঁর পিতা সত্যানন্দ দাশ ছিলেন শিক্ষক ও সাংবাদিক, এবং মা কুসুমকুমারী দাশ ছিলেন সেই যুগের এক নারী -কবি। হয়তো সেই বিরল ঘটনায় তার পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই কবি বাংলা, ইংরেজি এবং ছবি আঁকায় পারদর্শী ছিলেন। উচ্চ মাধ্যমিক বরিশালে পাস করবার পর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করবার জন্য বরিশাল ত্যাগ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন মনোরাজ্যে বিচরণকারী এক উদাস মানুষ। তাঁর এই তন্ময়তা জুড়ে দিয়েছিল তাঁর অন্ত্য ও বহিঃপ্রকৃতিকে। প্রকৃতির নৈসর্গিকতার মধ্যে তিনি ডুব দিতে পেরেছিলেন। আর সেই টপোগ্রাফি হয়ে উঠেছে তার কবিতার মূল সুর। সেই সুরের টানে বাধা তার কয়েকটি কবিতা হবে এই প্রবন্ধের আলোচ্য। তাঁর রচনা শুধু কবিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তিনি উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধও লিখেছেন। তাঁর উপন্যাস 'মাল্যবান' এবং 'সুতীর্থ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যকর্ম পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যে গভীর প্রভাব ফেলেছে, এক আনকোড়া ঘরানার জন্ম দিয়েছে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজিতে অনার্স সহ বি. এ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে জীবনানন্দের কবি প্রতিভা বিকশিত লাভ করেন। ধীরে ধীরে তার লেখা কলকাতা ও ঢাকায় বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে। সেই সময়কার যেগুলির মধ্যে ছিল সুবিখ্যাত পত্রিকা কল্লোল, কালিও কলম , প্রগতি প্রভৃতি। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' প্রকাশ পায়। তার প্রখ্যাত কাব্যগ্রন্থ গুলির মধ্যে 'ঝরা পালক', 'ধূসর পান্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী', 'রূপসী বাংলা' ও 'বেলা অবেলা কালবেলা'।

তিনি নজরুলের মত বিদ্রোহী না হয়েও, রাজনীতি অসাম্য দারিদ্র্য শোষণ সম্বন্ধে উচ্চকণ্ঠ না হয়েও, রবীন্দ্রনাথের মতো ভারত-আত্মার বাণী মূর্তি না হয়েও, একজন যুগস্রষ্টা কবি হিসেবে নিজের আসন গড়ে তোলেন। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার আকাশে জীবনানন্দ দাশ

ছিলেন ধ্রুবতারা। তার বিভিন্ন কাব্যিক প্রতিভার মধ্যে গ্রাম বাংলার প্রতি প্রেম ভালবাসা ও মাধুর্য্যতার রূপ আমরা পেয়ে থাকি।

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হলো জীবনানন্দ দাশের সুবিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'রূপসী বাংলা'। গ্রন্থটি হলো জীবনানন্দ দাশের সপ্তম কাব্যগ্রন্থ এবং কবি চিরতরে চলে যাওয়ার পর পাঠকের হাতের পরশ পায়। কবির বাংলার প্রতি প্রেম এতটাই ছিল যে তিনি সারা পৃথিবীর রূপ আমাদের এই বাংলায় খুঁজে পেয়েছেন। কবির এই বাংলার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা আমাদের সমৃদ্ধ করে আসছে যুগ যুগ ধরে। তাই পল্লী বাংলার রূপ আমরা যখনই দেখি তখনই আমাদের প্রথম মনে আসে জীবনানন্দ দাশের কথা। তার বাংলা সাহিত্যে যে অমূলক প্রতিভা এবং বাংলার প্রতি যে অনুরাগ তার সংমিশ্রণে আমরা এমন প্রসিদ্ধ সংলাপ কবির কাব্যগ্রন্থ থেকে খুঁজে পাই। জীবনানন্দ দাশের মধ্যে প্রকৃতির যে চেতনা তা আমরা তার আগের কাব্যগ্রন্থ থেকে পেয়েছি।

তাঁর লেখায় প্রকৃতির এবং জীবনের বাস্তবতার ছাপ আমরা পেয়ে থাকি। আগের কবিতাগুলির মধ্যে যেমন মাঠের গল্প, পেঁচা, অবসরের গান প্রমুখ, এসবতে প্রকৃতির নৈরাশ্যের কথা উল্লেখ পেয়ে থাকি। কিন্তু রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থে কবি শান্তির কথা বলেছেন। ঠিক যেন 'দু'দণ্ড শান্তি'। নাটোরের বনলতা সেন যেমনটা কবিকে দেন। জীবনানন্দ দাশের পূর্বের কবিতাগুলির মধ্যে প্যাঁচা, শকুন ইত্যাদির অবতরণ যেমন আছে, তেমনই 'রূপসী বাংলা'তে শঙ্খচিল, শালিক নানারকম বৃক্ষ ও রূপকথার কথাও আছে। রূপশালি ধান, রূপসীর ধান ধোওয়া হাতের গন্ধে বিভরতার নির্দশন পান এই এই কাব্যগ্রন্থে। বাংলার নদী, মাঠ, ভাটপুল পেরিয়ে যেন নিজের সাথেই একাত্ব হতে চাইছেন, প্রকৃতির সাথে যেন একই সত্ত্বাই মিশে যেতে চাইছেন আজীবন হতাশায় থাকা এক কবি। যার কবিতা পরবর্তী-তে বাংলা কবিতার বাঁক বদল করবে। সময়ের নিয়মে যিনি হয়ে উঠেছেন বাংলা কবিতা তথা সাহিত্যের এক মহীরুহ।

তেমনি আর একটি বিশেষ দিক হল, কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সব থেকে সুন্দর সৃষ্টি হিসাবে নারীকে তিনি সাজিয়েছেন নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে। প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করেছেন নারীকে, কোথাও তিনি লিখছেন প্রকৃতিকে নারী আবার কোথাও নারীকে প্রকৃতি। তার সারা মন প্রাণ জুড়ে শুধুই বাংলা। বাঙলা — প্রেম তাঁর এতটাই তীব্র যে তিনি লিখছেন তিনি এই দেহ ছেড়ে গেলেও, পৃথিবীর বাইরে থেকে বাংলাকে দেখবেন।

আসলে তার অন্তরের নীরবতা, প্রাণের শান্তি লুকিয়ে এই বাঙলার সন্ধ্যাতেই—'সন্ধ্যা হয় - চারিদিকে শান্ত নিরবতা'। জীবনানন্দ দাশের কাছে সন্ধ্যা বা অন্ধকার শান্তি বা নিবিড়তার কথা বলে, এই শান্তি যেন রাগ শ্যাম কল্যাণের পেলবতা, কোমল রুপ।

আমদের পারিপার্শ্বিকের যে প্রকৃতির ছবি, নিত্যদিনের, তা সহজেই চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু জীবনানন্দের কবিতায় সেই টুকরো ছবি গুলি হয়ে উঠেছে উপাদান। শুধু তাই নয়, সেই সব কিছু দিয়েই তিনি এঁকেছেন বাঙলার বর্ণ-ছবি।

"খড় মুখে নিয়ে এক শালিখ যেতেছে উড়ে চুপে;
গোরুর গাড়িটি যায় মেঠো পথ বেয়ে ধীরে ধীরে;
আঙিনা ভরিয়া আছে সোনালি খড়ের ঘন স্তূপে;"

তাঁর প্রেমের গভীরতা কোন পর্যায়ের, তা বোঝা যায় তখনই যখন এই বাঙলার ঘাসে তিনি খুঁজে পান জগতের সব রূপ, বিশ্বের সব পাখির কলতান তিনি শোনেন একান্ত বাঙলার গাছের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ঘুঘুর ডাক।

"পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে;
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে;"

জগত সংসারকে তিনি দেখছেন নিজের মনে। তা যখন দুই মানুষের প্রেম রুপে আসে, তখনও বিশ্ব চরাচরের সেই প্রেমই স্থান পায় কবির হৃদয়ে। সেই অনুভবই তাঁর কলম থেকে রুপ নেয়—

"পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দু'জনার মনে;
আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে-আকাশে"।

জীবনানন্দ দাশের কাছে সন্ধ্যা বা অন্ধকার শান্তি বা নিবিড়তার কথা বলে, তাঁর জীবন এতটাই প্রকৃতি সম্পৃক্ত যে তাঁর আত্ম — সঙ্গিনী হিসাবেও দেখেছেন প্রকৃতিকে। যেমন 'আমাদের দুজনার..' কথাটি দিয়ে সেই যুগল মূর্তিকেই তিনি এনেছেন।

প্রসঙ্গত একথা বলা যায়, সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ও নিসর্গকে করেছেন তাঁর সাহিত্যের ক্যানভাস, কিন্তু তা ছড়িয়েছে বাঙলার বাইরেও। সেখানে জীবনানন্দের কবিতায় শুধু বাঙলার আটপৌরে ঝোপ জঙ্গল, প্রাণী সর্বোপরি মেঠো গন্ধ উঠে এসেছে, যা ভূগোলের এই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ।

কবি এখানে ধান কাটার সাথে মানুষের মনকে তুলনা করেছেন... ধান কাটা হয়ে যাওয়ার পর মাঠ যেমন শূন্য হয়ে যায়—মানুষের মন থেকে তার প্রিয় মানুষ চলে যাবার পরেও মানুষের মন তেমন শূন্য হয়ে যায়— প্রকৃতি ও মানুষের জীবন যে আলাদা নয় তাও কবি বারবার বুঝিয়েছেন মধ্য দিয়ে। প্রকৃতিকে শুধুমাত্র সবুজ, দৃশ্যমান কিছু নদী, সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত ভেবে নিলে ভুল হবে আমাদের। প্রকৃতিও এক অমোঘ জীবনবোধ। শেষে এসে জীবনানন্দ দাশ গ্রাম বাংলার প্রকৃতি থেকে শহরের প্রকৃতি কথা বলেছেন। কবির কাছে শহরের সভ্যতা ধ্বংসের কথা বলে না। শহরে বেঁচে থাকার প্রধান রসই হলো প্রকৃতি। শহরের জীবনেও যে প্রশান্তি রয়েছে তাও তিনি এই কাব্যগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

শেষে এসে আমি আমার আলোচ্য বিষয়ে পরিসমাপ্তি ঘটাচ্ছি, এই দুটি লাইনের মধ্য দিয়ে...

"আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে এই বাংলায়,,
হয়তো মানুষ নয় হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে..."

জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থে রূপকথা, মঙ্গলকাব্য, পুরান,ইতিহাস, প্রকৃতি

প্রেমের মেলবন্ধন আমরা পেয়ে থাকি। এই কাব্যে কবি এক জায়গায় লিখেছেন..."আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি টের পাই..."

তিনি মাঠে শুয়ে আকাশের পানে চেয়ে ভাবছেন, আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল দিগন্ত রেখার মতো পৃথিবীকে সংযুক্ত করেছে।

তিনি ভাবছেন আকাশ যেন কেশবতী কন্যা, আবার কখনো কিশোরী চাল ভেজা হাতের সঙ্গে তুলনা করছেন। তার এই তুলনা ও অনুষঙ্গ গুলি খুবই সরল। কবির প্রতিটি শব্দ বন্ধন এর মধ্যে চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে।

জীবনানন্দ দাশ তার এই 'রূপসী বাংলা' প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে নিজেকে এবং আপামর বাঙালিকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করছেন এই বাংলাতে জন্মগ্রহণ করে... 'এখানে আকাশ....' কবিতায় দেখি—

"এখানে আকাশ নীল-নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল
ফুটে থাকে হিম শাদা-রং তার আশ্বিনের আলোর মতন
আকন্দফুলের কালো ভীমরুল এইখানে করে গুঞ্জরন
রৌদ্রের দুপুর ভ'রে,-বার-বার রোদ তার সুচিক্কণ চুল
কাঁঠাল জামের বুকে নিংরায়; —দহে বিলে চঞ্চল আঙুল
বুলায়ে-বুলায়ে ফেরে এইখানে জাম লিচু কাঁঠালের বন
ধনপতি, শ্রীমন্তের, বেহুলার লহনার ছুঁয়েছে চরণ;
মেঠো পথে মিশে আছে কাক আর কোকিলের শরীরের ধুলা,"

এমন কবিতার বাঁধন, এমন শব্দ ব্যবহার বিরল। অনেকে কবিতার শব্দের গাঁথুনির ওপর জোর দিয়েছেন, আবার কেউ শব্দকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে, ভাষার মাধুর্যকে শিরধার্য করেছেন। এমনও দেখা যায় কবিতার ব্যাকরণগত দিক নিয়ে অনেকে বেশী সচেতন।

"কবেকার কোকিলের, জান কি তা? যখন মুকুন্দরাম, হায়,
লিখিতেছিলেন ব'সে দু-পহরে সাধের সে চণ্ডিকামঙ্গল,
ককিলের ডাক শুনে চোখে তাঁর বাধা পায়—থেমে-থেমে যায়;—
অথবা বেহুলা একা যখন চলেছে ভেসে গাঙুড়ের জলে
সন্ধ্যার অন্ধকারে, ধানক্ষেতে, আমবনে, অস্পষ্ট শাখায়
কোকিলের ডাক শুনে চোখে তার ফুটেছিল কুয়াশা যেন"

এখানে আকাশ নীল কবিতার মধ্য দিয়ে কবি নৈরশ্যতা ও প্রকৃতিকে সমান্তরাল ভাবে চিত্রিত করেছেন। আমরা এখানে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের কথা জানতে পারি, আমরা জেনেছি মনসামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল ও বেহুলা লক্ষিন্দরের কথা। এটি যে আমাদের বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য সেটি তিনিই তার প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটন করেছেন। কবি জীবনানন্দ দাশ ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন তার এই রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে।

আসলে জীবনান্দ দাশ একজন আধুনিক এবং উত্তর আধুনিক কবি। প্রকৃতি, প্রেম, মুগ্ধতা, নির্জনতা, একাকিত্ব, সমাজ এবং সমকাল তাঁর সৃষ্টির অন্যতম অলংকার। জীবনানন্দ ছাড়া কে আর এভাবে বলতে পারে? — "কোথাও মঠের কাছে যেইখানে ভাঙা মঠ নীল হয়ে আছে শ্যাওলায়" শুধুই কি কবিতা! শুধুই কি শব্দ! নাকি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ পাওয়া এই কাব্যগ্রন্থের মধ্যে নিঃশব্দে লুকিয়ে কাঁদছে এক হেরে যাওয়া ক্ষয়াটে যুবক! বারবার চাকরি বদল, দিল্লির কলেজের চাকরি ছেড়ে এসে বেকার দিনগুলো। আসামে, পাঞ্জাবে এবং অন্যত্র চাকরি হলেও তাঁর ভালোবাসার কলকাতা ছেড়ে যেতে রাজি ছিলেন না। পরবর্তীতে যে কলকাতার ট্রামই তাঁর দৈহিক মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হ্যারিসন রোডের বাসা বদল, আজীবনই অর্থাভাব, শেষ জীবনে তা প্রবল হয়ে উঠল, স্টুডেন্টদের থেকে পাওয়া অসম্মান, সমকালীন কবিদের ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপ, দম্পত্য জীবন সুখের হল না, শোভনার কাছ থেকে পাওয়া প্রত্যাখ্যান এতকিছুর মধ্যে জীবন্ত করে রাখতে চাইলেন প্রকৃতিকে। নাহলে পরের লাইনে কেনই বা লিখবেন "অনেক গভীর ঘাস জমে গেছে বুকের ভিতর, পাশে দীঘি মজে আছে..." সবুজ-কে, ওই প্রাণের স্পন্দন-কে কিংবা ঘাসের প্রাচীন গভীরতা-কে তিনি রেখে দিলেন বুকের ভেতর। তার পরের শব্দবন্ধেই ছবি আঁকলেন চরম হতাশার। যেখানে ভাষা এবং ভাষ্যকার ওতপ্রোত অভিন্ন। আসলে জীবনানন্দের যে জীবনদর্শণ তা হয়তো একমাত্র উপলব্ধি করতে পারতো প্রকৃতিই। সেজন্যই প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে থাকা জীবনটাকে ধরতে পেরেছেন তিনি। আসলে তিনি আমাদের শিখিয়েছেন নতুন করে চেনা জিনিসগুল দেখতে। যা বঙ্গবাসীর আবাল্য সাথী তাকে নতুন ভাবে উপলব্ধি করতে।

তথ্যসূত্র :

১। জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
২। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ড: মহম্মদ আখতার হোসেন
৩। এবং জীবনানন্দ, মিজান রহমান

টি টু ঘো ষ
‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ : জীবনানন্দ দাশের প্রকৃতি-চেতনা

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ অপ্রতীম ও স্বতন্ত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে কবিদের ‘কাব্যচিন্তা’ তথা ‘কাব্যভুবন’ ভিন্নরূপ লাভ করে এবং তাঁদের মনন চর্চায় উনিশ শতকের প্রথাসিদ্ধ আদর্শবাদ, হৃদয়াবেগ, অমর্ত্যলোক বিশ্বাসের জগৎ ভেঙে গিয়ে সেখানে ঐতিহাসিক বাস্তবতা, স্ববিরোধ, তীব্র সংশয় ও জটিলতা স্থান লাভ করে। বাংলা কবিতায় রবীন্দ্র-অনুসারী যে কাব্যধারা এতদিন ধরে অব্যাহত ছিল তার পরিবর্তন সূচিত হল। একদল নতুন কবি প্রত্যেকের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা জগৎ ও জীবনকে নিয়ে কবিতা লেখা শুরু করলেন। তাঁদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমূখ অন্যতম। রবীন্দ্রোত্তর কালে এই যে নবীন আধুনিক কবিতার সৃষ্টি হয় তার উৎসমূল একদিকে যেমন ভারতীয় সংস্কৃতি অন্যদিকে এই কবিরা পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকেও তাঁদের চিন্তার রসদ সংগ্রহ করেছিলেন। আমরা জানি আধুনিক কবিতার জন্ম হয় বোদল্যেয়ারের হাত ধরে। তারপর আসেন র‍্যাবো অসুন্দরের ধারণা নিয়ে। বাংলা আধুনিক কালের কবিরাও তাঁদের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তবে জীবনানন্দ দাশ তাঁর সহধর্মীদের থেকে পৃথক পথের যাত্রী ও ব্যতিক্রমী ছিলেন। “যা দৃশ্যতো কুৎসিত তার মধ্য থেকে সুন্দরকে নিষ্কাশন করে নেওয়া; প্রেম-অনুভূতির জায়গায় অপ্রেমের অনুভূতিকে সত্য করে তোলা; বাস্তবের বিবর্ণতায় অস্তিত্বের নিগগ্নতার বোধ সঞ্চারিত করা-যেভাবে জীবনানন্দ পেরেছিলেন তেমন আর পারেননি অন্য কবিরা।”[১]

জীবনানন্দ দাশের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ‘ঝরা পালক’ ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কবিতা সংকলনটিতে কবির স্বকীয়তার থেকে তাঁর পূর্বজ কবিদের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এরপর তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে। এখানে কবি স্বতন্ত্র মহিমায় নিজস্ব ভঙ্গিতে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং গুণী-সমাজে সুনাম ও স্বীকৃতি লাভ করেন। বস্তুত ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ কাব্যই জীবনানন্দের প্রতিষ্ঠার অন্যতম সোপান। রবীন্দ্র-পরবর্তী কালে জীবনানন্দকে কেউ ‘নির্জনতম কবি’, কেউ ‘প্রকৃতির কবি’, ‘নিশ্চেতনার কবি’, ‘প্রতীকী কবি’ বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কিন্তু জীবনানন্দ এখানে খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব স্বর ও ভাষাভঙ্গি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ পাঠ করে খুশি হয়ে জানিয়েছিলেন ‘তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।” নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে পরিবর্তনশীল সময় এবং মৃত্যুচেতনা কাব্য সংকলনটির প্রধান ভিত্তি। এখানে কবির প্রিয় ঋতু ‘হেমন্ত’ কখনও জীবনের প্রতীক কখনো বা ক্ষয়শীল জীবন মৃত্যুর প্রতীক এবং কাব্যের সমগ্র অংশ জুড়ে রয়েছে প্রকৃতির অবাধ বিচরণ। বুদ্ধদেব বসু ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ কাব্য প্রসঙ্গে বলেছেন, “জীবনানন্দ প্রকৃত

কবি ও প্রকৃতির কবি। ঠিক প্রেমের কবিতা বলতে যা বোঝায় এই গ্রন্থে তা একটিও নেই। ‘নির্জন স্বাক্ষর’, ‘১৩৩৩’, ‘সহজ’, ‘কয়েকটি লাইন’, এ-সমস্ত কবিতায় প্রেমের পাত্রী অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিই অনেক বড়ো ও জীবন্ত হ’য়ে উঠেছে কবির কল্পনায়।”[২]

একদিক থেকে সকল কবিকেই প্রকৃতির কবি বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যের প্রধান বিষয়ই হল প্রকৃতি। ইংরেজি সাহিত্যের ওয়ার্ডস ওয়ার্থ প্রকৃতির কবি হিসেবে বিবেচিত। তবে সকল কবি মাত্রই প্রকৃতির কবি এই আখ্যা দেওয়া যায় না; কারণ তাঁদের কাব্যের প্রকৃতিই একমাত্র আলোচ্য ও প্রধান বিষয় নয়। বুদ্ধদেব বসু ‘কালের পুতুল’ গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেছেন “অনেক কবির পক্ষে প্রকৃতি মানবজীবনের নানা অভিজ্ঞতার পটভূমিকা; অনেকের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের বিলাস, আবার কারো-কারো পক্ষে আমাদের মনের অবস্থার প্রতিরূপমাত্র। প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে অনুভব না করেন এমন কোনো কবি নেই; কিন্তু সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়েই গ্রহণ ও প্রকাশ করেন এমন কবির সংখ্যা অল্প। তাঁরাই বিশেষভাবে প্রকৃতিব কবি।”[৩]

আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশকে প্রকৃতভাবে প্রকৃতির কবি বলা যায়। যুগের হতাশা ও ক্লান্তি তাঁকে প্রকৃতির থেকে দূরে নিয়ে যায়নি বরং তিনি প্রকৃতির মধ্যেই আত্মলীন হয়ে গেছেন। তাঁর প্রথম কবিতা সংকলন ‘ঝরা পালক’ থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর একাত্মতা শুরু, পরে ‘ধূসর পান্ডুলিপি, ‘বনলতা সেন’, ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যগ্রন্থে তা আরও বিস্তার লাভ করে। ‘ধূসর পান্ডুলিপি’ কাব্যের প্রথম কবিতা ‘নির্জন স্বাক্ষর’ কবিতায় দেখা যায় মৃত্যুর অনুষঙ্গ। প্রকৃতি এখানে প্রতীক রূপে বিরাজিত। মৃত্যুর প্রতীকী ভাবনায় উঠে এসেছে শীত ঋতুর প্রসঙ্গ, কবির জীবনের সমস্ত কিছুর মূলে যে মানবী, প্রিয় হেমন্তের মতো পৃথিবী থেকে ঝরে পরে শীতরূপী মৃত্যুর কোলে। অর্থাৎ পৃথিবীতে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয় তাই কেউই কারোর চিরসাথী হতে পারে না। কবি বলেছেন,

“হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন-
পথের পাতার মত তুমিও তখন
আমার বুকের ‘পরে শুয়ে রবে?-অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার!”[৪]

জীবনানন্দ দাশের প্রকৃতি-বর্ণনায় আছে হেমন্ত ঋতুর আধিপত্য। হেমন্ত প্রকৃতির বন্ধা রূপের মধ্যে কবি যুগের নিঃস্বতা, রিক্ততা ও শূন্যতাকে অনুভব করেছেন। তবে হেমন্ত ঋতু কবির কাছে কেবল বিনষ্টির প্রতীক নয়, রাতের জ্যোৎস্নায় হেমন্তের অপরূপ ফলবান রূপও তিনি প্রথম লক্ষ্য করেন।

‘মাঠের গল্প’ কবিতায় একইভাবে প্রকৃতি প্রতীকি রূপ লাভ করেছে। ‘মেঠো চাঁদ’ এখানে সফলতার এবং ‘পোড়ো জমি’ নিষ্ফলতার প্রতীক। ফসল কাটার পর মাঠে তৈরি হয়েছে ভয়াবহ শূন্যতা, পোড়ো জমিতে এদিকে সেদিকে পড়ে রয়েছে খড়, নাড়া আর আর

সেখানে তৈরি হয়েছে বড় বড় ফাটল। পৃথিবীও বারবার ফসল ফলিয়ে আজ হয়েছে বুড়ি:

"ফসল গিয়েছে ঢের ফলি,
শস্য গিয়েছে ঝরে কত,-
বুড়ো হয়ে গেছো তুমি এই বুড়ি পৃথিবীর মত!"[৫]

'পেঁচা' কবিতাতেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি পৃথিবীর মলিন রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানেও চাঁদ, তারার সুন্দর রূপের পাশাপাশি ধোঁয়াশা, কুয়াশায় ঝিমিয়ে থাকা পৃথিবী, হলুদ পাতা, মরা ঘাসের চিত্র ফুটে উঠেছে। বস্তুত জীবনানন্দ দাশ কেবলমাত্র প্রকৃতির সৌন্দর্যরূপ দর্শন করেননি, প্রকৃতির সমস্ত বস্তুকেই তিনি উপভোগ করেছেন। তাই কঠিন বাস্তব পৃথিবীর দুঃখ দুর্দশা এবং নাগরিক জীবনের যন্ত্রণা ও অভিশাপে জর্জরিত হয়ে তিনি প্রকৃতির কাছেই আশ্রয় ও শান্তি খুঁজে ফিরেছেন। 'পঁচিশ বছর পরে' কবিতায় আমরা প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক রূপের চিত্র পাই। পথের উপর পাখির ডিমের খোলা, নষ্ট শশা, মাকড়সার ছেঁড়া জাল এবং তাতে আটকে থাকা শুকনো মাকড়সা প্রভৃতি ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'মৃত্যুর আগে' কবিতাতেও আমরা দেখতে পাই কবির মৃত্যুচেতনা ও জীবনবোধ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একদিক দিয়ে তিনি যেমন দেখলেন নরম নদীর নারী, ফুল, চাঁদ, জোনাকি, নক্ষত্র আকাশ, অন্যদিকে হেমন্তের পর মৃত্যুর শীতলতা, নির্জন মাঠ, অন্ধকার কুয়াশা রাত, শিকারির গুলি। অর্থাৎ একদিকে জীবন অন্যদিকে প্রকৃতির শূন্যতা ও মৃত্যুর ছবি।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যে জীবনানন্দ যে প্রকৃতির চিত্র অঙ্কন করেছেন, তার রূপ, রস কেবল কল্পনা ও চিন্তাপ্রসূত নয়; তার গন্ধ ও স্পর্শ অনুভব করা যায়। সমগ্র কাব্য জুড়েই এই 'চিত্ররূপময়তা' বর্তমান। যেমন 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় দৃশ্যের সঙ্গে শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধের অসাধারণ যোগ রয়েছে। জ্যোৎস্নারাতে নির্জন খড়ের মাঠে হাঁটা, বকের ডাক, ডানার শব্দ, গুলির আওয়াজ, পুরনো পেঁচার ঘ্রাণ, ঝিঁঝিঁর গন্ধ, নরম জলের গন্ধ, শিশুর মুখের গন্ধ, চালের ধূসর গন্ধ, প্রান্তরের সবুজ বাতাস; সমস্ত কিছুই যেন ইন্দ্রিয়-দ্বারা অনুভব করা যায়—

"আমরা বসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত-রাত্রিটিরে ভালো,
খড়ের চালের 'পরে শুনিয়াছি মুগ্ধরাতে ডানার সঞ্চার;
পুরানো পেচার ঘ্রাণ; -অন্ধকারে আবার সে কোথায় হারালো!
বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ,-মাঠে-মাঠে ডানা ভাসাবার
গভীর আহ্লাদে ভরা: অশথের ডালে-ডালে ডাকিয়াছে বক:
আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এই সব নিভৃত কুহক;"[৬]

বুদ্ধদেব বসু বলেছেন "আমাদের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ সবচেয়ে কম 'আধ্যাত্মিক', সবচেয়ে বেশি 'শারীরিক'; তাঁর রচনা সবচেয়ে কম বুদ্ধিগত, সবচেয়ে বেশি ইন্দ্রিয় নির্ভর।"[৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতাটি পড়ে বলেছিলেন জীবনানন্দের 'চিত্ররূপময়' কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে।

কবিতা সংকলনটিতে কবি কখনও প্রকৃতির নির্জন ও প্রচ্ছন্ন রূপের মধ্যে দিয়ে রূপকথারও সৃষ্টি করেছেন। যেমন 'অবসরের গান' কবিতায় পল্লীপ্রকৃতির নানান ছবি রূপকথার আদলে ধরা পড়েছে। গর্ভবতী ধান্যনারীর সৌন্দর্য্য, মাতৃত্বের পরিণতি, শারীরিক অবসাদ ও ক্লান্তি, উৎসব, মাটির বুক থেকে তোলা মদ ও আইবুড় মেয়েদের নৃত্য এবং গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের ঠান্ডা মধুর সুরে শান্ত ঘুম প্রভৃতি গল্পের মত চিত্রিত হয়েছে।

"গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেক দিন-
জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ ভালোবেসে।"[৮]

'পরস্পর' কবিতাটিও রূপকথার কাহিনি নিয়ে রচিত হয়েছে। কবি এখানে একদিকে দেখেছেন মৃত্যু ও প্রকৃতির করুণ রূপ এবং অন্যদিকে স্বচ্ছ ও আনন্দময় জীবন।

"কুমারের শেষ হলে পরে,—
আর এক দেশের এক রূপকথা বলিল আর এক জন,
কহিল সে,-উত্তর সাগরে
আর নাই কেউ!—
জ্যোৎস্না আর সাগরের 'ঢেউ
উ'চুনিচু পাথরের 'পরে
হাতে হাত ধ'রে
সেইখানে; কখন জেগেছে তারা-তারপর ঘুমাল কখন!"[৯]

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকৃতির মধ্য দিয়ে নারী রূপের জন্ম হয়েছে। যেমন বনলতা সেন, শেফালিকা বোস, মৃণালিনী ঘোষাল। 'ধূসর পান্ডুলিপি' কাব্যেও আমরা প্রকৃতিদেহের মধ্যে নারীদেহের রুপ লক্ষ্য করি। নারীর মতোই ইন্দ্রিয়ঘন অনুভূতি নিয়ে প্রকৃতি যেন এখানে উপস্থিত হয়েছে। 'অবসরের গান', 'পরস্পর', 'পিপাসার গান' প্রভৃতি কবিতায় প্রকৃতি ও নারীর ভেদরেখা যেন মুছে গিয়েছে—

"চারিদিকে নিয়ে পড়ে ফলেছে ফসল,
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা-ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল;"[১০]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য প্রকৃতির আদলে নারীদেহ বর্ণনা থাকলেও, নারীকে ঘিরে আদিম আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার বাসনা জীবনানন্দের কবিতায় স্থান পায়নি।

জীবনানন্দ দাশের কাছে প্রকৃতি হল জীবনের শান্তির পরম আশ্রয়স্থল। জীবনের বিষাদ, বেদনা ও বিষন্ন প্রেমের পটভূমি হিসেবে প্রকৃতিকে কবির ধূসর মনে হলেও, প্রকৃতির মধ্যেই কবি সহজ শান্তি খুঁজে পেয়েছেন। প্রকৃতিকে ভালোবেসে কোন দুঃখ, ক্ষতি

নেই; কারণ নারীর মতো সে নিষ্ঠুর নয়। তাছাড়া প্রকৃতির বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে একদিকে যেমন ঠকবার ভয় থাকে না ঠিক তেমনই প্রকৃতির রূপমুগ্ধতায় ফাঁকিও থাকেনা। তাই রসময় বিচিত্র প্রকৃতি জীবনানন্দের কাছে অবারিত শান্তির আশ্রয়—

"রয়েছি সবুজ মাঠে-ঘাসে-
আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে;
জীবনের রং তবু ফলানো কি হয়
এই সব ছুঁয়ে ছেনে!-সে এক বিস্ময়
পৃথিবীতে নাই তাহা-আকাশেও নাই তার স্থল-
চেনে নাই তারে অই সমুদ্রের জল!"[১১]

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যে বেশিরভাগ কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনার সঙ্গে মৃত্যুচেতনা রয়েছে। কবি উপলব্ধি করেছেন কেবল মানুষ নয়, গাছ, ফুল, শিশির, নক্ষত্র, চাঁদ সকলের সঙ্গে পৃথিবীরও একদিন মৃত্যু হবে। 'ক্যাম্পে' কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হৃদয়হীন হিংস্র রূপের চিত্র ফুটে উঠেছে। হরিণীর ডাকে প্রেমের অভিসারে গিয়ে শিকারির হাতে হরিণের নির্মম মৃত্যু সভ্যসমাজের হৃদয়হীন পাশবিকতাকে প্রকাশ করে। আবার 'পাখিরা' কবিতায় গভীর জীবনবোধের চিত্র পাওয়া যায়। বসন্তের রাতে, সমুদ্রের তীব্র বাতাস, শীতকে অতিক্রম করে এবং মৃত্যুকে উপেক্ষা করে বংশরক্ষার তাগিদে পাখিরা লক্ষ লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করে চলেছে বসন্তের দেশে। বসন্ত ঋতু এখানে জীবনের প্রতীক। 'অনেক আকাশ' কবিতায় শীত ও হেমন্ত ঋতুর বর্ণনার মাধ্যমে কবি জীবন ও মৃত্যুর স্পষ্ট আভাস দিয়েছেন। 'জীবন' কবিতাতে প্রকৃতির ছয় ঋতুর আবর্তনের মতোই জন্ম, প্রেম ও মৃত্যুর আবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মৃত্যুরূপী শীত সমস্ত সজীবতাকে নষ্ট করে দেয়, গাছের পাতার মতো জীবনও ঝরে পড়ে:

"যে পাতা সবুজ ছিল-তবুও হলুদ হতে হয়,—
শীতের হাড়ের হাত আজো তারে যায় নাই ছুঁয়ে;"[১২]

'প্রেম' কবিতাতেও কবি দেখিয়েছেন চলমান জীবনের পরিবর্তন; মৃত্যু যার অনিবার্য পরিণতি। এখানেও শীতঋতু মৃত্যুর প্রতীকী রূপ বহন করেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যের সমগ্র অংশ জুড়েই রয়েছে কবির প্রকৃতি কল্পনা এবং মানব জীবনের বহু বোধ ও বিস্ময়ের মূল কেন্দ্রই যে প্রকৃতি তা জীবনানন্দ দাশ মনে প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র :

১। চক্রবর্তী, সুমিতা. 'আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়'. বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২২, পৃ. ১৫.

২। বসু, বুদ্ধদেব. 'কালের পুতুল'. কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৯, পৃ. ২৭.

৩। তদেব. পৃ. ২৯.
৪। দাশ, জীবনানন্দ. 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'. কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ২০২০, পৃ. ১৪.
৫। তদেব. পৃ. ১৬.
৬। তদেব. পৃ. ৮০.
৭। বসু, বুদ্ধদেব. 'কালের পুতুল'. কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৯, পৃ. ৩১.
৮। দাশ, জীবনানন্দ. 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'. কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ২০২০, পৃ. ৪৯.
৯। তদেব. পৃ. ৩৬.
১০। তদেব. পৃ. ৪৫.
১১। তদেব. পৃ. ১৩.
১২। তদেব. পৃ. ৫৪.

সহায়ক গ্রন্থ :

১। চক্রবর্তী, সুমিতা. 'আধুনিক কবিতার চালচিত্র'. কলকাতা: সাহিত্যলোক, ২০১৬.
২। চট্টোপাধ্যায়, হীরেন. 'কবি ও কবিতা কায়া ও মায়া'. কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২.
৩। দাশ, জীবনানন্দ. 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'. কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ২০২০.
৪। দীপ্তি, ত্রিপাঠী. 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়'. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৫৮.
৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ. 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা'. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭.
৬। ভট্টাচার্য, বীতশোক. 'জীবনানন্দ'. কলকাতা: বাণীশিল্প, ২০১৪.
৭। মুখোপাধ্যায়, তরুণ. 'কবি জীবনানন্দ অনুভবে, অনুধ্যানে'. কলকাতা: প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১০.
৮। মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার. 'আধুনিক বাংলা কবিতা স্বরূপে রূপে'. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫.

অ লো ক ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় আখ্যানের অবিনির্মাণ

প্রথমেই মার্জনা চেয়ে নিই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রেক্ষিত থেকে নিবন্ধটি শুরু করার জন্য। তখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। দশম শ্রেণির এক দাদা দুটি বই পড়তে দিলেন একটি শংকর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'তিন দশকের কবিতা' আর অন্যটি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'অন্ধকার বারান্দা'। তখন কবিতা বলতে আমার বিদ্যের দৌড় রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা', নজরুলের 'সঞ্চিতা' আর সুকান্ত ভট্টাচার্যের ছাড়পত্র-এর মধ্যেই মূলত সীমাবদ্ধ। আর এ ছাড়া পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য কবির কিছু কবিতা। সুতরাং কবি নীরেন্দ্রনাথ এক কিশোরের কাছে সম্পূর্ণ নতুন এক আবিষ্কার। এই বইয়ের কবিতাগুলি আমার বোধের জগৎকে সম্পূর্ণ তছনছ করে দিল, ঘটে গেল এক অমোঘ বিস্ফোরণ। কবিতার সংজ্ঞাটাই মুহূর্তে বদলে গেল। অবাক বিস্ময়ে ভাবতে লাগলাম এরকমও হতে পারে কবিতা। মনে রাখতে হবে তখনও জীবনানন্দ দাশ নামক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় বাকি ছিল। পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অনেক কবিতায় এমনই গ্রস্ত হয়ে গেলাম যে সেগুলি মুখস্ত হয়ে গেল। আধুনিক কবিতার বন্ধ দরজাটা এক মুহূর্তে উন্মুক্ত হয়ে গেল চোখের সামনে শুধু নয় মনের গভীরে—

"পিতামহ, তোমার আকাশ
নীল—কতখানি নীল ছিল?
আমার হৃদয় নীল নয়।
পিতামহ, তোমার হৃদয়
নীল—কতখানি নীল ছিল?
আমার হৃদয় নীল নয়।
আকাশের হৃদয়ের যাবতীয় বিখ্যাত নীলিমা
আপাতত কোনো এক স্থির অন্ধকারে শুয়ে আছে।"

(মৌলিক নিষাদ, অন্ধকার বারান্দা)

কিংবা

"এবং দেয়ালে নেই ঈশ্বরের ছবি।
এবং দেয়ালে নেই শয়তানের ছবি।
(তা যদি থাকত, তবে ঈশ্বরের ছবির অভাব
ভুলে যাওয়া যেত।) নেই, তা-ও নেই তোর
নির্বিকার ঘরের ভিতরে।

না, আমি যাব না তোর ঘরের ভিতরে।
যাব না, সিতাংশু আমি কিছুতে যাব না।

যেখানে ঈশ্বর নেই, যেখানে শয়তান নেই, কোনো কিছু নেই,
প্রেম নেই, ঘৃণা নেই, সেখানে যাব না।
যাব না, যেহেতু আমি মুর্তিহীন ঈশ্বরের থেকে
দৃশ্যমান শয়তানের মুখশ্রী এখনও ভালবাসি।
না, আমি যাব না তোর ঘরের ভিতরে।" (দৃশ্যের বাহিরে, অন্ধকার বারান্দা)

একটিও অপরিচিত শব্দ নেই, দুর্বোধ্যতা নেই, অথচ কী সাবলীল অকপট উচ্চারণ, এক স্বতন্ত্র কাব্যভাষা নাড়িয়ে দিল এক ব্যাকুল কিশোরকে। এবং ঠিক এই জায়গা থেকেই শুরু হল, অবিনির্মাণের প্রস্তুতি।

ফরাসি দার্শনিক জাক দেরিদা প্রবর্তিত অবিনির্মাণ (Deconstruction) তত্ত্ব সাধারণত এটাই দেখানোর চেষ্টা করে যে কোনো পাঠ্যাংশ (text) একটি বিচ্ছিন্ন সমগ্র নয়, কিন্তু এতে বেশ কিছু অসংলগ্ন এবং পরস্পরবিরোধী অর্থ রয়েছে; যে কোনো পাঠ্যের তাই ব্যাখ্যা আছে; যে পাঠ্য নিজেই এই ব্যাখ্যাগুলিকে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত করে; যে এই ব্যাখ্যাগুলির অসঙ্গতিকেও মান্যতা দেয়। এই তত্ত্বের মূল যুক্তিটি হল যেহেতু অর্থ যে ভাষার মাধ্যমে সংবাহিত, সেই ভাষাই নির্ভরযোগ্য নয়, তাই অর্থও নির্ভরযোগ্য নয়। সেকারণ কোনো পাঠ্যাংশের নির্দিষ্ট মর্মার্থ সন্ধান করা সম্ভব নয়।

পূর্বোদ্ধৃত 'দৃশ্যের বাহিরে' কবিতাটিতে এই পরস্পর বিরোধী অসংলগ্নতা দূর্লক্ষ নয়—

"সিতাংশু, আমাকে তুই যত কিছু বলতে চাস, বল
যত কথা বলতে চাস, বল।
অথবা একটাও কথা বলিস নে তুই।"

কবিতার মাধ্যমে যদি একটি নিটোল পূর্ণাঙ্গ গল্প উপস্থাপিত হয়, তখন আজকের কবিতার দীক্ষিত পাঠক কবিতার কাছ থেকে প্রত্যাশিত স্বাদটি থেকে বঞ্চিত হন। পূর্ববর্তী যুগে কাব্য বলতে ছন্দোবদ্ধ আখ্যানকেই বোঝান হত—মৈনসিংহগীতিকা, মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যজীবনীকাব্য এমনকী রবীন্দ্রকাব্যেও আখ্যানাশ্রিত পদ্য প্রবণতার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে যে কাব্যের এই ধারাটি সমসাময়িক কবিতায় অনুপস্থিত। বরং ঠিক উল্টো। বেশ কয়েকজন কবি আজও আখ্যানমূলক কাব্যসাধনায় ব্যাপৃত। জনমোহিনী এই কাব্য প্রচেষ্টা সহজেই আমজনতার কাছে গৃহীত হয়। বাচিক শিল্পীদের বদান্যতায় এই সব আবৃত্তিবান্ধব কবিতাসমূহের জনপ্রিয়তার শিখরে পোঁছতে খুব বেশি দেরি হয় না। সুতরাং সমান্তরাল কাব্যপ্রয়াস হিসেবে আখ্যানধর্মী কাব্যচর্চাকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা যদি নীরেন্দ্রনাথের কিছু কবিতাকে একটু বিশ্লেষণ করি, তবে

দেখব যে তিনি কীভাবে গল্পগুলিকে টুকরো টুকরো করে ভেঙেছেন। এই প্রসঙ্গে 'নক্ষত্র জয়ের জন্য' কাব্যগ্রন্থের 'বাতাসি' কবিতাটি একটি সার্থক উদাহরণ। সমগ্র কবিতাটি কয়েকটি টুকরো মুহূর্তের কোলাজ। সম্পূর্ণ দৃশ্যটি অস্পৃশ্য থেকে যায়। বাতাসি, হেমাঙ্গ কিংবা সেই ছেলেটার খণ্ডিত সংলাপ কবিকে আলোড়িত করে, মথিত করে, তিনি ভেবে চলেন প্রতিটি ঘটনার আশপাশ বা পূর্বাপরের কথা কিন্তু সম্পূর্ণ ঘটনাটা তাঁর অনায়ত্ত থেকে যায়। তিনি বলে চলেন :

"টুকরো টুকরো কথাগুলি ইদানীং যেন বড় বেশি
গোঁয়ার মাছির মতো
জ্বালাচ্ছে।
গল্পের সবটা যেন নাগালে পাচ্ছি না।

গল্পের সবটা আমি নাগালে পাব না।
শুধু শুনে যাব। শুধু এখানে-ওখানে,
জনারণ্যে, বাসের ভিতরে, হাটেমাঠে
অথবা ফুটপাথে, কিংবা ট্রেনের জানলায়
টুকরো টুকরো কথা শুনবো, শুধু শুনে যাব।"

নীরেন্দ্রনাথের এই সময়ের কবিতায় খণ্ডিত আখ্যান বা চূর্ণ আখ্যানের যে অবিনির্মাণ তা কবিতা পাঠকের এক অমোঘ প্রাপ্তি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরবর্তী সময়ে তাঁর জনপ্রিয়, পুরস্কারপ্রাপ্ত 'আইকনিক' 'কলকাতার যিশু', 'উলঙ্গ রাজা' বা ইত্যাকার কবিতাসমূহে তিনি তাঁর পূর্বোক্ত অবস্থান থেকে সরে এসে পূর্ণাঙ্গ গল্পের দিকে ঝুঁকেছেন। কিন্তু বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় সেটি নয়। মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের কথা, সংসারের জাঁতাকলে নাভিশ্বাস ওঠা এইসব মানুষের উদয়াস্ত পরিশ্রমজনিত ক্লান্তির কথা তাঁর অনেক কবিতাতেই প্রকাশ পেয়েছে। এইসব মানুষেরা তাদের সুকোমল হৃদয়বৃত্তির সামান্য চাহিদা মেটাতেও অপারগ। হয়তো কখনো সখনো তারা তাদের দৈনন্দিন রোজনামচা থেকে সামান্য সময় বের করে চেষ্টা করে সাধ মেটানোর। এমনই এক চিত্র অল্প একটু আকাশ কবিতাটিতে আমরা পাই :

"অতঃপর সে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।
জুঁইয়ের গন্ধে বাতাস যেখানে মন্থর হয়ে আছে;
এবং রেলিংয়ে ভর দিয়ে,
যেখান থেকে অল্প একটু আকাশ দেখা যায়।
রুগ্ন স্ত্রীকে মেজার গ্লাসে মাপা ওষুধ খাইয়ে
কুঁচকে যাওয়া বালিশটাকে গুছিয়ে রেখে,

দুরন্ত ছেলের ইজেরের দড়িটাকে আর-একটু আলগা করে দিয়ে,
সে তাই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।"

কবিতাটি পড়লেই একটি মলিন অসচ্ছল পরিবারের চিত্র ভেসে ওঠে। সংসারের কর্ত্রী অসুস্থ, তাই গৃহকর্তাকেই অসুস্থা স্ত্রীর সেবা এবং নাবালক পুত্রের দেখাশোনার দায়িত্ব সামলাতে হয় সারাদিন, নিজস্ব বৃত্তিজনিত পীড়ার সঙ্গে মোকাবিলার পর। এতকিছুর পরও তার আকাশ দেখার ঈপ্সা মারা যায়নি, অল্প একটু আকাশে যখন সে উঁকি দেয় তখন তার মানস জগতে ঘটে এক আমূল পরিবর্তন। প্রাত্যহিকতার গ্লানিকে অতিক্রম করে সেই মুহূর্তে সে এক অন্য জগতের বাসিন্দা। জীবনের এই খণ্ডচিত্র যাকে এডগার অ্যালেন পো বলেছেন 'আ স্লাইস অফ লাইফ' নীরেন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের কবিতার মূল শক্তি। তাঁর 'অমলকান্তি' নামক বহুপঠিত, বহুচর্চিত কবিতাটিতেও আমরা লক্ষ করি সেই প্রবাদ প্রতিম অমোঘ উচ্চারণ: 'অমলকান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল'। তার বন্ধুদের মতো কোনো অর্থকরী পেশাকে অবলম্বন করে দিনগত পাপক্ষয় সে করতে চায়নি, সে এই পরিচিত বৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে সূর্যালোকে নিজের অস্তিত্বকে খুঁজতে চেয়েছে, হয়তো সে পারেনি, 'সে এখন অন্ধকার একটা ছাপাখানায় কাজ করে' কিন্তু ওই যে ঈপ্সার কথা উল্লেখ করেছিলাম, সেই ঈপ্সাই তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে রাখে। ব্যর্থতার মধ্যে, পরাজয়ের ঘূর্ণাবর্তে অবস্থান হওয়া সত্ত্বেও সে একক এবং অনন্য। এখানেই তার জয়, এখানেই তার মুক্তি। তাঁর এই পর্যায়ের কবিতায় মধ্যবিত্ত মানুষের আকাঙ্ক্ষার কথা বার বার উচ্চারিত হয়েছে, তার চাহিদা সীমিত, অল্প একটু আকাশ বা অল্প একটু সুখই তার জন্য যথেষ্ট—কোনো উচ্চবিত্তীয় বিলাস, ব্যসনের স্বপ্ন সে দেখে না, সামান্যতম আশাটুকু পূরণ হলেই সে খুশি। কিন্তু আজকের পণ্যসর্বস্বতার যুগে মানুষের চাহিদার পূরণ কোনো সামান্য কিছুতে হয় না, আগুনের লেলিহান শিখার মতোই সর্বগ্রাসী তার ভোগের অন্বেষণ। তাই এহেন পরিবেশে যে মানুষ সামান্যতেই তৃপ্ত, তাকে ভ্রান্ত বলেছেন কবি। কারণ ভোগবাদী সমাজে সে একেবারেই বেমানান—

"নিতান্তই ভ্রান্ত লোকটা। হায়,
অল্প একটু সুখের কাঙাল।
রৌদ্রে, জলে, উদ্দাম হাওয়ায়
ঢের ঘুরেছে। বুঝল না এখনও
ইচ্ছার আগুনে খেয়ে জ্বাল
একটু সুখে তৃপ্তি নেই কোনো
নিতান্তই ভ্রান্ত লোকটা। হায়,
অল্প-একটু সুখের কাঙাল।" (নিতান্ত কাঙাল : অন্ধকার বারান্দা)

ভাঙা গল্পের নানা উদাহরণ তাঁর কবিতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এই সময়ের বিভিন্ন

কবিতায় বিচিত্র তাদের বিষয়, অনবদ্য তাদের উপস্থাপনা, এতটাই নিপুণ তুলির টানে এই সব স্কেচ তিনি নির্মাণ করেছেন যে পাঠক অত্যন্ত সহজে প্রবেশ করেন চরিত্রগুলির অন্তর্লোকে :

"এককালে আমিও খুব মাংস খেতে পারতুম হে;
দাঁত ছিল মাংসে তাই আনন্দ পেতুম।
তোমার ঠানদিদি রোজ কব্জি-ডোবা বাটিতে, জানো হে;
না না, শুধু মাংস নয়, মাংস মাছ ইত্যাদি আমায়
(রান্নাঘর নিরামিষ, তাই রান্নাঘরের দাওয়ায়)
সাজিয়ে দিতেন। আমি চেটেপুটে নিত্যই খেতুম।
সে সব দিনকাল ছিল আলাদা, জানো হে,
হজমের শক্তি ছিল, রাত্তিরে সুন্দর হত ঘুম।"

"মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি, রোগা ঢ্যাঙা বৃদ্ধ এক তার
পাতের উপরে দিব্য জমিয়েছে মাংসের পাহাড়।
যদিও খাচ্ছে না। শুধু মাংসল স্মৃতির তীব্র মোহে
ক্রমাগত বলে যাচ্ছে 'জানো হে জানো হে।"

(বৃদ্ধের স্বভাবে : অন্ধকার বারান্দা)

এই কবিতাটিতে যে বিগতযৌবন বৃদ্ধের ছবিটি আমরা দেখতে পাই সে বেঁচে আছে তার স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে —অনন্ত স্মৃতিমেদুরতায় সে তার যৌবনের উপচীয়মান আনন্দকে মন্থন করে শোনাতে চান সবাইকে। তাতেই তার সন্তুষ্টি। তাই এখন তিনি আর মাংস খেতে পারেন না। কিন্তু পাতের ওপর মাংসের পাহাড় জমিয়ে অতীত স্মৃতি রোমন্থন করে তিনি প্রত্যেককে তার ফেলে আসা জীবনের কথা সোচ্চারে জানাতে চান, তাই প্রয়াশই বলে ওঠেন, 'জানো হে জানো হে'।

তাঁর কবিতায় বৃদ্ধদের উঁকি ঝুঁকি প্রায়ই চোখে পড়ে। আর একটি কবিতার কথা বলা যাক :

"ফুলেও সুগন্ধ নেই। অন্তত আমার যৌবনবয়সে ছিল যতখানি,
আজ তার অর্ধেক পাই না।
এখন আকাশ পাংশু, পায়ের তলায় ঘাস অর্ধেক সবুজ, নদী নীল নয়।
তা ছাড়া দেখুন, স্ট্রবেরি বিস্বাদ, মাংস রবারের মতো শক্ত।
ভীষণ সেয়ানা গোরুগুলি।
বালতি ভরে দুধ দেয় বটে, কিন্তু খুব জোলো দুধ।
নির্বোধ পশুও দুগ্ধের ঘনতা আজ চুরি করে কী অবলীলায়।

এদিকে মদ্য প্রায় জলবৎ।
আগে দু তিনটে বিয়ার টেনে অক্লেশে মাতাল হওয়া যেত।
ইদানীং কম করেও পাঁচ বোতল লাগে।" (বার্মিংহামের বুড়ো : নীরক্ত করবী)

এখানেও বৃদ্ধ চরিত্রটি, অতীতচারিতায় রত; পাঠক সহজেই শনাক্ত করেন বৃদ্ধদের একটি সাধারণ প্রবণতা, অতীতের গুণগান আর বর্তমানের নিন্দা করা। স্থান কাল পাত্রের ভিন্নতায় যে এই প্রবণতার অভিমুখ পরিবর্তিত হয় না কবি তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন কবিতাটির নামকরণের মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে বার্মিংহাম আর কলকাতার মধ্যে কোনও ফারাক নেই। পাঠক লক্ষ করে দেখবেন, উপরে উদ্ধৃত স্তবকটি এক বৃদ্ধের সংলাপ, যার মধ্যে আভাসিত হয়েছে একটি গল্পের বীজ।

১৯৮০ সালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'পাগলা ঘন্টি'-র 'হাইওয়ে' কবিতায় একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের পরিচিত চিত্র কবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। জন্মস্থানে রুটি রুজি না মেলায়, হাওড়ার গোবিন্দ সামন্তকে মেদিনিপুরের দেউলিয়া বাজারে চায়ের দোকানে কাজে যেতে হয়। কিন্তু তার বুড়ি ঠাকুমা নিজের ভিটে ছেড়ে না নিজে যেতে রাজি হন, না অন্য কাউকে যেতে দিতে চান—

"এন এইচ সিক্সের উপরে সারা দুপুর সে তার
ধান আগলে বসে থাকে
আর
তেরপলে ঢাকা ট্রাক দেখলেই
লাঠি উঁচিয়ে
কাক তাড়াবার ভঙ্গিতে বলে হুশ"

নীরেন্দ্রনাথের কবিতায় একটু কান পাতলেই আমরা এরকম নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষের অজস্র আখ্যানের টুকরো কথা শুনতে পাই। এক নিপুণ বিশ্বস্ততায় রেখাচিত্রের মাধ্যমে তিনি পাঠককে ধরিয়ে দেন একটি অসম্পূর্ণ গল্পের ধরতাই, বাকিটা পাঠক তার কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে নিজের মত করে নির্মাণ করার সুযোগ পান। এই প্রক্রিয়ায় পাঠক নিজেও সৃজনের অংশ হয়ে যান। এখানেই নীরেন্দ্রনাথের সিদ্ধি ও সার্থকতা।

নারী জীবনের ছোটোখাটো সাধ-আহ্লাদও অপূর্ণ থেকে যায় মধ্যবিত্তের সংসারে। প্রত্যেকটি আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বুকের মধ্যে নিয়ে গুমরে গুমরে কেটে যায় তার জীবন— এমনই একটি খণ্ডিত গল্প কবি পাঠককে উপহার দেন তাঁর নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটিতে :

"ট্রেন চলে যাবার পরে প্লাটফরমটা আবার
খাঁ খাঁ করতে থাকে,
নিঃশব্দে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে খোলা জানলায়
চক্ষু রাখে

মালবাবুর বউ,
এই ছোট্ট শহর ছেড়ে তার কখনও দিল্লি বা লখনউ
যাওয়া হয়নি।” (কিছু বা কল্পনা : আজ সকালে)

গৃহবধূটির সামান্য ভ্রমণপিপাসা অধরা থেকে যায়, ঘরের চৌহদ্দি থেকে মুক্তি পায় না সে। তৃষ্ণা মেটে না তার। আমাদের স্মরণে আসে মানিক বন্দ্যপাধ্যায়ের ‘সমুদ্রের স্বাদ’ গল্পটির কথা। এই গল্পেও মেয়েটির সমুদ্র দর্শনের সাধ পূর্ণ হয় না, এইটুকু আশাও যখন বাস্তবায়িত হয় না স্বভাবতই তখন তার নীরব অশ্রু কপোল অতিক্রম করে তার জিহবা কে স্পর্শ করে, সেই লবণাক্ত স্বাদই তার কাছে সমুদ্র দর্শনের বিকল্প হয়ে ওঠে। মানিকবাবুর মরমী কলমে মেয়েটির অসহায়তার কথা এমন দরদের সঙ্গে বলা হয়েছে যে পাঠকের অভিভূত হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই। এভাবেই নানা গল্পের অসম্পূর্ণতার মধ্যে দিয়ে পাঠক ছুঁতে পারে একটি বিশেষ সময়গ্রন্থিকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালখণ্ডে পৃথিবীব্যাপী যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল, তার আগ্রাসন আমাদের দেশেও ছিল অবশ্যম্ভাবী, ফলে মুদ্রাস্ফীতির সাঁড়াশি আক্রমণে মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তদের নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা। প্রতিটি সংসারে তখন নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। এই পরিস্থিতিতে ভ্রমণ নামক ব্যসনটির ওপর প্রথমেই কোপ পড়ে। এভাবেই নীরেন্দ্রনাথের কবিতার বিষয় হিসেবে মধ্যবিত্তের সংকট ও তার নানাবিধ উপসর্গগুলি অত্যন্ত নিপুণতায় খণ্ডচিত্রের মাধ্যমে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন এবং পাঠক কবির অভিজ্ঞতাকে মান্যতা দিয়ে বুঝতে পারেন এই গল্পটি তার জীবনেরও গল্প, নিজেকে যখন সে কবির ভাঙা আখ্যানেরই এক চরিত্র হিসেবে আবিষ্কার করেন, তখন গল্পের বাকিটা নিজের মনে মনেই তিনি রচনা করে নেন। কবি যে এই ব্যাপারটি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন, সেটি একটি কবিতার মধ্যেই পরিস্ফুট। কবি জানিয়েছেন তাঁর তিন বন্ধু অমিতাভ, হরদয়াল আর পরমেশের সঙ্গে যে গল্প হয় তার বিষয়বস্তু :

“আমাদের গল্প হয়
মধ্য-কলকাতার সেই গলিটাকে নিয়ে
গ্যাসের বাতির সবুজ আলোর মধ্যে
সাঁতার কাটতে-কাটতে
রাত-বারোটায় যে হরেক রকম স্বপ্ন দেখত।
আমাদের গল্প হয়
এই শহরের অঘ্রাণের সেই ঘোলাটে আকাশটাকে নিয়ে,
শীলেদের বাড়ির মেজ-তরফের বড় ছেলের
বিয়ের রাত্তিরে
চিনে কারিগর ডাকিয়ে যাকে

মস্ত-মস্ত আলোর নেকলেস পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।"

(গল্পের বিষয় : যাবতীয় ভালবাসাবাসি)

নীরেন্দ্রনাথের এই পরিমিতিবোধ, ও সুচারু উপস্থাপনা পাঠককে বিস্মিত করে। তাঁর কবিতার এই অসম্পূর্ণ আখ্যানমূলক রহস্যময়তা সেই কিশোর বয়সে যেমন মুগ্ধ করেছিল, আজ প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেও সে আকর্ষণ বিন্দুমাত্র কমেনি। তাঁর শতবর্ষে তাঁকে স্মরণ করার সুযোগ দেবার জন্য 'সাহিত্য অঙ্গন' পত্রিকার সম্পাদক ড. জয়গোপাল মণ্ডলকে ধন্যবাদ।

সহায়ক গ্রন্থপুস্তিকা :

চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, পরিবর্ধিত পরিমার্জিত ষড়বিংশ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৪২৯, নভেম্বর ২০২২

Bandyopadhyay, Alapan– Makers of Indian Literaturer- Nirendranath Chakravarti– Sahitya Akademi– First edition 2024– Kolkata.

চক্রবর্তী, সুমিতা, আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়, বিকাশ সাধুখাঁ, প্রজ্ঞাবিকাশ, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, বইমেলা,২০১৬।

দাশ,অনির্বাণ (সম্পাদনা), বাংলায় বিনির্মাণ/অবিনির্মাণ, পার্থ চক্রবর্তী, অবভাস, প্রথম প্রকাশঃ বইমেলা, জানুয়ারি, ২০০৭

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল, উত্তর-আধুনিক চিন্তা ও কয়েকজন ফরাসি ভাবুক, সঞ্জয় সামন্ত, এবং মুশায়েরা, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, মাঘ ১৪২০, জানুয়ারি ২০১৪

সাহা, মানবেন্দ্রনাথ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় ন্যারেটিভের মনতাজ, কবিতা প্রতিমাসে, জুলাই ২০২৪

সিংহ, রাজীব, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় গল্প, তদেব

স্নেহাশিস সরকার

শতবর্ষের আলোকে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : কবিমানস ও কবিতার (নির্বাচিত) বিষয় অনুসন্ধান

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪-২০২৪) বাংলা কবিতা অঙ্গনে পদার্পণ করেন বিংশ শতাব্দীর চারের দশকে। পরাধীন ভারতবর্ষ তখন উত্তাল। দিকে দিকে স্বাধীনতা আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৩ এর ভয়ঙ্কর মন্বন্তর। চলছে মানুষের বেঁচে থাকার চূড়ান্ত লড়াই। সমকালীন কবি-সাহিত্যিকদের কলমেও জ্বলছে প্রতিবাদের লেলিহান শিখা। শ্রোতের অনুকূলে না গিয়ে কবি সত্ত্বাকে বিপরীত পথে নিয়ে চললেন কবি নীরেন্দ্রনাথ। বাঙালি পাঠক সন্ধান পেলেন এক অন্য স্বাদের কবিকে।

১৯২৪ সালের ১৯ শে অক্টোবর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার চান্দ্রা গ্রামে। কর্মসূত্রে পিতা জিতেন্দ্রনাথ ও মাতা প্রফুল্লনলিনীর কলকাতায় বসবাস। জানা যায় প্রথম অবস্থায় কবির পিতামহ গ্রাম থেকে বালক নীরেন্দ্রনাথকে পাঠাতে বেশ আপত্তি করেছিলেন। নীরেন্দ্রনাথ খুব ছোটো থেকেই জানতেন চাষবাসের যাবতীয় নিয়ম। পারদর্শী ছিলেন গরুর দুধ দোয়ান, সাঁতারকাটা, গাছে চড়া প্রভৃতি কার্যে। কিন্তু ছয় বছর বয়সে পড়াশোনার সুবিধার্থে কলকাতায় আসতেই হয়। শুরু হয় পড়াশোনা, ইতিহাসে স্নাতক হন সেন্ট পলস কলেজ থেকে। পরবর্তীকালে কর্ম জীবনের সূচনা সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে। পরে কর্মসূত্রে যুক্ত হয়েছিলেন বিভিন্ন পত্রিকার সাথে।

প্রথম অবস্থায় বিভিন্ন পত্রিকায় অল্প অল্প লেখালেখি কখনও স্বনামে আবার 'বরুণদেব' ছদ্মনামে। 'পূর্বাশা', 'কবিতা' প্রভৃতি নামকরা সাময়িকপত্রে কবিতা লেখার মধ্য দিয়েই কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আত্মপ্রকাশ। গভীর ভাবনাকে সহজ সরল ভাবে প্রকাশ করার বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনি। সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সাহিত্য আকাদেমি আয়োজিত নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্মশতবার্ষিকী আলোচনাচক্রে তাঁর বক্তব্যে এই অভিমত ব্যক্ত করেন—"কবিদের দুটি জগত, একটি চেতন জগত আর অপরটি মগ্নচেতনার জগত। মগ্ন চেতনার কবিরা অতি সাধারণ বিষয়কে বেশ খানিকটা জটিল আধারে উপস্থাপিত করে থাকেন। আপন প্রতিভাবলে তাঁদের কবিতা হয়ে ওঠে অসাধারণ। তাঁদের কবিতা পাঠককে নানা ভাবে ভাবিত করে। অনেক সময় লেখনি বুঝতে বেশ খানিকটা বেগ পেতে হয়। এই পর্যায়ের কবিরা হলেন---বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪), জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) প্রমুখ। চেতন জগতের কবিরা যেকোন বিষয়কে সহজ সরল ভাবে উপস্থাপন করে থাকেন। ফলসরূপ পাঠককূল অতি সহজেই কবিতাকে আয়ত্ত করে একাত্ম হতে সক্ষম হন। এই পর্যায়ের কবিরা হলেন বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) প্রমুখ। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী হলেন সচেতন জগতের কবি।"

কবির লেখনীতে বার বার উঠে এসেছে সমকালের নানা জীবন্ত চিত্র। তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য মানুষ। কলমে ফুটে উঠেছে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, দেশ-কাল ও সমাজের কথা। অনেক সময় অতি সাধারণ ঘটনা তাঁর কবিতায় অসাধারণত্ব লাভ করেছে। কবিসত্ত্বাকে তিনি সাধারণ জগত থেকে কখনো আলাদা করে দেখাতে চাননি। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মনে করতেন কবির কাজ তাঁর নিজস্ব হৃদয়ের গভীর আর্তিকে উন্মোচন করে দেখানো। এও বলতে চেয়েছে—কিন্তু তার মানে এই নয় যে শুধু ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কথাই তিনি বলবেন। নীরেন্দ্রনাথ বারংবার বোঝাতে চেয়েছেন কবি একজন সামাজিক মানুষই।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যসংকলন—'নীল নির্জন' (প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৩১), 'অন্ধকার বারান্দা' (চৈত্র ১৩৬৭), 'নীরক্ত করবী' (মাঘ ১৩৭১), 'নক্ষত্র জয়ের জন্য' (বৈশাখ ১৩৭৬) 'কলকাতার যীশু' (অগ্রহায়ণ ১৩৭৬), 'উলঙ্গ রাজা' (জুলাই ১৯৭১), 'কবিতার বদলে কবিতা' (আষাঢ় ১৩৮৩), 'পাগলা ঘন্টি' (মাঘ ১৩৮৭), 'যাবতীয় ভালবাসাবাসি' (মাঘ ১৩৯২), 'জঙ্গলে এক উন্মাদিনী' (জানুয়ারি ১৯৮৯) 'চল্লিশের দিনগুলি' (জানুয়ারি ১৯৯৪), 'সত্য সেলুকাস' (জানুয়ারি ১৯৯৫), 'মায়াবী বন্ধন' (ডিসেম্বর ২০০৪), 'জ্যোৎস্নায় একেলা' (জানুয়ারি ২০০৬) , 'অনন্ত গধূলিবেলা' (জানুয়ারি২০০৮) প্রভৃতি। এছাড়া তাঁর স্বরচিত জীবনী গ্রন্থ 'নীরবিন্দু' (প্রথম অখন্ড সংস্করণ: বৈশাখ ১৪২৩)।

নীরেন্দ্রনাথের কবিতা একটি নিদিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সমাজের সর্বস্তরে তাঁর অবাধ বিচরণ। তাই তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে দেশ ও সমাজের কথা, রোমান্টিক প্রেম, গার্হস্থ জীবন, মৃত্যু চেতনা, আত্মোপলব্ধির কথা আবার কবিতা নিয়ে বিভিন্ন ভাবনার কথা। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পর্কে প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত লিখেছেন—"নীল নির্জনে নীরেন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত রোমান্টিক কবি, কিন্তু নিত্য বিবর্তনশীল তাঁর কবিতা আস্তে আস্তে বিস্তৃততর জীবনের পরিমণ্ডলকে স্পর্শ করেছে। চল্লিশ দশকের লেখকদের মধ্যে তিনিই একমাত্র কবি, যাঁর কবিতা কখনো এক জায়গায় থেমে থাকেনি—ধাপে ধাপে সিঁড়িতে উঠে গেছে। তিনি যা বলতে চান তা খুব স্পষ্ট ভাবে বলতে পারেন এবং তাঁর কণ্ঠস্বরে কোথাও দ্বিধা বা জড়িমার অবকাশ নেই।"[১]

সচেতন কবি সমাজের অবক্ষয় নীরবে মেনে নিতে পারেন না। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও তার ব্যতিক্রম নয়। স্রোতের প্রতিকূলে হাঁটলেও তাঁর কাব্যে উঠে এসেছে অন্যায়ের প্রতিবাদ। সমাজের জীবন্ত ছবি উঠে এসেছে তার 'উলঙ্গ রাজা' কাব্যেসংকলনের 'উলঙ্গ রাজা' শীর্ষক কবিতা মধ্যে। সহজ সরল মানুষের না বলতে পারা কথা তিনি নির্ভয়ে ব্যক্ত করেছেন। তিনি সচেতন ভাবে জানেন সাধারণ মানুষের পক্ষে সত্যিটা বলা সম্ভব নয়। সে কারণে তিনি বলেছেন—

> "সবাই দেখছে রাজা উলঙ্গ, তবুও
> সবাই হাততালি দিচ্ছে।

সবাই চেঁচিয়ে বলছে; শাবাশ শাবাশ!
কারও মনে সংস্কার, কারও ভয়;
কেউ-বা নিজের বুদ্ধি অন্য মানুষের কাছে বন্ধক দিয়েছে;
কেউ-বা পরান্নভোজী, কেউ
কৃপাপ্রার্থী, উমেদার, প্রবঞ্চক; ...”[২]

শাসক চিরকালই শাসন ও শোষণ করে আসে। শাসক কখনও ন্যায় আবার কখনও অন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করেন। দেশে চলছে সত্তরের অন্ধকারময় পরিস্থিতি; চলছে হানাহানি, মৃত্যুর মিছিল। ক্ষমতার আস্ফালন ও রক্তচক্ষু জনতার কণ্ঠ রুদ্ধ করে রাখে। শাসককে আগলে রাখে সুবিধাভোগী ও তোষামোদকারী ব্যক্তিবর্গ। তবে অন্যায়কে কবি কখনও মেনে নিতে পারেননি, প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কবিতা মধ্যে নির্ভীক, সাহসী ও সারল্যের প্রতীক এক শিশুকে আহ্বান জানিয়েছেন, একমাত্র যার কণ্ঠে বেরিয়ে আসবে শোষিত মানুষের অব্যক্ত সত্য কথা:

“সে এসে একবার এই উলঙ্গ রাজার সামনে
নির্ভয়ে দাঁড়াক।
সে এসে একবার এই হাততালির ঊর্ধ্বে গলা তুলে
জিজ্ঞাসা করুক:
রাজা, তোর কাপড় কোথায়?”[৩]

তাঁর প্রতিবাদ কখনও অত্যাচারী রাষ্ট্র-শক্তির বিরুদ্ধে, কখনও সমাজের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে। চূড়ান্ত প্রতিবাদের ভাষা ব্যক্ত হয়েছে ‘উলঙ্গ রাজা’ কাব্যে সংকলনের ‘কবিতা ৭০’ নামক কবিতায়—

“এক-একটা কবিতা যেন রমণীর নখে, ওষ্ঠে, জঙ্ঘাদেশে, হাতে মুদ্রায়
বিষাক্ত ফুলের মতো ফোটে।
এক-একটা কবিতা যেন ঝড়ের ভিতর হয়ে ওঠে
নিয়তির কণ্ঠস্বর।”[৪]

ন্যায়ের আদর্শকে অনুসরণ করে সমকালীন দুর্নীতিগ্রস্থ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে তিনি মুখরিত হয়েছিলেন। ‘উলঙ্গ রাজা’ কাব্যসংকলনের ‘হ্যালো দমদম’ কবিতার শেষ অংশে তিনি লিখেছেন—

“যদি বাঁচতে চাস হারামজাদা,
তা হলে আয়, আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বল:
হ্যালো দমদম... হ্যালো দমদম...হ্যালো...”[৫]

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় বারবার উঠে এসেছে মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার কথা। মানুষের সারল্যের মধ্যেই বারবার উপলব্ধি করেছেন আসল সত্যকে।

এক ভিখারি মায়ের সন্তানকে কবি দেখেছেন স্বয়ং যীশু রূপে, কলকাতার রাজপথে। যে যীশু সত্যকে অনুসরণ করে মানুষকে সর্বদায় শান্তির বাণী শুনিয়েছেন, দেখিয়েছেন মুক্তির পথ। অসাধারণ নাটকীয় চিত্রময়তার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর 'কলকাতার যীশু' কাব্যসংকলন অন্তর্গত 'কলকাতার যীশু' কবিতায়। কবি লিখেছেন—

"স্তব্ধ হয়ে সবাই দেখছে,
টালমাটাল পায়ে
রাস্তার এক-পার থেকে অন্য-পারে হেঁটে চলে যায়
সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি শিশু।"[৬]

যান্ত্রিক সভ্যতাকে আশ্রয় করে সকলেই যে যার কাজে ব্যস্ত। গতিময় এই শহরকে এক নিমেষে স্তব্ধ করে দেওয়া ও যান্ত্রিকতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তা পারাপার করা একমাত্র ভিখারি মায়ের উলঙ্গ শিশুর পক্ষেই সম্ভব। তাই কবি বলেছেন,

"সমস্ত ট্রাফিক তুমি মন্ত্রবলে থামিয়ে দিয়েছ।
জনতার আর্তনাদ, অসহিষ্ণু ড্রাইভারের দাঁতের ঘষটানি,
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই;
দু'দিকে উদ্যত মৃত্যু, তুমি তার মাঝখান দিয়ে
টলতে টলতে হেঁটে যাও।"[৭]

স্পষ্টবাদী কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর কবিতার মধ্যে কল্পনাকে আশ্রয় করে চলতে চাননি। সর্বদা চেয়েছেন যেকোন বিষয়কে সরাসরি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলতে। কবি নীরেন্দ্রনাথ সহজ সরল কথাকে সাবলীলভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'নক্ষত্র জয়ের জন্য' কাব্যসংকলনের 'কবিতা কল্পনালতা' কবিতাটিতে বলেছেন—

"স্পষ্ট কথাটাকে আজ অন্তত একবার খুব স্পষ্ট করে বলে দেওয়া ভাল।
অন্তত একবার আজ বলা ভাল,
যা-কিছু সামনে দেখছি, ধোঁয়া বা পাহাড় কিংবা পরস্পর-আলাপনিরত
ক্ষিপ্র পশু—
হয়তো এছাড়া কোনো দৃশ্য নেই।"[৮]

সাধারণ মানুষের কথা বলতে গিয়ে এক জোয়ান মানুষের তীব্র আকাঙ্ক্ষা অসাধারণ চিত্রময়তার সাথে উপস্থাপন করেছেন 'নক্ষত্র জয়ের জন্য' কাব্যসংকলনের 'বাতাসি' কবিতাটিতে। ট্রেন থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন একটি যুবক লোক বাতাসি বাতাসি বলে ভয়ঙ্কর চিৎকার করতে করতে ছুটে চলেছে। যে ডাকের কারণ কবি জানেন না। কিন্তু সেই উচ্চস্বরে ডাক মানব হৃদয়কে নিমেষে আন্দোলিত করে তোলে। মানুষের জীবন প্রণালী বৈচিত্র্যময়। সভ্যতা এগিয়ে চলেছে, মানুষের ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া অনেক সময় অন্যের কাছে তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর হয়ে ওঠে। সেই আপেক্ষিক তুচ্ছতা কখনও আবার স্বর্গীয় সুখ প্রদান করে।

প্রেমিক হৃদয়ের শূন্যতা পূরণ করে একমাত্র তার একান্ত আপনজন। যার বিকল্প তৃষ্ণার্ত ও উৎকণ্ঠিত যুবক পৃথিবীতে আর কোথাও খুঁজে পাবেনা। একমাত্র উদ্দেশ্য তাকেই পাওয়া। তাইতো পাগলের মত চিৎকার করে দৌঁড়ে যায় সেই হৃদয়বান প্রেমিকদের প্রতিনিধি কবিতার জোয়ান পুরুষটি। কবিকে এই দৃশ্যটি ভাবিয়ে তুলেছে। কবি বুঝতে ও অনুভব করতে চান সেই অসীম রহস্যকে। কবি জানিয়েছেন—

"বাতাসি! বাতাসি!' লোকটা ভয়ঙ্কর চেঁচাতে চেঁচাতে
গুমটির পিছন দিকে ছুটে গেল
ধাবিত ট্রেনের থেকে এই দৃশ্য চকিতে দেখলুম।
কে বাতাসি? জোয়ান লোকটা অত ভয়ঙ্করভাবে
তাকে ডাকে কেন? কেন
হাওয়ার ভিতর বাবরি-চুল উড়িয়ে
পাগলের মতো
'বাতাসি! বাতাসি!' বলে ছুটে যায়?"[৯]

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছিলেন আশাবাদী কবি, হতাশা-নৈরাশ্য তাঁকে কোনদিনও গ্রাস করতে পারেনি। অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬) কবিতায় পাওয়া যায় চূড়ান্ত আশাবাদ। 'অভিজ্ঞানবসন্ত' কাব্যসংকলনের 'সংগতি' নামক কবিতায় ব্যক্ত করেছেন নানা ইতিবাচক প্রসঙ্গ—

"মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙ্গা দরজাটা
মেলাবেন।"[১০]

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতাতেও চূড়ান্ত আশাবাদের মন্ত্র শুনতে পাওয়া যায়। 'কবিতার বদলে কবিতা' কাব্যসংকলনের কবিতা 'একদিন এইসব হবে, তাই'-এর মধ্যে উল্লিখিত—

"একদিন সমস্ত শিল্পী কল্পনার প্রতিমা বানাবে।
একদিন সমস্ত নারী চোখের ইঙ্গিতে বলবে, এসো।
একদিন সমস্ত ধর্মযাজকের উর্দি কেড়ে নিয়ে
নিষ্পাপ বালক বলবে, হাহা।
একদিন এইসব হবে বলেই এখনও
সূর্য ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, এবং কবিতা লেখা হয়।"[১১]

কবিতাটির শেষ অংশ বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। যেখানে কবি নীরেন্দ্রনাথ সর্বজনীন সত্য ঘটনাদ্বয় অর্থাৎ 'সূর্য ওঠা' এবং 'বৃষ্টি পড়া'র সাথে 'কবিতা লেখা'কেও সমান গুরুত্ব

দিয়েছেন। অর্থাৎ পৃথিবীতে যতদিন সূর্য উঠবে, বৃষ্টি পড়বে, কবির আশা ঠিক ততদিনই কবিতা রচিত হবে।

নারীকে সযত্নে স্থাপন করেছেন নীরেন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায়। নিষ্কাম প্রেমের অপূর্ব চিত্রময়তা তার লেখনীতে ফুটে উঠেছে। কামের উন্মত্ততা তাঁর কবিতায় কখনও ছাপিয়ে যায়নি। 'না লেখা চিঠি' কবিতায় প্রেমের গভীর শ্রদ্ধা ও আকুতি লক্ষ্য করা যায়—

"অনেক দিন হল আমি তোমাকে দেখি না
অনেক মাস, অনেক বছর।
অনেকদিন তোমার গলা শুনি না
অনেক মাস, অনেক বছর।
এবারে তুমি এসো।"[১২]

সময়ের গণ্ডিতে প্রেমকে আবদ্ধ করা যায় না, ভোলাও যায় না। প্রেম চিরন্তন। তবে একমাত্র বিশুদ্ধ প্রেমই এই বৈশিষ্ট্যের বাহক। 'যাবতীয় ভালবাসাবাসি' কাব্যেসংকলনের 'মনে পড়ে' কবিতায় কবি না-ভোলা প্রেমের অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন—

"ভুলে গেলে ভালো হত, তবু ভোলা গেল না এখনও।
পঁয়ত্রিশ বছর পার হয়ে গেছে, তবু কোনো-কোনো
মুহূর্তে তোমাকে মনে পড়ে।"[১৩]

আমাদের সকলেরই একটা ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া থাকে। সেগুলি কখনও বাস্তবিক আবার কাল্পনিক। কল্পনাবিহারী মনকে কোন শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা যায়না। 'জীবনস্মৃতি'তে (১৯১২) রবীন্দ্রনাথের মুক্ত জীবনযাত্রার কথা বারংবার এসেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চাননি বিদ্যালয়, সিলেবাস প্রভৃতির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করতে। চূড়ান্ত অভিযোগ আসত বিদ্যালয় থেকে ছোট্ট রবির নামে। পড়াশোনায় মনোযোগ ছিল না তাঁর। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বন্ধু অমলকান্তির বড্ড মিল কবিগুরুর বাল্যকালের জীবনের সাথে। 'অন্ধকার বারান্দা' কাব্যসংকলনের 'অমলকান্তি' শীর্ষক কবিতায় কবি জানিয়েছেন—

"অমলকান্তি আমার বন্ধু,
ইস্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়তাম।
রোজ দেরি করে ক্লাসে আসত, পড়া পারত না,
শব্দরূপ জিজ্ঞেস করলে
এমন অবাক হয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকত যে,
দেখে ভারী কষ্ট হত আমাদের।"[১৪]

সকলেই একটা উদ্দেশ্য নিয়ে পড়াশোনায় ব্রতী হয়। পিতা-মাতা উদ্দেশ্য সাধনে সন্তানকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। লেখাপড়া সম্পন্ন করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চায় প্রত্যেকে। কেউ হতে চায় মাস্টার, কেউ ডাক্তার, আবার কেউ উকিল। কবি জানান—

"অমলকান্তি সে-সব কিছু হতে চায়নি।
সে রোদ্দুর হতে চেয়েছিল!"[১৫]

কিন্তু নিয়তির পরিহাসে অন্যান্য সহপাঠীদের চাওয়া পাওয়া পরিপূর্ণ হলেও, কল্পনা বিলাসী কবিবন্ধু অমলকান্তির প্রতাশা পূরণ হয়নি। সে রোদ্দুর হতে পারেনি। কবি জানিয়েছেন—

"আমরা কেউ মাস্টার হয়েছি, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল।
অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি।
সে এখন অন্ধকার একটা ছাপাখানায় কাজ করে।"[১৬]

অমলকান্তির এমন একটি কর্মক্ষেত্র যেখানে রোদ্দুর লেস মাত্র প্রবেশ করতে পারে না। প্রতিষ্ঠা পায়নি তার একান্ত মনের বাসনা। জীবন সংগ্রামে বেঁচে থাকার জন্য তাকে কাজ করতেই হয়। অমলকান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল অথচ দেখা যাচ্ছে রোদ্দুর তার সাথে মিত্রতা না করে, দূরে সরে গেছে। অমলকান্তির মত কত মানুষেরই এরকম ইচ্ছাগুলো মনের অন্তরালে নীরবে নিভৃতে কাঁদে কিংবা মৃত্যু ঘটে। অমলকান্তির ব্যর্থ জীবনকথাই কবিতার শেষে ব্যক্ত হয়েছে—

"অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি।
সেই অমলকান্তি— রোদ্দুরের কথা ভাবতে-ভাবতে
ভাবতে-ভাবতে
যে একদিন রোদ্দুর হতে যেতে চেয়েছিল।"[১৭]

কবি নীরেন্দ্রনাথ সকল মায়া ত্যাগ করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন ২০১৮ সালের ২৫শে ডিসেম্বর। রেখে গেলেন তাঁর অমর সৃষ্টিকে। পিপাসু পাঠক পেলেন অজস্র লেখনী। সমাজের লাঞ্ছিত মানুষ, প্রতিক্ষারত প্রেমিক, আশাবাদী মানুষ, আবৃত্তিকার তথা সর্বশ্রেণির মানুষ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় আপন আপন ছন্দ খুঁজে পান।

তথ্যসূত্র :

১. অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা)। আধুনিক কবিতার ইতিহাস। কলকাতা, ভারত বুক এজেন্সি, নতুন সংস্করণ, ১৯৮৩। পৃষ্ঠা-১২৩। ২. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, অষ্টাদশ সংস্করণ, ২০১৮। পৃ.-১১৯। ৩. তদেব। পৃষ্ঠা-১১৯। ৪. তদেব। পৃষ্ঠা-১২৭। ৫. তদেব। পৃষ্ঠা-১২৯। ৬. তদেব। পৃষ্ঠা-১১৮। ৭. তদেব। পৃষ্ঠা-১১৯। ৮. তদেব। পৃষ্ঠা-৯০। ৯. তদেব। পৃষ্ঠা-৯১। ১০. অমিয় চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা, ভারবী, ১৩৬২। পৃষ্ঠা-২৮। ১১. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, অষ্টাদশ সংস্করণ, ২০১৮। পৃষ্ঠা-১৪৮। ১২. ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত। ১৩. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, অষ্টাদশ সংস্করণ, ২০১৮। পৃষ্ঠা-১৮৪। ১৪. তদেব। পৃষ্ঠা-৫৩। ১৫. তদেব। পৃষ্ঠা-৫৩। ১৬. তদেব। পৃষ্ঠা-৫৩। ১৭. তদেব। পৃষ্ঠা-৫৩।

চ ন্দ ন চৌ ধু রী

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় বিবেকী দর্শন

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শুধু রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা ও আবেগী বিদ্রোহের কবিতা রচনাতেই নিমগ্ন থাকেননি, বরং শিল্পময় এক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সার্বিক প্রয়োগে তিনি সর্বদাই আত্মপ্রসারণের মানবিক কবিতা রচনায় নিমগ্ন ছিলেন। বাস্তব জগৎ থেকে স্বপ্নের জগতে যেমন তিনি স্বচ্ছন্দে চলে গেছেন, তেমনই স্বপ্নের জগৎ থেকে মাটি ও মানুষের নিবিড় সম্পর্কস্থাপনে বারবারই ফিরে এসেছেন বাস্তবের প্রত্যক্ষ রূপে ও স্বরূপে; এইজন্যই চারের দশকের অন্যান্য কবিদের থেকে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ব্যতিক্রমী কবি তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় সমাজদর্শন ও সমাজচেতনার এক ভিন্ন ছবি সর্বদাই ফুটে ওঠে। চারের দশকের কবিরা যখন নানা অবক্ষয়ে ক্ষতবিক্ষত, গোটা বিশ্বের সাথে ভারতে চলছে অস্থিরতা, ফ্যাসীবাদের উত্থান ও আক্রমণ, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন, এর ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভয়ঙ্কর মূর্তিতে আবির্ভূত হয়, যুদ্ধের আতঙ্ক, বোমা, বিদেশী সেনার আনাগোনা মানুষকে সন্ত্রস্থ করে তোলে, সঙ্গে পঞ্চাশের মন্বন্তরের মতো ঘটনার ফলে চারের দশকের কবিরা তখন আর শান্ত থাকতে পারছিলেন না, কবিতায় উচ্চকণ্ঠে তাই কথা বলছেন, চিৎকার করছেন, আবেগে ফেটে পড়ছেন এমন এক উত্তেজিত ও তরঙ্গিত গর্জনের সময়পর্বে দাঁড়িয়ে ক্রোধ, আবেগকে শান্ত ও সংহত করে চূড়ান্ত এক কাব্যিক ভাবসংহতির কবিতা রচনা করেছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। চারের দশকের কবিরা যখন সরাসরি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ভাবনার কবিতা লিখছেন, নীরেন্দ্রনাথ সেই সময়পর্বে দাঁড়িয়েও সরাসরি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ভাবনার কবিতা না লিখে ধীর-স্থির বিবেচনাপ্রসূত দীপ্ত উজ্জীবনবাদের কবিতা লিখেছেন। ফলে দেখা যায় তাঁর কবিতাগুলি প্রত্যক্ষ রাজনীতির কবিতা নয়, কিন্তু প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক চেতনার কবিতা। আসলে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নিভৃতমনের বেদনা ও সহানুভূতি থেকে বহুমুখী সমাজসচেতনমূলক কবিতাই লিখেছেন; ফলে তাঁর কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে বিবেকী দর্শনের কবিতা।

চারের দশকের কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আগের দশক তথা তিনের দশকের ক্ষুদ্র আলোচনা প্রয়োজন, কেননা তিনের দশকের আগে বাংলা কবিতা ছিল মূলত রবীন্দ্রভাবধারা আশ্রিত কবিতা। তিনের দশকের কবিরা রবীন্দ্রভাবধারা থেকে প্রথম থেকেই সরে আসার চেষ্টা করলেন, কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন 'রবীন্দ্রবন্ধন' থেকে সরে না আসতে পারলে নিজেদের অস্তিত্বই শুধু অবলুপ্ত হবে না, সঙ্গে বাংলা কবিতার বিপর্যয়ও অনিবার্য। এই 'রবীন্দ্র বন্ধন' থেকে সরে আসার ক্ষেত্রে 'কল্লোল'এর ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। 'কল্লোল' যুগে গদ্য সাহিত্যের প্রাধান্য ছিল, তা সত্ত্বেও কিছু তরুণ কবি বিশেষ করে জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র বিষয় ও প্রকাশভঙ্গিতে সাতন্ত্র্যের পরিচয়

দিয়েছিলেন। শুধু 'কল্লোল'ই নয়, 'পরিচয়' পত্রিকাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। বিশেষ করে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণুদের মতো কবিরা বাংলা কবিতাকে রবীন্দ্রভাবধারার থেকে বের করে আনতে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

তিনের দশকের কবিরা রবীন্দ্রভাবধারা থেকে সরে এসে বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন এবং বাংলা কবিতার মোড় অনেকখানি ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তী উত্তরসুরী হিসেবে চারের দশকের কবিরা কবিতায় নতুন আঙ্গিক, নতুন ভাষ্য নিয়ে উপস্থিত হলেন; বলা দরকার এই দশকের কবিদেরকে সময়ের উত্তাপ ও জনগণতান্ত্রিক বাস্তবতার সঙ্কট ভীষণভাবে স্পর্শ করেছে। চারের দশকের কবিতার কথা বলতে গেলে সুমিতা চক্রবর্তীর কথায় বলা যেতে পারে—"এই দশকের কবিতার প্রধান পরিচয় এই যে তা তীব্রভাবে এবং অত্যন্ত গভীর সমাজসচেতন ও ইতিহাসমনস্ক।" (চল্লিশের কবিতা, আধুনিক কবিতার ইতিহাস, পৃ. ১২৯)

এটা সত্যি চারের দশকের কবিরা এক ভয়াবহ সময়পর্বে দাঁড়িয়ে কবিতা লিখছেন একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা, সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন, ফ্যাসিবাদের উত্থান, অন্যদিকে পঞ্চাশের মন্বন্তর গ্রামে গ্রামে মানুষের এক মুঠো ভাতের হাহাকার। স্বদেশে ও বিদেশে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে পারেননি চারের দশকের কবিরা। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি চারের দশকের কবিদের কবিতাকে শান্ত, সুসংহত থাকতে দেয়নি তাই দেখা যায় চারের দশকের কবিদের কবিতা হয়ে উঠেছে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কবিতা, চারের দশকের কবিতা হয়ে উঠেছে উগ্রকণ্ঠে চিৎকারের কবিতা, চারের দশকের কবিতা হয়ে উঠেছে রাজনীতির কবিতা, চারের দশকের কবিরা চিৎকার করে ওঠেন—

"আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।"

(সুকান্ত ভট্টাচার্য; 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি')

অসহনীয় নিপীড়নে ক্ষুব্ধ হয়ে কবি প্রতিবাদে গর্জন করে ওঠেন—

"আদিম হিংস্র মানবিকতার আমি যদি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই"(সুকান্ত ভট্টাচার্য; 'বোধন')

চারের দশকের মূল প্রবণতা কবিতায় সুন্দরের জয়গান নয়—বিপ্লবে বা বিদ্রোহে এক সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলবার প্রতিজ্ঞা; এইজন্য বলা হয় চারের দশক আসলে বিপ্লব অন্বেষণের যুগ: দিনেশ দাসের কবিতায় তা ধরা পড়ে—

"বাঁকানো চাঁদের সাদা ফালটি
তুমি বুঝি খুব ভালোবাসতে?
চাঁদের শতক আজ নহে তো,
এ যুগে চাঁদ হল কাস্তে।" (দিনেশ দাস, 'কাস্তে')

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় একইভাবে ধরা পড়ে এযুগের কথা—

"প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা,
দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য
চিনে নেবে যৌবন-আত্মা।" ('মে-দিনের-কবিতা', সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

আসলে চারের দশকের কবিতায় কোন রকম 'কল্পনালতা' ছিল না, কোন রকম কৃত্রিমতা, আরোপিত বিষয় ছিল না। চারের দশকের কবিতায় এক ভয়াবহ ব্যস্তব অভিজ্ঞতার চিত্র ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক মন্দা, হিংসা, হত্যা, রিরংসা, ক্ষুধা, দারিদ্র, শোষক শক্তির আগ্রাসন-কী নেই চল্লিশের কবিতায়। এই সময় যারাই কবিতা লিখতে এসেছেন, তাঁরাই চেয়েছেন মুক্তি; দারিদ্র থেকে মুক্তি, ক্ষুধা থেকে মুক্তি। শোষণ থেকে মুক্তি। এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকেই কবিরা দেখেছেন:

"আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রি আকাশে
কারা যেন আজো ভাত রাঁধে,
ভাত বাড়ে, ভাত খায়।" (বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'আশ্চর্য ভাতের গন্ধ')

চারের দশকের কবিদের মধ্যে তাই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ছবি ফুটে উঠছে। এইরকম এক অগ্নিগর্ভ গর্জন ও শ্লোগানের সমাজবাস্তবে দাঁড়িয়ে চারের দশকের আর এক কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সমাজের ভয়াবহতা দেখে ব্যথিত, চিন্তিত, শঙ্কিত হয়েছেন এবং লিখেছেন—

"সাফল্য, হতাশ, দারিদ্র, বৈভব, বোমা, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা
চল্লিশের সেই
স্বপ্নে আর দুঃস্বপ্নে ভরা দিনগুলি
সবই আমি দেখেছি।" (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'চল্লিশের দিনগুলি')

'স্বপ্নে আর দুঃস্বপ্নে ভরা দিনগুলি' সবই কবি দেখছেন, উপলব্ধি করছেন, তবুও কবি নিভৃতের মনোদেশে আশাবাদে ক্রমাগত অবিচল, গতিবাদে অবিচল, তাই কবিতায় ক্রোধে গর্জনে ফেটে না পরে প্রত্যয়ে অবিচল হয়ে দীপ্ত উজ্জীবনবাদের কথাই তিনি বলেছেন, নতুন সকাল আসার অপেক্ষায় অপেক্ষারত কবি জানেন-দুঃখের পরসুখ আসে, যন্ত্রণার পর শাস্তি আসে, লাঞ্ছনার পর মুকুলিত হয় সৌন্দর্যর। তাই মনের ভিতরে তিনি কখনো হার বা পরাজয় মেনে নেননা; বরং পরাজয়ের পর প্রজ্ঞায় দীপিত হয়ে তিনি লাঞ্ছিত মানুষকে এই বলে অভয় দেন যে

"এমন কোন রাত্রি কখনও আসেনি যার পরেই
সুন্দর একটা সকাল ছিল না।" (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'যখন রাত্রি')

বোঝা যায়, নীরেন্দ্রনাথ চাইছেন অন্ধকার পরবর্তী এক সুন্দর সকাল; যেখানে মানুষে

মানুষে মানুষে এক হয়ে গড়ে উঠবে জীবনের চলমান সাঁকো, যেখানে মানুষে মানুষে হাতে হাত ধরে গড়ে তুলবে এক শাশ্বত ও চিরন্তন দেশ-কালে-সমাজের প্রেক্ষিত; কিন্তু তিনি এও জানেন, এই সুন্দর সকাল পেতে হলে তাড়াহুড়ো করলে-চলবে না, উত্তেজিত হলে চলবে না, বরং পরম প্রশান্তি নিয়ে ধৈর্য ধরতে হবে; ধীর স্থির বিবেচক হয়ে আত্মপ্রসারণের পথ ও পাথেয় খুঁজে নিতে হবে; কবি নীরেন্দ্রনাথ এভাবেই চূড়ান্ত সময়সচেতন আস্তিক্যবাদী কবি হয়ে উঠেছেন।

নীরেন্দ্রনাথের কাব্যভাবনা চারের দশকের কবিদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। চারের দশকের কবিতার মূল প্রবণতা থেকে কবি 'দ্বিমত' পোষণ করেছিলেন। আসলে চারের দশক আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে এক উত্তাল সময়। অধিকাংশ কবি এই সময়পর্বে যখন হাহাকার করছেন, চিৎকার করছেন, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তখন ব্যতিক্রমী থেকে গেলেন; তিনি অন্যদের মতো প্রতিবাদীদের মিছিলে হাটলেন না; বরং এই দশকের অন্যান্য কবিদের সঙ্গে দ্বিমত হয়ে দীপ্ত উজ্জীবনবাদের কথাই বললেন, সৌন্দর্যের কথাই বললেন, আলোর কথাই বললেন, আশাবাদের কথাই বললেন।

চারের দশকের অধিকাংশ কবিরা যখন সব আশা ছেড়ে নিরাশায় ক্রমাগত তলিয়ে যাচ্ছেন। গভীর সমুদ্রে, তখনও নীরেন্দ্রনাথ ভয়াবহ বাস্তবকে নিজের অন্তরে সমাহিত করে 'সুন্দর একটা সকাল' এর অপেক্ষা করলেন, 'হ্যালো দমদম' কবিতাটি পড়লেও একইভাবে সেই ছবি ফুটে ওঠে—

> "আমি বিস্মিত হই না।
> কচুরিপানার ফুলগুলিকে আমি ফ্লাওয়ার-ভাবে সাজিয়ে রাখি,
> এবং নেড়িকুত্তাটিকে খুব যত্ন করে আমার
> সোফার উপর বসাই।
> তারপর টেলিফোনের মাউথপিসটাকে
> তার মুখের কাছে এগিয়ে দিয়ে বলি
> যদি বাঁচতে চাস হারামজাদা,
> তাহলে আয়, আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বল
> হ্যালো দমদম... হ্যালো দমদম... হ্যালো..." ('হ্যালো দমদম'; উলঙ্গ রাজা)

মানুষ যখন সব হারাতে বসেছে, এমনকি রাস্তার কুকুরও যখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে—তখনও কবি হাল ছাড়েন না, তিনি কুকুর সঙ্গে নিয়ে একটা 'রেসকু বোট' আসার আশায় 'হ্যালো দমদম.. হ্যালো দমদম... হ্যালো...' বলে আহ্বান করতে থাকেন।

শুধু তাই নয়, চারের দশকের অধিকাংশ কবিতরা যখন 'প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন' দেখছেন, 'মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি' দেখছেন নিজেকে; 'দুর্ভিক্ষের'র কবি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছেন না, সেই সময় পর্বে দাঁড়িয়েও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অন্ধকারে হারিয়ে না গিয়ে

আলোর স্বপ্ন দেখছেন। সামাজিক অবয়ব যতই রক্তাক্ত হয়ে উঠুক না কেন কবি প্রত্যয়ে অবিচল, আশাবাদে উজ্জ্বল—

"এমন কোন রাত্রি কখন আসেনি যার পরেই
সুন্দর একটা সকাল ছিল না।" (যখন রাত্রি)

শুধু আশাবাদে উজ্জ্বলই নয়, অন্ধকার অন্ধকার করে চিৎকার না করে অন্ধকারে আলোর ইচ্ছা লালন করেন—

"অন্ধকার ভাল নয়, আমি অন্ধকারে এতকাল
শুধুই আলোর ইচ্ছা লালন করেছি।
শুধুই আলোর ইচ্ছা, আলোর অসীম ইচ্ছা নিয়ে
আমি এই অন্ধকারে জেগে আছি। এই
অব্যয় তরল অন্ধকারে।" ('অন্ধকার নয়', অন্ধকার বারান্দা)

ভালবাসি, অন্ধকারকে তত বাসি না। আলো নিঃস্বার্থ, যে সবকিছুকে দৃশ্যমান করে তোলে, সবকিছুকে দৃশ্যমান করে তোলে। সবকিছুকে দেখার সুযোগ এনে দেয়। অন্ধকার তা করেনা, সে দেখায় শুধু নিজেকে। তাই তাকে বড় স্বার্থপর বলে মনে হয়। তবে এই দুই নিয়েই তো জীবন। আমি যে দুটোকেই পুরোপুরিভাবে ধরতে বিশ্বাস করি। এই বরাটা আসল ধরা। যাকে ভালবাসি তাকেও স্বীকার করি; যাকে মন্দবাসি, তাকেও স্বীকার করি।'

(সাক্ষাৎকার : ব্রত চক্রবর্তী, 'অন্তরীপ' ১৯৯২)

কবি সমাজের আলো-অন্ধকারকে সমানভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। সমানভাবে উপলব্ধিও করেছেন। কিন্তু চারের দশকের অন্যান্য কবিদের থেকে সর্বদাই ব্যতিক্রমী থেকেছেন। তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন শুধু রক্ত ঝরালেই মুক্তি আসে না, বিপ্লবের জন্য মানসিক বা আত্মিক অনুশীলনের দরকার, প্রত্যেক মানুষকে এই অনুশীলদের মধ্যে দিয়ে নিজ নিজ হৃদয়কে উন্মুক্ত ও প্রসারিত করতে হবে, সুতরাং প্রথমে মানুষের ঘুমন্ত চৈতন্যে স্বপ্নসম্ভবের দীপশিখা জ্বালিয়ে তোলা দরকার, তারপর সেই দীপশিখা থেকেই যাত্রা শুরু করতে হবে আশার দিকে, চেতনা প্রসারণের দিকে। এইজনাই তিনি সর্বদাই ক্রোধ আবেগকে শান্ত-সংহত করে চূড়ান্ত এক কাব্যিক ভাবসংহতির কবিতা রচনা করেছেন।

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর কবিতায় কখনোই কল্পলোকাশ্রিত কল্পনালতায় বিশ্বাস করতেন না; তাঁর কবিতাগুলি পড়লেই তা স্পষ্ট বোঝা যায় এবং একথা তিনি মল্লিকা সেনগুপ্তের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন—

"কবিতা, কল্পনালতা'য় আমি বিশ্বাস করি না। যার সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি, অর্থাৎ চোখ-কান-স্পর্শ কি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের যোগাযোগ তৈরি হয়নি তাকে নিয়ে আমি লিখতে পারি না।" (সাক্ষাৎকার: মল্লিকা সেনগুপ্ত, বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০০৫)

উপরের সাক্ষাৎকার থেকেই বোঝা যায় কবি কবিতায় অকারণ কৃত্রিম আবরণ এবং

আরোপিত দৃশ্যকল্প অনুসারী 'কল্পনালতা'র ছবি দেখতে চান না। কবি মনে করেন চোখ-কান-খোলা রেখে চারপাশের বিপন্ন ও বিপদগ্রস্ত সমাজকে দেখতে হবে, সবকিছুকে আঙুল দিয়ে ছুঁতে হবে। তাই কবি বাস্তবকে অস্বীকার করেননি। কবির বিশ্বাস ছিল কবিতা শুধু ব্যক্তিগত আনন্দ বেদনার রোজনামচা নয়, সমকালীন সমাজের প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন। স্বভাবধর্মে স্থিত হয়েই এই প্রতিফলনের ১৩৭৯ তে লেখা 'কবিতা দিকে' প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—

"কবির কাজ তাঁর নিজস্ব হৃদয়কে উন্মোচিত করে দেখানো। কিন্তু তার মানে কি এই যে শুধু ব্যক্তিগত কিছু দুঃখ-সুখের কথাই তিনি বলবেন। আমার তা মনে হয় না। হৃষীকেশ কি লছমনঝুলার সন্ন্যাসী তিনি নন। তিনি সামাজিক মানুষই। উপরন্তু, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, তাঁকেও একটি রাজনৈতিক বিন্যাসের মধ্যেই নিঃশ্বাস নিতে হয়। তাঁর কবিতায় কি সেই মনোভাবের সেই প্রতিক্রিয়ার কোন প্রতিফলন আমরা দেখব না?"

('কবিতার দিকে', নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

এ থেকেই স্পষ্ট চলিষ্ণু আর্থসামাজিক প্রেক্ষিত কখনোই কবি এড়িয়ে যেতে পারেননি। ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় একটি রাজনৈতিক বিন্যাসের মধ্যেই নিশ্বাস নিতে হয় প্রত্যেককে। কিন্তু তা কখনই পক্ষপাতদুষ্ট হবে না। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বিশ্বাস করতেন নিরপেক্ষতায়; তাই তিনি সত্তরের সেই প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছিলেন-

"সবাই দেখছে যে, রাজা উলঙ্গ, তবুও
সবাই হাততালি দিচ্ছে।
সবাই চেঁচিয়ে বলছে: শাবাস, শাবাস।" ('উলঙ্গ রাজা'; উলঙ্গ রাজা)

সন্ত্রাসশাসিত ভয়ংকর এই রাষ্ট্রীয় শক্তির নির্লজ্জতার বিরুদ্ধে তিনি তাই প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করেননি। 'সত্যবাদী, সরল, সাহসী শিশুটিকে এনে স্পষ্টই জানতে ও বুঝতে চেয়েছেন নির্মম সময় এবং জীবনের সত্যটি—''রাজা তোর কাপড় কোথায়?"

আবার একইভাবে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করছে, সেই ভণ্ড ছদ্মবেশী রাজনীতির বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছেন—যারা নিজের সন্তানকে নিরাপদে রেখে, নিজের পরিবারকে নিরাপদে রেখে অন্যের সন্তানকে ঠেলে দেয় ভয়ংকর যুদ্ধক্ষেত্রে—

"বলো, আমার নামজাদা ব্যাটসম্যানদের
কাউকেই কি এখন আমি
মাঠে পাঠাতে পারি?
... ...
তুমি যাও।
তুমি গিয়ে ওদের তেষ্টা মেটাও।
তুমি আমার এগারো নম্বর খেলোয়াড়;

কিন্তু প্রমোশন দিয়ে তোমাকে আমি
তিন-নম্বরে তুলে আনলুম।
তোমার স্বার্থে নয়,
দলের স্বার্থে।” (‘রক্তপাত, পড়ন্ত বেলায়’; উলঙ্গ রাজা)

আমাদের দেশের রাজনীতি যে ক্রমশ দলতন্ত্রের স্বার্থে এবং দলতন্ত্রের ভৃত্যে পরিণত হয়েছে—এই সত্য বুঝতে দেরি হয়নি কবির। তিনি জানেন, যে খেলোয়াড়টিকে ১১ নম্বর থেকে ‘প্রমোশনে’ দিয়ে ৩ নম্বরে তুলে আনা হচ্ছে, সেই খেলায়াড়টিকে আসলে দলই সুকৌশলে হাড়িকাঠে বলি দিচ্ছে। মানুষকে এইভাবে বলি দেয় যে রাজনীতি, কবি তাকে ধিক্কার দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। আলোচ্য কবিতায় ‘প্রমোশন’ শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব মেনে নেননি, হয়ত কবির বিশ্বাস ছিল লোভ থেকে পক্ষপাতিত্ব আসে; তাই তিনি চাননি কবিরা একটা রাজনৈতিক দলতান্ত্রিক পক্ষপাতে বিচরণ করুন। তাই কবিতায় তিনি বলেন-

“কবি যদি লোভী হয়,
তাহলে সে কবি নয়,
তা হলে সে পথের কাঙাল
কখনও সবুজ পরে,
কখনও গেরুয়া ধরে
কখনও বা টকটকে লাল।” (‘কবি যদি’, ‘ভালবাসা মন্দবাসা’)

তবে অন্যায় দেখলে দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘরের কোণটিতে আশ্রয় নিয়ে যাঁরা চোখ বুজে গার্হস্থের মজায় ডুবে থাকে, তাদেরও কিন্তু তিনি পছন্দ করেননি কখনো। শুধু তাই নয়, তিনি ভয়মুক্ত কবি; আর ভয়মুক্ত বলেই মানুষকে যারা ভয় দেখায় তাদের প্রতি নির্মম ও দীপ্ত কণ্ঠে তিনি বলেন—

“তর্জনী দেখিয়ে কেন কথা বলো... কখনও বলবে না...
কাকে... তুমি ভয় দেখাও কাকে...
আমি অনায়াসে সব ভেঙে ফেলতে পারি....
মুহূর্তে তছনছ করে দিতে পারি সবকিছু...
বাঁ পায়ের আঘাতে আমি সব
মুছে ফেলতে পারি...
তর্জনী দেখিয়ে কেন কথা বলো... কখনও বলবে না...।”(‘তর্জনী’; নীরক্ত করবী)

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সমাজের অবক্ষয়ের কথা ও পচনশীল রজানীতির কথা বললেও বিশ্বাস করতেন এই অন্ধকার একদিন দূর হয়ে গিয়ে আবার নতুন সূর্যের আলো দেখা দেবে। আসলে তিনি গতিবাদের ভাবনায় উজ্জ্বল। শুভময় আস্তিক্যের এবং শুভঙ্করী চৈতন্যের

চলমান ভাবনায় সৃজনের নদী হয়। মানবিকতায় কবি তাই বারবার গতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন আস্তিক্যচালিত শুভসত্তার গতিই হলো আসল জীবন, আর স্থিতি হল মৃত স্বপ্নের স্থবিরতা। কবিতায় এই ভাবনাতেই তিনি বলেন—

"আমি শুধু যাবার কথা বলি,
পৌঁছবার কথা বলি না।
আসলে, পৌঁছানোটা যে খুব জরুরি ব্যাপার,
এমন বিশ্বাসই আমার নেই।" ('শুধু যাওয়া'; 'পাগলা ঘণ্টি')

কবি মনে করেন, চলাটাই সত্য; চলতে চলতে জীবন জেগে উঠবে, প্রাণ মুকুলিত হবে; সুতরাং চলতেই হবে; যাত্রা ক্রমাগত যাত্রা; কবি সেই যাত্রার শরিক; পৌঁছানোটা একদিন হবেই; তার জন্য ব্যস্ততা কিসের? তিনি জানেন পৌঁছে স্থির হয়ে যাওয়া মৃত্যুর সামিল; তাই তিনি শুধু যেতেই চান। এভাবেই গতিমান জীবনের পাশাপাশি কবি শুধু আলোর স্বপ্ন দেখেন অন্ধকারের নয়। মনে মনে কবি আলোর ইচ্ছা লালন করেন, অন্ধকারে জেগে থাকেন শুধু অসীম আলোর ইচ্ছা নিয়ে—

"অন্ধকার ভাল নয়। আমি অন্ধকারে এতকাল
শুধু আলোর ইচ্ছা লালন করেছি।
শুধুই আলোর ইচ্ছা, আলোর অসীম ইচ্ছা নিয়ে
আমি এই অন্ধকারে জেগে আছি, এই
অব্যয় তরল অন্ধকারে।" ('অন্ধকার নয়'; 'অন্ধকার বারান্দা')

আসলে নীরেন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় প্রাত্যহিক নষ্টভস্ট বাস্তবকে গভীরভাবেই দেখেছেন, আর দেখতে দেখতে বদলাতে চেয়েছেন বাস্তবের কদর্য অন্ধকারাচ্ছন্ন রূপ; চেয়েছেন পরিচ্ছন্ন জীবনজাত আলো—যা মানবিক ও সুদুরপ্রসারী: জীবনানন্দ বারবার যে অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিলেন, নীরেন্দ্রনাথ সেই অন্ধকার সরাবার ব্রত নিয়েই যেন বাংলা কবিতায় এসেছেন; তাঁর কবিতা তাই—আলোর দীক্ষা, আলোর সন্ধান, আলোর স্বপ্ন, আর এই আলোর স্বপ্ন থেকেই তিনি কবিতায় দীপ্ত উজ্জীবনবাদের কথা বলেছেন। গভীরভাবে ভিতর থেকে বাস্তবকে দেখা এবং তার পরেও এই উত্তরণের পথ খোঁজা কবিতাগুলিকে কবি বিবেকীদর্শনের কবিতা করে তুলেছে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সমাজকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, আঙুল দিয়ে স্পর্শ করেছেন এবং এই দেখাগুলোই 'দর্শন'—গুলোই হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাতে বেরিয়ে এসেছে কবিতার অক্ষরে। সমগ্র চল্লিশ দশক যখন কার্ল মার্কসকে সামনে রেখে ইস্তেহার রচনার মতো কবিতা লিখেছেন, কবি নীরেন্দ্রনাথ তখন শুধু মার্কসবাদের সীমায় আবদ্ধ থাকেননি; বরং সর্বজনীন এক মানবিক স্বরেই বারবার কথা বলেছেন নিজের মতো করে; ঠিক সাধারণ দীন-দুঃখী মানুষ যেভাবে বলে। সরাসরি মার্কসবাদ অনুগত কবিতা পড়লেই বোঝা যায়। তাঁর কবিতাগুলো মানব জীবন বিকাশের এক একটি বিবেকী দর্শনের কবিতা হয়ে উঠেছে।

দে ব শ্রী ঘো ষ বি শ্বা স

শঙ্খ ঘোষের কবিতা : প্রেক্ষিত সত্তরের দশক

"রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক বামনদের পক্ষে কোন দশকের সংক্ষিপ্তসার করা রীতি মতো অসুবিধাজনক। লেনিন-স্তালিন-মাও-এর মতো অন্তর্দৃষ্টি কার আছে? বুর্জোয়া জগতেও ইতিহাসবোধ সম্পন্ন মানুষ আর নেই, যা করা যেতে পারে তা হল বিভিন্ন ঘটনা ও আন্দোলন সম্পর্কে টুকরো টুকরো ব্যক্তিগত অভিমতগুলো সাধ্যমত সাজানো"—সমর সেন।

বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে বাংলায় যে আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিঘাত বাঙালী মননে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতেও তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। সত্তর দশকের প্রেক্ষিত কেন আলোচনার শিরোনামে তা আলোচনা সাপেক্ষ। কোন একটি দশক বা সময় আকস্মিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে না, সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক ঘটনা-প্রবাহ যখন সামাজিক বিষফোরণ ঘটায়, তখনই সমাজ কেন'র উত্তর খোঁজে। সেই খোঁজে আমাদের ফিরে যেতে হবে বিগত সময়ে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ জনিত সমস্যা'র কিছুটা নিরসন হলেই এক নতুন শ্রেনির উদ্ভব হয়, যারা মধ্যসত্ত্বভোগী বা মধ্যবিত্ত সমাজ। ঔপনিবেশিক আমল থেকে ইংরাজী শিখে ইংরেজের স্তাবকতা করা কেরানী সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছিল, যাঁরা কালক্রমে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে রূপান্তরিত হয়। সঙ্গে যুক্ত হয় কিছু শব্দ মূল্যবোধ, আর্দশ, নৈতিকতা, সততা, মেধা, মননশীলতা, সৃজনশীল ইত্যাদি। চল্লিশের দশককে নব জাগরণের যুগ বলে অতিরঞ্জিত না করলেও একথা স্বীকার্য বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে ত্রিশ-চল্লিশের দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ফলে ইউরোপে ঘটে চলা ঘটনার অনুরণন, মূলত রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষিত নতুন ভাবধারার উদ্ভব ও অনুপ্রেরণা বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলে। স্পেনের স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে ইউরোপের প্রগতিশীল মানুষদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং কবি লোরকা, কর্ড ওয়েল ও ফিসারের হত্যা ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে বিশ্ব জুড়ে এক নতুন ভাবধারার জন্ম দেয়। জর্জ অরওয়েল তাঁর উপন্যাস 'the Road to wigan pyre' ফ্যাসিবাদের বিপরীতমুখী চেতনার বিকাশ ঘটায়। বৈশ্বিক সৌহার্দ্য ও মার্ক্সীয় ভাব ধারায় দীক্ষাগ্রহণ। বিশ্বের নিপীড়িত শোষিত জনগণের মুক্তি, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের প্রাথমিক চাহিদা পুরাণের লড়াই। যা লক্ষ্যগোচর হয় চল্লিশের দশকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্বাধীনতা প্রাপ্তির চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা, দ্রুতগতিতে সমগ্র দেশজুড়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ছাড়িয়ে পড়ছিল। দ্বিতীয় বার বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধের ভয়াবহতা, ন্যাৎসী বাহিনীর নিমর্মতা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক পীড়ন থেকে মুক্তি এবং ফ্যাসিবাদ স্তব্ধ হওয়া যায় সময়কাল কাছাকাছি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগের বছর ১৯৪৬ সালে শুরু হয়েছিল 'তেভাগা' কৃষক আন্দোলন। ১৯৪৮ পর্যন্ত মাত্র দুই বছর ছিল আন্দোলনের স্থায়িত্ব কাল। উৎপন্ন ফসলের দুই ভাগ পাবে

চাষী, এক ভাগ পাবে জমির মালিক, এটাই ছিল দাবী। আন্দোলন ব্যর্থ হলেও জনমানসে স্থায়ী ছাপ রেখে যায়। ভারতবর্ষ মূলত কৃষিনির্ভর দেশ।

তাই নায্য ফসলের ভাগের দাবীও সঙ্গত। জমির মালিক জমিদার, কৃষকরা বেশীরভাগ ভাগচাষী। তাদের শোষণের ইতিহাস শতাব্দী প্রাচীন। ধূমায়িত ক্ষোভ লাভা উদ্গীরণ শুরু করেছিল তেভাগা কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে সেমি কলোনিয়াল কাঠামোতেই সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনীতি পরিচালিত হতে শুরু করে, ফলত আগের সামন্ততান্ত্রিক চেহারার রূপ বদল হয় মাত্র। ব্যাপারটা টলস্টয়ের ভাষায় এ ভাবে বলা যায়—

"ধরুন আমি একজন মানুষের ঘাড়ে চেপে বসেছি, চেপে ধরেছি তার গলা। তাকে বাধ্য করছি বোঝা হিসাবে আমাকে বহন করতে। আর সেই ফাঁকে নিজেদের ও অন্যদের বোঝাচ্ছি যে আমি যার ঘাড়ে চেপেছি, তার জন্য আমি দুঃখিত। যে ভাবেই পারি তার দুঃখ আমি মোচন করবই; কিন্তু ঘাড় থেকে আমি কিছুতেই নামতে পারব না।"

কিন্তু জনগণ এদেরই ঘাড় থেকে সম্পূর্ণ নামিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছিল। সেই চাওয়া ছিল সোনার পাথরবাটি স্পর্শ করার মতো। স্বাভাবিকভাবে পাওনা বুঝে নেওয়ার দাবিতে জ্বলে উঠেছিল কৃষক সম্প্রদায়। এর পর ছয়ের দশক জুড়ে চলছিল ঔপনিবেশিক পরিকাঠামো অটুট রেখে সার্বিক বিকাশের চেষ্টা, যা অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়। ভারতীয় রাজনীতিতে, স্বাধীনতা পরবর্তী পার্লামেন্টারি মার্ক্সীয় মতবাদ ঘুণধরা সমাজ ব্যবস্থা এবং রুগ্ন অর্থনীতির মূলে কুঠারাঘাত করে এক দিনবদলের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করে। সাতের দশকের শুরুতেই পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ী অঞ্চলে শুরু হয় আবার কৃষক আন্দোলন। তবে এ আন্দোলনের চরিত্র একেবারেই আলাদা। অতি বামপন্থার ধারা আন্দোলনকে চালিত করতে থাকে, ফলে তা প্রথম থেকেই ছিল সশস্ত্র।

আন্দোলনকে কৃষি বিপ্লবের রূপ দেওয়ার প্রয়াসও ছিল। এই আন্দোলনকে ঘিরে শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনে ঝড় ওঠে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গ্রামে গিয়ে কৃষকদের পাশে দাঁড়ায় বিপ্লবের সাফল্যের স্বপ্নে অগুনতি ছাত্র যুব প্রাণবিসর্জন দেয়। এই কৃষক আন্দোলন শেষ পর্যন্ত এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার ভিত গড়ে তুলতে চেয়ে সরাসরি যুদ্ধে নেমে পড়ে। সবার উপর নেমে আসে, রাষ্ট্রীয় নির্মম দমন-পীড়ন। নির্বিচার হত্যা, বিনা প্রশ্নে, বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা, গণ হত্যা, কলকাতা যেন বধ্যভূমি, বাতাসে বারুদের গন্ধ। সত্তরের দশক হয়ে ওঠে মুক্তির দশক। রক্তস্নাত সেই সময়ে অনেক সাহিত্যিক তাঁদের কথা, প্রতিবাদ, অনুভব লিপিবদ্ধ করছেন কবিতায়, গদ্যে, নাটকে। শিল্পী মাত্রেই সংবেদনশীল, সেই উত্তাল সময় তাঁদের মসীই হয়ে উঠেছিল অসি। সাহিত্য, সময় কালকে ধরে রাখে নিজ গর্ভে। উত্তরকাল যেন তার সন্ধান করে নেয় এই প্রত্যাশায়।

বাংলা সাহিত্যে সমকালীন কবিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শঙ্খ ঘোষ। যাঁর লেখনি বারংবার ক্ষুরধার হয়ে সত্যতার, নির্ভীকতার প্রতিবাদের আয়ুধ হয়ে উঠেছে। প্রবহমান সময়ের বিমুখতা নয়, বরং তাকে আত্মস্থ করেই কবির উচ্চকণ্ঠ। গভীর বেদনায় তিনি বলেন—

"নেকড়ে-ওজর মৃত্যু এল/ মৃত্যুরই গান গা-/ মায়ের চোখে বাপের চোখে/ দু-তিনটে গঙ্গা। দুর্বাতে তার রক্ত লেগে/ সহস্র সঙ্গীর******।"

সন্তান, স্বজন, সহযোদ্ধারা হিমশীতল মৃত্যুর আলিঙ্গনে চিত হয়ে পড়ে আছে ঘাসের উপর, বাবা মায়ের চোখে যন্ত্রণার অব্যক্ত জলধারা। দিন বদলের স্বপ্নে বলি হওয়া অজস্র অগুনতি সন্তানের পিতা মাতার হাহাকার, আর্তনাদে ভারী আকাশ বাতাস। কিন্তু কবি মখন বলেন—"নিভন্ত ঐ চুল্লিতে মা/ আর একটু আগুন দে/ আর একটু কাল বেঁচেই থাকি/ বাঁচার আনন্দে।" বিপ্লবের আগুন বুকের মধ্যে জ্বালিয়ে রাখতেই হবে।

নিভে যাওয়া মানেই তো সব শেষ। সবার সমান অধিকার নিয়ে প্রকৃত মানুষের মতো আনন্দে বেঁচে থাকার জন্যেই লড়াই। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দলে দলে দিন বদলের উদাও আহ্বান শুনে ঘর ছেড়ে ছিল। 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' জ্ঞানে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছিল সান্ত্রীর উদ্যত বেয়নেটের সামনে। কবি তাঁর যন্ত্রণা দীর্ণ মন নিয়ে অনুভব করছেন—"শরীরের মধ্যে কিছু একটা ঘটছে ডাক্তার/ঠিক জানি না/ কিভাবে বলতে হয় তার নাম।/ আয়নার সামনে বসলে ভারী হয়ে নামে চোখ/ পেশীর মধ্যে ব্যথা/ ভেতর থেকে ফুটে বেরোয় হলুদ রঙের আলো/কিন্তু সে তো গোধুলীর আভা/ রক্তে কি গোধূলী দেখা যায়?" পাঁজর ভাঙার নিঃশব্দ অসহায় যন্ত্রণায় বিদ্ধ কবি প্রশ্ন করেন নিজেকে। এক ভয়ঙ্কর সময় অতিক্রম করতে হচ্ছে ওঁকে। চারপাশে জমাট অন্ধকার, কালো হয়ে যাওয়া রক্তের দাগ আর বারুদের গন্ধ অস্থির করে তোলে। অস্তমিত সূর্যের হলুদ আভায় প্রকৃতি মোহময়ী হয়ে ওঠে, অথচ কবি সৌন্দর্য পিয়াসী হতে পারছেন না। এক বৌদ্ধিক চেতনা জন্ম হচ্ছে। প্রতিবাদের চিত্রকল্পে রক্তের মধ্যে আসন্ন গোধূলীর রং খোঁজেন। সেই রক্তক্ষয়ী দিন গুলোতে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বে দিশেহারা বাঙালী জীবন। মতাদর্শগত পার্থক্য যে কি ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটাতে পারে তার উদাহরণ সত্তরের দশক। এক দমবন্ধ করা পরিস্থিতির শিকার সকলে। কোন বিরুদ্ধ মত নেই। বাক্ স্বাধীনতার অধিকার হৃত। সরকার যেন জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। ১৯৭১ সালে দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করে, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির মাত্র তিন দশকের মধ্যে মৌলিক অধিকারগুলো কেড়ে নেওয়া হয়। তাতে ঘৃতাহুতি দিয়েছিল নকশালবাড়ি আন্দোলন। রাষ্ট্রশক্তি সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় শঙ্খ ঘোষের 'স্তব' কবিতাটি। প্রতি ছত্রে ঝড়ে পড়েছে সীমাহীন ক্ষমতার দম্ভ। হীরকের রাজা ভগবান গোছের এক নায়কতান্ত্রিক মনোভাব—

"তুমিই আবর্ত, তুমি পিন্ড, তুমিই লূতাতন্ত্রজাল
নিশ্বাসপরিধি, তুমি মজ্জাভুক বোধেন্দুবিনাশ
তুমিই নৈবেদ্য, তুমি ফুলজল, বিগ্রহও তুমি"

"তুমি যা রচনা করো তা-ই একমাত্র সত্য জানি
তুমি আবর্ত, তুমি পিন্ড, তুমি চমৎকার চিতা।"

সকলের চিন্তা-চেতনা একই খাতে প্রবাহিত করার নির্দেশ। না হলেই নেমে আসবে নির্মম মৃত্যুদন্ড। যন্ত্রর-মন্তর ঘরে মগজ ধোলাই হবে, সকলেই নির্দেশ পালন করবে শাসকের,

অন্যথায় জীবন হয়ে উঠবে নরক। গরম বুলেট শরীর ভেদ করবে। ময়দানে, রাজপথে, গলিতে পড়ে থাকবে তোমার গলিত শব, না হলে হঠাৎই একদিন হারিয়ে যেতে হবে। স্বাধীন রাষ্ট্রে এইভাবে গণতান্ত্রিক পরিসর রুদ্ধ করে দেওয়ার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত বিশ্ব ইতিহাসে কমই আছে। সত্তরের দশকের রাজনৈতিক দর্শন তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল। শাসকের রক্তচক্ষুতে চোখ রেখে নির্মম দমন পীড়ন সত্বেও শ্রেণি সংঘাত, মতাদর্শের প্রয়োগ ঘটাতে দিয়ে এক দানবীয় বিভৎসতার সাক্ষী হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। 'বঁড়শি' কবিতায় কবি বলেন,

> "*** আমি যত টুকু চাই তত দূর
> সহজেই যেতে পারো—এই স্বাধীনতা—সে তো আছে
> ******* ******* এর মধ্যে তুমিও এভাবে
> মেজাজ দেখাও যদি, কথার উপরে বলো কথা—
> তা হলে মুশকিল বড়ো। মারতে তো চাই না সহজে—
> কিন্তু এরকম হলে নিতান্তই নিরুপায় হয়ে
> খুলে নিতে হবে চামড়া তোমারই ভালোর জন্য বাপু"।

আপাত সহজ এই বলা কথাগুলোর মধ্যে আছে নির্দেশ। প্রচ্ছন্ন হুমকি আমিই একমাত্র সত্য। লক্ষণরেখে টেনে দেওয়া হয়েছে। তার বাইরে গেলেই ভয়ংকর বিপদ শিকারী স্বাপদের মতো ওত পেতে আছে। তোমারই গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে অন্যদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা পাকা। লড়াইটা ছিল আমিত্ববাদের সঙ্গে বহুত্ববাদের। আমি থেকে আমরায় উপনীত হওয়ার। এই অনৈতিক দমবন্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি যন্ত্রণায় ছটফট করছিল সমাজ। সমস্ত হিসাব ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল। একদিকে ছিল রক্তরাঙা প্রত্যুষের স্বপ্ন, আর একদিকে সন্ত্রাসের—স্বেতপতাকা। যুব সমাজ দুটোকেই বহন করেছিল আর মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিল—"এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়"। স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গ প্রত্যক্ষ করেছিল বিট্রিশ শাসনের থেকেও নগ্ন নির্মমতা। 'বেলেঘাটার গলি' শীর্ষক কবিতাটি সমকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক আবহের তথ্যনিষ্ঠ দলিল হয়েছে আছে। সেই ভয়ঙ্কর নির্দয় সংগঠিত হত্যালীলার বিবমিষাময় দিনলিপির খন্ড চিত্র—

> "যা দেখি সব চমকপ্রদ, মুন্ড আছে মাথায়
> চৌরাস্তায় চিৎ হয়েছি ছেঁড়া জরির কাঁথায়
> হুকুম দিলে খুলতে পারি বুকের কাটা পাঁজর
> বলতে পারি, বাজে বাশিঁ, আপন মনে বাজো।
>
> আর তাছাড়া সবটা কথা কেমন করে বলি
> বাইরে লেনিন ভিতর শিব বেলেঘাটার গলি"

ক্ষত-বিক্ষত বিভৎস নির্যাতনের সাক্ষ্য শরীরে নিয়ে যুব মৃতদেহে ভরে উঠেছিল কলকাতার ময়দান। তৎসহ বরানগর, বেলেঘাটা, অশোকনগর সহ একাধিক স্থানে গনহত্যায় সরকার রক্ত হোলির উৎসবে মেতে উঠেছিল। এক ধরনের দিশাহীনতা, বাম ও অতিবামের

মতাদর্শগত পার্থক্য, কর্মপদ্ধতি এবং আদর্শচ্যুতি সত্তরের বিপ্লবে ব্যর্থতা ডেকে আনে। সাফল্য-ব্যর্থতার ঐতিহাসিক বিচার চলতেই থাকবে কালের নিয়মে। পূর্ণাঙ্গ ফুল হয়ে ফোটার আগে যেসব তাজা কুঁড়িরা ঝরে গিয়েছিল তাদের প্রতি কবির সহমর্মিতা ও ক্ষোভ একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে—

"তিন রাউন্ড গুলি খেলে তেইশ জন মরে যায়, লোকে এত বজ্জাত হয়েছে।
স্কুলের যে ছেলেগুলো চৌকাঠেই ধ্বসে গেল তাঁরা অবশ্যই ছিল
সমাজ বিরোধী'।

আত্মরক্ষা ছাড়া আর কিছুই জানে না বুলেটরা
দার্শনিক চোখ শুধু আকাশের তারা বটে দেখে মাঝেমাঝে
পুলিশ কখনো কোন অন্যায় করে না তারা যতক্ষণ আমার পুলিশ"।

তীব্র কটাক্ষের শব্দবন্ধে কবি শাসকের চালাকি যে ধরে ফেলেছেন তা ব্যক্ত করতে তিনি অকুতভয়। শাসকের আগ্রাসন যত তীব্র, ততই বিরুদ্ধতার স্বর চড়িয়েছেন তিনি। শঙ্খ ঘোষ রাজনীতি সচেতন, সমাজ সচেতন কবি। যখনই দেখেন নৈরাজ্যের বা অরাজকতার ছবি, তাঁর মননে- যাপনে যখনই কোন রাষ্ট্রিক ব্যভিচার ধরা পড়ে তখনই তিনি সচেতন ভাবে তাঁর প্রতিবাদের অস্ত্র কলম হাতে তুলে নেয়। আর দুর্ভাগ্য যে কোনো ঘটনায় রাজনৈতিক রং আমাদের পরিচায়ক হয়ে ওঠে। তাই আগে জানাতে বা জানতে হবে তুমি কোন দলের। সেই মতো তোমার যাবতীয় ন্যায় অন্যায় বিচার্য হবে, নির্ধারিত হবে শাস্তির মাত্রা—

"পুলিশের গুলিতে যে পাথরে লুটোয় তাকে টেনে তুলবার আগে জেনে নাও কোন দল তোমার দু হাতে মাখা রক্ত কিন্তু বলো এর কোন হাতে রং আছে কোন হাতে নেই? বিচার দেবার আগে জেনে নাও দেগে দাও প্রশ্ন করে তুমি কোন দল

"আত্মঘাতী ফাঁস থেকে বাসি শব খুলে এনে কানে কানে প্রশ্ন করো তুমি কোন দল
রাতে ঘুমোবার আগে ভালোবাসবার আগে প্রশ্ন করো কোন দল তুমি কোন দল"।

অত্যন্ত সহজ সাবলীল ভাষায় কবির রাজনৈতিক প্রতিরোধ, রাষ্ট্রিক সন্ত্রাস, সামাজিক অন্যায়-অবিচার, সবাই তাঁর কবিতার প্রতি ছত্রে প্রতিফলিত। কবিতাগুলির প্রেক্ষিত সত্তরের দশক হলেও বর্তমান সময়েও। যেন ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। আজ যখন মেধাবী ডাক্তার তয়নী কর্মস্থলে ধর্ষিতা হয়, তখন ঘটে জনজাগরণ—শাসক ঠিক একইভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছে বিদ্রোহীরা কোন দলের, আর অপরাধীরাও! হে কবি, খুব প্রয়োজন আপনার মননের পুনর্জাগরণ।

তথ্যসূত্র :

১. শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ-প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, দে'জ পাবলিশিং।
২. সত্তরের দশক : সম্পাদনা- অনিল আচার্য, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, অনুষ্টুপ।

কা রি মু ল চৌ ধু রী

প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কবির প্রতিবাদী স্বরায়ন : শঙ্খ ঘোষের নির্বাচিত কবিতা

বাংলা কাব্যের জগতে বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দশক। এই দশকে অসংখ্য কবির আবির্ভাব ঘটে, যা অন্য কোন দশকে আমরা পাই না। শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অলোক সরকার, উৎপল কুমার বসু, বিনয় মজুমদার, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সমরেন্দ সেনগুপ্ত — সকলেই পঞ্চাশের দশকের কবি, সংক্ষেপে 'পঞ্চাশের কবি' নামে অভিহিত। এছাড়া কবিতা সিং, নবনীতা দেবসেন, আনন্দ বাগচী, পূর্ণেন্দু পত্রী, দিব্যেন্দু পালিত, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, সমীর রায়চৌধুরি, দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় দত্ত — এঁরা সকলেই কেউ নাট্যকার, কথাসাহিত্যিক, অনুবাদক, সমালোচক, প্রচ্ছদ শিল্পী, বিভিন্ন আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে পরবর্তীসময়ে খ্যাতিলাভ করলেও সকলে পঞ্চাশের কবি হিসাবেই পরিচিত।

শঙ্খ ঘোষ পঞ্চাশের দশকের কবি হলেও মানসিকতা ও জীবনদর্শনে তিনি ছিলেন সম সময়ের কবিদের চেয়ে ভিন্ন। ব্যক্তি স্বর তাঁর কবিতার অন্যতম নিয়ন্ত্রক শক্তি, যদিও সমাজ সেখানে প্রাণবন্ত ও বাস্তব। তবে তিনি সংহত আবেগের আত্মমগ্ন কবিতা রচনা করলেও তাঁকে শেষপর্যন্ত প্রতিবাদী কবি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। তাঁর এই প্রতিবাদ কখনো মৃদু, কখনো তা ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে উচ্চকিত। এক্ষেত্রে তাঁর 'যমুনাবতী' কবিতাটির কথা ধরা যাক। ১৯৫২ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর এই প্রথম কবিতা নাড়িয়ে দিয়েছিল সকল কাব্য প্রেমিকে। এই বিষয়ে সমালোচক অশ্রুকুমার শিকদারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

"কোচবিহারের খাদ্য আন্দোলেনর ১৯৫১ সালে গুলিচালনায় নিহত কিশোরীর নির্ধারিত দেশকালের ঘটনা কালোত্তীর্ণ মহিমা পেয়ে যায় আবহমান ছড়ার ছোঁয়ায়। ঘর থেকে ভেসে আসছে আমার ছোটো বোনের ছড়া আওড়ানো ...যেন এক দমকাই ফিরে এল এক মাসের পুরোনো সে কোচবিহারের দিন, ফিরে এল নাম-না-জানা সেই মেয়েটির আর তার মায়ের মুখচ্ছবি, দুলে উঠল কয়েকটি শব্দ : নিভন্ত এই চুল্লিতে মা একটু আগুন দে!"[১]

কবি এই কবিতায় বলেন —

"নিভন্ত এই চুল্লিতে মা
একটু আগুন দে
আর একটু কাল বেঁচেই থাকি
বাঁচার আনন্দে।"[২]

একজন কিশোরীর মৃত্যু এই কবিতার উপজীব্য। সেই কিশোরী মারা যায় পুলিশের গুলিতে এক ভুখা মিছিলের মধ্যে। প্রান্তিক মানুষের বুভুক্ষার যন্ত্রণা, শোষকের ভূমিকায় কবি হৃদয় ব্যথিত, তাই তাঁর অন্তরে জেগে উঠেছে প্রতিবাদী সত্তা। 'দিনগুলি রাতগুলি" (১৯৫৬) কাব্যের এই কবিতা বাংলা প্রতিবাদী কবিতার বিশ্বে একঝলক নতুন বাতাস।

এই কাব্যের অন্য একটি কবিতা 'শিশুসূর্য'-তে কবির এই প্রতিবাদ - শাসকের প্রতি, ক্ষমতাতন্ত্রের প্রতি আরও তীব্র হয়েছে। কবি বলেন —

"এ কোন দেশ ?
মৃত্যু তার স্খলিত অঞ্চল ঢালে দয়িত মুখে
শিশু তার জন্মে পায় দুর্বল দুয়ারে হাহাকার।"[৩]

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের ক্ষমতাসীন সরকার জনগণের প্রাথমিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ। সাধারণ মানুষের দুবেলা দু-মুঠো অন্ন যোগাতে না পারার জন্য হাহাকার এবং মৃত্যুশোকে আচ্ছন্ন হয়ে যায় এদেশের আকাশ-বাতাস। তাই কবির সংবেদনশীল মন শাসকের প্রতি বক্র-বচনে তুলে এনেছেন তাঁর প্রতিবাদ —

"এ কোন দেশ ?
তোমার শরীর শিশু মৃত্যুকায় লগ্ন ক'রে ক'রে
শৈশবে কামনা করে দেশমতা দেশ
এ কোন দেশ
অসংখ্য - শিবিরে রুদ্ধ - শিবির কামনা করে
এ কোন দেশ?"[৪]

প্রথম কাব্যগ্রন্থের এই দুটি কবিতায় শঙ্খের যে প্রতিবাদী চেতনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল পরবর্তীকালে সেই প্রতিবাদ আরও ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়' কাব্যগ্রন্থ থেকে সেই প্রতিবাদী চেতনা আরও সংহত রূপ পেয়েছে। 'বাবরের প্রার্থনা' (১৯৭৬), 'বন্ধুরা মাতি তরজায়' (১৯৮৪) ইত্যাদি কাব্যের মধ্যে কবির ক্ষমতাতন্ত্রবিরোধী স্বর আরও জোরালো হয়েছে। বঙ্গীয় মেধাবী যুবক - যুবতীরা নিজেদের আত্মকেন্দ্রিকতার বেড়াজাল ভেঙে এসে দাঁড়িয়েছিল কৃষিজীবী জনতার পাশে সত্তরের দশকে। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস সরকার জয়লাভের পর বাংলায় যে অত্যাচারের নয়া অধ্যায় যোগ করে সেই সময়কালই উঠে এসেছে এই দুটি কাব্যে। তবে তাঁর প্রতিবাদ নবারুণ বা মণীভূষণের মতো উচ্চকণ্ঠের প্রতিবাদ নয়, সেই প্রতিবাদ মগ্নস্বরে, কিছুটা দাপটে কাঠিন্যে তা অনন্যপরতন্ত্র। তাঁর 'জয়ৎসব', ১৯৭২, 'তিমির বিষয়ে দু — টুকরো' ('মূর্খ বড়ো, সামাজিক ন'য় - ১৯৭৪), 'ইন্দ্র ধরেছে কুলিশ', 'মার্চিং সং', 'রাধাচূড়া', 'আপাতত শান্তিকল্যাণ', 'বাবু বলেন' ("বাবরের প্রার্থনা' - ১৯৭৬) কবিতায় যে প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে তা তুঙ্গস্পর্শী।

১৯৭৫ সালের ২৫ শে জুন রাত্রে ভারতবর্ষে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে তদানীন্তন শাসক তাদের প্রতি নিন্দাকে ধ্বংস করতে চাইলেন। সে সময়ে শিল্পী — লেখক — সাংবাদিকের কন্ঠস্বর এবং লেখনী আর্তনাদ করে উঠল। জরুরী অবস্থাকে কেন্দ্র করে রচিত 'মার্চিং সং' কবিতায় শঙ্খ ঘোষের বিদ্রুপ মনোভাব লক্ষ্য করা যায় —

"নেই কোন সন্ত্রাস
ত্রাস যদি কেও বলিস তাদের
ঘটবে সর্বনাশ —
ঘাস বিচালি ঘাস
ঘাস বিচালি ঘাস!"[৫]

তাঁর 'রাধাচূড়া' কবিতায় বাচ্যার্থের মালী ও রাধাচূড়ার আড়াল সরিয়ে কবি সমকালকে ব্যঞ্জিত করেছেন। যাটের দশকের শেষে নকশাল আন্দোলনের মাধ্যমে যে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা শুরু হয়েছিল, সত্তর দশকের প্রথম থেকেই রাষ্ট্রপতি শাসনের মাধ্যমে তাকে গুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। ৭২' এর পর থেকে ক্ষমতাশীল কংগ্রেস সরকার সমস্ত বিরোধী স্বরকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করেছিল। রাধাচূড়াকে একটি ছোটো টবের মধ্যে আটকে রাখার চেষ্টা, আইন করে গণতান্ত্রিক মানুষের কণ্ঠকে রোধ করা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতাকে হরণ করা এই দুটি বিষয়কেই কবি এই কবিতায় একসূত্রে বেঁধেছেন। একসময়ই রাধাচূড়ার প্রতিবাদে টবের অস্তিত্ব যেমন ফেটে যায়, তেমনি ছিঁড়ে যায় একসময় আইনের লাগাম। মালী যতই রাধাচূড়ার মাথা ছেঁটে গাছকে বাড়তে না দেওয়ার চেষ্টা করুক, মাটির নিচে শিকড়কে সে বিস্তৃত করে বহুদূর, মাটি ভেদ করে জন্ম নেয় আরও অনেক গাছ। একইভাবে কণ্ঠবিরোধী আইনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক মানুষও প্রতিবাদ জানায়। কবিতার মুহূর্ত প্রবন্ধে এই কবিতাটির প্রসঙ্গে কবি ইতিহাসের সত্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন—

"দিল্লির মসনদ কি জানে না যে প্রতিবাদীর এই সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলবে? অনিচ্ছুকের ওপর চাপ দিয়ে খুব বেশিদিন যে বাঁচে না ক্ষমতা, ইতিহাস কি তাকে শেখায়নি এটা?"[৬]

'রাধাচূড়া' কবিতটিকে তৎকালীন সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে কবি বন্ধু অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত দৃপ্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ করেন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কার রায়-আয়োজিত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কবি সাহিত্যিকদের সাক্ষাতের সময় যা ঘটেছিল ইতিহাসে তা বিরল। শিল্পীর স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন কবি অলোকরঞ্জন। আসলে 'রাধাচূড়া' একটি রূপক কবিতা। মালী কর্তৃক গাছের পরিচর্চার আড়ালে স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টাকে একেবারে নগ্ন করেছেন এই কবিতায়।

এরপর ক্ষমতায় জনগণের আশীর্বাদ নিয়ে আসে বামফ্রন্ট সরকার। কিন্তু ক্ষমতা এক স্বতন্ত্র স্বত্তা যাকে আশ্রয় করে তাকেই গ্রাস করে নেয়। এই সরকারও ক্রমে হয়ে উঠল স্বেচ্ছাচারী, তারাও ক্ষমতার দম্ভে মানুষকে তুচ্ছ ভাবতে লাগলো। সিঙ্গুর — নন্দীগ্রাম —

লালগড়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নগ্ন রূপ দেখে যখন বহু সুবিধাবাদী কবি সাহিত্যিকরা শাসকদলের স্তাবকতা করে চলেছেন সেই সময়ে কবি শঙ্খ ঘোষের বিবেক হয়ে উঠল প্রতিবাদী। তাঁর ‘সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি (২০০৭), ‘মাটি খোঁড়া পুরোনো করোটি’ (২০০৯), ‘গোটাদেশজোড়া জউঘর’ (২০১০), “হাসি খুশি মুখে সর্বনাশ’ (২০১১), ‘প্রতি প্রশ্নে কেঁপে উঠে ভিটে’ (২০১২), শুনি নিরব চিৎকার’ (২০১৫), ‘এ ও এক ব্যথা — উপশম’ (২০১৮) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ আকাশচুম্বী।

নন্দীগ্রাম গণহত্যার পরবর্তী সময়ে লিখিত ‘স-বিনয় নিবেদন’ কবিতায় তৎকালীন বাম সরকারের আগ্রাসী মনোভাবকে কবি ধিক্কার জানিয়ে তাঁর তীব্র প্রতিবাদী উচ্চারণ—

“আমি তো আমার শপথ রেখেছি
অক্ষরে অক্ষরে
যারা প্রতিবাদী তাদের জীবন
দিয়েছি নরক করে।
দাপিয়ে বেড়াবে আমাদের দল
অন্যে কবে না কথা
বজ্র কঠিন রাজ্যশাসনে সেটাই স্বভাবিকতা
গুলির জন্য সমস্ত রাত
সমস্ত দিন খোলা
বজ্র কঠিন রাজ্যে এটাই
শান্তি শৃঙ্খলা।”[৭]

গুজরাত গণহত্যার বীভৎসতার নিরিখেও কবির প্রতিবাদী মানসে যন্ত্রণাদগ্ধ উচ্চারণ—

“যেদিন নদীর জলে ভেসেছিল দু-হাজার শব
যেদিন পাড়ার সব দুয়োরে কুলুপ আঁটা ছিল
যেদিন শহরজোড়া গাছে গাছে ঝোলা কাটা হাত
অসাড় ইশারাভরে ডেকেছিল হৃৎপিণ্ডগুলি
যেদিন মাটির থেকে উঠেছিল শুধু কচি হাড়
বুভুক্ষু সমস্ত মুখ ভরে দিয়েছিল হুতাশনে
রাজপথে ছুটেছিল যেদিন উলঙ্গ নারীদল
এবং স্তনের শীর্ষে গাঁথা ছিল হাজার ত্রিশূল
যেদিন কবন্ধগুলি মদভাণ্ড রেখে ডানপাশে
নিজেরই মুণ্ডের চোখ খুঁজেছিল টেবিলের নীচে
যেদিন পৃথিবী তার সম্বিৎ হারিয়ে ছিল চুপ।”[৮]

এরপর বামফ্রন্ট সরকারের পতন হয়ে এল নতুন সরকার তৃণমূল কংগ্রেস। অতি দ্রুত ক্ষমতার সত্ত্বা তাদেরকেও গ্রাস করেছে। তাদের বিরুদ্ধে কবির শাণিত বিদ্রোহী ফুটে উঠেছে 'মাওবাদী' কবিতায়—

"প্রশ্ন করার সাহস করেছো?
মাওবাদী।
চোখে চোখ রেখে কথা বল যদি
ঘড়ি ঘড়ি সাজ মানবদরদী
আদরের ঠাঁই দেবে এ —গারদই
মাওবাদী।
সহজ চলার ছন্দটা আজ
একটু না- হয় দাও বাদই!"[৯]

এখানে কবি প্রশাসনের পুলিশের স্বৈরাচারী, দমন —পীড়ন মানসিকতাকে বিদ্ধ করেছেন এই কবিতায়।

আবার বিগত পঞ্চায়েত ভোটকে ঘিরে সারা রাজ্যে যখন সাধারণ মানুষের অধিকারকে হরণ করতে চেয়েছে বর্তমান শাসকদল। বর্তমান সরকারের বিশেষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন উন্নয়ন রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলে মনে করেন। তখন কবি প্রতিবাদে লেখেন —

"যথার্থ এই বীরভূমি —
উত্তাল ঢেউ পেরিয়ে এসে
পেয়েছি শেষ তিরভূমি।

দেখ্ খুলে তোর তিন নয়ন
রাস্তা জুড়ে খড়্গ হতে
দাঁড়িয়ে আছে উন্নয়ন।"[১০]

তবে শঙ্খ ঘোষ যে তাঁর কবিতায় শুধু রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ক্ষমততন্ত্রের বিরুদ্ধে সরব এমনটা নয় ক্ষমতার অনান্য দিককেও তিনি সমান ভাবে বিদ্ধ করেছেন। এই প্রতিবাদী চেতনার আন্তরিক প্রকাশ তাঁকে স্বতন্ত্রতা প্রদান করেছে। ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণ নয় বরং ক্ষমতাতন্ত্রবিরোধী স্বরায়নই যে একজন কবির প্রধান কর্তব্য তাঁর কবিতা আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

তথ্যসূত্র :

১। আচার্য, অনিল (সম্পাদক), অনুষ্টুপ, শঙ্খ ঘোষ বিশেষ সংখ্যা, অষ্টবিংশ : দ্বিতীয় সংখ্যা ১৯৯৪, পৃ. ২৪

২। ঘোষ, শঙ্খ, কবিতা সংগ্রহ - ১, দেজ পাবলিশিং : কলকতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, অগ্রহায়ন, ১৪১৬, পৃ. ৪৬
৩। তদেব, পৃ. ৩৫
৪। তদেব, পৃ. ২৩০
৫। তদেব, পৃ. ২৩১
৬। ঘোষ, শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের গদ্য সংগ্রহ (দ্বিতীয় খন্ড), দে'জ পাবলিশিং : কলকতা, মাঘ, ১৪০৮, পৃ. ৭০
৭। ঘোষ, শঙ্খ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দেজ পাবলিশিং : কলকতা, দে'জ দ্বাদশ সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪১৫ , পৃ. ১৮০
৮। তদেব, পৃ. ১৮২
৯। আচার্য, অনিল (সম্পাদক), অনুষ্টুপ, শঙ্খ ঘোষ বিশেষ সংখ্যা, শারদীয় সংখ্যা ১৪১৯ , পৃ. ২৪০
১০। রায়, দেবেশ (সম্পাদক), সেতুবন্ধন (মাসিক)

স ম্প্রি য়া চ্যা টা র্জী

কান্তিময় আলোর সন্ধানে উষালগ্নের অভিযাত্রী : শঙ্খ ঘোষের নির্বাচিত কবিতা

কবিতার জগতে শঙ্খ ঘোষ মহাভারতের যুদ্ধবর্ণনার প্রথমে সংঘটিত কম্বুধ্বনির মতোই সুমন্দ্রিত একটি নাম। তার আসল নাম চিত্তপ্রিয় ঘোষ। কাব্যজগতের আধুনিকতা এক বহুল চর্চিত বিষয়। প্রচলিত বিষয়ের মধ্যে থেকে তিনি অপ্রচলিত বিষয়ভাবনাকে তাঁর লেখনীতে স্থান দিয়েছেন। বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যজগতের কবিতাকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন তিনি। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের চাঁদপুর জেলায় তাঁর জন্ম। মানবসভ্যতার ইতিহাসে শাসন, শোষণ, অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন এ সবই আবহমানকাল ধরে চলে আসছে ধারাবাহিক পরম্পরায়। বর্তমান প্রেক্ষিতে তার লেখা কয়েকটি বিখ্যাত কবিতার নির্যাসে নির্মিত হবে এ যুগে কান্তিময় আলোর সন্ধান। অত্যাচারের বৈপরীত্যে প্রতীকী হয়ে থাকে ভালোবাসার আলোকমিনার। বাকঋদ্ধ জীবনদর্শনে সেই স্বরপংক্তিকে কবি সন্ধান করে ফিরেছেন আজীবন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সমালোচকের মন্তব্য—

"সমাজ বা সমষ্টি, যাই বলি তাকে, তার দিকে তো এগোতে চান এই কবি; যদিও ব্যক্তিকে বিলীন করে নয়। ব্যক্তির পরিচয় সঙ্গে করেই তিনি সমষ্টিকে মিলিয়ে নেন বারেবারে।"[১]

'ভূমধ্যসাগর', 'আরুণি উদ্দালক' এবং 'জাবাল সত্যকাম' কবিতাগুলি 'তুমি তো তেমন গৌরী নও' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। ১৯৬৭-৬৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই কবিতাগুলি রচিত। কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ। ভূমধ্যসাগর একটি দীর্ঘ কবিতা। অনুভব, ছন্দোময়তা, গতিময়তা, প্রাণময়তা—এ কবিতাকে গঠন করে অপরূপ অবয়বে। এক অধিকতর শীতের দিনে কবি দেখা পান তাঁর প্রেয়সীর। প্রিয়তমাকে তিনি পূর্বদেশের প্রহরারত অবস্থায় খুঁজে পান। তিনি স্বয়ং পশ্চিমাঞ্চল থেকে প্রেরিত। বিশ্বের দুই প্রান্ত থেকে আসার পর তাদের দেখা হল ভূমধ্যসাগরে। দীর্ঘ অদেখার পর দুই হাতের স্পর্শে হাতে হাত তুলে নিয়ে কবি তাঁর প্রিয়তমার প্রতি প্রেম জ্ঞাপন করেন। সেই প্রিয়তমা নেশালুতায় পূর্ণ উচ্ছল, কলঙ্কিত প্রেমিক কবিকে জিজ্ঞাসা করেন তার সমস্ত দেহলতা জুড়ে থাকা বিসর্পিল অত্যাচারের চিহ্ন সম্পর্কে। স্তব্ধ, নিশ্চুপ রাত্রিতে কবি যে প্রেমিকার অবয়ব মানসপটে রচনা করেছেন; সেই প্রেয়সী এমন শীতার্ত রাত্রির অধিবাসিনী—এ যে কল্পনাতীত কবির কাছে। বহুদিন পরে সম্মুখবর্তী হয়েছেন দু'জনে। কবি প্রেমিকার শ্যামলিমাময় মুখাবয়বে সমুদ্রের সান্তর, লবণাক্ত বাতাসের ঝাপটা অনুভব করেছেন। নিশ্চুপ তর্জনী দিয়ে তিনি ইঙ্গিত করেন দূর ভূমধ্যসাগরে জ্বলে ওঠা অগ্নিশিখার দিকে। সেখানে জেগে ওঠে এক তৃতীয় বিশ্ব।

কবির কথায় —

"পুব বা পশ্চিম নয়, দেখো ওই দক্ষিণ জগত
অসম্ভব তৃতীয় ভুবন এক জ্বলে ওঠে দূর বন্য অন্তরাল ভেঙে।"[২]

অন্তরের পরিশুদ্ধতায় অনির্বাণ, দীপময় জগতে মহাবিশ্বের বুক জুড়ে এক দিব্য প্রহরজোড়া ত্রিতাল ধ্বনিত হয়।

কবি বলেন— "তাঁর ভবিষ্যতের দৈশিক চেতনার কথা। মৃত্যু আর জীবনের সুদূরপরাহত অলাতচক্র কায়াকে প্রতি জন্মে নবায়মান করে নির্মাণ করে। সৃষ্টির প্রজ্ঞাবান অলিন্দে কবির সঙ্গে তার প্রিয়তমার দেখা হয় সুদূরব্যাপ্ত বিরহের পর। ধূপের ধোঁয়ার মতো আচ্ছন্ন দিন উড্ডীন হয় সমুদ্রতটে। মসৃণতার পথসীমা ধরে আবর্তিত হয়নি দুই প্রণয়ীর প্রেম। দিনানুদিনের পাশে দাঁড়ানোর মতো হৃদয়ের উৎসারী ভাব যেন কখনো বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে। চারটি চোখের সম্মেলনে তৃতীয় বিশ্বভূমি জেগে ওঠে। পৃথিবী থেকে ফেরার সময় সমাগত হওয়ার বিবরণ দিয়েছেন লেখক। দিন যখন অস্তমিত; সেই সময়ের মৃদুমন্দ আভাস কবিতার শেষে ধ্বনিত হয়েছে।"

'আরুণি উদ্দালক' কবিতার আখ্যানভাগ সংগৃহীত হয়েছে মহাভারতের আদি পর্ব থেকে। গুরু-শিষ্যের চিরায়ত সম্পর্কবীজের মূলে থাকা যে জ্ঞানতৃষার আবেগ এবং অপরিমেয় শ্রদ্ধা—তারই আধারে নির্মিত হয়েছে এ কবিতার কায়াপট। গুরু ধৌম্য স্মরণ করেছেন তাঁর শ্রদ্ধাবনত, চিরবিনত ছাত্রকে। আরুণি তার দেহ দিয়ে ক্ষেত্রের আলরক্ষকের কাজ করেছে। গুরুর আদেশ ঈশ্বরের আদেশবত ভেবে সে তার কায়মন দিয়ে ক্ষেত্ররক্ষকের কার্য সমাধা করেছে। আধুনিক জীবনের ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করার ক্ষেত্রে গুরু আরুণির মতো স্বার্থত্যাগী শিষ্যকে স্মরণ করেন। রাত্রিদিনের স্বাভাবিক চক্র আবর্তমান। জীবনের স্রোতে নির্মিত হয় গুরুর প্রতীক্ষা। সে প্রতীক্ষা অন্তবিহীন। সময়ের সুগভীর তরঙ্গে আবৃত হয়ে পড়ে সমষ্টির সুখবার্তা। গুরুবন্দনা আজ তাই শব্দমাত্র হয়ে বিরাজমান।

পূজা ও হোমশেষের শান্তিজল পঞ্চশীলে বিলীয়মান হয় না। সেখানে জীবনের জাগতিক রহস্যাবলী খেলা করে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলগ্নের পুণ্যাষ্টমীকে স্মরণ করেছেন কবি। নাতিদীর্ঘ স্তবকে যমুনার বক্ষদেশ থেকে উদ্ভাসিত হয়ে আছে যৌবনোচ্ছল মহিমান্বিত জীবন। দৈশিক জীবন আর বৈশ্বিক জীবন হয়ে যায় সেখানে একাকার। সময়ের সতর্কবাণী থাকা সত্ত্বেও ভেঙে পড়া ক্ষেতের আল সংস্কার করা হয়নি। আগমন ঘটেনি কোনো আরুণিসম শিষ্যের। বৃদ্ধ দেহের অশক্ত হাতে প্রতিষ্ঠা করা চলে না বাঁধের দেহ। অথচ সময় তার প্রতীক রেখে যায় প্রতিটি দেশকালের নিহিত বীজগর্ভে।

নদীজলে অম্বার পুত্রের প্রতি আহ্বান ধ্বনিত হয়। তৃষ্ণার্ত আরুণি আর সুমন একাকার হয়ে পড়ে। কল্লোলিতা, মায়াবিনী মহানগরীর উপকণ্ঠে নতুন ভাবে তৈরি হয় পরিব্যাপ্ত সময়ের আখ্যানমঞ্জরী। সময় বড়োই নিষ্করুণ। সেখানে রাত্রির অত্যাচার, প্রভাতের ত্রাণবিতরণ একসঙ্গেই সংঘটিত হয়। মস্তকের অবনমনে প্রকৃত সত্যকে আত্মস্থ করার লক্ষে দিগন্তপ্রসারী

অভিজ্ঞতা সুদৃঢ় হবে। সুস্থিত সেই ক্ষণমুহূর্তে মানবিকতা তার প্রকৃত পাঠ খুঁজে পাবে। আঙুল থেকে যখন ছিন্ন হয় স্নেহ-প্রেম-মায়া-মমতার বন্ধন; সেসময় জাগরূক হয় ভালোবাসা। ধ্বংসের প্রলয়ংকরতার মাঝে বেঁচে থাকে জীবনের সমর্পণ।

স্মরণ করা যায় কবিতার উল্লেখযোগ্য পংক্তি—

"যে বলেছে আজও এই প্লাবনে সংক্ষোভে মেঘে আমার সমস্ত জ্ঞান দিতে চাই
সে বড়ো প্রত্যক্ষ চোখে আপন শরীর নিয়ে বাঁধ দিতে গিয়েছিল জলে।"[৩]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সমালোচকের মন্তব্য—

"তবে শঙ্খ ঘোষের কবিতায় যে অপরিসীম বেদনাবোধ, বিষণ্ণতা আর অন্ধকার টের পাওয়া যায়, তা সর্বার্থে সমার্থক নয়।"[৪]

আলোচনার অন্তর্গত তৃতীয় কবিতাটি হল 'জাবাল সত্যকাম'। আচার্য গৌতম-এর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে এসে নিজ জাতিগোত্রহীন, পিতৃপরিচয়হীন লাঞ্ছনাময় সত্য সত্যকাম জ্ঞাপন করেছে গুরু গৌতম-এর কাছে। গুরু তাকে শিষ্যত্বে বরণ করে নিয়েছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে গৃহীত হয়েছে এই আখ্যান। দায়িত্ব গ্রহণ করে নির্জন রাখাল হয়েছেন কবি। দিবারাত্রি কবি আজানু ভঙ্গিমায় বসে থাকেন। দুই হাতের সযত্ন পরিচর্যায় প্রাণ পেয়ে সতেজ হয়ে ওঠে প্রেমজ প্রতীক। বায়ুবহুল স্বরে খেলা করে জীবিত অন্তরস্পন্দন। সত্যের মহিমা উদ্ভাসিত হয় হীরকখণ্ডের মতো। সত্যকাম গুরু গৌতম - এর দুর্বল ৪০০ টি ধেনু নিয়ে তার যাত্রাপথ প্রারম্ভ করেছিল। ১০০০ ধেনু পূর্ণ না হওয়া অবধি সত্যকাম গুরুর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে না বলে স্থির করেছে। পরিচিত বন্ধুবর্গের বৃত্তের বাইরে গিয়ে বনবাসী হয় সত্যকাম। সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে দুঃখকে পাথেয় করে দীক্ষাগ্রহণে আগ্রহী সত্যকাম। তুফানময় পদ্মার মুখ দিয়ে জীবনকে বাঁচিয়ে এসেছে সে। দুঃখস্মৃতির অন্তরালে তার গোত্রপরিচয় জানতে চায় শ্যামল বনান্তরাল। কালচক্রের পথ বেয়ে যে সত্যকাম দেশান্তরে ফেবে, তার কাছে গোত্রপরিচয় জানতে চাওয়ার আকুতি পৃথকভাবে রণিত হয়।

কবিতার অংশবিশেষ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য—

"দেশদেশান্তর কালকালান্তর কোথায় আমার ঘর
তুমি চাও গোত্রপরিচয়।"[৫]

শহরের হিন্দোলিত নাগরিক সভ্যতায় নারীদেহের বিবিধ বিপণন দেখে সত্যকামের স্বাভাবিক প্রশ্ন—তার প্রকৃত পরিচয় কোথায় নিহিত? গ্রামের সঙ্গে নগরজীবনের মানসিকতা, জীবনযাপন, ইতিবৃত্তের কথকতা—সবকিছুই এক করে তুলে ধরেছেন কবি। তাই সত্যকাম এই অচেনা, রঙিন নগরে নিজের পরিচয় খুঁজে বেড়ায় সতত।

বহু পুরুষের পরিচর্যা করার পরে জবালা জন্ম দিয়েছে সত্যকামের। পিতৃপরিচয় সম্পর্কে জানে না সত্যকাম। স্বাভাবিক অর্থেই এই সামাজিক নির্মমতম সত্য কীটের মতো দংশন করে সত্যকামকে। তার বিলাপে কম্পমান হয় শহর, নগর, গ্রামের প্রান্ত থেকে প্রান্তর। গুরু

গৌতম কথিত সমিধ অর্থাৎ যজ্ঞের কাঠ আহরণ করে এনেছেন সত্যকাম। নিজেকে কায়মনোবাক্যে তিনি সমর্পিত করতে প্রস্তুত গুরু গৌতমের কাছে।

কবিগুরু তাঁর 'ব্রাহ্মণ' কবিতায় বলেছিলেন—

"উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন,
বাহু মেলি, বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন, অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত।
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।"[৬]

বিজন প্রান্তরে ধেনুদের ভার নিয়ে আজও বর্তমান সত্যকাম। নাগরিক মানসিকতায় বিদ্ধ সাম্প্রতিককালের সত্যকাম নিজের প্রকৃত পরিচয় সন্ধান করে।

'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত একটি অন্যতর কবিতা হল 'পদ্মসম্ভব'। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি ১৯৮২ থেকে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত। এই কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ। কবি কবিতা জুড়ে এক অলোকসামান্য শক্তিকে স্মরণ করেছেন। সেই শক্তি আলোকিত মননশীলতার প্রতিভূ। পাহাড়ের শেষে অবস্থিত চূড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন সেই প্রতিভূ। প্রভাতী সূর্যের রক্তিম বন্দনাগীতিতে মুখরিত সেই পাহাড়ের শীর্ষপ্রান্তে অধিষ্ঠিত হয়েছেন সেই মহীয়ান মানব। সেই মানবের পদতলে পাহাড়ের নিম্নভাগে পদ্মসম্ভব-এর জাজ্বল্যমান বিগ্রহ। গুম্ফার ওপরে অধিষ্ঠিত আলোকপ্রতিভা। বর্ণচক্রের অবিরত ঘূর্ণনে মন্দ্রিত হয় পাহাড়ের চূড়া। ঘৃতপ্রদীপের মিষ্টি সুবাসে মুখরিত সমগ্র পরিবেশ। তিব্বতি মন্ত্র উচ্চারণের ধ্বনি মেঘমালার স্পন্দনে উত্থিত হয়।

কবি বলেন—

"ধ্বনির ভিতরে তুমি অবলীন মেঘ হয়ে আছো...।"[৭]

ধ্বনিমঞ্জরীর মধ্যে একীভূত হয়ে থাকে অবরুদ্ধ মেঘমণ্ডল। যতদূরে দেখা যায় ততখানি দূরত্ব জুড়ে দিকবলয় ব্যপ্ত করে প্রস্তরাকীর্ণ পাপড়ি ছড়িয়ে থাকে। দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে কুয়াশামণ্ডিত পর্বতচূড়ারা। সমগ্র পর্বতের পরিসীমা আকুল আগ্রহে কেন্দ্রীভূত করে জেগে থাকে ঐশ্বরিক শক্তি।

আর পৃথিবীর কক্ষ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়া শিলাউৎসমুখে বহুজনের আবেগমুখরিত মন্দ্র-বাণীর উদ্দীপনায় আবেগের জ্যোৎস্নাকীর্ণ উপত্যকায় ক্ষণিকের ঘূর্ণাবর্ত থেকে চোখ তুলে ধারণা হয় যে, এই বাণীমূর্তি স্বয়ং পদ্মসম্ভব-এর প্রতিরূপ। সেই শক্তির নৈরাশ্য, বৈরাগ্য কিছুই নেই। তাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে থাকে উদ্ভাসিত অসীম শূন্যতা। অরুণালোকিত মানবজীবনের নিহত পদচারণায় মহীয়ান এবং অটল সেই মূর্তি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় সমালোচকের মন্তব্য—

"মিতায়তনের সুবাদে, কবিতাগুলির প্রকাশ আশ্চর্য সংহত, প্রতিটি শব্দ যেন ঝাড়াই-বাছাই করে বসানো, যা নিজের বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে এক জটিল ও রহস্যময় প্রতীকবিশ্বের

জন্ম দেয়। কখনও তা পেলব ও লিরিকাল, আবার কখনও মন্ত্রোচারণের মতো তাদের স্বরের ওঠাপড়া।"[৮]

কবির লিখনভুবন সতত পৃথিবীব্যাপী। কবিতার তীক্ষ্ণ অর্থবোধক শব্দসমূহ মানবমনকে স্পন্দিত করে। বর্তমান ভুবনের প্রেক্ষিতে গঠনমূলক চিন্তাও মানুষের অর্জন। সেই চিন্তাবিশ্বকে প্রাণিত করে জাগতিক সমাজের ঘটনাবলী।

'ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত একটি কবিতা 'মহাপরিনির্বাণ'। কাব্যগ্রন্থটি রচিত হয়েছিল ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

কবিতাটির শিরোনামে লগ্ন হয়ে আছে এক অত্যাশ্চর্য বৈপরীত্যধর্মী আবেগমথিত চেতনা। ভালোলাগার চিরন্তন বোধ থেকে জন্ম নেয় অপ্রস্তুত মুহূর্তের কিছু খণ্ড কোলাজ। কিন্তু সেই ভালোলাগার বোধের মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে থাকে স্মৃতিমেদুর সুবাস। সাংগীতিক ধ্বনিতে দেহ জেগে ওঠে। দেহলতা থেকে সৃষ্টি হয় সংগীতের। বহুদিনের মিলনবোধ পরিণত হয় মহাপরিনির্বাণ-এ। ভাবনার অন্তর্জগত বহুধাব্যাপ্ত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কবিতার অংশবিশেষ—

"বহুদিন হলো সে—মিলন থেকে মহাপরিনির্বাণ।"[৯]

বাক্য শোনার আনন্দে সেই আনন্দবোধ পৌঁছায় না চরম পরিতৃপ্তির পথে। সফলতার দানবীয় পৈশাচিক ভাবনা গ্রাস করে নেয় আদ্যোপান্ত বিশ্বাস। বিশ্বাসে ঝলকিত হয়ে নিবিড়তাময় হয়ে থাকে মানুষের হৃদয়। সেই প্রকৃত মানবতাবোধে উদ্দীপিত হলে কামনা, বাসনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির মোহময় বন্ধনে নিজেকে বেঁধে রাখা অনুচিত। মানবজগতের সভা ত্যাগ করার মূর্ত বাণীকে অগ্রাহ্য করেছে মানুষ। গীতিময় রজনীকে সে বিস্মৃতির গভীরতায় নিমজ্জিত করেছে বহু পূর্বে। প্রতিবাদহীন অন্যায়কে সে নিশ্চুপ নির্জনতায় নিয়ত স্মরণ করেছে। জাতিস্মরের মতো ললাটে আজীবনের বহমান স্মৃতিভাণ্ডার নিয়ে জন্মাতে চেয়েছিলেন কবি। কিন্তু দু'চোখে এখন কেবল ঘনিয়ে আসা ক্ষণিকের বুদ্ধিদীপ্ততা। উৎসারিত আবেগের নির্ঝরকে কবি রূপ দিয়েছেন প্রয়াণের সুগভীর অথচ সুতীব্র ব্যঞ্জনায়।

কবির নিজের কথাই এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়—

"সত্যি বলা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই কবিতার।"[১০]

নৈঃশব্দ্য মানুষকে ভাবতে শেখায়। নতুন ধারণার জন্ম দেয় মানুষের মনে। বিশ্বব্যাপী নৈঃশব্দ্য এবং তীব্র মুখরতা একে অপরের পরিপূরক রূপে পরিচায়িত। পৌরাণিক কাহিনির আবরণে কবিতার কায়াপট বিনির্মিত। অন্যদিকে ঐতিহাসিক চরিত্র ও সত্যালাপের অনিন্দিত আলাপনে গ্রন্থন করেছেন লিখনশৈলীর কোমলগান্ধার।

সেই রাগিণী পাঠকের অনুভবে স্মরণ করিয়ে দেয় নির্জনতম কবি জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত কবিতার পংক্তি —

"এ যুগে কোথাও কোনো আলো-কোনো কান্তিময় আলো
চোখের সুমুখে নেই যাত্রিকের।"[১১]

এ সময়পর্ব বড়োই সংক্ষুব্ধ। মহাকালের লীলাচঞ্চলতায় এ ভুবনে স্থির নয় কিছুই। অশান্তি, দ্বেষ, হিংসা, আগ্রাসনের উন্মূলীকরণে তবু প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তির উচ্চারণ। জীবনানন্দ দাশ আশাবাদের কথা প্রতিধ্বনিত করেছেন কবিতার শেষে। শঙ্খ ঘোষ উষালগ্নের অভিযাত্রী হয়ে স্মরণ করেছেন শুভময়তাকে। জীবনানন্দের কবিতার সর্বশেষ অংশটি তাই পাঠককে আজও স্বপ্ন দেখায়—

"তবুও মানুষ অন্ধ দুর্দশার থেকে স্নিগ্ধ আঁধারের দিকে
অন্ধকার হ'তে তার নবীন নগরী গ্রাম উৎসবের পানে
যে অনবনমনে চলেছে আজো—তার হৃদয়ের
ভুলের পাপের উৎস অতিক্রম করে চেতনার
বলয়ের নিজ গুণে রয়ে গেছে ব'লে মনে হয়।"[১২]

এই আশাবাদী প্রাণোন্মুখতাই উষার রঞ্জিত আলোকে ভূষিত করে শঙ্খ ঘোষের কবিতাকে। সত্য সর্বদাই নিজ গুণে ভাস্বর। সেই শুভত্বকে বিনষ্ট করার অপচেষ্টা সফল হয়নি; আর হবে না কোনোদিন। হৃদয়ের দীপিত কণিকায়, মূর্ছনার স্মরণিকায় তাই জেগে থাকে সত্যকথনই কবিতার কাজ। সেই সত্যপথদ্রষ্টা কবিরূপে চিরন্তন হয়ে থাকুন কবি শঙ্খ ঘোষ। পল্লবিত—পুষ্পিত হয়ে সচেতন পাঠকের মনে জোয়ার সৃষ্টি করে চলুক তার অসামান্য অমর লেখনী।

তথ্যসূত্র :

১. দেব, সব্যসাচী। মাটি জল দ্যাবা পৃথিবী মানুষকে ছুঁয়ে থাকা কবির অভিজ্ঞতার সারাৎসার। গুরুচণ্ডা 9a(Journal)। ২০২১, পৃষ্ঠা ২৫।
২. ঘোষ, শঙ্খ। ভূমধ্যসাগর। শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৫৪।
৩. ঘোষ, শঙ্খ। আরুণি উদ্দালক। শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা।১৯৭০, পৃষ্ঠা ৫৯।
৪. ফজল, মো. আবুল। শঙ্খ ঘোষের কবিতা : নৈশব্দ্যের নন্দন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা - সাহিত্যপত্র, www/researchgate/net/Journal)। ২০২০, পৃষ্ঠা ১৯৭।
৫. ঘোষ, শঙ্খ। জাবাল সত্যকাম। শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৬০।
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ব্রাহ্মণ। রবীন্দ্ররচনাবলী (৪র্থ খণ্ড)। ১৩৯৪, পৃষ্ঠা ২৬।
৭. ঘোষ, শঙ্খ। পদ্মসম্ভব। শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ১৯৭০, পৃষ্ঠা ১৩৭।
৮. চট্টোপাধ্যায়, শৌভ। অন্তর্মুখী, রহস্যময় প্রতীকে ঘেরা, অস্তিত্বের গভীরে প্রসারিত শিকড়। গুরুচণ্ডা 9e (Journal)। ২০১১, পৃষ্ঠা ১৫৫।
৯. ঘোষ, শঙ্খ। মহাপরিনির্বাণ। শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ১৯৭০, পৃষ্ঠা ১৭৬।
১০. ঘোষ, শঙ্খ। ভূমিকা। শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৫।
১১. দাশ, জীবনানন্দ। ১৯৪৬-৪৭। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ১৯৫৪, পৃষ্ঠা ১৩৯।
১২. তদেব।

স্ব রূ প দে

'জীবনানন্দ : উত্তরাধিকার' : শঙ্খ ঘোষের অন্তর্লীন অনুভবে

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের একজন উল্লেখযোগ্য ভারতীয় সাহিত্যিক হলেন শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২ খ্রি. — ২০২১ খ্রি.)। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিভাবান সাহিত্যিক। প্রকৃত নাম চিত্তপ্রিয় ঘোষ। তবে শঙ্খ ঘোষ নামেই অধিক পরিচিত তিনি। বঙ্গবাসী কলেজ, জঙ্গীপুর কলেজ, ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফঅ্যাডভান্স স্টাডিজ (সিমলা), বিশ্বভারতী ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ শিক্ষকতার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চাতেও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি ছিলেন একজন কবি, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য- সমালোচক। এর পাশাপাশি তিনি একজন সাহিত্যিক বোদ্ধা, জীবননন্দ ও রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ। রাজনীতি ও সমাজের আঙিনায় তাঁর প্রতিবাদী সত্তা বারবার উচ্চকিত হয়েছে সৃষ্টির উন্মাদনায়। উল্লেখ্যভাবে, কেন্দ্রীয় সরকারের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন। লিখেছেন 'মাটি' নামক কবিতা। কবিতার কিয়ৎ উদ্ধৃতি নিম্নে তুলে ধরা হল:

"আমারই হাতের স্নেহে ফুটেছিল এই গন্ধরাজ
যে-কোন ঘাসের পরে আমারই পায়ের স্মৃতি ছিল
আমারই তো পাশে পাশে জেগে ছিল অজয়ের জল
আবারও সে নেমে গেছে আমারই চোখের ছোঁয়া নিয়ে।"[১]

এমনকি উন্নয়ন নিয়ে রাজ্যসরকারের মনোভাবের বিরুদ্ধেও এক হাত নিয়েছেন কবি, 'মুক্ত গণতন্ত্র' কবিতায় লিখেছেন :

"দেখ খুলে তোর তিন নয়ন
রাস্তা জুড়ে খড়্গ হাতে
দাঁড়িয়ে আছে উন্নয়ন।"

বাংলা সাহিত্যে তিনি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও জীবনানন্দ দাশের উত্তরসূরী ছিলেন। ছদ্মনাম হিসেবে তিনি 'কুন্তক' ও 'শুভময়' নামটিও ব্যবহার করতেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল- 'দিনগুলি রাতগুলি' (১৯৫৬খ্রি.), 'নিহিত পাতালছায়া' (১৯৬৭খ্রি.), 'মূর্খ বড় সামাজিক নয়' (১৯৭৪খ্রি.), 'বাবরের প্রার্থনা' (১৯৭৬ খ্রি.), 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' (১৯৮৪খ্রি.), 'লাইনেই ছিলা বাবা' (১৯৯৩খ্রি.), 'জলই পাষাণ হয়ে আছে' (২০০৪খ্রি.) ইত্যাদি। কবিসত্তার পাশাপাশি গদ্য রচনাতেও তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থগুলি হল—

'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক' (১৯৬৯ খ্রি.) 'ছন্দের বারান্দা' (১৯৭২ খ্রি.) 'শব্দ আর সত্য' (১৯৮২ খ্রি.) 'জার্নাল' (১৯৮৫ খ্রি.) 'ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম' (১৯৮৬ খ্রি.) 'কবিতার মুহূর্ত' (১৯৮৭ খ্রি.) সময়ের জলছবি' (১৯৯৮ খ্রি.)।

ছোট ও কিশোরদের জন্যও তিনি লেখালেখি করেছেন। যেমন- 'বিদ্যাসাগর (১৯৫৬ খ্রি.), 'সকালবেলার আলো' (১৯৭২ খ্রি.), 'সেরা ছড়া' (১৯৯৪ খ্রি.) 'কথা নিয়ে খেলা' (১৯৯৩ খ্রি.), 'ছোটদের গদ্য' (২০১৭ খ্রি.), 'আজকে আমার পরীক্ষা নেই' (২০১৮ খ্রি.) ইত্যাদি।

তাঁর দুটি অগ্রন্থিত রচনা সংকলন হল- 'মুখজোড়া লাবণ্য' (২০১৯ খ্রি.), 'অগ্রন্থিত শঙ্খ ঘোষ' (২০১৭ খ্রি.)। সাহিত্যে অবদানের জন্য পেয়েছেন একাধিক পুরষ্কার। নিম্নরূপে তা তুলে ধরা হল : নরসিংহ দাস পুরস্কার (১৯৭৭ খ্রি.) সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার (১৯৭৭ খ্রি.) রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৮৯ খ্রি.) দেশিকোত্তম পুরস্কার (১৯৯৯ খ্রি.) পদ্মভূষণ পুরস্কার (২০১১ খ্রি.) জ্ঞানপীঠ পুরস্কার (২০১৬ খ্রি.) ডি.লিট. (২০১০ খ্রি. ও ২০১৫ খ্রি.)

দুই

শঙ্খ ঘোষের গদ্যগ্রন্থগুলি সময়ের প্রতিচ্ছবি। তিনি একজন প্রকৃতই সাহিত্য-সমালোচক। সাহিত্যিক ও সাহিত্য বিশ্লেষণে তিনি সিদ্ধহস্ত। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে জীবনানন্দ, উইলিয়াম কিথো, মার্গারেট ম্যাথিউ থেকে শুরু করে অ্যালিম বার্কার তাঁর সমালোচনায় উঠে এসেছে। তাঁর গদ্যগ্রন্থের সংকলনের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন হল 'জার্নাল'। এই জার্নালের দুটি খণ্ড। যথাক্রমে এক. জার্নাল ১, দুই. জার্নাল ২, 'জার্নাল' এর দুটি খণ্ড দে'জ পাবলিশিং থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। সময়টা মে, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ। এর প্রচ্ছদ করেন পূর্ণেন্দু পত্রী, দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয় মে, ১৯১১ সালে। আর তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ২০০০ সালের মে মাসে। চতুর্থ তথা সর্বশেষ মুদ্রণ প্রকাশিত হয় অক্টোবর, ২০২০ সালে।

জীবনানন্দকে নিয়ে এই 'জার্নাল' গ্রন্থ সংকলনে মোট দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় খণ্ডে এই দুটি প্রবন্ধ উঠে এসেছে। যথাক্রমে প্রবন্ধ দুটি হল 'জীবনানন্দ: উত্তরাধিকার' ও 'জীবনানন্দ : গদ্যপ্রতিমা'।

তিন

'জীবনানন্দ : উত্তরাধিকার' প্রবন্ধটি শঙ্খ ঘোষের একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে শঙ্খ ঘোষ উত্তর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্যিক জীবনানন্দ দাশের সত্ত্বার মূল্যায়ন করেছেন। বিভিন্ন লেখক, কবি, সাহিত্যিকদের বক্তব্য ও মন্তব্য উদ্ধৃত করে প্রবন্ধটিকে সম্পূর্ণ করেছেন। আধুনিককালের সমালোচক বিনয় মজুমদার থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অলোক সরকার, শৈলেশ্বর ঘোষের জীবনানন্দীয় ভাবনার চিন্তাশিলতাকে ধরেছেন লেখক। ফলত জীবনানন্দের লেখক সত্ত্বার উত্তর আধুনিক স্রোতে চর্চিত হয়েছে এই প্রবন্ধে। প্রবন্ধে শঙ্খ ঘোষ বলেন:

"জ্ঞান আর প্রাণের সামঞ্জস্য করতে চান জীবনানন্দ। মানুষের ভাষা যে তার অনুভূতি দেশ থেকে আলো না পেলে 'নিছক ক্রিয়া, বিশেষণ এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল' ভাষাকে যে কঙ্কাল থেকে উদ্ধার করেন বলেই তিনি পরবর্তী কবিদের এত অমোঘ, এত প্রিয়।"[৩]

চার

জীবনানন্দ একজন পরাবাস্তব, অধিবাস্তব কবি। তাঁর কবিতায় বারে বারে বাস্তবের পোড়ো কথা উঠে এসেছে। প্রচলিত ধরাবাঁধা বিষয় থেকে বেরিয়ে এসে অন্যভাবে তিনি সাহিত্যিক জীবনাচরণ বাহিত করেছেন। ধূসর, গলিত, পচা দৃশ্যপট তাঁর সাহিত্যের ভিত্তিভূমি। শুধু তাই নয়, তিনি জীবন মানে শুধু বুদ্ধির অনুশীলন বোঝেননি, বরং জীবনকে সৌন্দর্যতত্ত্ব, বিচ্ছিন্নতাবাদ, এলিমিনেশেন, অনিশ্চিয়তা ও প্রাণের মানদণ্ডে বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন। তাই তাঁর কাছে কবিতা মানে 'সুড়ঙ্গললিত সম্পর্ক'। শঙ্খ ঘোষ বলেছেন:

"পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে দিয়েও নতুন এক জলের কল্পনা করতে চেয়েছিলেন এই কবি, সমস্ত দীপ ছেড়ে দিয়ে দেখেছিলেন এক নতুন দীপ। এইভাবে তিনি দেখেন জল নয়, তার জলত্ব। দীপ নয়, তার দীপতা। অর্থাৎ, বস্তু নয়, এক বস্তুসংগতি। এইখান থেকেই তাঁর কবিতার শুরু।"[৪]

জীবনানন্দ 'অমোঘ' কবিতায় বলেছেন:

"অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই।"[৫]

আসলে জীবনানন্দ সময়ের সাহিত্যিক, জীবনের সাহিত্যিক। অন্ধকার জগৎ থেকে আলো উদ্গীরণের সাহিত্যিক। যা কিছু বাস্তব সত্য তা-ই তার সাহিত্যের বিষয় ও ভাবনা। অন্ধকার আর আলোর খেলা তাঁর লেখায় চলে। কোনো কোনো সাহিত্যিক তাঁর লেখার ঘের খুঁজে পান না। খুঁজে পানা আসল সত্য, বাস্তবতাকে। তাই তাঁরা জীবনানন্দের লেখার মর্ম বুঝতে পারেন না। বুঝতে পারেন না তাঁর লেখার মমার্থ ও গুরুত্বকে। তাদের চোখে জীবনের অনেকটা অংশ জীবনানন্দকে অবহেলায় 'হেয়ো কবি' হিসেবে কাটাতে হয়। যে কবি লেখেন:

"আলো- অন্ধকার যাই মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে:
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়— ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়।"[৬]

বা কখনো অন্যভাবে বলেন:

"কোনদিন জাগিবে না আর
জানিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম—অবিরাম ভাব
সহিবে না আর"[৭]

এ কথার সত্যতা তা তো সার্বিক সত্য। এই জীবন ও মৃত্যু চেতনা তো সার্বিক জীবন

চেতনা। যা জীবনানন্দের লেখায় বারবার উঠে এসেছে। কখনো ‘মৃত্যুর আগে’, ‘শকুন’, ‘স্বপ্নের হাতে’ আবার কখনো বা ‘ধান কাটা হয়ে গেছে’, ‘বনলতা সেন’, ‘অন্ধকার’, ‘বিড়াল’, ‘রাত্রি’, কবিতা তো সকল মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র, মানিক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমকাল ও উত্তরকালে যতটা প্রশংসিত হয়েছেন জীবনানন্দ কি ততটা সম্মান ও যোগ্য প্রশংসা পেয়েছেন। উত্তরটা না। কেননা জীবনানন্দের সাহিত্যকে বোঝার মতো সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বোধ হয় অনেক পাঠকেরই ছিল না। কিন্তু অনেকেই তাঁর সাহিত্যিক বহেমিয়ানাকে বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হয়ে ভবিষ্যতের ইঙ্গিতকে। তেমনি একজন লেখক ছিলেন বিনয় মজুমদার। যিনি জীবনানন্দের কৃতিত্বকে সামনে রেখে লিখেছিলেন:

> “ধূসর জীবনানন্দ, তোমার প্রথম বিস্ফোরণে
> কতিপয় চিল শুধু বলেছিল, ‘এই জন্মদিন’।
> এবং গণনাতীত সারস্বত মেঘের স্বরূপ
> দর্শনে বিফল বলে, ভেবেছিল, অক্ষমের গান।
> ....
> একদিন সচেতন হরীতকী ফলের মতন
> ঝরে গেল অকস্মাৎ, রক্তাপ্লুত ট্রাম থেমে গেল।”[৮]

কবি জীবনানন্দকে নিয়ে কবি বিনয় মজুমদারের আক্ষেপই পরবর্তী প্রজন্মকে আশ্বাস জুগিয়েছে, আশ্বস্ত করেছে। যে অন্ধকারের কথা জীবনানন্দ বলেছেন, তা তো চিরসত্য, তা তো বেদনাগভীর। তাই জীবনানন্দের মুখে যখন উচ্চারিত হয়:

> “মেঠো চাঁদ রয়েছে তাকায়ে
> আমার মুখের দিকে ডাইনে আর বাঁয়ে
> পোড়ো জমি—খড়-নাড়া-মাঠের ফাটল,
> শিশিরের জল।”[৯]

কিংবা বলেন,

> “গভীর হাওয়ার রাত ছিলো কাল— অসংখ্য নক্ষত্রের রাত;
> সারারাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে;
> মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো,
> কখনো বিছানা ছিঁড়ে
> নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে।”[১০]

এ তো অন্ধকার হতে আলোরই দিশা, প্রকৃতই স্যুরিয়ালিস্ট ভাবনা। এই ভাবনা তো উত্তর আধুনিক কবিদের ভাবনা। জীবনানন্দের ভাবনার মধ্যেই তো তা সমাহিত।

—শঙ্খ ঘোষ বলেছেন আধুনিক পাঠকরা রবীন্দ্রনাথ নন, জীবনানন্দের ভাবনা ও

রচনার মধ্যেই তাঁদের অস্তিত্ব তথা জীবন খুঁজে পান। যা এতকাল নিভৃতে লুকিয়ে ছিল, তাকে বাহির করেছেন আধুনিক পাঠক সমাজ। তাই 'কবিতা' পত্রিকার শেষ পর্যায়ে জ্যোতির্ময় দত্ত বা নিরূপম চট্টোপাধ্যায়ের মতো তরুণের গলায় উঠে আসে জীবনানন্দের কথা, জীবনানন্দের কবিতা। তাঁরা বলেন:

"চিনেবাদামের মতো 'বিশুদ্ধ বাতাস' বা 'হাইড্রান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল' বা 'একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে': এ ধরণের ছোট এক একটি উচ্চারণ কীভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনেক দীর্ঘ বর্ণনার তুলনায় অনেক সহজে তুলে আনে শহরের আত্মা, এঁরা তা দেখালেন সেদিন।"[১১]

পাঁচ

শুধু জ্যোতির্ময় কিংবা নিরূপম নয়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অলোক সরকার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সকলেই রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দকে এগিয়ে রাখেন তাঁর ভাষা ও বিষয়ের কলেবরের জন্য। আসলে সাহিত্যের সৌন্দর্যতত্ত্ব বলতে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ সকলেই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃষ্টিকোণ থেকে ভেবেছিলেন। কিন্তু সাহিত্যের সৌন্দর্যতত্ত্বের মূল বিচার্য বিষয়ই হল 'এলিমিনেশন'। 'এলিমিনেশন' ছাড়া সাহিত্যের রহস্যময়তা বাড়ে না। এর দ্বারাই পাঠক মনযোগী হয়। আর সেই এলিমিনেশনের কথাই বারবার উঠে এসেছে জীবনানন্দের ভাষায়। কবিতায় পাই:

"আমরা যাইনি ম'রে আজো তবু কেবলই দৃশ্যের জন্ম হয়:
মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে:
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনাসোর 'পরে।"[১২]

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত তাই জীবনানন্দের সম্পর্কে বলেন: "বক্তব্যকে ঘোষণার মতো করে বলবার প্রয়োজন নেই, আমাদের কেবল কয়েকটি ছবির মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে, এবং যেমন কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের সামনে আলোকিত উন্মোচন ঘটায়, ঠিক সেইরকমই কবিতাটি তার সকল সত্য নিয়ে আমাদের সামনে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভাসিত হয়েছে।"[১৩]

একথা জীবনানন্দ সম্পর্কে সর্বাংশে খাটে। সাহিত্য হল ভাবী অনিশ্চিত তুলে ধরা। এই 'মহতী অনিশ্চিত' ভাবনায় জীবনানন্দকে আধুনিককালে প্রতিষ্ঠিত করেছে, অন্য কবিদের থেকে।

অন্যান্য অনেক তরুণের মতোই বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দের ভাবনাকে বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর অন্তঃসারসত্তাকে। তাই যখন 'শনিবারের চিঠি' র মতো পত্রিকায় জীবনানন্দের কবিতা, সাহিত্যে উপেক্ষা করা হয়েছিল তখন বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কবিতা' পত্রিকায় জীবনানন্দের ভাবনার বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিপথকে পাঠকের সামনে পৌঁছে দিয়ে কৃতজ্ঞতাবোধ করেছিলেন। জীবনানন্দের কবিতায় তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন, 'স্বপ্নের হাতে আত্মসমর্পণের আকুতি' কিংবা জীবনানন্দকে তাঁর 'নস্টালজিয়ার কবি' বা 'প্রকৃতির

কবি' মনে হয়েছিল। কিন্তু শঙ্খ ঘোষ বলেছেন, জীবনানন্দ কেবল প্রকৃতি, নস্টালজিয়া কিংবা আত্মসমর্পণের কবি নন, তিনি ছিলেন, 'পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে দিয়ে নতুন এক জলের কল্পনা।' তা 'জীবনকে এড়িয়ে নয় এ নয় কেবল অধোজাগতিক চেতনার পথ।'[১৪]

মূলত কবি বুদ্ধদেব বসুও জীবনানন্দকে বা জীবনানন্দের সাহিত্যকে যতটা চিনেছিলেন তা সম্যক চেনা নয় বলে জানিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ। জীবনানন্দের কবিতা মানেই এক 'সুড়ঙ্গলালিত সম্পর্ক'। এর অনুভব অনেকের মধ্যেই আসে না।

ছয়

জীবনানন্দ সাহিত্যকে দেখেছিলেন একটু অন্যরকমভাবে। তাঁর কাছে সাহিত্য মানে বস্তু পৃথিবী থেকে একটু সরে যাওয়া। তবে সেই সরে যাওয়া বস্তু পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নয়। জীবনকে এড়িয়ে গিয়ে নয়, বরং অধোজাগতিক চেনতার পথ ধরেই ক্লান্তির মুক্তি ঘোষণা করেন তিনি। শঙ্খ ঘোষ বলেছেন:

"নিজেকে তাই অল্প একটু সরিয়ে নিয়ে যেন বহু দেশ আর বহু কালের সুড়ঙ্গ পথে ধরতে চান তিনি আমাদের সমসাময়িক পৃথিবী, কেননা ঠিক ওই দূরত্বের মধ্যেই আমাদের বহিরাশ্রয়িতা মানবস্বভাব স্পর্শে আরো ঋত- অন্তর্দীপ্ত হয়।"[১৫]

জীবনানন্দ কবিতায় বলেন :

"তোমায় আমি দেখেছিলাম ঢের
সাদা কালো রঙের সাগরের
কিনারে এক দেশে
রাতের শেষে দিনের বেলার শেষে।"[১৬]

আসলে সাহিত্য বা কবিতার আবেদন সর্বদা বুদ্ধি বা জ্ঞানের কাছে হয় না। তা হয় শরীরের কাছে, জীবনের কাছে, জীবনের বাস্তবতার কাছে, প্রাণের কাছে। যে কথা বারবারই জীবনানন্দ তার কবিতায় বলার চেষ্টা করেছেন। যখন তিনি অন্যত্র আকার বলেন,

"আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!"[১৭]

তখন মানবের কাছে হৃদয়, বুদ্ধি, জ্ঞান থাকে না, থাকে বেঁচে থাকার আবেগ, বেঁচে থাকার বাস্তবতা। তাই তো তরুণ সাহিত্যিক শৈলেশ্বর ঘোষও জীবনানন্দের প্রতিভায় মুগ্ধ হন। উত্তর আধুনিক জীবনানন্দীয় বলয় তৈরী করেন। শঙ্খ ঘোষের ভাষায় :

"জ্ঞান আর প্রাণের এই সামঞ্জস্য করতে চান জীবনানন্দ। মানুষর ভাষা যে তার অনুভূতি দেশ থেকে আলো না পেলে 'নিছক ক্রিয়া, বিশেষণ, এলেমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল' ভাষাকে সেই কঙ্কাল থেকে উদ্ধার করেন বলেই তিনি তাঁর পরবর্তী কবিদের কাছে এত অমোঘ, এত প্রিয়।"[১৮]

প্রাবন্ধিক শঙ্খ ঘোষ এত্ত বলেছেন যে, কবি জীবনানন্দ যে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে

'বেলা অবেলা কালবেলা'তে পৌঁছেছেন, তার মুখ্য কারণ তিনি আশাবাদী কবি, প্রাণের কবি, জীবনের কবি।

সাত

কবি জীবনানন্দ মানুষকে, প্রকৃতিকে, প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও ভারসাম্যকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। যা কিছু বলবার আপাত বিষয় নয়, তাকেও তিনি বলার বিষয় করেছেন। আপাত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও তাঁর চোখ এড়িয়ে যায় নি। ক্ষুদ্র বিষয় তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে জানার বিষয়, অনুভবের বিষয়। যা সত্য, যা বাস্তব তা হয়তো জটিল, তা হয়তো কঠিন, কিন্তু সেই নির্মম সত্যের কথা ব্যক্ত করাও কবিতা তথা সাহিত্য। শুধু কল্পনা নয়, মাটির ভেতরে থাকা পচা দেহও জীবনানন্দের কাছে অধিক সত্য। আর তাই তিনি আধুনিক উত্তরকালে সাহিত্যিক, পাঠকের কাছে অন্যতম অনুভূতির সংস্থান, জীবনের চেয়েও বাস্তব সত্য। শঙ্খ ঘোষের 'জীবনানন্দ: উত্তরাধিকার' সেই আধুনিক সত্তার মজ্জাতে জীবনানন্দীয় ভাবনার উত্তরসুরীও বহন করে। শুধু কবিতা নয়, জীবনানন্দের গদ্য সাহিত্যও যেমন- 'গ্রাম ও শহরের গল্প', 'সুতীর্থ', 'ছায়ানট', 'মাল্যবান', 'বিলাস' সেই একই ভাবনার সারৎসার। তাই পৃথিবীতে যতদিন মানুষ থাকবে, পৃথিবীর সৃষ্টি থাকবে, থাকবে তার চরম বাস্তবতা ততদিন শঙ্খ ঘোষের মতো সমালোচকের লেখনীতে উঠে আসবে জীবনানন্দীয় অনুভূতি। আর সেই অনুভূতির সুরেই জীবনানন্দের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মানুষ বলে উঠবে :

> "মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব
> থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
> প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।"[১১]

তথ্যসূত্র :

১। দাশ, জীবনানন্দ: মাটি, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, বাংলা কবিতা (www.bangla-kobita.com)

২। দাশ, জীবনানন্দ: মুক্ত গণতন্ত্র (bengaliforum.com)

৩। ঘোষ, শঙ্খ: জীবনানন্দ: উত্তরাধিকার, শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, অক্টোবর, ২০২০, পৃ. ৩৯৩

৪। তদেব, পৃ. ৩৯২

৫। তদেব, পৃ. ৩৯৫

৬। দাশ, জীবনানন্দ: বোধ, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, আগস্ট ২০১৬, পৃ. ১৭

৭। দাশ, জীবনানন্দ: আট বছর আগের একদিন, পৃ. ৬৫

৮। তদেব, পৃ. ৩৮৯

৯। দাশ, জীবনানন্দ: মাঠের গল্প, তদেব, পৃ. ৩০

১০। দাশ, জীবনানন্দ: হাওয়ার রাত, তদেব পৃ. ৫৯

১১। তদেব, পৃ. ৩৯১
১২। দাশ, জীবনানন্দ: ঘোড়া, তদেব, পৃ. ৭৪
১৩। তদেব, পৃ. ৩৯১
১৪। তদেব, পৃ. ৩৯২
১৫। তদেব, পৃ. ৩৯২
১৬। দাশ, জীবনানন্দ: তোমায় আমি দেখেছিলাম, তদেব, পৃ. ১২৬
১৭। দাশ, জীবনানন্দ: হায় চিল, তদেব, পৃ. ৫৬
১৮। তদেব, পৃ. ৩৯৩
১৯। দাশ, জীবনানন্দ: মানুষের মৃত্যু হ'লে, তদেব, পৃ. ১১৫

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১। ঘোষ, শঙ্খ: শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ, দে'জ পাবলিশিং, অক্টোবর ২০২০, কলকাতা।
২। দাশ, জীবনানন্দ: জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, আগস্ট ২০১৬, কলকাতা।
৩। ত্রিপাঠী, দীপ্তি: আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ২০০৩, কলকাতা।
৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ: বাংলা কবিতা কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০০৮, কলকাতা।
৫। সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০১০, কলকাতা।
৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি, পুনর্মুদ্রণ ২০১০—২০১১, কলকাতা।

আ বে শ ম ণ্ড ল

শঙ্খ ঘোষের কবিতা : পুরাণের নবরূপায়ণ

"Myth is essentially a cultural construct-a common understanding of the world that binds individuals and communities together."
(Devdutta Pattanaik. Myth)

মানুষের আদিম চিন্তা চেতনার খন্ডিত চিত্ররূপই হল পুরাণ। যা দীর্ঘকাল ধরে মানুষের জীবনকে একই সুতোয় গেঁথে রেখেছে। আমাদের উৎসকে জানতে বা ঐতিহ্যকে বুঝতে পুরাণের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আর তাই আজও মানুষের চেতনায় থেকে গেছে 'মিথ' কে জানার আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষাকে সঙ্গী করেই সৃজনশীল কবি শিল্পী সাহিত্যিকেরা প্রাচীনত্বকে অমরতা দানের জন্য পুরাণ বা মিথকেই শিল্প সাহিত্যের বিষয় হিসাবে বেছে নেন। কেবল রবীন্দ্র সমসাময়িক লেখনীতেই নয় রবীন্দ্র- উত্তর সাহিত্য ধারাও প্রাচীন সম্পদে ঋদ্ধ। এ প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য পাঁচের দশকের কবি শঙ্খ ঘোষও ব্যতিক্রম নন। পুরাণের বিস্তৃত ক্ষেত্র তাঁর কবিতার অন্তর্লীন উপাদান। মিথ-পুরাণের নানা কাহিনিকে একই সূত্রে গেঁথে সমকালীন সময়ের দৈন্যতাকে ভাষ্যরূপ দিয়েছেন তিনি। আপন ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে কবি ফিরে যেতে চেয়েছেন আদিম উৎসের কাছে। প্রাবন্ধিক শিশিরকুমার দাসের কথায়:

"প্রত্যেককালকেই আবিষ্কার করতে হয় তার নিজের ঐতিহ্য, নিজের পরিচয়। নির্ণয় করতে হয় কতটুকু তার জীবিত, কতটুকু মৃত।" (শিশিরকুমার দাশ, ভারতসাহিত্যকথা)

কবি শঙ্খ ঘোষের জন্ম হয় বাংলাদেশের চাঁদপুর গ্রামে ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ সালে। তাঁর বাবা মনীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং মা অমলা ঘোষ। বংশপরম্পরায় কবি পৈত্রিক বাড়ি বাংলাদেশের বরিশাল জেলার বানারি পাড়া গ্রামে। কিন্তু তার বেড়ে ওঠা পাবনাতে। দেশভাগের পর কলকাতায় চলে আসেন এবং সেখানেই বাকি জীবন কাটান। ১৯৫১ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি মূলত যাদবপুর এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। সারাজীবনে তিনি একাধিক কাব্য, গদ্য, প্রবন্ধ এবং অনুদিত গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল। 'দিনগুলি রাতগুলি' (১৯৫৬), 'নিহত পাতাল ছায়া' (১৯৬৭), 'আদিম লতাগুল্মময়' (১৯৭২), 'মূর্খ বড় সামাজিক নয়' (১৯৭৪), 'বাবরের প্রার্থনা' (১৯৭৬), 'তুমি তো তেমন গৌরী নও' (১৯৭৮) 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' (১৯৮৪) ইত্যাদি।

কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর অনেক কবিতাতেই পুরাণকে আশ্রয় করে বর্তমান সময়ের জীবনপ্রবাহকে বর্ণনা করেছেন। এই ঐতিহ্য প্রীতি থেকেই দেশকালের সংকটকালীন অবস্থায় কবি আশ্রয় নিয়েছেন মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ সওদাগর ও তার হেতালের

লাঠির কাছে। ১৯৩০ বঙ্গাব্দে শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় কবি শঙ্খ ঘোষের 'হেতালের লাঠি' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে এটি 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে (১৯৮৪) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। কবি শঙ্খ ঘোষ, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অবক্ষয়িত সময়ের প্রহরী রূপে চাঁদ বণিককে উপস্থাপন করেছেন। সমগ্র কবিতায় 'হেতালের লাঠি'-কে কবি অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন। মনসামঙ্গল কাব্যে সর্পদংশনের কারণে বাসররাতে পুত্র লখিন্দরের মৃত্যু হয়। 'হেতালের লাঠি' কবিতায় শঙ্খ ঘোষ আজকের বেহুলা লক্ষিন্দরের সমস্ত অশুভ শক্তির হাত থেকে বাঁচাতে সারা রাত্রি হেতালের লাঠি হাতে লোহার সিঁড়িতে বসে পাহারা দেওয়ার কথা ভাবেন। তাই কবি লিখেছিলেন:

> "হেতালের লাঠি নিয়ে বসে আছি লোহার সিঁড়িতে
> কালরাত্রি কেটে যাবে ভাবি, ওরা বাসর জাগুক
> এমন রাত্রিতে কোনো ফণা এসে যেন না ওদের
> শিয়রে কুন্ডল করে, কেটে যাক প্রেমের প্রহর।"

(হেতালের লাঠি: মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে)

কিন্তু কোনো এক মায়াঘুমের আবেশে মুঠি থেকে খসে পড়ে হেতালের লাঠি। আসলে কবি বেহুলা লখিন্দরকে তৎকালীন সময়ের 'দিনানুদিনের আলপথে হেঁটে' যাওয়া এক আদর্শ নরনারী রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনি প্রার্থনা করেছেন "আর যতদূর যায় ধানে ভরে যায় তত দূর।" কবি চান এই আদর্শবাদী চরিত্রেরা গড়ে তুলবে এক নতুন স্বপ্নময় দেশ, প্রতিষ্ঠিত করবে গণতান্ত্রিক চেতনার অধিকার। আর তাই কবি দেশের মানুষকে নিজের স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখতে বলেছেন:

> "যেন না ওদের গায়ে কোনো নাগিনীর শ্বাস লাগে
> যেন কোনো ঘুম, কোনো কালঘুম মায়াঘুম এসে
> শিয়র না ছুঁতে পারে আজ এই নিশীথনগরে
> হেতালের লাঠি যেন এ-কালপ্রহরে মনে রাখে
> চম্পকনগরে আজ কানীর চক্রান্ত চারদিকে"

(হেতালের লাঠি: মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে)

বিশ শতকের এই উত্তাল পরিস্থিতিতে হেতালের লাঠিকে কেন্দ্র করে কবি মনসামঙ্গলের এক নবরূপায়ন ঘটিয়েছেন। মঙ্গলকাব্যে চাঁদ বণিকের হেতালের লাঠি মনসাকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলেও বিশ শতকের কবি শঙ্খ ঘোষ এই অস্ত্রকে অবশ্যই ব্যবহারের কথা বলেছেন। তাই সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাঁর 'বাংলা কবিতার কালান্তর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

'চারের দশকে কোনো কোনো কবি লোকপুরাণ, জাতীয় মিথ ইত্যাদিকে কবিতায় ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। আমার বলতে দ্বিধা নেই সে কবিতায় যে ব্যঞ্জনা আভাসিত

হতে গিয়েও পারেনি, 'হেতালের লাঠি' সে সীমাবদ্ধতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই কালরাত্রির উপরই তখন একটি কবিতা শারদীয় সংখ্যা 'পরিচয়'-এ বেরিয়েছিল।... শঙ্খ 'হেতালের লাঠি'তে চাঁদবেনেকে নায়ক করে শুধু যে পটভূমির ব্যাপকতা এনেছেন তাই নয়—সমস্ত সংকটকে এক বিপুলতর ব্যাপ্তি দিয়েছেন। অধিকার নিয়েই বলছি—নিশীথনগরে কানীর চক্রান্ত নিয়ে লেখা এ কবিতা অনেক লক্ষ্যভেদী কবিতা—উৎকৃষ্টতর কবিতা।' ('বাংলা কবিতার কালান্তর')

এই প্রসঙ্গ সূত্রেই আমাদের মনে পড়ে যেতে পারে কবির 'তুমি তো তেমন গৌরী নও' কাব্যগ্রন্থের 'আরুণি উদ্দালক'। এই কবিতাটিতে কবি আমাদের দৈনন্দিন বাস্তবতাকে মহাভারতের আলেখ্যে নিদারুণ কল্পনায় ও শব্দের বুননের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ১৯৬৮ সালে কবি বিদেশ থেকে ফিরে পুজোর ছুটিতে একবার গিয়েছিলেন জলপাইগুড়ি। লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন সেখানে পৌঁছে দেখলেন দিনভর বৃষ্টি আর হাওয়ার দাপটে তিস্তার বাঁধ ভেঙ্গে চারিদিকে শুধু জল। এ প্রসঙ্গে কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'কবিতার মুহূর্ত' গ্রন্থে লিখলেন:

"চারিদিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে নদীর ওপারে ভাসছি আমরা ভেলায়, কিন্তু দূরে ওই কী-একটা ভেসে যাচ্ছে না জলে? কোনো কাঠের টুকরো? কোনো মৃত পশু? মানুষই নয় তো? কারো মাথা? ঝাঁপিয়ে পড়লেন একজন, সাঁতরে গিয়ে ধরে আনলেন ভাসমান সে মাথা ওপরেই বন্দি আছি সারাদিন, সারাদিন ধরে ভাবি কোথায় আমাদের ভুল। ভাবি, এখানে তো দোতলা আছে। যাদের তা নেই? আর এ শহরে সবই তো প্রায় তেমন। কীভাবে আছে তারা? কোথায়? সন্ধ্যায় সবাই ট্রানজিস্টর কানে ধরে থাকে উৎকণ্ঠায়, সাহায্যের কোনো খবর এসে পৌঁছবে হয়তো ভেঙ্গে গেছে করলা-র ব্রিজ। এখানে-ওখানে দেখতে পাই মৃত শরীর, পশুর, মানুষেরও কখনো-বা, এক হয়ে আছে সব। কার দোষ? কার? শুনতে পাই বসতি থেকে এক লহমায় মিলিয়ে গেছে হাজার হাজার লোক।"(কবিতার মুহূর্ত : শঙ্খ ঘোষ)

সাহায্যের অপেক্ষা করতে করতে তারাও বোঝে আরুণি কিংবা উদ্দালকের মতো মানুষেরা হারিয়ে গেছে আজকের দেশকাল সমাজ থেকে। এই প্রলয়তাড়িত সংক্ষোভের মারাত্মক অভিজ্ঞতা নিয়ে শঙ্খ ঘোষ শহরে এসে স্তম্ভিত হয়ে যায় উৎসবের আলোর রোশনাই দেখে। দেশের দুই প্রান্তের মানুষের জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়ে যায় শঙ্খ ঘোষের লেখা 'জার্নাল' গ্রন্থের 'কালোসময়' গদ্যাংশটি যেখানে তিনি বন্যা কবলিত কলকাতা বা পরিপার্শ্বিক এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রসঙ্গে বলেছেন:

"কলকাতার অনেক মানুষ ঠিক ধরতে পারে না দুঃখের মাপটা। দেশের যেকোনো প্রান্তে দুর্গতির কথা জানলেই ত্রাণের মিছিল অবশ্য বেরোয়, কিন্তু সেখানে দুর্গতি নাশের দৃঢ়তার চেয়ে ত্রাণোৎসবের উৎসাহই হয় বড়ো।" (জার্নাল :শঙ্খ ঘোষ)

সেই অসহায় অবস্থায় কবির মনে পড়ে আরুণির কথা। যে আরুণি জলপ্রবাহ রোধ

করতে না পেরে একদা নিজেই আল হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন ক্ষেতের উপর। এই উদাহরণ, আজ আমাদের চলমান জীবন থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। তাই সকল দুর্ভাগ্যও সংকটের মধ্যে বসে কবি নিজেকেই আহবান করেছেন গভীর সুরে:

"আমি বলে উঠি এসো এসো উঠে এসো উদ্দালক হও
স্পষ্ট হও, বাঁচো-
শুধু মূর্খ অভিমানে বসে থেকে জলস্রোতে কখন যে আরুণি সুমন
তৃষ্ণা দেবতার মূলে একাকার হয়ে যায় তা আমার বোধেও ছিল না।"

(আরুণি উদ্দালক: 'তুমি তো তেমন গৌরী নও)

মহাভারতের পৌরাণিক প্রতীকে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার আরও এক দৃষ্টান্ত 'প্রহরজোড়া ত্রিতাল' কাব্যগ্রন্থের কবিতা 'জতুগৃহ'(১৯৭৭-৮১)। মহাভারতের জতুগৃহ বলতে বোঝায় সেই গৃহ যেখানে পঞ্চপান্ডবদের জলজ্যান্ত পুড়িয়ে মারার জন্য দুর্যোধন নানারকম দাহ্য বস্তু দিয়ে তৈরি করেছিলেন একটা বাড়ি। কবি শঙ্খ ঘোষ ভারতবর্ষের সংকটকালীন পরিস্থিতির সাথে তুলনা করেছেন সেই জতুগৃহের। আমাদের চারপাশ জুড়ে তখন সব যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে উঠছিল এবং মূঢ় বারনাবতের উৎসবে মেতে ছিল আমাদের অবক্ষয়ী নাগরিক সমাজ। এই সংকটময় সময়ে পথ নির্দেশক হিসাবে দেখা মেলে না কোনো বিদুরের। কবি বলেছেন:

"ঘৃণা-বিচ্ছেদে দলে-উপদলে
স্ফুলিঙ্গপাতে সহজে দাহ্য—
বিদুরেরা শুধু নেই কোথাও।" (জতুগৃহ: প্রহরজোড়া ত্রিতাল)

তাই মহাভারতের জতুগৃহ থেকে পাণ্ডবরা মুক্তি পেলেও বর্তমানকালে যে দাবানল তাতে গোটা দেশকে পুড়তে হবেই। তাই কবি শঙ্খ ঘোষ বলেছেন:

"তবু বোধহীন বিশ্বাসে ঘেরা
দুর্যোগে খুঁজে ঘুমের সুযোগ
চতুর্দশী র প্রতীক্ষা নিয়ে
প্রস্তুত সব জতুগৃহ" (জতুগৃহ: প্রহরজোড়া ত্রিতাল)

এই বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যপূর্ণ সময়ের থেকে কবি নিজেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন তাঁর 'দিনগুলি রাতগুলি' কাব্যের 'যমুনাবতী' কবিতাগুচ্ছে 'কবর' নামক কবিতায়। এই কবিতায় তিনি দৈনন্দিন যাপনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। আজীবন তিনি যে অদৃশ্য রেখার মধ্য দিয়ে নিজেকে বন্দী করেছেন বা সুরক্ষিত রেখেছেন যার ফলে তাঁর বিবেকী চেতনা জাগ্রত হয়েছে এবং কবির মনে হয়েছে তিনি কখনো পৃথিবীর কোন কাজে আসেননি তাই এই উপেক্ষিত জীবন যাপন থেকে মুক্তি চেয়ে পৃথিবীর কাছে একটুখানি কবরস্থানের আকুতি জানিয়েছেন, তিনি বলেছিলেন :

"আর কিছু নয়, তোমার সূর্য আলো তোমার তোমারই থাক
আমায় শুধু একটু কবর দিয়ো
চাই না আমি সবুজ ঘাসের ভরা নিবিড় ঢাকনাটুকু
মরাঘাসেই মিলুক উত্তরীয়।" (কবর : বাবরের প্রার্থনা)

উপেক্ষায় ভরা এই লজ্জিত জীবনকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চান। কবির ইচ্ছে তাঁর শরীর মাটির মধ্যে ঘুমিয়ে যাওয়ার পর তা থেকে যেন শস্য ফলে উঠে। কবির কথায় :

"আমার জন্য একটুখানি কবর খোঁড়ো সর্বসহা
লজ্জা লুকোই কাঁচা মাটির তলে—
গোপন রক্ত যা—কিছুটুকু আছে আমার শরীরে, তার
সবটুকুতেই শস্য যেন ফলে।" (কবর : বাবরের প্রার্থনা)

কবি শঙ্খ ঘোষ চেয়েছিলেন মাটির কোমলতায় মিশে গিয়ে নতুন প্রাণের সঞ্চারের মধ্য দিয়ে জাগতিক জীবনের সকল ব্যর্থতা ও লজ্জাকে সফলতা দিতে চান। তাই পৃথিবীর কাছে কবির প্রার্থনা :

"আমার হাড়ে পাহাড় করো জমা—
মানুষ হবার জন্য যখন যজ্ঞ হবে, আমার হাড়ে
অস্ত্র গোড়ো আমায় কোরো ক্ষমা।" (কবর : বাবরের প্রার্থনা)

'কবর' কবিতা প্রসঙ্গে কবি রণজিৎ দাশ জানিয়েছেন :

"এই কবি নিজেই এক লৌকিক নচিকেতা এবং দধীচি। নব্য-ধ্রুপদী কাব্যপ্রকরণের এই লৌকিক-আধুনিক রূপান্তরটি তরুণ শঙ্খ-র কবিতার এক প্রথম বৈশিষ্ট্য এবং এই অর্থে 'কবর' কবিতাটি থেকেই শুরু শঙ্খ-র মূল কাব্যযাত্রা। এই নশ্বর, নিরীশ্বর জগতে শুদ্ধ মনুষ্যত্বের সন্ধানে এক ক্ষুব্ধ, লৌকিক নচিকেতার ক্লান্তিহীন মহাযাত্রা।"

কবর কবিতার কবি পুরাণের দধীচি মুনির প্রসঙ্গ এনেছেন। দেবতারা এই দধীচি মুনির আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে পেয়েছিল বেঁচে থাকার রসদ। কবি শঙ্খ ঘোষও নিজের মৃত্যু কামনার মধ্যে দিয়ে সকল ব্যর্থতাকে সফলতা দান করতে চেয়েছিলেন। তাই কবি পুরাণের ঐতিহ্যকে স্মরণ করে বর্তমান সময়ের নানা সমস্যা, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আগামী যুবসমাজকে রুখে দাড়ানোর কথা বলেছেন আবার ভবিষ্যতের মঙ্গল চেতনায় কবি তাঁর 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন :

"ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।" (বাবরের প্রার্থনা)

কবি বার বার নিজের জীবনের বিনিময়ে ভবিষ্যতের প্রজন্মকে সুরক্ষিত করতে চেয়েছেন এবং নতুন পৃথিবী, নতুন দেশ, নতুনসমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছে। তাই এই

অন্ধকারময় সময়ের প্রতি, রোগগ্রস্থ সমকালের প্রতি তাঁর প্রতিবাদ যেন প্রার্থনা রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে কবি শঙ্খ ঘোষের 'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যগ্রন্থের 'নচিকেতা' কবিতাতেও আমরা এক 'দৃষ্টিহীন বধির সমাজ'-এর কথা জানতে পারি। রাজা বাজশ্রবার পুত্র ছিল নচিকেতা। রাজা বাজশ্রবা স্বর্গে যাওয়ার জন্য এক যজ্ঞে তার সকল সম্পদ বিলিয়ে দেন। সেইসময় পুত্র নচিকেতার মনে প্রশ্ন জাগে, পিতা তাকে কোন মুনি ঋষির নিকট দান করেছেন। পুত্রের এহেন প্রশ্নে পিতা বিরক্ত হয়ে বলেন—'যমের হাতে'। কিন্তু মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়া কথা ফিরিয়ে নেওয়ার সাধ্য তো রাজার নেই। তাই নিরুপায় পিতাকে কথা রাখতে প্রিয় পুত্রকে যমের হাতে তুলে দিতে হয়। পিতার করুণ আর্তনাদ ফুটে ওঠে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ এর ভাষায় :

"শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা
শোন নি কি জননীর অন্তরের কথা।" (দেবতার গ্রাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এই আকুতি থেকে আমরা বুঝতে পারি সমাজের আঙ্গিনা থেকে ম্লান হয়ে গেছে মায়া মমতা নামক স্নেহাঞ্চল। তাই প্রতিটি মানুষকে নানা অপ্রাপ্তির বিনিময়ে দান করে যেতে হয় জীবনের সমস্ত রসদ। দিয়ে যেতে হয় 'ঘ্রাণ শ্রুতি স্পর্শ', 'দুই চোখ', 'বিচালি ও খড়', 'ভিটে মাচা ঘর'। আর দিতে হবে—

"আর তোকে
যমের দক্ষিণ হাতে দিতে হবে আজ
চায় তোকে দৃষ্টিহীন বধির সমাজ!" (নচিকেতা : বাবরের প্রার্থনা)

একই ভাবে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নচিকেতা' পিতার নিরুপায়তাকে অতিক্রম করে স্বপ্ন দেখে এক নতুন বাসযোগ্য পৃথিবীর। কিন্তু কবে আসবে যে দিন যখন কোনো পুত্রকে পিতার থেকে আর কেড়ে নেওয়া হবে না। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন :

"তাই নিয়ে নচিকেতা, তবু তুমি গড়বে প্রতিমা?
অন্ধ হবে, বোবা ও বধির
তবু ক্লান্তিহীন, মৃত্তিকায় পুনর্জন্মের অস্থির
জিজ্ঞাসায় মৃত্যুর তুষার
বারবার হেঁটে হবে পার?
অগ্নিদগ্ধ দুই হাতে কতবার খুলবে তুমি যমের দুয়ার?"

(নচিকেতা : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত কবিতা)

শঙ্খ ঘোষের 'নচিকেতা' কবিতার মতই মহাভারতের পৌরাণিক প্রতীকে সমাজের অবনমনের একই চিত্র দেখা যায় 'যযাতি' কবিতায়। যযাতি কাম ও আকাঙ্ক্ষার কারণে দেবযানী ও শর্মিষ্ঠাকে একই সাথে গ্রহণ করলে যযাতির গুরু এবং দেবযানীর পিতা শুক্রাচার্য ক্রোধান্বিত

হয়ে যযাতিকে অকাল জরার অভিশাপ দেন। যযাতি জরার থেকে মুক্তি পাবার কামনা করলে গুরুদেব জানান তার কোনো পুত্র যদি জরা গ্রহণ করে তাহলেই তিনি এই যৌবন ফিরে পাবে। তখন তার একমাত্র পুত্র পুরু নিজের জীবন-সম্পদ দানের মধ্য দিয়ে পিতার ইচ্ছা পূরণ করেন। এখানে কবি যযাতির নিচ এবং ক্লেদাক্ত মানসিকতাকে এই মৃত্যুমুখী শহরের সাথে তুলনা করেছেন। সমগ্র শহরকে যেন যযাতির অকাল জরার শ্বাস-প্রশ্বাস ঘিরে ফেলেছে 'শহর অর্থব হয়ে পড়ে আছে'। এই সংকটময় কালে পুরুর এই আত্মত্যাগ কেবল যযাতির নয় সমগ্র মৃত্যুমুখী নগরীকে প্রাণময় করে তোলে। কবির শঙ্খ লিখেছেন:

"আপন ফুসফুস নিয়ে নিজেকে আহুতি দিতে গেলে
বিস্ফারিত মুহূর্তের ধাবমান স্বপ্নে চেয়ে দেখি—
কালপুরুষের নীচে মাথা তুলে দাঁড়ায় শহর
যযাতি জীবন পায় মূর্ছিত পুরুর শিরোদেশে।" (যযাতি: প্রহরজোড়া ত্রিতাল)

এই সুত্রে কবি মনে করিয়ে দিয়েছেন পুরাণের চরিত্র জাবাল সত্যকামকে যে নিজের চেষ্টায় তার অজ্ঞাত পরিচয়কে প্রতিষ্ঠা করেছে। এই প্রসঙ্গে কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতা 'জাবাল সত্যকাম। 'ছান্দোগ্য উপনিষদ'-এর সূত্র থেকে জানা যায়, সত্যকাম ব্রহ্মচর্য নিয়ে গুরু গৃহে যাওয়ার আগে মায়ের থেকে তার গোত্র পরিচয় জানতে চায়। মা তাকে জানায় বহুজনের সেবা করে আমি তোমায় পেয়েছি। মায়ের কাছ থেকে সে কথা জেনে সত্যকাম ঋষিকে সেটাই বলেছিলেন, বলেছিলেন "বহু পরিচর্যাজাত আমি, প্রভু, পরিচয়হীন।" সত্যকামের এই একনিষ্ঠতা গুরু গৌতমকে মুগ্ধ করে। গুরু, সত্যকামের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে উপনয়নের পর তাকে চারশত দুর্বল ও শীর্ণ গরু দিলে গুরুর কাছে সে অঙ্গীকার করে সহস্রপূর্ণ না হলে ফিরবো না। কবি শঙ্খ ঘোষের কাব্যিক দ্যোতনায় উপনিষদের সত্যকাম জাবাল হয়ে ওঠে আধুনিক দেশ-কাল-সময় ও সংকটের জাবাল সত্যকাম, তিনি বললেন:

"এখন স্পষ্টই
আমার আড়াল, বনবাস
এখন অনেকদিন বন্ধুদল তোমাদের হাতে হাতে নই।
যখন সহস্র পূর্ণ হবে
ফিরে যাব ঘরে
যখন সহস্র পূর্ণ হবে
আয়তনবান এই দশ দিক গাঢ়তর স্বরে
ফিরে নেবে ঘরে
এখন আজানু এই উদাসীন মাঠে মাঠে আমার সকাল
তুমি দিয়েছিলে ভার আমি তাই নির্জন রাখাল"

(জাবাল সত্যকাম:তুমি তো তেমন গৌরী নও)

দেশভাগের যন্ত্রণা, অস্তিত্বের সংকট, পরিচয়হীনতার গ্লানিকে কবি 'জাবাল সত্যকামের' যন্ত্রণার আকারে রূপ দিয়েছেন। পৌরাণিক কাহিনীর অন্তরালে মানব অনুভূতিকে উপস্থাপন করছেন আপন আঙ্গিকে।

উপরিক্ত এই আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতা জীবন সত্যের পথে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গিয়েছে আদিপুরাণের কাছে। প্রাচীন কাল থেকে আজ অবধি সকল জীবনছন্দ একই সুরে বেজে চলেছে অর্থাৎ শঙ্খ ঘোষের কবিতায় জীবনের ক্লেদ, ক্লান্তি, হতাশা, আনন্দ, বেদনা, দেশকাল, রাজনীতি এবং সময়চেতনার অপরিহার্য সত্য ভাবনা-বীজের মতো লুকিয়ে থাকে চিন্তা আর নতুনত্বের গরিমা নিয়ে। কবিং শঙ্খ ঘোষ যে আপাদমস্তক একজন চৈতন্যজাগরণের কবি এবং তার কবিতার কেন্দ্রীয় অভিমুখ যে সর্বদাই মানবীয় দেশগঠনের দিকে জাগ্রত চৈতন্যসহ সদা চলিষ্ণু—এ বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. শঙ্খ ঘোষ। কবিতা সংগ্রহ-১। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। নবম সংস্করণ: মাঘ ১৪২৭
২. শঙ্খ ঘোষ। কবিতা সংগ্রহ-২। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। সপ্তম সংস্করণ: ফাল্গুন ১৪২৩
৩. শঙ্খ ঘোষ। শ্রেষ্ঠ কবিতা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। দ্বাদশ সংস্করণ: বৈশাখ ১৪১৫
৪. শঙ্খ ঘোষ। কবিতার মুহূর্ত। অনুষ্টুপ, কলকাতা। ষষ্ঠ মুদ্রণ:২০১০
৫. সুতপা ভট্টাচার্য। গাঢ় শঙ্খের খোজে। প্যাপিরাস,কলকাতা।প্রথম প্রকাশ-ফ্রেব্রুয়ারি ২০০৩
৬. শঙ্খ ঘোষ। জার্নাল। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। প্রকাশ: ১৩৯২
৭. জহর সেনমজুমদার। বাংলা কবিতার মেজাজ ও মনোবীজ। পুস্তক বিপনী, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৮
৮. শিশিরকুমার দাশ।ভারতসাহিত্যকথা। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৯।
৯. মধুময় পাল। 'দেশভাগ: বিনাশ ও বিনির্মাণ'। গাঙচিল, কলকাতা। জানুয়ারি, ২০১১
১০. শান্তি সিংহ (সম্পা.)। শঙ্খ ঘোষ। দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা। ডিসেম্বর ২০১৩
১১. তারাপদ আচার্য। শঙ্খ ঘোষের কবি জীবন। দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা। প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৯৯

শুভ কুমার পাত্র

সমকালীনতার দুরন্ত প্রচ্ছায়ায় শঙ্খ ঘোষের কবিতা

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে একুশ শতকের দুই দশক পর্যন্ত যে কবি নিরন্তর বাংলা কবিতাকে তাঁর নিজস্ব প্রতিভার আলোকে আলোকজ্জ্বল করেছেন তিনি হলেন শঙ্খ ঘোষ। যুগসচেতন কবি হিসাবে তাঁর কবিতায় সমসাময়িক কালের ছবি যে ফুটে উঠবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর কবিতায় যেভাবে মুহর্মুহু প্রতিবাদের আগুনকে জ্বলে উঠতে দেখা গেছে তাতে বর্তমান সময়ের নবীন কবিদের যেমন ভাবিত করে তেমনি পাঠকসমাজকেও বিস্মিত করে। যখন বর্তমান সময়ে দেশজুড়ে একদিকে নৈরাজ্য ও বিভাজনের রাজনীতি আর অন্যদিকে নির্যাতিত ও বঞ্চিত সাধারণ মানুষ, আবার স্বাধীনতার পচাঁত্তর বছর পরেও যখন একদিকে গণতন্ত্র, ক্ষমতার রাহাজানি আর অন্যদিকে আত্মসুখমগ্ন বুদ্ধিজীবী সমাজ ও তাদের নিদ্রিত বিবেকবোধ ঠিক তখনই কবিতার পাঠক হিসাবে শঙ্খ ঘোষকে পাঠ করা ছাড়া উপায় নেই। কারণ স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে শঙ্খ ঘোষ-ই সেই অন্যতম অসামান্য কবি যিনি ব্যক্তিগত পরিসরে স্বল্পবাক হলেও কলমের খোঁচায় সাধারণ মানুষের হয়ে শাসকের চোখে চোখ রেখেছেন। সমাজের বীভৎসতা ও মূঢ়তাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। যা একজন সমাজকর্মীর কাজ। কিন্তু কবি যখন কাব্য জগতে বিচরণ করেন তখন তিনি তো সমাজকর্মী বা সমাজনীতিবিদ নন, যেমন তিনি নন রাজনীতিজ্ঞ বা ঐতিহাসিক। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উদ্ধৃতি মনে পড়ছে। "সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আর্শি নহে। কেবল সাহিত্য কেন,কোনো কলাবিদ্যায় প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে।"[১]

যদি তা না হবে, তাহলে কখনো দেশভাগের 'রক্তভরা বীভৎসতা', এদেশ-ওদেশ, ভাসমান ছিন্নমূল জীবন,কখনো কলকাতার ভিতরে থাকা আর এক কলকাতা, প্লাটফর্ম, দশমী এই সব নানা ছবি কীভাবে উঠে আসে শঙ্খ ঘোষের সাহিত্যচর্চায়? এর উত্তর খুঁজতে জীবনানন্দ দাশের 'কবিতার কথা' গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা যাক। তিনি লিখেছেন, "সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে।"[২]

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবির কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে থাকা চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা অংশটি। এই চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা মধ্যেই এসে পড়ে কবির মেধা ও মনন, দর্শন ও উপলব্ধির প্রশ্নচিহ্ন। আর সেখান থেকেই কবিতায় উঠে আসে ইতিহাসচেতনা বা সমকালীনতা। সেদিক থেকে শঙ্খ ঘোষ যে প্রথম শ্রেণীর কবি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই প্রথম শ্রেণির কবি হিসাবে কবিতার মধ্যে দিয়ে উঠে আসা তাঁর চিন্তা

ও অভিজ্ঞতাগুলিকে স্পর্শ করার চেষ্টা করবো এই আলোচনার মধ্য দিয়ে। দেখবার চেষ্টা করবো তাঁর কাব্যচেতনার মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক বিস্মিত জীবনবোধ। যে জীবনবোধ থেকে তিনি লেখেন 'আমার জন্মের কোনো শেষ নেই'।

কাব্য জগতে শঙ্খ ঘোষের আবির্ভাব পঞ্চাশের দশকে। ১৯৫৬ সালে 'দিনগুলি রাতগুলি' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে দিয়ে তাঁর পথচলা শুরু। কালের বিচারে পঞ্চাশের দশকও বাংলার ইতিহাসে খানিকটা এই দিন ও রাতের মতোই; আলো ও অন্ধকারের এক সুমিশ্র অনুভূতির কাল। তবে আলোর চেয়ে অন্ধকারই বেশি। কারণ প্রায় দুশো বছরের অপেক্ষমান স্বাধীনতার সূর্যের উপর ঢেকে যায় দেশভাগের মর্মান্তিক কালোছায়া ও নেমে আসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আর দাঙ্গার পরিণতি তো কমবেশি সকলেরই জানা। খুন-ধর্ষণ -রাহাজানি -রক্তপাত এবং দুই দেশের মাটিতে জড়ো হওয়া এক উদ্বাস্তু সমস্যা। এই সময়ের মধ্যে দিয়ে কবি শঙ্খ ঘোষের বেড়ে ওঠা ও কৈশোরের কাল যাপন। তাঁর জন্ম ১৯৩২ সালে ৫ই ফেব্রুয়ারি বর্তমান বাংলাদেশের চাঁদপুর জেলায় ও তাঁর বড় হওয়া বরিশালে ও পাবনায়। তারপর সেখানে থেকে কলকাতায় চলে আসা। শিক্ষাজীবন থেকে শুরু করে কর্মজীবন এমনকি সাহিত্যজীবন সবটাই এই দেশের মাটিতে। ফলত এই উদ্বাস্তু জীবন তিনি শুধু প্রত্যক্ষই করেননি, সেই জীবন যন্ত্রনা নিজে উপলব্ধি করেছেন। তিনি 'নির্বাসন' কবিতায় লিখেছেন—

"আমার সামনে দিয়ে যারা যায়, আমার পাশ দিয়ে যারা যায় সবাইকে বলি : মনে রেখো মনে রেখো একজন শারীরিক খঞ্জ হয়ে ফিরে গিয়েছিল এই পথে বালকের মতো তার ঘর ছিল বিষণ্ণের দুপুর আকাশে ছন্নছাড়া"।[৩]

শঙ্খ ঘোষের একটি আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'সুপুরিবনের সারি'। এই উপন্যাসে পুত্রদের উদ্দেশ্যে বলা বৃদ্ধের ভারাক্রান্ত মনের সংলাপ উচ্চারণে দেখি এমনি দেশভাগের যন্ত্রণার ছবি।দেশভাগের প্রাক্কালে ভিটে-মাটি ছেড়ে আসার মুহূর্তে বৃদ্ধ বলে, 'ওই কাছারি ঘরটার পিছনে সুপারি গাছের সারি একটা একটা করে ওর সবকটা আমার নিজের হাতে লাগানো... ওই আম-কাঁঠাল তেঁতুলের গাছগুলি দিনান্তে একবার ওদের গায়ে হাত না রাখলে ভালোও লাগে না আমার। আর ওই যে মন্ডপের পাশ দিয়ে পুকুরের পিছন দিকটা... ওইখানে পড়ে আছে বাবার মঠ ঠাকুরদার মঠ এখনো তোর মা ওখানে নিত্য গিয়ে পিদিম জ্বালিয়ে আসে এইসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে, বল তো আমি যাই কোথায়, যাই কেমন করে।"[৪]

এই উপন্যাসের বৃদ্ধের মতো যারা দেশহারা, বাস্তুহারা, পথহারা তাদের অনেকের গল্পই প্রায় একরকম। আবার কিছুজনের বেঁচে থাকার গল্প আরও করুণ। দক্ষিণারঞ্জন বসুর 'ছেড়ে আসা গ্রাম' কিংবা সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এর 'দেশভাগ দেশত্যাগ' গ্রন্থে এইসব কাহিনির বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। শঙ্খ ঘোষ যতদিন বেঁচেছেন এইসব ফেলে আসা মানুষের গল্প, মনকেমনের স্মৃতি, একরাশ বিষন্নতা, সংকট, সংগ্রামকে একেবারে ভুলে যেতে পারেন নি। আর ভুলতে পারেনি বলেই শুধু 'দিনগুলি রাতগুলি' কাব্যগ্রন্থে নয়, তার

পরবর্তী ‘নিহিত পাতালছায়া’ (১৯৬৭), ‘তুমি তো তেমন গৌরী নও’(১৯৭৮), ‘আদিম লতাগুল্মময়’ (১৯৭২), ‘মূর্খ বড়ো,সামাজিক নয়’ (১৯৭৪), ‘বাবরের প্রার্থনা’ (১৯৭৬), মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে(১৯৮৪), জলই পাষাণ হয়ে আছে (২০০৪) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের কবিতাতেও কখনো বা স্মৃতির অনুষঙ্গে কখনো বা ভাবের অনুষঙ্গে সে কথা উঠে এসেছে। যেমন ধরা যাক ‘রাঙা মামিমার গৃহত্যাগ’ কবিতাটি। তিনি লিখছেন—

“ঘর, বাড়ি, আঙিনা
সমস্ত সন্তর্পণে ছেড়ে দিয়ে মামিমা
ভেজা পায়ে চলে গেল খালের ওপারে সাঁকো পেরিয়ে
ছড়ানো পালক, কেউ জানে না!”[৫]

এই যে চলে যাওয়া, তার একমাত্র কারণ ছিল ভয়, সংশয় ও প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ। কিন্তু চলে যাওয়া মানেই কি ছিল সব সমস্যার সমাধান? কবি তা মনে করে না। তাঁর মনে হয়, “আমরা হাঁটতে থাকি, হেঁটে যেতে থাকি এক দেশ থেকে অন্য দেশে এক ধর্ষণের থেকে আরো এক ধর্ষণের দিকে”।[৬] (‘দেশান্তর’)

দেশ বদলালে কিংবা ধর্মের বদল করলেই মানুষের অন্ধত্ব ঘুচে যায় না। ঘুচে যায় না হিংসা, নৃশংসতা ও অমানবিতা। হয়তো বেঁচে থাকা যায়। কিন্তু সে তো শরীরের, বিদীর্ণ মনটার কী হবে? মানচিত্রের মতো যে হৃদয় টুকরো টুকরো হয়ে গেলো সে হৃদয় কী জোড়া লাগার?যদি জোড়া লাগতো তাহলে কবিকে ‘পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ’ কাব্যগ্রন্থে লিখতে হতো না—

“প্রগাঢ় অন্যায় কোনো ঘটে গেছে মনে হয় যেন
কিছু কি দেবার কথা কিছু কি করার কথা ছিল?
থেমে-থাকা বৃষ্টিবিন্দু হাড় থেকে টলে পরে ঘাসে
ভেজা বিকেলের পাশে ডানা মুড়ে বসে আছে আলো।”[৭]

অন্ধকার যখন গ্রাস করে তখন আলোর পাখি ডানা মুড়েই বসে। কিন্তু কবি তো জানেন—‘আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে’। তাই তিনি অন্ধকারকে সরিয়ে দিয়ে আলোটুকু ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। তাই প্রার্থনার সঙ্গে আত্মনিবেদনের ভাব মিলিয়ে দিয়ে লিখেছেন—

“আমার জন্য একটুখানি কবর খোঁড়ো সর্বসহা
লজ্জা লুকোই কাঁচা মাটির তলে
গোপন রক্ত যা কিছুটুক আছে আমার শরীরে, তার
সবটুকুতেই শস্য যেন ফলে
কঠিন মাটির ছোঁয়া বাতাস পেয়েছি এই সমস্ত দিন
নিচে কি তার একটুও নয় ভিজে?
ছড়িয়ে দেবো দু’হাতে তার প্রাণাঞ্জলি বসুন্ধরা
যেটুকু পাই প্রাণের দিশা নিজে।”[৮] (‘কবর’)

কবি কি সেই প্রাণাঞ্জলি বসুন্ধরা ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন? জহর সেন মজুমদার ‘বাংলা কবিতা : মেজাজ ও মনোবীজ’ গ্রন্থে লিখেছেন—“চল্লিশ-দশকের বেশ কয়েকজন কবিদের কবিতায় যে প্রবল এবং অনিবার্য সমকালমনস্কতা পঞ্চাশে এসে তা যখন প্রায় ধূসর তখনই মর্ম নিংড়ানো ব্যর্থতাকে সমষ্টির চৈতন্যে মিলিয়ে দেওয়ার আকুতি সহ শঙ্খ ঘোষের আবির্ভাব”।

অর্থাৎ,কবি যে ‘মর্ম নিংড়ানো ব্যর্থতা’-র অনুভূতিকে সমগ্র মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতে চাইলেন, তা ধূসর বা ম্লান হলেও সমকালমনস্কতা ও তার রাজনৈতিক দর্শনের অভিজ্ঞতা কি ভিড় করে না? আমার তা একেবারে মনে হয় না। কারণ শঙ্খ ঘোষ বাংলা সাহিত্যের এমন একজন কবি যিনি স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় ৭৫ বছর পশ্চিমবঙ্গের তথা দেশের রাজনীতি সরাসরি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি দেখেছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একের পর এক ক্ষমতার হাত বদল। প্রথমে জাতীয় কংগ্রেস (১৯৫২-১৯৬৭), তারপর বাংলা কংগ্রেসের যুক্তফ্রন্ট কিংবা জাতীয় কংগ্রেসের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক জোটের (১৯৬৭-১৯৭৭) সরকার গঠন। তবে এসবের মাঝে তিনি রাজনৈতিক অচলবস্থা ও বারকয়েক রাষ্ট্রপতি শাসনও দেখেছেন। তারপর এসেছে সুদীর্ঘ সময়ের বামফ্রন্টের যুগ (১৯৭৭-২০১১)। এরপর বামফ্রন্টকে হারিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার, যে সরকার আজও তার ক্ষমতায় আসীন। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে শাসকের পর শাসক বদল হয়েছে। কিন্তু শাসক বদলালেও সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের দিনযাপন,ব্যথা-বেদনার উপশম হয়নি। দূরীভূত হয়নি অন্ধকার। শঙ্খ ঘোষের কবিতা পর্যালোচনা করলে সেদিকটি স্পষ্ট হবে। প্রথমে দেখা যাক ‘ঘরে বাইরে’ কবিতার প্রথম একটি স্তবক।

> “এই সেই অনেক দিনের ঘর, তার দেয়াল ফাটছে, আশা ফাটছে।
> যেদিকে তাকাই তার নির্বোধ নীরব চোখ,
> ভীষণ লজ্জাহীন একঘেয়ে সূর্যহীন গন্ধ
> বৎসরের পর বৎসর একখানি করে টালি খসিয়ে মাথা তুলছে।
> বৃদ্ধা ঠাকুমার নামাবলির মতো মূঢ় দেয়ালের অসহ্য দুরবলোক্য তর্জনী
> তাকিয়ে মনে হয়
> আশা নেই আশা নেই
> আমার বয়স হাজার কিংবা এ-রকম
> আমার সামনের ভবিষ্যৎ মানেই প্রাগৈতিহাসিক অন্ধ বর্বর যুগ
> যে মারে সেই বাঁচে
> অন্তত মার মুখে তাকিয়ে এছাড়া আর কোন আশা?”[৯]

এই কবিতাংশটি ‘দিনগুলি রাতগুলি’ কাব্যগ্রন্থের। ফলত, এটি কংগ্রেসের সময়ের রচনা বলাবাহুল্য। এদেশে মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত সমাজে আশ্রয় মানেই প্রাচীন ঘর, চুনখসা দেওয়াল,

স্যাঁতস্যাঁতে মেঝে এবং ফুটো টালি। আর জীবন বলতে সরীসৃপের মতো শ্রান্ত চলাচল আর নৈরাশ্যের পাহাড় বুকে নিয়ে একান্ত দিনযাপন। এই কবিতা পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশি' কবিতার হরিপদ কেরানির মুখ মনে পড়ে,

"কিনু গোয়ালার গলি
দোতলা বাড়ির
লোহার- গরাদে- দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই।
লোনা-ধরা দেয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি,
মাঝে মাঝে স্যাঁতা-পড়া দাগ।'
বর্ষা ঘনঘোর।
ছাতার অবস্থাখানা জরিমানা-দেওয়া
মাইনের মতো,
বহু ছিদ্র তার।
আপিসের সাজ
গোপিকান্ত গোঁসাইয়ের মনটা যেমন,
সর্বদাই রসসিক্ত থাকে।"[১০]

এই যে অসহায় মানুষের রসসিক্ত জীবন একদিন শুকিয়ে যাবে, সে রকম কোনো প্রত্যাশা নেই। আসলে এই জীবনে বাঁচা মানেই গোপনে আমারই মতো আরেকজনকে মারা। শুধুই নৈরাশ্য আর শূন্যতার অনুভূতি। তাই কবির —'দুঃখের দিন তথাগত' হয়ে ওঠে। এমন সংকটের দিনে, এই অন্ধকার সময়ে পরস্পরের হাত ধরে বেঁচে থাকা ছাড়া উপায় নেই।তাই 'জলই পাষাণ হয়ে আছে' (যেটি বাম সরকারের সময়ে রচনা) কাব্যগ্রন্থের 'আয় আরও বেঁধে বেঁধে থাকি' কবিতায় লেখেন—

"আমাদের ইতিহাস নেই
অথবা এমনই ইতিহাস
আমাদের চোখমুখ ঢাকা
আমরা ভিখারি বারোমাস
পৃথিবী হয়তো বেঁচে আছে
পৃথিবী হয়তো গেছে মরে
আমাদের কথা কে-বা জানে
আমরা ফিরেছি দোরে দোরে।
কিছুই কোথাও যদি নেই
তবু তো কজন আছি বাকি?

আয় আরো হাতে হাত রেখে
আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।"[১১]

এই ইতিহাস রচনা করেছে কারা? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সব দায় কি সব শেষে মানুষের ওপর বর্তায়? যদি তাই হয় যখন মানুষের অধিকার খণ্ডিত হয় তাহলে সেই অধিকার রক্ষার দায়িত্ব কাদের? এই নিয়ে তর্ক চলতে থাকে কিন্তু মানুষের অবস্থার বদল হয় না। বদলের রাজনীতি করবে বলে আজ যে সরকার গঠিত হলো তারাও কি পারলো? যদি পারতো তাহলে শঙ্খ ঘোষের 'সীমান্ত বিহীন দেশে দেশে' (রচনা ২০১৮-১৯) কাব্যগ্রন্থে এই ছবি উঠে আসত না—

"মুহূর্তে মোচড় লেগে পৃথিবী ভূলোক হয়ে ওঠে।
আমি ভেসে যাই জলস্রোতে

বুকে বুকে বৃষ্টি ঝরে, দিকে দিকে অনন্ত ভিখারি
মৃত্যু তার স্পর্শ দিয়ে জীবন আকুল করে ধরে।"[১২] ("গান")

তাহলে অসহায়-সর্বহারা নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জীবনের আকুলতা কি চিরদিনের? সে উত্তর তো রাজনীতিবিদ বা সমাজনীতিবিদরা দেবে। কিন্তু কবি সমাজনীতিবিদ না হলেও তিনি তো স্বপ্নদর্শী। ফলত তিনি একদিন যে স্বপ্ন দেখেছিলেন "হবে/ নতুন সমাজ চোখের সামনে বিপ্লবে বিপ্লবে", একদিন যখন সেই বিপ্লবের পথেই হেঁটে যায় যমুনাবতী সরস্বতীরা, আর নিভন্ত চুল্লিতে আগুন ফলে, তখন কবি বিশ্বাস করেন এই পথই একমাত্র পথ। তাই ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁকে কয়েকবার পথে নামতে দেখা গেছে প্রতিবাদে-প্রতিরোধে। কাজেই, কাব্যসৌন্দর্য অক্ষুন্ন রেখে তাঁর কবিতায় যে প্রতিবাদ উঠে আসবে সেটাই স্বাভাবিক। তিনি শাসকের চোখের সামনে শাসকের প্রকৃতিকে উন্মোচিত করে লিখেছেন :

"আমি তো আমার শপথ রেখেছি
অক্ষরে অক্ষরে
যারা প্রতিবাদী তাদের জীবন
দিয়েছি নরক করে।

দাপিয়ে বেড়াবে আমাদের দল
অন্যে কবে না কথা
বজ্রকঠিন রাজ্যশাসনে
সেটাই স্বাভাবিকতা।

গুলির জন্য সমস্ত রাত
সমস্ত দিন খোলা

বজ্রকঠিন রাজ্যে এটাই
শান্তি ও শৃঙ্খলা।"[১৩] ('স-বিনয় নিবেদন')

কবি এই রকম শান্তি-শৃঙ্খলা চান না। তিনি চান সত্যিকারের সুদিন আসুক, 'সন্ততি স্বপ্নে থাক'। তাই ঝড়ের মধ্যরাতে 'হামাগুড়ি' দিয়ে তিনি খোঁজার চেষ্টা মানুষের বিকিয়ে যাওয়া 'মেরুদন্ডখানা'। কারণ আত্মসুখমগ্ন মানুষ কেউবা রাজরোষ কেউবা উপঢৌকনের প্রলোভনে বিকিয়ে দিয়েছে নিজেকে রাষ্ট্রনায়কের কাছে।মানুষের কিংবা রাজার এই স্বার্থপরতা ও প্রবঞ্চনা একটি সুষ্ঠ রাষ্ট্রকাঠামো গড়তে পারে না। তাই তিনি কবিতার মধ্য দিয়ে যেন গণজাগরণের ডাক দেন। বলেন,

"ঝরে যাবেন? ঝরুন
ঝরুন দাদা ঝরুন!
ভিতরদিকে আছেন যাঁরা
একটু মশাই নড়ুন

হঠাৎ ঝাঁপে উল্টে যাবেন
শক্ত হাতে ধরুন
খুব যে খুশি পা-দানিতেই
কেইবা চায় দুঃখ নিতে
যা পেয়েছেন দেখুন ভেবে
নাক না ওটা, নরুন।

চাপ সৃষ্টি করুন
চাপ সৃষ্টি করুন।"[১৪] ('চাপ সৃষ্টি করুন')

স্বাধীন বা পরাধীন ভারতবর্ষ এই 'চাপ সৃষ্টি' অর্থাৎ কোনো বৃহত্তর আন্দোলন দেখেনি যে তা নয়। কবি শঙ্খ ঘোষ ও তার জীবদ্দশায় বাংলার বুকে একাধিক আন্দোলন বা প্রতিবাদের আগুনকে ছড়িয়ে পড়তে দেখেছেন। খাদ্য আন্দোলন থেকে নকশাল, তেভাগা থেকে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন এমনকি একাধিক অন্যায় ও দাবি-দাওয়া নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন, মিটিং-মিছিলের সাক্ষীও থেকেছেন। তিনি দেখেছেন অন্যায় বা অপরাধ হয় আর তার বিরুদ্ধে একসময় সমবেত মানুষের কণ্ঠে প্রতিবাদের শব্দ ধ্বনিত হয়। কিন্তু সরকার তা কঠোর হাতে দমন করে ও স্বৈরাচারী ভাবে তার শাসন চালিয়ে যান। ফলত, পুনরায় অপরাধের পর অপরাধ জমতে থাকে। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি কবিদের মধ্যে যে হতাশা গ্রাস করে না, তা নয়। তিনি নিজেই তার শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকা লিখতে গিয়ে লিখেছেন—হতাশা ছাড়া হাতে থাকে না কিছুই—সেই হতাশা থেকে উঠে এসেছে তাঁর 'যা ঘটবার ঘটতে থাকে'-র মতো কবিতা।

"আমরা কথা বলি
আমরা কথা বলি আর প্রতিবাদ করি
প্রতিবাদ করতে করতে কথা বলি
কথা বলতে বলতে প্রতিবাদ করি
আর যা ঘটবার তা ঘটতে থাকে
আমরা প্রতিবাদ করি
করতে করতে ঘুমোই
ঘুমোতে ঘুমোতে কথা বলি
যা ঘটবার ঘটতে থাকে
ঘটতে থাকে।"[১৫]

পৃথিবীর বুকে মানবসভ্যতার যত অগ্রগতি হয়েছে, মানবিকতার অবক্ষয় হয়েছে তার চেয়েও অনেক বেশি। মনুষ্যত্বের অভিজ্ঞান মুছে গিয়ে মানুষের ধর্মীয় পরিচয় প্রধান হয়ে উঠেছে। অথচ ধার্মিক মানুষের যে পরিচয় ক্ষুদ্রতা, সহিষ্ণুতা, উদারতা এবং সর্বোপরি সরলতা; তা তাদের নেই। আছে চোখে মুখে হিংসা-প্রতিহিংসার আগুন আর হৃদয়ের মধ্যে এক নিষ্ঠুর পাশবিকতা। এমনই কাল প্রবাহের মধ্যে দিয়ে ভেসে যায় কবি। যেখানে মানুষের অ-প্রগলভতা অ-চতুরতা পরম বিস্ময়কর। আসলে যা দুর্লভ তা যখন দৃশ্যমান হয়, তখন তা আমাদের বিস্মিত করে। এরকম পরিস্থিতিতে 'পিশাচ পোশাক' খুলে 'মানব শরীর' পরে নেওয়া কে লোকে বলে 'মূর্খ বড়ো' লোকে বলে 'সামাজিক নয়'। তবু কবি চান মানুষ 'পিশাচ-পোশাক' খুলে মানব শরীরের অধিকারী হোক। ভালোবাসা ও উদারতার মন্ত্রে দীক্ষিত হোক মানব জীবন। অথচ কবি কি সেই মানুষ তৈরি করে যেতে পেরেছিলেন? আমরা এর উত্তর জানিনা। কিন্তু তাঁর প্রার্থনা যে ছিল সে কথা 'কবর' কবিতায় লিপিবদ্ধ আছে—

"কুণ্ডলিত রাত্রিটা আজ যাবার সময় বলল আমায়
তুমিই শুধু বীর্যহারার দলে,
ঋজু কঠিন সব পৃথিবী হাড়ে- হাড়ের ঘষা লেগে
অক্ষমতা তোমার চোখের পলে
নিবেই যখন গেলাম আমি, নিবতে দিয়ো হে পৃথিবী
আমার হাড়ে পাহাড় করো জমা—
মানুষ হবার জন্য যখন যজ্ঞ হবে, আমার হাড়ে
অস্ত্র গোড়ো, আমায় কোরো ক্ষমা।"[১৬]

পৃথিবীর কাছে যখন মানুষের গভীরতর ঋণ, অথচ সেই ঋণস্বীকার না করে, মানুষ নিজেরই 'শরীরের পাপের বীজাণু'-তে যখন ভবিষ্যতের নাগরিক সমাজকে করে তোলে কলুষিত। তখনই শঙ্খ ঘোষের মতো কবির বড়ো প্রয়োজন অনুভব হয়। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি,

ব্যথা-বেদনা, প্রত্যাশা-হতাশা, সুখ-দুঃখ এইসবের সমষ্টি নিয়েই তো মানবজীবন। তবুও যে মূঢ়তা ও অন্ধত্ব ঘিরে আছে জীবন জুড়ে, সেই অন্ধকার কাটিয়ে শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে গলা মিলিয়ে "ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর/আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক"—এই কথাটুকু বলার জন্য অন্তত কবির বারবার জন্ম হবে পাঠকের চেতনায়, পাঠকের মননে। একথা নিশ্চিত।

তথ্যসূত্র :

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "সাহিত্য", বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রিট, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-২৩

২। দাশ,জীবনানন্দ, 'কবিতার কথা', সিগনেট প্রেস কলকাতা ২৩, তৃতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৫৮, পৃষ্ঠা -৭

৩। ঘোষ,শঙ্খ, "শ্রেষ্ঠ কবিতা", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭, ত্রয়োবিংশ সংস্করণ, পৃষ্ঠা- ৭৪

৪। ঘোষ,শঙ্খ, 'সুপুরিবনের সারি', অরুনা প্রকাশনী, কলকাতা ৬, প্রথম প্রকাশ : ১৩৭০, পৃষ্ঠা-৬৫

৫। ঘোষ,শঙ্খ, "শ্রেষ্ঠ কবিতা", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭, ত্রয়োবিংশ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৩৮

৬। তদেব, পৃষ্ঠা-১৮৬

৭। তদেব, পৃষ্ঠা-১০৯

৮। তদেব, পৃষ্ঠা-১৩

৯। তদেব, পৃষ্ঠা-১৫

১০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'পুনশ্চ', বিশ্বভারতী, পঞ্চম সংস্করণ : ফাল্গুন ১৪২৫,পৃষ্ঠা- ১১৬-১১৮

১১। তদেব, পৃষ্ঠা-১৯১

১২। তদেব, পৃষ্ঠা-২৬৬

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা-২০৩

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা-৯৮-৯৯

১৫। তদেব, পৃষ্ঠা-১৯৭

১৬। তদেব, পৃষ্ঠা-১৪

সো মা মু খা র্জি
গণেশ বসুর শেষের কবিতা

‘ক্রুশবিদ্ধ জিশুর মতোই স্বদেশভূমির গণতন্ত্র’—এমনই এক স্বপ্নহীন স্বপ্নভূমিতে কবি গণেশ বসুর আবির্ভাব; ‘সমুদ্র-মহিষ’-এর গর্জন নিয়ে। ষাটের দশকের নিরাশা আর নৈরাজ্যের অন্ধকারে তিমির বিনাশী এই জীবন-যোদ্ধা নতুন স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করেন। তিরিশ, চল্লিশ আর পঞ্চাশের দশকের কবিরা যখন বিচিত্র স্বতন্ত্র ধারায় নিজেদের অনুভবের ভাঁড়ার উজাড় করে দিচ্ছিলেন, তখন পাঁজর ফাটানো এই দশকে কবি গণেশ বসু নিয়ে আসলেন একগুচ্ছ প্রেমের কবিতা। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘বনানীকে কবিতাগুচ্ছ’ (১৯৬৪)—প্রথম কবিতার প্রথম পংক্তিতে লিখেছিলেন, ‘আমরণ সে রহিবে অশ্রুময় হৃদয়ে আমার’ যেখানে ব্যক্তি প্রেম একাত্ম হয় দেশপ্রেমে, কিন্তু ব্যক্তি প্রেমই তো সৃষ্টির নিহিত উৎস। এই যে অবিনশ্বর প্রেমের অনুভূতি তাঁর শেষের কবিতাতেও বহমান। জীবনানন্দের ‘বনলতা সেন’, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘নীরা’, বিনয় মজুমদারের ‘গায়েত্রী’র মতোই ‘বনানী’ও কোনো ধ্রুব শাশ্বত প্রেমসত্ত্বা। এই প্রেমভাবনা ব্যক্তিভাবনার গণ্ডী পেরিয়ে বহুমাত্রিকতায় বিথারিত হয়ে আছে। কিন্তু জীবন-শেষের পর্বে এসে কোথাও যেন এই প্রেম পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে সহধর্মিনীর অবয়বে। ২৭ জুলাই ২০২৩-এ পত্নী বিয়োগ ঘটে। কর্কট রোগে এ বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী জেনেও আকস্মিক আঘাতে, বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েন কবি। অসুস্থ পত্নীকে আগলে রেখেছিলেন; প্রতিটি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে। তাঁকে ঘিরেই দিন-রাতের মুহূর্তগুলো বিমূর্ত ভালোবাসায় প্রদীপ্ত হয়েছিল। তাই পত্নী-বিয়োগে বড়ো একা হয়ে গেলেন কবি। মৃত্যু-চেতনায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন। কবি যেন মৃত্যুর স্বাদ পান শ্মশানভূমিতে দাঁড়িয়ে,

> “মৃতদের মধ্যে আমি মৃতপ্রায় শ্মশানতলিতে।
> এখানে সকলে মৃত বস্তুত স্বাধীন।
> আমি তার স্বাদ পাই। চেখেচুখে দেখি
> স্বাদ পায় অন্যেরাও চেটেপুটে সারা রাতদিন
> আমার পত্নীর স্বাদ এ শ্মশান পেয়েছে কবেই;
> আমারও সৃষ্টির স্বাদ পেয়ে যাবে বিরামবিহীন।”[১]

সময় বয়ে যায়, স্মৃতি ক্রমশ কুয়াশাবৃত হতে থাকে। নিজের শূন্য ঘরে ‘হিম বিছানায় শুয়ে’ একাকী কবি খুঁজতে থাকেন তাঁর কাছের মানুষকে। রাস্তায়, পার্কে, আকাদেমি বা রবীন্দ্রসদনে, এডিনবরার জাদু শিল্পিত ক্যাসেলে, ডান্ডির সৈকতে পরিত্যক্ত জাহাজের কেবিনে কেবিনে, স্টেডিয়ামে হেলসিঙ্কিতে কবি তাঁকে খোঁজেন। ঘরের মার্বেল মেঝে, ছাদে বা সিঁড়িতে যেখানে তাঁর নিত্য উপস্থিতি ছিলো, সেখানে আজ পায়ের চিহ্ন কোথাও নেই। এই

হাহাকার প্রতিধ্বনিত হতে থাকে কবিতার শরীর জুড়ে,

"তুমিও হারিয়ে যাচ্ছ, দেখাও হচ্ছে না মুখ ফ্রেসকোতে অথবা স্মৃতিতে।
মার্বেল মেঝেয় নেই, ছাদে নেই, সিঁড়িতেও নেই চিহ্ন তোমার পায়ের।"[২]

নিঃস্বতা তাঁকে অস্থির করে তোলে। বোধের ভিতরে কোন এক বোধ জন্ম নেয়। মনে হয় জীবন অর্থহীন হয়ে গেছে। কোনো উদ্দেশ্য নেই বেঁচে থাকার,

"এখন আমার কাছে উদ্দেশ্য বিধেয় ব'লে কিছু নেই আর।
কারোর জন্যেও নেই হৃদয়ের উষ্ণ আঁচ, আবেগ, আব্দার।"[৩]

ক্ষণ-দিন-মাস অতিক্রান্ত হতে থাকে। কবি বুঝতে পারেন ক্ষতি যা কিছু হয়েছে তা মুহূর্তের এবং ব্যক্তিগত। শোকও দীর্ঘস্থায়ী নয়। জীবন জীবনের নিয়মে চলতে থাকে। 'পিপঁড়েরা হেঁটে চলে', 'ভুঁইপোকা জন্ম লয়', 'ধীরে ধীরে চারা কিছু উঁকি মারে' ('শূন্যতাও অস্থায়ী আভোগ')। জীবন তার কাছে হয়তো 'বিষণ্ণ রুদালি' বা 'ন্যাড়াপোড়ানোর' সদৃশ হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই শূন্যতা, সেই 'অলখ ছায়া'ও একদিন রোদের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। যদিও তা ক্ষণিকের। একাকীত্ব বারবার ঘুরে ফিরে আসে জীবনের শেষ প্রান্তে।

কবি কখনো কখনো নিজেকে বয়ঃবৃদ্ধ গাছের মতো নিঃস্ব রিক্ত মনে করেছেন। 'গাছ' কবিতায় সেই 'স্মৃতিহীন আঁচে' টিকে থাকার কথা উঠে এসেছে। ডালপালা নেই, বয়সের ভারে নুয়ে থাকা গাছে কোনো পাখি উড়ে এসে বসে না আর। সারা গায়ে ঘুণ ধরে গেছে। উপেক্ষার অন্ধকার এতই গাঢ়তর যে ছায়ারাও এড়িয়ে চলে তাকে। স্ত্রীবিয়োগ তাঁর জীবনকে কতটা অর্থহীন ভঙ্গুর করে তুলেছে তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে কবিতার অক্ষরে অক্ষরে। 'স্ববন্দি' কবিতায় কবি লিখেছেন 'নিজেকে নিজেই বন্দি' করে রেখেছেন মনের গোপন সিন্দুকে। সময় পেলেই যে 'নকশাবুনোট উলের কাঁটা' চলতো, নিভৃত কুজনে জীবনের জোয়ার-ভাটা খেলে যেত, তা এখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। এখন শুধু 'বিশ্ব বিপুল শূন্যতার' দীর্ঘশ্বাস,

"কথার ভাঁড়ার শূন্য প্রান্তরের, খড়কুটো কিছু প'ড়ে নেই।
এখন অপেক্ষা জারি। অনেক হয়েছে বস্তুজগতের জোয়ারভাটায়।
বাবুইয়ের বাসা ফাঁকা, তারও যেন ঘর নেই সবুজ চূড়ায়।
সঙ্গিনী উড়েই গেলে আত্মহননের চিন্তা মগজ জুড়েই।"[৪]

হৃদয়ে যেন 'তালাচাবি' লেগে গেছে। 'স্মৃতিময় পাহাড়ে'র আলো-আঁধারে তবু মাঝে মাঝে মনে হয় সে হয়তো দূরে কোথাও যায়নি, কাছেই আছে। তাকে অনুভব করা যায়, কিন্তু ধরা যায় না। তাই,

"শূন্য ঘরে কেন ওঠে নির্জনতার ঢেউ ?
বলতে পারে কেউ
হৃদ্মাঝারে রাতবিরেতে কে দিয়ে যায় হানা?
অধরা যন্ত্রণা।"[৫]

প্রেম আজ ক্ষতবিক্ষত, স্বপ্নেও অনিশ্চয়তার ছোঁয়া। ব্যাকুল ডাক মৌন, তা দীর্ঘশ্বাসে পর্যবসিত। শোক হয়তো কবি নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন বোধের দ্বারা। কিন্তু স্মৃতির ঝড় যখন ওঠে, তখন 'স্মৃতির জ্বরে' মুহ্যমান হয়ে পড়েন তিনি। বিরহের 'গুল্মকাঁটায়' সব শূন্য মনে হয়। কবি লেখেন,

"তুমি আর নেই সেই চেনা তুমিতেই
স্মৃতি বিস্মৃতি সাড়ম্বর।
গিয়েছো কোথায়! এ সময় কোনদিকে?
কেন রেখে গেলে আমাকেই প্রান্তিকে ?"[৬]

'স্মরণসভায়' কবিতায় কবি তুলে ধরেছেন জীবনের এক অতি বাস্তব চিত্র। স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা, শ্রম দিয়ে গড়ে তোলা, দুটি হৃদয়ের 'সেতুবন্ধন' যে বাড়ি, মৃত্যুর পরে তা তো পড়ে থাকে ভূমে, কোনো কিছুই নিয়ে যাওয়া যায় না মৃত্যুর পরে। সবই 'স্মৃতিলাঞ্ছন' হয়ে পড়ে থাকে।

বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় কাতর কবির জীবনে আচমকাই যে ছন্দপতন ঘটেছিল স্বপ্নের মধ্যে যদি বেখেয়ালে হয় পুনর্বার সাক্ষাৎ তখন কি সুপ্ত মন আবার জাগ্রত হবে ! এমন কুয়াশা-কঠিন প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয় মন,

"আমার শরীর মিথ্যে, এ সময় ক্লান্ত লাশঘর,
শিরায় শিরায় যেন কর্কটের ভাসমান মেঘ;
দমবন্ধ অবস্থাটা পড়ে আছে ত্বকের নীচেই
আবার কি দেখা হবে, উশে দেবে অবুঝ আবেগ?"[৭]

স্মৃতি যেন 'অতল আঁধার'এ 'মৃদু অনুভূতি'। আবেগের ধ্বস নামে অতলান্ত খাদে। না হারালে বোঝা যায় না সে কতটা প্রিয় ছিল। ভালোবাসার মানুষকে হারিয়ে তাকে খুঁজতে সাদা গোলাপ এক গুচ্ছ ঘরে এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখেন।

'তুমি, তুমি, তুমি' কবিতাটি অসামান্য আবেদনে ধরা দিয়েছে। কাছের মানুষটিকে হারানোর বেদনা যেন এক সর্বজাগতিক অর্থে ব্যাপকতা লাভ করেছে। একটি বাংলা পংক্তির পরে একটি জার্মান পংক্তি; তারপর আবার একটি ইংরেজি পংক্তি। তিনটি একই অর্থে প্রযুক্ত। অর্থাৎ কবির এই বিরহ শুধু কবির নিজস্ব নয়, পৃথিবীর অপরপ্রান্তে কোনো বিরহীর সাথে তা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়,

"ওপরে রাত
Noche arriba
The night above.
আমরা দু'জন
Los dos

গণেশ বসুর শেষের কবিতা

We two.

পূর্ণ চাঁদ
Con luna llena
Full moon.

পূর্ণ চাঁদ আমরা দু'জন ওপরে রাত
ওপরে রাত। O। আমরা দু'জন।"[৮]

বারবার মনে হয় হয়তো সময় হয়ে গেছে, প্রিয়তমার ডাক বুঝি আসবে এইবার। কবি প্রতীক্ষারত হয়ে বসে থাকেন। একেবারে শেষের দিকের কবিতা 'বাসনা'য় সেই অপেক্ষমান কবিকেই যেন আমরা দেখি, "শরীর শীতল হ'তে খুব বেশি দেরি নেই আর।"[৯]

'দেয়ালজোড়া ফ্রেমে' যে বন্দি হয়ে আছে সে কি শুধুই ছবি! চোখের আলোয় যাকে দেখা যায় না চোখের বাইরে অর্থাৎ অন্তরে তাকেই খুঁজে পাওয়া যায়। 'তিনি' কবিতাটি একদম ব্যতিক্রমী একটি কবিতা। এর গঠন বাংলা কবিতার ভাণ্ডে অনন্য এবং নতুন পথের দিশারী। কয়েকটি অযৌক্তিক অক্ষর এলোমেলো বিস্রস্ত ছড়ানো ছিটানো রয়েছে। কবি যেন বলতে চেয়েছেন ঘরের ভিতর ও বাইরে আমাদের সম্পর্কগুলো এমনই সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছে। কারুর সাথেই কারুর যেন কোনো সংযোগ নেই। সবাই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো অবস্থান করছে। প্রেমহারা জীবন কবিকে এতটাই নিঃসঙ্গ করে তুলেছে যে কবিতার শরীরেও সেই একাকীত্ব ধ্বনিত হয়েছে। 'ভাসমান বিষণ্ণতা' কবিতায়ও বিষাদ-ঘন দীর্ঘশ্বাস পাঁজরটাকে ঘিরে ধরে,

"তোমার কাছেই এসেছিলাম শাপলাপাতা ভোরে
তুমিই গেলে সরে
রাত্রি হঠাৎ ঝাঁপ মেরেছে ঘষাকাচের দোরে।"[১০]

মনের ঘষা কাচের শার্সিতে ঝাপসা হয়ে আসে বেদনার্ত মন। 'হাড়হিম নীরবতা'র মাঝে রোগশয্যায় ঘুমন্ত প্রেয়সীর মুখ মনে পড়ে। বোধের ভিতরে এক প্রশ্ন জন্ম নেয় 'মৃত্যুর পরে কি ফের জীবন সুন্দর?' অনিঃশেষ ভালোবাসা সুন্দরেরই অন্বেষণ করে চলে নিরন্তর।

স্ত্রী বিয়োগ কবিকে মৃত্যু ও মৃত্যুত্তীর্ণ জীবনবোধে উত্তোরিত করলেও সমাজ- সমকাল-মানুষ সম্পর্কে তিনি কখনোই উদাসীন থাকতে পারেননি। তাঁর শেষের কবিতাতেও সমাজ মনস্কতা প্রকাশ পেয়েছে। আসলে কবির রক্তে মিশে ছিল বিপ্লবের আঁচ। ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল তাঁকে। ফেলে আসা জন্মভূমির স্মৃতি তাঁর সত্তাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর ষাট-সত্তরের দশকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়া। ১৯৫৩ সালে ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি, ১৯৫৪-র শিক্ষক ধর্মঘট, ১৯৫৯-এর খাদ্য আন্দোলন প্রভৃতি আন্দোলনকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। কখনো

প্রত্যক্ষভাবে যুক্তও হয়েছেন। এসবেরই প্রতিচ্ছায়া লক্ষ করা যায় তাঁর ‘নিজের মুখোমুখি’ (১৯৬৭), ‘রক্তের ভিতরে রৌদ্র’ (১৯৬৯), ‘লেলিন: অধিকার রক্তের কবিতার (১৯৭০), ‘অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ’ (১৯৭১), ‘বাঘের থাবার নিচে’ (১৯৮২), ‘নীরব সন্ত্রাস’ (১৯৯৯), ‘অন্ন আশ্রু ভায়োলিন’ (২০০৪), ‘ভাসান দরিয়া’ (২০০৮), ‘ভাঙা বইঠার গান’ (২০১১), ‘বর্ণময় পৃথিবী’ (২০১৩), ‘বল্গা হরিণের শিং’ (২০১৫) কাব্যগ্রন্থগুলির কবিতার ছত্রে ছত্রে। শাসকের অত্যাচার, ক্ষুধার্ত সর্বহারা শোষিত মানুষের হাহাকার, প্রতিরোধ, রাজনৈতিক অস্থিরতা কবির রক্তের ভিতরে ‘লক্ষ লক্ষ ক্রোধের ফার্নেস’ (‘রক্তের ভিতরে রৌদ্র’) তৈরি করে। তাঁর ‘ধমনী নিদ্রিত সিংহ ফুঁসে ওঠে রৌদ্রের কেশরে’ (‘সিংহ’)। আর তখন প্রেম, নারী, স্বদেশানুরাগ কবির চেতনায় একাকার হয়ে যায়। সমকালের নিকষ কালো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কবি পথ খুঁজতে থাকেন, আলোর সন্ধান করতে থাকেন। কিন্তু ‘সোনালি গির্জার সেই মোরগচূড়ায়’ আর পৌঁছতে পারেন না। বর্তমান ঘুন ধরা সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এ উদ্বিগ্নতা দায়বদ্ধতা থেকেই তৈরি হয়। স্বৈরাচারী শাসকের তাণ্ডব লীলায় গণতন্ত্রের ধ্বস্ত রূপ কবিকে বিচলিত করে তোলে। আর তখন কবি কলম ধরেন নির্ভিক চিত্তে,

“ক্ষমতা ছেনাতে চায় কুমিরেরা। কখনো কখনো চুক্তি বাঘেদের নিয়ে।
ক্ষমতার স্বপ্ন দেখে বুনোমোষ, সাপেদের পরামর্শ মেনে
ইঁদুর বিছেরা ছুঁচো দেশে দেশে ভ্যান্টাল্যাক সুড়ঙ্গ বানিয়ে
শূন্য ক’রে দিয়ে যায় মানবমনীষা,
স্তম্ভগুলি গুঁড়ো গুঁড়ো, ডাকাতির খনি।
গণতন্ত্র খাবি খায়, কোথায় কোথায় তুমি মামণি, মা ম ণি!”[১১]

এই যে দেশ জুড়ে বাংলা জুড়ে মামনিদের নরম শরীর লোভাতুর পুরুষ তথা শাসক ছিঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে, রাতদখল করছে মেয়েরা—এ ভ্যান্টালিজম তো কবি আগেই উপলব্ধি করেছিলেন—কী দূরদৃষ্টি কবি প্রজাপতির!

কিভাবে এই রুদ্ধ দরজা খোলা যাবে, সেই চাবি কোথায় কার কাছে আছে তা তাঁর জানা নেই। শুধু এটুকুই জানেন যে ‘জং ধরেনি এ হৃদিতে’ তাই

“স্বপ্ন আজো মৃত্যু-জয়ী
ক্ষয়ক্ষতি নেই শিরদাঁড়ায়।”[১২]

বিশ্বাসের বীজ বুনে চলেন কবি। স্বপ্ন ভাষণের মিথ্যে ফানুসটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চান। মগজে শান দিতে থাকেন। তিনি জানেন ‘একনায়কেরা কোনো সুপারনায়ক নয়’ (‘একনায়কেরা’), এরা ‘ক্ষণিকের বিভীষিকা’ (‘একনায়কেরা’) মাত্র। এদের তিমিরবিলাসের একদিন অবসান হবেই। কিন্তু ‘বিদ্বেষের ষাঁড়াষাঁড়ি, ধর্মহীন ধর্মবোধ তামসিকতায়’ (‘ইতিহাস’)

নিমজ্জিত সমাজের পরিত্রাণ কিসে! রাজা আসে, রাজা যায়, গণতন্ত্রের হাত বদল হয়, শিক্ষা স্বাস্থ্য বিশবাঁও জলে,

"হাতবদল হ'য়ে যায় গণতন্ত্রে কয়লার চেয়েও কালো ভ্যান্টাব্ল্যাক ব্যবস্থাপনায়।
শিক্ষাও এদেশে পণ্য আগ্রাসী ক্ষুধায়।"[১৩]

মানুষ মানুষকে ঠকায়, তার ধূর্ততার কাছে 'শেয়ালও ফ্যাকাসে ম্লান' ('আঙ্গার')। 'দুরারোগ্য দুর্নীতির জাল' বুনতে থাকে তারা। বিনষ্টির শেষ ধাপে পৌঁছে যায়,

"যারা বহুদিন ছিলো পায়ে পায়ে হাতে হাতে স্বপ্ন ছুঁয়ে প্রীতিতে নিষ্ঠায়
তারাও চূড়ান্ত লোভে ঠাডাপড়া তীক্ষ্ণ তরবারি।
তারা ক্রমে স'রে যায় লক্ষ থেকে, ব্যক্তিও ঝাঁপিয়ে পড়ে হিংস্রতায় বড়ো
তাড়াতাড়ি সুস্থতা বিশ্বাস স্নেহ মুহূর্তেই
খ্যাপা ষাঁড় লন্ডভন্ড ক'রে দিয়ে যায়।"[১৪]

মানুষ জলের মতো। যে পাত্রে রাখা হবে সেই পাত্রের আকার ধারণ করবে। শরণার্থী মানুষ দ্বিতীয় মাতৃভূমিতে 'শান্তির শীতলপাটি' ('মানুষ এখন') বিছিয়ে থাকে। কবিও একদিন এভাবেই এসেছিলেন। সহমর্মিতা আর সহিষ্ণুতা দিয়ে গড়ে তুলেছেন দ্বিতীয় আবাসভূমি। কিন্তু কখনো শিরদাঁড়াটা ধনুকের মতো বাঁকাতে হয়নি। আপোস করে চলেননি অন্যায়ের সঙ্গে,

"নির্মমতার ভিড়ে
আজো আছি সত্তা স্বাধীন
আকাশকুসুম ছিঁড়ে
সত্যতাকে ঘিরে।"[১৫]

কবি আশাবাদী। হৃদয়ে কারফুজারি করতে চান না আর। বিশ্ব জুড়ে এই যে লাশের মিছিল, এই তামসতা, নরকবাস ঘুচে যাক। কবির প্রার্থনা ঈগল শকুন প্রেমিক হয়ে যাক। কবির মনের মধ্যে যে কম্যুনিজমের আদর্শ রয়েছে তাকেই বাঁচিয়ে রাখতে চান তিনি অতি যত্নে।

সংসদ ভবনের মধ্যে রাজনীতিবিদদের আচরণ দেখে কবির সার্কাসের কথা মনে আসে। দেশপ্রেম যেন দেশদ্রোহিতায় পর্যবসিত। বিচারের মানদণ্ড শোষকের অধীনস্ত। 'নারকীয় নিন্দ্য ইতিহাস' ('বিবৃতি') রচিত হয়। কবিতাই তখন একমাত্র আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়,

"আলো নেই, জ্ঞান নেই, স্বস্তির বিনাশ,
হৃদয়েও তালাচাবি, সে সময়ে গান আর কবিতাই বিরল বিভাস।"[১৬]

শুধু দেশ নয়, বিশ্ব সন্ত্রাস নিয়েও কবি বিচলিত। গুপ্ত ঘাতক যেন লুকিয়ে রয়েছে। সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে। তাই কবি অশনিসংকেত দেখেন। 'হিংসা মৃত্যু আজরাইল অঞ্চল'। রাষ্ট্রসংঘের উদাসীন কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ বিস্মিত কবি লেখেন,

"রাষ্ট্রসংঘ ধৃতরাষ্ট্র, রঙ্গনপাপড়িরা
কেন যুদ্ধের লাশ?
অদ্ভুত ইতিহাস।"[১৭]

চারিদিকে 'ক্ষমতা শানিত উলঙ্গ তরবারি' ('বিপর্যয়')। বাতাসে বারুদের গন্ধ ছড়ানো। সমাজ আজ 'ফোঁপরা' হয়ে গেছে। খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আমরা। আইনের চোখ একপেশে, গণতন্ত্রের তৃতীয় স্তম্ভ 'ট্রায়ালে বিচারের রায়' ঘোষণা করে। বঞ্চনা ক্রমে বেড়েই চলে,

"ধর্ষিত ও সময়ের স্নায়ুতে স্নায়ুতে কোশে কোশে
নির্বাচনী গণতন্ত্র খেলা করে স্বৈরতন্ত্রী ম্যাজিক মুখোশে।"[১৮]

'চিত্রকল্প' কবিতাটিতে অভিনব সুচারু ভঙ্গিমায় মৌলবাদ, রাজনীতি, শাসক, দুর্নীতির চিত্রকল্প অঙ্কিত হয়েছে। নির্বাচনী গণতন্ত্র আজ রাজতন্ত্র বা দাসতন্ত্রে পর্যবসিত। 'চারদিকে রাষ্ট্রের/ চোরাবালি জল্লাদ' ('তৃষ্ণায়')। নীরবে জাল বুনে যায় মাকড়শারা। স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে কবির কলম,

"আমাদের ডানা ফের ছাঁটা হবে ? ঘাতকের খড়্গা বিদ্বেষের
বিশ্বস্ত পায়ের নীচে মাটি আর পোক্ত নেই, রাষ্ট্রযন্ত্র নাতসি পুলিশের।"[১৯]

'লাশপাহাড়ের এমনতর বীভৎসতা' ('চলকানো রক্ত'), 'উপচেপড়া রক্তনদী' ('চলকানো রক্ত'), এত অবিচার, এত অনাচার 'আর কত সহ্য হয় হায়েনীয় রাষ্ট্রের লাঞ্ছনা?' ('পুনশ্চ') তাই 'নরম পৃথিবী ক্রমশ গরম হয়' ('সভ্যতা')। সীমা পেরিয়ে গেলে ভস্ম হয়ে যেতে পারে নিমেষেই। কোনো আশার আলো নেই, এমনকি 'জোনাকিরা আলোহীন' ('ঋণ')। তবু 'শিরায় শিরায় ফোঁটা ফোঁটা বয়' স্বপ্ন। এ তমিস্রা কাটিয়ে একদিন পৌঁছে যাবেন পূর্ণতায়। কারণ 'স্বপ্ন বেঁচে থাকে' ('দ্বিখণ্ডিত স্বর্গ')। কবি মাথা না বিকিয়ে গান গান, ছবি আঁকেন, কবিতা লেখেন; আর মুঠো রাখেন শক্ত করে। সহযোদ্ধাদের সাহস যুগিয়ে সামনের সারিতেই দাঁড়ান। গুলি বন্দুক রক্তের স্বাদ নিতে প্রাণ কাড়তে পারে। 'তবু উজ্জ্বল সুন্দরতম সুগভীর প্রত্যয়' ('মৃত্যু অথবা জয়') নিয়ে অপেক্ষমান থাকেন। ভরসা দেন 'কেউ একা নয়, পাশে আছি জেনে নিয়ো' ('আমি আছি, আমি আছি')। বোঝেন পরিবর্তন একার পক্ষে আনা সম্ভব নয়। তাই সম্মিলিত হওয়ার ডাক দেন,

"স্বপ্ন বানানো স্বপ্ন বাঁচানো কোরাসেই স্বাভাবিক
সৃজনে মননে কথনে দহনে রাস্তাই মানবিক।"[২০]

গণেশ বসুর কবিতা আমাদের এক নতুন পথের দিশারী। আত্মানুসন্ধান ও আত্মজাগরণের মধ্যে দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী। চিত্ত ও বোধের শুদ্ধিই তাঁর লক্ষ্য। তাই তাঁর কবিতায় মানবতার নিশান উড়তে থাকে প্রত্যয়দীপ্ত ভঙ্গিতে।

তথ্যসূত্র :

বসু গণেশ, গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ ৩, সম্পাদনা ড. জয়গোপাল মন্ডল, দিয়া পাবলিকেশন, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, প্রথম সংস্করণ, জুলাই ২০২৪

নি খি ল চ ন্দ্র মা হা তো
গণেশ বসুর কবিতায় মৃত্যু-চেতনা

"সময় ফুরিয়ে এলো। নানাবিধ ঝড়ঝাপ্টা উপেক্ষা লাঞ্ছনা, অসূয়া সইতে সইতে যে-কোনো মুহূর্তে আমি চলে যেতে পারি বিস্মৃতির অতল আঁধারে।"[১] গত শতকের ছয়ের দশকের অন্যতম প্রধান কবি গণেশ বসুর জীবনে উপেক্ষা, বঞ্চনা ছিল নিত্যসঙ্গী। সারাজীবন নিজের আদর্শে অবিচল থেকে কাব্য-সাধনা করে গেছেন। পুরস্কারের লোভে কিংবা ভয়ে কখনো কারো তোষামোদ করেননি। ফলে বড় কোনো প্রতিষ্ঠানের বদান্যতা বা সরকারের দাক্ষিণ্য কিছুই তাঁর কপালে জোটেনি। রয়ে গেছেন প্রচারের আলোর বাইরে। তবে এ নিয়ে কবি কখনোই প্রকাশ্যে আক্ষেপ করেননি। ভিতরে ভিতরে একটা যন্ত্রণা হয়তো বয়ে বেড়িয়েছেন, কিন্তু নিজের সৃষ্টি-বিশ্বে তার ছাপ পড়তে দেননি। 'কবিতা সংগ্রহ' দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় কবির এই উক্তি তাই কতকটা আপাত নির্মেঘ আকাশে হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকানির মতো। যার মাধ্যমে কবি-হৃদয়ের রক্তক্ষরণের একটা দিক প্রকাশ হয়ে পড়ে। প্রকাশ হয়ে পড়ে আরো একটি অনালোকিত দিক, তা হলো — 'সময় ফুরিয়ে এলো' অর্থাৎ কবির মৃত্যুচেতনা।

ছিন্নমূল এই কবি বেঁচে থাকার জন্য জীবনে প্রচুর ঝড়ঝাপ্টা সহ্য করেছেন। জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও জমিদারি-সচ্ছলতায় মানুষ হতে পারেননি। মাত্র আট বছর বয়সে দেশভাগের অভিশাপ বহন করে চলে এসেছেন এপার বাংলায়। খড়কুটোর মতো ভেসে বেড়িয়েছেন মাথা গোঁজার একটু আশ্রয়ের জন্য। বাল্য বয়সেই নেমে পড়তে হয়েছে কাজে। আধপেটা সিকিপেটা খেয়ে দিন অতিবাহিত হয়েছে। চোখের সামনে বোনকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেখেছেন। ওই কচি বয়সেই হারিয়েছেন বাবাকেও। এরকম কঠিন-কঠোর জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাঁদের বেড়ে ওঠা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের হতাশা, বিষাদ ঘিরে ধরে। বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পান না। জীবন-যুদ্ধে টিকতে না পারার আশঙ্কাও গ্রাস করে ফেলে। কিন্তু জীবনে এত টানাপোড়েন সত্ত্বেও গণেশ বসুকে কখনো মৃত্যুভয় তাড়া করেনি। তাঁর 'কবিতা সংগ্রহ' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের কবিতাগুলিতে তাই মৃত্যুচেতনা খুব একটা দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ প্রিয়তমা স্ত্রী-র মৃত্যুর পর মৃত্যুচেতনা কবির ভাবনাবিশ্বের একটা বড় অংশ দখল করে নিয়েছে। যার প্রতিফলন দেখা যায় 'কবিতা সংগ্রহ' তৃতীয় খণ্ডের কবিতাগুলিতে।

কবির পুত্র, কন্যা বিদেশবাসী। অসুস্থ সহধর্মিনী আর কবিতাকে সঙ্গী করে এই অশীতিপর বৃদ্ধের দিন গুজরান হতো। আশঙ্কায় উদ্বেগে পার করে দিতে পেরেছিলেন করোনা মহামারীর বিভীষিকাময় বছরগুলিও। কিন্তু অন্ধের যষ্ঠিস্বরূপ স্ত্রী-কে হারিয়ে এবার যেন কবি পড়লেন

অকূল-পাথারে। এই বিরাট সংসার-সমুদ্রে তিনি হয়ে পড়লেন সম্পূর্ণ একা। মুখোমুখি বসে কথা বলার মতো একজন আপনজনও নেই। ফলে জীবন যেন হয়ে উঠল উদ্দেশ্যহীন। 'হৃদয়ের উষ্ণ আঁচ' অর্থাৎ প্রেম-ভালোবাসা, রাগ-অভিমান, আবেগ বিনিময় করার মতো প্রিয়জন কেউ আর নেই তাঁর পাশে—

"এখন আমার কাছে উদ্দেশ্য বিধেয় ব'লে কিছু নেই আর।
কারোর জন্যেও নেই হৃদয়ের উষ্ণ আঁচ, আবেগ, আব্দার।"[২]

আত্মীয়-পরিজনহীন কবি বার বার নিজেকে এক গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যার ডালপালা কিচ্ছু নেই। পাখিও এসে বসে না আর। তার পরিবর্তে উইপোকা ঘোরাফেরা করে। জরাজীর্ণ কাণ্ডটা বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। সামান্য ঝড় এলেই বোধহয় এবার ভেঙে পড়বে—

"কোনোভাবে টিকে আছে যেন
পাতাগুলো স্মৃতিহীন আঁচে
ডালপালা নেই গায়ে আর
বয়সের ভারে নুয়ে বাঁচে।"[৩]

কিংবা,

"বিরল বাগান থেকে রোজ কিছু গাছ উড়ে চ'লে যায় অলখ ছায়ায়।
ডালপালাশূন্য ধড় মাঝে মাঝে প'ড়ে থাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেন মর্গের মানুষ।"[৪]

এখন যেন কবির শুধুই দিনগোনা। যেকোনো সময় প্রিয়তমার ডাক এসে পৌঁছতে পারে। অমনি মৃত নক্ষত্রেরর মতো টুপ করে ঝরে পড়বেন তিনি। রোগগ্রস্ত শরীর নিয়ে দীর্ঘ বিনিদ্র রজনী যাপনের সময় তিনি যেন স্ত্রীর আহ্বান শুনতে পান—

"পুবের বারান্দা থেকে রোজ
শেষরাতে আমি তাকে দেখি
ওশপড়ে, ব'সে ব'সে ভাবি
খোঁজ নেয় আমাকেও সে কি?"[৫]

মৃত্যু চিন্তায় আচ্ছন্ন ব্যক্তির মনে একসময় অবধারিতভাবে যে প্রশ্নটা আসে তা হলো— মৃত্যু-পরবর্তী জীবন কেমন?

"বোধের ভিতরে তবু জিজ্ঞাসার খড়্গ খোঁজে মৃত্যুর পরে কি ফের জীবন সুন্দর?"[৬]

কিন্তু সে জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে না। আর সেখান থেকেই জন্ম নেয় ভয়। অজানা, অনিশ্চয়তার ভয়—

"শেষের সেদিন কেমন হবে
জানতে কি চায় জলঘোড়া?

ভয়টা কীসের? পাঙ্গা কষি
হোক না শরীর রোদপোড়া।”[৭]

শেষ দিনটা কেমনভাবে কবির সামনে উপস্থিত হবে এই চিন্তা তাঁর অবচেতন মনে অহরহ ঘোরাঘুরি করে।। এরপর যখন সচেতন হয়ে ওঠেন তখন ‘ভয়টা কিসের’ বলে সেই মৃত্যুভয়কে যেন উড়িয়ে দিতে চান। আত্মচিন্তায় মগ্ন থেকে অনিবার্য মৃত্যুকে অহেতুক ভয় পাওয়ার জন্য কখনো কখনো বোধহয় কবির সংকোচও হয়—

“মৃত্যুর ফাঁড়িটা সবে এড়িয়ে এসে গেছে আমার হৃদয়।
—তুমি কি আতঙ্কগ্রস্ত নিজেকে নিয়েই?”[৮]

মৃত্যু-চিন্তাটাকে কতকটা জোর করে সরিয়ে রেখে নিজের সৃষ্টিশীল জগতে মনোনিবেশ করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু সেখানেও লক্ষ্য করেন—

“গিটারে তরঙ্গ নেই, মানবপ্রেমিক নেই বিপ্লবীর মতো,
কোকিলের স্মৃতি নেই, দিন রাত সব একাকার।
অপেক্ষার কারাগার।”[৯]

একদিন মানুষের ‘অন্ন অশ্রু’-র জন্য তাঁর কাব্য-ভায়োলিনে সুর তুলেছিলেন। কিন্তু আজ জীবনের প্রান্তবেলায় এসে দেখলেন — ‘গিটারে তরঙ্গ নেই’। সুর যেন আর খেলছে না। ‘কোকিলের স্মৃতি নেই’ অর্থাৎ রোম্যান্টিক কবিতা রচনার রসদও খুঁজে পাচ্ছেন না। পাবেন কী করে - যে প্রিয়তমা স্ত্রীকে নিয়ে সুখে দুঃখে এতকাল কাটিয়ে দিলেন তিনিই তো আর নেই। অনুপ্রেরণা কোথা থেকে পাবেন? সুতরাং এখন শুধুই অপেক্ষার দিনগোনা। এই নিষ্ফল, নিঃসঙ্গ, অর্থহীন ‘কারাগার’ থেকে মুক্তি লাভ করে অমৃতলোকে পাড়ি দিয়ে প্রিয়তমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য পথ চেয়ে থাকা। অর্থাৎ ঘুরেফিরে সেই মৃত্যুচেতনা।

স্ত্রী চলে যাওয়ার পর এবার সন্তানদের কাছে পাওয়ার আকুলতা তীব্র হয়ে ওঠে। ‘সন্তান’ নামক কবিতায় বলেন—

“সন্তান
সেতুবন্ধের গান,
সন্তান
আত্মার জয়মান।
সন্তান
বাতায়ন, ইনসান।
সন্তান -
উজ্জ্বল উদ্যান।
সন্তান -
সত্তার রূপকল্প।

সন্তান -
আলোর পৃথিবী, পৃথিবীর আশমান।"[১০]

শূন্য ঘরে একাকী দিনযাপন করতে করতে কবি যেন নতুনভাবে উপলব্ধি করেন সন্তানের তাৎপর্য। কখনো ডুবে যান সন্তানদের ছোটোবেলার দিনগুলিতে। কীভাবে তাদের মানুষ করেছেন তা এই বৃদ্ধ বয়সে বার বার মনে পড়ে। 'সেই ছেলেটিই' কবিতায় স্মৃতির সাগরে অবগাহন করে তুলে আনেন পুত্রের জন্ম, অসুখে ভোগার কথা আর অশান্ত পিতৃহৃদয়ের উদ্বিগ্নতার দিনলিপি। তবে—

"সেই ছেলে এখন বিজ্ঞানী
বিশ্বনাগরিক
তার কাছে
সময় সমাজ মহাকাশ
কেউ নয় সদুত্তর জীবন মৃত্যুর।"[১১]

মাঝে মাঝে তীব্র অভিমান হয়। অনুতাপও হয় কি? সন্তানদের উচ্চ-শিক্ষিত করে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করে তোলার জন্য — "অনুতাপের জ্বরে পোড়ে স্মৃতির অভিমান / প্রবাসী সন্তান।"[১২] সীমাহীন একাকীত্বের যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হতে হতে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে এরকম অনুতাপ উঁকি দিলেও কবি তাকে প্রশ্রয় দেন না। এইজন্যই কবিতাটি ওই দু'টি পংক্তিতেই সীমাবদ্ধ।

'কবিতা সংগ্রহ' তৃতীয় খণ্ডের কবিতাগুলিতে বারবার ঘুরেফিরে এসেছে স্ত্রীর সঙ্গে জীবনযাপনের দিনগুলির কথা। বিশেষ করে একদম শেষদিকের কথা যখন কবি-পত্নী রোগশয্যায় শায়িত। জলছবির মতো টুকরো টুকরো সেসব ঘটনার বর্ণনা দিয়ে কবিতার শেষ স্তবকে অবধারিতভাবে তাঁর মৃত্যুর কথা ও কবির একাকীত্বের হাহাকার—

"হাড়হিম নীরবতা
মেনে চলতাম, এড়িয়ে যেতাম
মৃত্যুর কথকতা।
যখন ঘুমোতে একা
ঠোঁটদু'টি তার খোলা রয়ে যেতো
রোগশয্যায় দেখা।
ঘুমিয়েই পারাপার
নদীতে সাঁতার, উড়িয়েই নিলো
রহস্য আত্মার।"[১৩]

ছিন্নমূল হয়ে এদেশে আসার পর বেঁচে থাকার জন্য কবি আক্ষরিক অর্থেই লড়াই করেছেন। খুদের জাউ ও মুড়ি খেয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিয়েছেন। কখনো সস্তার ভাড়াবাড়িতে তো কখনো আত্মীয়ের অনুগ্রহ-প্রত্যাশী হয়ে বাড়ির বারান্দায় রাত কাটিয়েছেন।

স্বদেশে যে মা ছিলেন রাজরাণীর মতো, এদেশে এসে তাঁকেই কখনো কাঁথা সেলাই, কখনো অন্যের বাড়িতে রাঁধুনির কাজ, কখনোবা প্লাস্টিক কারখানায় অস্থায়ী কর্মীর কাজ করতে দেখেছেন। এরকম নিদারুণ জীবনযন্ত্রণা সত্ত্বেও কবিকে কখনো হতাশা ঘিরে ধরেনি, আত্মহননের ইচ্ছা জাগেনি। বরং তাঁর মতো হাজার হাজার সর্বহারা মানুষের সুদিন আনার লক্ষ্যে মার্কসীয় আদর্শে দীক্ষা নিয়েছেন। স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। জনজাগরণের স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু জীবনের প্রান্তবেলায় এসে স্ত্রীকে হারিয়ে হতাশা ও একাকীত্বে মুহ্যমান হয়ে লেখেন—

> "কথার ভাঁড়ার শূন্য প্রান্তরের, খড়কুটো কিছু প'ড়ে নেই
> এখন অপেক্ষা জারি। অনেক হয়েছে বস্তুজগতের জোয়ারভাটায়।
> বাবুইয়ের বাসা ফাঁকা, তারও যেন ঘর নেই সবুজ চূড়ায়।
> সঙ্গিনী উড়েই গেলে আত্মহননের চিন্তা মগজ জুড়েই।"[১৪]

কবিতার আঙ্গিক নিয়ে গণেশ বসু সারাজীবন পরীক্ষা-নিরিক্ষা করেছেন। জীবনের শেষলগ্নেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কবির ব্যক্তিগত জীবনের একাকীত্ব কীভাবে কবিতার আঙ্গিককে প্রভাবিত করছে তার পরিচয় পাওয়া যায় এই পর্বের কবিতায়। কবিতার নাম 'তুমি তুমি তুমি'। প্রথম লাইন বাংলায়, দ্বিতীয় লাইন জার্মানে ও তৃতীয় লাইন ইংরেজিতে — এইভাবে ক্রমান্বয়ে কবিতার শুরু। কিন্তু শেষদিকে এসে শুধু বাংলা ভাষাতেই উপসংহার লিখেছেন। এ তো তাঁর জীবনেরই গল্প। প্রথমে বাংলা ভাষায় সাংবাদিকতা ও কবিতাচর্চা। তারপর জার্মানী যাওয়া। সেখানকার শিল্প, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, সংস্কৃতি, আদব-কায়দার সান্নিধ্যে এসে সমৃদ্ধ হওয়া। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেশে ফিরে এসে নিজের মাতৃভাষাকেই আপন করে নেওয়া।

ঠিক তারপরের কবিতার নাম 'তিনি'। আঙ্গিকের অভিনবত্বে স্বাতন্ত্র্য হয়ে উঠেছে এ কবিতাটিও। কবিতার শুরুর কয়েকটি পংক্তি স্বাভাবিক আর পাঁচটা কবিতার মতোই। তারপরেই দেখা যায় শব্দের অন্তর্গত বর্ণগুলো আর পাশাপাশি না থেকে পুরো ভেঙে গিয়ে আলাদা আলাদা হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে—

"মানুষ এবং
ঈশ্বর তাঁর
ফুসফুস হৃৎপিন্ড
সসং প
প্রসং ছগা ভাঠুপ শিভো পূ লে
ককো ম
মা ব প পু
সোত ন চি বি শেষ

... বীজের ডানা আকাশ মাটি
হারানো চাবি
জল”[১৫]

বিক্ষিপ্ত বর্ণগুলিকে একটির সঙ্গে আর একটি জুড়েও অনেকসময় অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। এও যেন কবির ব্যক্তিগত জীবনেরই প্রতিফলন। ছেলে মেয়ে বিদেশে। সহধর্মিনীও পরলোকগতা। অর্থাৎ কবির পুরো সংসার জীবন ছিন্নভিন্ন। ওই ভেঙে যাওয়া শব্দের বিক্ষিপ্ত বর্ণগুলির মতো কবির পরিজন তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে ছিটকে গিয়েছে। ফলে ওই বর্ণগুচ্ছের মতোই কবির জীবনও যেন হয়ে পড়েছে অর্থহীন। ছেদ ও যতিচিহ্ন কবিতার ভাবার্থকে স্পষ্ট করে তোলে, যেভাবে প্রেম-ভালোবাসা, রাগ-অভিমান, আবেগ বিনিময়ের মাধ্যমে জীবন পরিপূর্ণ ও অর্থময় হয়ে ওঠে। কিন্তু উভয়ই এখানে অনুপস্থিত। এ কবিতায় ছেদ ও যতিচিহ্নের ব্যবহার নেই। আর কবির জীবন থেকে দূরে সরে গেছে স্নেহ, প্রেম, রাগ, অভিমান প্রকাশ করার মতো প্রিয়জনগুলো। এ কি কেবল কবির একলা জীবনের বিচ্ছিন্ন জীবন-যন্ত্রণার হাহাকার, না কি এই উগ্র আধুনিকতার শাশ্বত পরিণাম? এখানেই কবি ব্যক্তি থেকে নৈর্ব্যক্তিকতায় পৌঁছে যান। সাধারণত কবিতার বিষয়ভাবনায় কবি-সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত জীবনের ছায়াপাত ঘটে। কিন্তু কবিতার আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে কবির যাপনের প্রতিফলন ঘটানো সত্যিই অভিনব।

‘কবিতা সংগ্রহ’ তৃতীয় খণ্ডের কবিতাগুলিতে কবির একাকীত্ব, হতাশা, মৃত্যুচেতনা বারবার ঘুরেফিরে এসেছে ঠিকই, তবে কবির স্বভাবসিদ্ধ প্রতিবাদী সত্তাটিরও বিলোপ ঘটেনি। ব্যক্তিগত যাপন-যন্ত্রণাকে পাশ কাটিয়ে মানবিকতার পক্ষে আজও তিনি সমান সোচ্চার। যে বয়সে মানুষ পরমার্থ চিন্তায় মগ্ন থাকেন এবং প্রতিমুহূর্তে গা বাঁচিয়ে কথা বলেন সেই বয়সেও গণেশ বসু স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে মুখর। অন্য শিল্পী-সাহিত্যিকরা যখন শাসক-প্রভুর অঙ্গুলিহেলনে কখনো মোমবাতি মিছিল করেন, তো কখনো মৌনব্রত ধরেন; তখন এই অশীতিপর বৃদ্ধ লেখেন— ‘ক্ষয় ক্ষতি নেই শিরদাঁড়ায়’-এর মতো কবিতা—

“জং ধরেনি এ হৃদিতে
হয়নি কাবু ব্যর্থতায়
আমের মুকুল ফাল্গুনেতে
ঢপবাজিদের শাস্তি চায়
স্বপ্ন আজো মৃত্যু-জয়ী
ক্ষয়-ক্ষতি নেই শিরদাঁড়ায়।”[১৬]

এই বিপন্ন মানবতার যুগে তিনি যেন সদা-জাগ্রত বিবেক। ‘গণতন্ত্র খাবি খায়’ স্বৈরাচারী শাসকের হাতে পড়ে। অথচ রুখে দাঁড়াবার মতো মানুষ নেই। ‘অণুবীক্ষণে শিরদাঁড়া’ খুঁজতে হয়। ‘নির্বাচনী গণতন্ত্র’ একটা মুখোশমাত্র। সেই মুখোশের আড়ালে প্রশ্নহীন আনুগত্যের ফতোয়া—

"প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন নয় কোনো।
ধর্ষিত এ সময়ের স্নায়ুতে স্নায়ুতে কোষে কোষে
নির্বাচনী গণতন্ত্র খেলা করে স্বৈরতন্ত্রী ম্যাজিক মুখোশে।"[১৭]

একজন খাঁটি বামপন্থী কবি হিসেবে এভাবেই তিনি সারাজীবন স্বৈরাচারী শাসকের মুখোশ খুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। মানুষের অসহায়তায় পাশে দাঁড়িয়েছেন। যে বয়সে প্রতিষ্ঠিত সন্তানের অর্থানুকূল্যে নির্ভার, নিশ্চিন্তে থেকে সবদিক থেকে সাবধানে গা বাঁচিয়ে চলার কথা, সেই বয়সেও তাঁর লেখনী প্রতিবাদে মুখর। এ যুগের মেরুদণ্ডহীন শিল্পী-সাহিত্যিকদের ভিড়ে তাই তাঁর স্বর স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। মাঝে মাঝে তীব্র একাকীত্ব বোধ তাঁকে কাবু করেছে। জীবন অর্থহীন মনে হয়েছে। আত্মহননের ইচ্ছাও জেগেছে। কিন্তু এসবই শেষ কথা নয়। কবির জীবনের মূলমন্ত্র—"তবু আমি চোখ তুলি, মুখে রাখি হাত/ গান গাই, ছবি আঁকি, কবিতাও লিখি/মাথা না বিকিয়ে।"[১৮]

তথ্যসূত্র :

১। বসু, গণেশ, গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২৩, ভূমিকা অংশ
২। বসু, গণেশ, গণেশ বসুর কবিতা সংগ্রহ তৃতীয় খণ্ড, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২৪, পৃষ্ঠা - ১৮
৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ২০
৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৮
৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ২০
৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৬
৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩
৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ৬৬
৯। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩
১০। তদেব, পৃষ্ঠা - ৮৫-৮৬
১১। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭১
১২। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৯
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ৬০
১৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৫
১৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৬
১৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৪
১৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৪
১৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ৬২

তরুণ মুখোপাধ্যায়

দেবারতি মিত্রের কবিতা : 'এক কণা মুগ্ধ উষ্ণ স্বেদ'

দশক বিভাজনে তাঁর আপত্তি। তা যথার্থই। তবু আলোচনার সুবিধার জন্য আমাদের বলতেই হয় দেবারতি মিত্র ষাট দশকের কবি। যাঁর কবিতায় তথাকথিত নারীবাদ নেই, কিন্তু নারীর ভূমিকা, যৌনতা প্রাধান্য পেয়েছে। প্রাবন্ধিক পরিমল চক্রবর্তী বলেছেন,"কবিতায় দেবারতি ব্যক্তিবাদী, সমষ্টিবাদদী নন" (বাংলা কাব্যধারা : নারীমনীষা)। অন্যদিকে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় ১৯৬৯-এ লেখা হয়, কবির কবিতার "পংক্তিগুলি নরম ও বিপন্ন, নিঃসঙ্গতাময় এবং বিরল কবিত্বে উদ্ভাসিত... নিশ্চিত আধুনিক।" স্বয়ং কবি বলেন,

"ঘটনাচক্রে আমার জীবনে কবিতায় বিকল্প
কিছু নেই, এই একটিমাত্রই আমার পথ ও পাথেয়।"

তাঁর প্রিয় কবির তালিকায় আছেন রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, কিট্‌স্‌ ও এলিয়ট; এরা তাঁকে যেমন উদ্বুদ্ধ করে, 'তেমন আর কেউ না।' নিজের কবিতা লেখা প্রসঙ্গে দেবারতি জানান, (সাক্ষাৎকার/এবং আমরা, ডিসেম্বর, ২০০৭)—

১. কবিতা যেভাবে আমার কাছে ধরা দেয় সেভাবেই লিখি। ভেবেচিন্তে কিছু করবার শক্তি আমার নেই।

২. কবিতা লেখবার জন্য এক প্রেরণা ছাড়া আর কিছুই কাজে লাগে না।

৩. প্রত্যেক কবিরই লিখতে শেখার একটা ব্যাপার আছে।....

তাঁর "শ্রেষ্ঠ কবিতা"-র ভূমিকায় লেখেন,

'...এক বিরাট আন্তর্জাতিক সময় আমার ব্যক্তিগত ছোট সেকালের সমান্তরাল হয়ে আমার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। লেখার আমি সেই স্রোতকে প্রাণপণে ধরতে চাই।'

কবিতায় এমনি অনুভবের ছায়া পড়ে। 'অন্ধ স্কুলে ঘন্টা বাজে' কাব্যে পড়ি,

"...দিকচক্ররেখা থেকে বহুদূরে আলোয় ছায়ায়
প্রতিচ্ছবি কেঁপে ওঠে আমার শরীরে,
বয়ে যায়, সারাদিন ধরে বয়ে যায়।" (প্রতিচ্ছবি কেঁপে ওঠে)

অবশ্য কবি এও স্বীকার করেন,

"বহুকালের সুখ ক্রন্দন হাহাকার, উৎসব, ইন্দ্রিয়ানুরাগ, অদম্য আবেগ, আরও না-জানা অসংখ্য সংস্কার ও প্রবৃত্তি আমার চেতনার মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকে।" এ তাঁর কবিতা-সৃষ্টির রহস্য। উপাদানও বলা যায়।

প্রবুদ্ধ বাগচী তাঁর 'ষাটের কবিতা : চিহ্ন, বিন্যাস' গ্রন্থে এই দশকের কবিতায় কাঠামো ব্যাখ্যায় লিখেছিলেন,

> "সামাজিক নৈরাশ্য, মানসিকতার ক্ষেত্রে তার অনুপ্রবেশ, সমাজবিপ্লবের স্বপ্ন, প্রতিবাদ, ব্যক্তিমগ্নতা, কবিতার বিষয়-আঙ্গিক বদলের আন্দোলন, এ্যান্টি-পোয়েট্রি সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে এইভাবে ষাটের কবিতার কাঠামো।"

ষাটের দশকের কবিতা 'স্বভাবধর্ম' প্রসঙ্গে তিনি দেখেছেন,

> "এই কালপর্বেই চীন-ভারত সীমান্তযুদ্ধের পরিণতিতে কমিউনিস্ট দলের বিভাজন ঘটেছে, ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ এ রাজ্যের অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থাকে বেসামাল করেছে।... সর্বোপরি সাত দশকের অগ্নিস্রাবী নকশালবাড়ি আন্দোলনেরও সূত্রপাত এই দশকের শেষ পর্বে।"

সংবেদনশীল কবিচিত্তে এর অভিঘাত থাকে। তবে ব্যক্তিবিশেষের অনুভব ও উপলব্ধি ভিন্ন। দেবারতি মিত্র দেশ-কাল-সমাজ-রাজনীতি নিয়ে তেমন ভাবেননি। নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আত্মসমীক্ষায় কবি লেখেন,

> "ব্যর্থতা একটি মৌচাক।
> আমি সেখানে নানান প্রায়শ্চিত্ত থেকে এনে
> অশ্রু ভরি।" (আমার ব্যর্থতা)

'একজন সমবয়সী তরুণের প্রতি' বলেন,

> "জেনো বন্ধু আমি আছি এক কণা মুগ্ধ উষ্ণ স্বেদ
> আপ্লাবন উপহারে খুঁজে পাই বিদ্রোহের মিল।"

গভীর প্রত্যয়ে উচ্চারণ করেন,

> "ভেবো না, অত ভেবো না মা,
> আমি আমরা, তোমরা মেয়েরা
> দেশে দেশে বয়ে যাবো—
> গাছ শব্দ আর প্রাণ
> আমাদের ছাড়া জন্মাতেই পারবে না।" (আমার মেয়েরা)

কখনো বা জানান,

> "গ্রীক নাটকের স্তব্ধ নেমেসিস সারাদিন
> কাঁপাচ্ছে আমাকে
> আচমকা মাঝরাত্রে বুক ধড়ফড় করে ঘুম ভেঙে যায়"
> (প্রিয়তম নেমেসিস)

পুরুষের যৌন-আধিপত্যের পাশে নারীর যৌনকামনা, অধিকার-বোধ তাঁর কবিতায় রিরংসারক্তিম হয়ে উঠেছে। নারীবাদী তকমা না এঁটে-ও দেবারতি লিখতে পারেন, "তবু প্রেম আমাদের আগুন, মুকুলগুচ্ছ, আর সম্ভাবনা হতে চায়।" তারপর—

"সারা দুপুর আমি তোমায় স্নান করিয়ে দিই
ডিমের মতন গড়ানো মসৃণ
ঢেউ তুলেছে ঠাণ্ডা জলের ঘর
* * * * * *
আমি তোমায় জম্বুদ্বীপের জলপাই তেল মাখাই
সরের স্নেহে শক্ত দুহাত ভিজিয়ে রেখে
সাহস করে সূক্ষ্ম তারের যন্ত্র ছুঁই" (তোমার স্নান)

এক সাক্ষাৎকারে (শিলাদিত্য/জুলাই, ২০১৪) কবি স্বীকার করেছেন, 'সূর্যাস্তের দৃশ্য, আমি তোমাকে চুম্বন করি'। বলেন,

"স্নান ও চুম্বন এই দুটি সুখকর অভিজ্ঞতা আমাকে বড়ো আরাম দিতো, সর্বাঙ্গ দিয়ে এর স্বাদ নিতাম—স্বভাবতই এরা আমার কবিতায় এসেছে।"

ওরাল সেক্স যদিও এই সমাজে কুণ্ঠিত, অবগুণ্ঠিত। দেবারতি অকপটে লেখেন,

"প্রিয়তম পুরুষটি এক পা একটুখানি উঁচু করে
বিছানায় ভেসে আছে দেবদূত
সুকুমার জেলভরা মাংসের ব্রোঞ্জের উরু
অবিশ্বাস্য নিখুঁত সহজ গ্রীক ভাস্করতা
হঠাৎ সচল হয়ে ডাকে তরুণীকে।
দুহাতে জড়ানো নারী
তাঁর ঊর্ধ্ব শরীরের গভীর সৌকর্য ফেলে রেখে
গা শিরশিরে লোভে
দু'পায়ের ফাঁকে এসে মুখ গুঁজে দেয়।"
(পৃথিবীর সৌন্দর্য একাকী তারা দুজন)

কখনো সমকামিতা মুখর হয় তাঁর কলমে—

"এক মেয়ে আরেক মেয়ের ঘন ছাউনিতে
কথা বলে, গল্প করে, চুম খায়, এ ওকে জড়ায়—
ক্রমে এক অতসী ও রিয়া।" (দ্র. সৃজন/ নারীর কলমে কবিতা/১৪৩০)

এরই পাশে তাঁর বিষাদখিন্ন উচ্চারণ শুনি—'তোমার কোথাও বীজ নেই—বীজ থাকবে না' (আরো অন্ধ), এক নিঃসন্তান দম্পতির বেদনা মর্মরিত হয়ে ওঠে।

প্রেম ও কাম একই মুদ্রার দু'পিঠ। দেহের স্বাদ-স্পর্শ না পেলে প্রেম স্থায়ী হয় না অনেকেই বলেন। যদিও বিদেহী বা প্লেটোনিক প্রেমের তথা দিব্যপ্রেমের জয়ধ্বনিও শোনা যায়। কার্যত এমন প্রেম হৃদয়বসন্তবনে যে মাধুরী জাগায়, তা ফুরিয়েও যায়। প্রিয় নারী প্রিয় পুরুষের আদরে ভুলে যায় প্রথম প্রেমের ও প্রেমিকের স্মৃতি। যে জন্য দেবারতি লেখেন, 'স্মৃতি বলে কিছু নেই'। নারী ও পুরুষের যুগল সম্মিলনে উৎসুক কবি কণ্ঠে যেন ধ্বনিত হয়,

"দমবন্ধ সর্বস্ব আদর
তোমার, তোমারই শুধু" (সব ফুল তার)

কখনো বলেন,

"তোমার চোখের কাছে
জলপাত্রের মতো আমি লজ্জাহীন,
আমারও পিপাসা ছিল, আমি শুধু সান্ত্বনা চাইনি।"(তোমার জ্যোৎস্না সুর)

অভিমানে লেখেন,

"আমি তোমার বিচ্ছেদ, প্রেম নিয়ে চলে গেছি
একা পলাতক।" (ব্যথাহত দূরের বিকেলে)

কিশোরীদের পথে দেখে কবির মনে হয়—

"এত স্বল্পবাসা কিশোরীরা রাস্তায় এসেছে
তা কি করে সম্ভব?
* * * * * * * * * *
গোছা গোছা পাতাসুদ্ধ শাখাগুলি পাগলী কিশোরী
নতুন উজ্জ্বল স্তন উড়ু উড়ু ফিকে টিউফুল।" (কিশোরীর ফুল)

—এ তো নারী মনে বিস্ময়ের প্রকাশ! এ কোন জগত, প্রশ্নটা যেন অন্তরে আলোড়ন তোলে। দেহসঙ্গমের এক ঝলক 'বাড়ি' কবিতায় পাই—

"ঘুমোতে গেলেই শুধু বুক ঘেঁসে শুতে আসে
আত্মজ শিশুর মতো যৌবনের অমোঘ বিচার।"

মনে পড়ে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের আশ্চর্য অভিজ্ঞতার অনুভবী পংক্তিগুলো, "এক বক্ষে ছেলে জাগে/ আর বক্ষ বাপে মাগে/ যুবতীর এহি যৌবন।" অবশ্য এক সাক্ষাৎকারে দেবারতি স্পষ্টত জানান, "আমি বরাবরই পুরুষকে শুধু কানা-ই করিনি, আদরও করেছি।" (এবং আমরা, ডিসেম্বর, ২০০৭)। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর আশ্রয় ও মুক্তি। তাঁর কবিতা পাঠ করতে করতে কখন অজ্ঞাতসারে—

"জানালাবন্ধ ঘরের দেয়ালের বাইরে চলে যাই
বুঝতে পারি না।" (অন্ধ স্কুলে ঘন্টা বাজে)

যুগের হাওয়ায় এই ব্যতিক্রমী কবির কবিতা বর্ণময়। হ্যাঁ, বিচিত্র রঙের দ্যোতনা তাঁর কবিতাকে উজ্জ্বল করেছে। শ্রেষ্ঠ কবিতা-র ভূমিকায় কবির বক্তব্য,

"সারা পৃথিবী যেন ঝাঁপিয়ে আমার উপর চলে আসে—আমি আমার নিজের মর্মে তার সমস্ত কাঁপন—তার সব রং ঐশ্বর্য, বেদনা, অন্ধকার, বঞ্চনা, চরিতার্থতা যেন অনুভব করি।" কিংবা তাঁর অনন্য উপলব্ধি, ('অসফল, মর্মপীড়িত, ভ্রান্তনারী')—

"...বহুকাল জলের তলায় ডুবে থাকা রঙধোয়া,
আবছা রেখা ছবির মতো নিজেকে শুরু থেকে
আজ পর্যন্ত মনে পড়ে যাচ্ছে।"

পরিচিত সাত রঙের অধিকাংশই তাঁর কবিতায় যাওয়া যায়। তবে নীল লাল সবুজ রঙের প্রতি ঝোঁক বেশি। রঙের বিন্যাসে, বিলাসে কবির মনে হয়, 'একদিকে জীবন ও শিল্প আর অন্যদিকে শূন্যতা' যা কল্পনা-রঙে নিজেকে সৃষ্টি করে।

কবিতায় কেন রঙের গুরুত্ব? যন্ত্রশিল্পীর মতে, 'Colour is the keyboard, the eyes is the hammer'; সেখানে 'soul is the piano' রঙের ছোঁয়ায় বেজে ওঠে (Vasily Kandinsky)। কবিরা 'used colour for their strong connection with emotion'. মহৎ ও শ্রেষ্ঠ কবিরা তাই বারংবার রঙের দ্বারস্থ হয়েছেন। মানুষের মনে রঙের অভিঘাত বিচিত্র। কয়েকটি রং ও তার প্রতিক্রিয়া কী, জানাই।

নীল—বিষাদ, প্রেম, বেদনা, প্রশান্তি, অবসাদ, মৃত্যু, নিঃসঙ্গতা।

লাল—বিদ্রোহ, উষ্ণতা, কামনা ভয়, উত্তেজনা, শক্তি, ক্রোধ।

সবুজ— তারুণ্য, জীবন, আশা, জয়, প্রশান্তি, প্রকৃতি, মুক্তি।

হলুদ—আনন্দ, জ্ঞান, ক্ষয়, মৃত্যু, হিংসা, যৌনতা, ভয়।

খয়েরি—রুক্ষতা, ধৈর্য্য, বিবর্ণতা।

গোলাপি—প্রেম, আশা, দয়ামায়া, স্নেহ।

ব্যক্তি ও পরিস্থিতি অনুসারে রঙের এই মাত্রা প্রকাশ পায়। দেবারতি মিত্র তাঁর কবিতায় রঙের প্রয়োগ যেভাবে ঘটিয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত দিই।

প্রথমে সবুজ রঙের বিবিধ প্রয়োগ—

১. অস্বচ্ছ সবুজ রঙ ডাক দেয় অনেক গভীরে (অষ্টধাতুর মেঘ)

২. রুপোলি সবুজ বন রজস্বলা নারীর শরীর (পদ্মগোখরোর শিস)

৩. সবুজ সবুজ তুমি ক্রমেই সবুজ হয়ে যাও (স্মৃতি বলে কিছু নেই)

৪. আলতো সবুজ ঝিঁ ঝিঁ থোকা থোকা (একটি বাজনা গাছ)

৫. নিসর্গ সমস্ত ভুলে ভেসে উঠল সবুজ নীল বন (সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম সমুদ্রের ধারে)

এবার আসি নীল রঙে—

১. নীল রঙের সঙ্গে পাখির ওড়ার পথ যোগ করলে কি আকাশ হবে? (ফলিত গণিত)

২. ঢেউ তুলেছে ঠাণ্ডা জলের ঘর বিশাল নীল হ্রদ থেকে আকাশে (তোমার স্নান)

৩. সবুজাভ নীল ফানুষের মতো টলে টলে
হারিয়ে যাচ্ছে গর্ভকোষে। (সে রাস্তা পার হচ্ছে)

লাল রঙে সব কবিই আগ্রহ দেখান। দেবারতি লেখেন,

রাশি রাশি লাল আতপ্ত গাছ উড়ে যাচ্ছে দিগন্তহীন ছাতে(আসমুদ্র ছাদ)
কখনো দেখতে পান 'টকটকে লাল পাতা উল্টেপাল্টে বেহুঁশ হাওয়াতে'।
নানা রঙের বর্ণালী তিনি দেখেন তরুণীর দেহে—
পঞ্চদশী কিংবা কোনও ষোড়শীর ললাটে, চিবুকে,
ওষ্ঠে, ব্যগ্র সন্তনমূলে তপ্তোজ্জ্বল শ্রেণীর সংকটে
একটি গোলাপি দাগ, খয়েরি পিঙ্গল রক্ত তিল (অন্ধ স্কুলে ঘন্টা বাজে)

আছে অন্যান্য রঙের প্রয়োগও। যেমন, 'শক্তি রঙে রঙের গেরুয়া উড়ছে চারদিকে' (বিবাহ)। কিংবা 'হলুদ জবায় পশ্চিম আকাশ ছেয়ে যাচ্ছে' (সন্ধ্যা উতরে গেলে)। দেবারতি মিত্রের কবিতা জুড়ে ফুটে ওঠে 'এক কণা মুগ্ধ উষ্ণ স্বেদ', যা কাব্যে-প্রেমে করুণ রঙিন।

প্রী ত ম চ ক্র ব র্তী

‘ধূলায়-পড়া ম্লান কুসুম’ : প্রসঙ্গ নারায়ণ সান্যালের সুতনুকা সিরিজ

নকশালবাড়ি আন্দোলনের সূত্রে নিজের জীবন-অভিজ্ঞতা লিখতে গিয়ে কমরেড অসীম চট্টোপাধ্যায়ের মনে হয়েছিল “ইতিহাস দাবি করে ঘটনা ও সময়ের থেকে দূরত্ব। আসলে ইতিহাসকে পচতে দিতে হয়, নইলে ইতিহাস অধরা থেকে যায়।”[১] তিনি আরো জানিয়েছেন, “আসলে ইতিহাস রচনা এক ধরনের দূরত্ব দাবি করে ঘটনা থেকে, সময়ের থেকেও। সমসাময়িক ইতিহাস রচনায় সেই সুযোগ থাকে না। বহু মানুষের এত অপরিসীম আত্মত্যাগ, এত বীরত্ব, এত শহীদ, এত রক্ত এক কোমর রক্তের সমুদ্রে দাঁড়িয়ে অবেগবর্জিত ‘নিরপেক্ষ’ ইতিহাস লেখা যায় না।”[২] কথাগুলি অসীমবাবু মূলত নকশালবাড়ি আন্দোলন প্রসঙ্গে বললেও ভারত ইতিহাসের বিবিধ পর্ব পর্বান্তর বিষয়েও এটি সত্য। ইতিহাস আর ঐতিহাসিক গল্প-উপন্যাস সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও ওপরের বক্তব্যটি উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে যে ঐতিহাসিক উপন্যাস (রোমান্সও বলা যেতে পারে)-এর সূত্রপাত (রমেশচন্দ্র দত্ত ও স্বর্ণকুমারী দেবী যে ধারাকে পুষ্ট করেছিলেন), রবীন্দ্রনাথ (বউ ঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি), হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (‘বেনের মেয়ে’) পর বিশ শতকে তা সমৃদ্ধির শীর্ষ স্পর্শ করেছিল শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে; নিষ্প্রাণ তথ্য নয়, তাঁর ‘ঐতিহাসিক কথাসাহিত্যে’ ভারত-ইতিহাসকে চিরন্তন সত্যের দৃষ্টিতে দেখেছেন বাঙালি পাঠক। তারপরেই সে ধারায় অগ্রগণ্য ব্যক্তি অবশ্যই নারায়ণ সান্যাল (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘পদসঞ্চার’, ‘অমাবস্যার গান’, রমাপদ চৌধুরীর ‘লালবাঈ’ ছাড়াও নিকট-ইতিহাস নিয়ে লেখা প্রমথনাথ বিশীর ‘কেরি সাহেবের মুন্সি’, ‘লালকেল্লা’ ও একাধিক ছোটগল্প, গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ‘বহ্নিবন্যা’, বিমল মিত্রের ‘সাহেব বিবি গোলাম’, ‘বেগমের মেরী বিশ্বাস’, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সেই সময়’, ‘প্রথম আলো’, অমিয়ভূষণ মজুমদারের ‘নয়নতারা’ ও ‘রাজনগর’ স্মরণে রেখেও)। আঠারো-উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে হটু ও হটী বিদ্যালঙ্কারের বিমিশ্রিত জীবনকে কেন্দ্রে রেখে তিন খণ্ডের দীর্ঘ উপন্যাস ‘রূপমঞ্জরী’ ছাড়াও ভারত ইতিহাসের নানা সময়কে তথ্য ও সত্যের মেলবন্ধনে ধরে লিখে গেছেন ‘আনন্দস্বরূপিণী’, ‘রাওয়ালা’, ‘নার্গিস’, ‘লাডলী বেগম’, ‘হংসেশ্বরী’র মতো উপন্যাস। লেডি-ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (‘রানী কাদম্বিনী’) থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (‘বিশ্বাসঘাতক’) বা দেশভাগ-উদ্বাস্তু সমস্যা (‘বল্মীক’, ‘বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প’, ‘অরণ্যদণ্ডক’, ‘দণ্ডকশর্বরী’) হয়ে ওঠে তাঁর উপন্যাসের প্রেক্ষাপট। বুদ্ধদেব বসুর ‘রাত ভ’রে বৃষ্টি’ কিংবা সমরেশ বসুর ‘বিবর’, ‘প্রজাপতি’ নিয়ে বিতর্ক ও মামলা-মোকদ্দমা সেই পটভূমি ফিরে আসে নারায়ণ সান্যালের ‘অশ্লীলতার দায়ে’ উপন্যাসে। তেমনই ভারত ইতিহাসের বাস্তব অথচ মসীলিপ্ত প্রথা যা ‘পরম ব্যথায় পরান কাঁপায়’ তাই ফিরে ফিরে এসেছে নারায়ণ সান্যালের ‘সুতনুকা’ শীর্ষক গল্পগুলিতে;

দেবদাসীদের বন্দী জীবন আর মুক্ত প্রেমের প্রেক্ষিত হয়ে প্রতিটি গল্পেই এসেছে পুরোহিত সহস্রাক্ষ এবং প্রেমিক-ভাস্কর দেবদিন্ন।

২

১৩৬৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশ পেয়েছিল শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘জনপদবধূ’ উপন্যাস, যার পটভূমি দক্ষিণ ভারতের কোন এক অনামা ‘দেবীপল্লী’, যেখানে লেখক দেখিয়েছেন বিশ শতকে দেবদাসী প্রথার একটি ‘রিফাইন্ড’ রূপ। দেবীপল্লীর নিয়ামক নারায়ণ নিজেই বলেছেন— “...নানান দেশ ঘুরে এসে নানান লোক দেখে এটুকু বুঝছি, প্রসটিটিউশনকে একেবারে উচ্ছেদ করা যাবে না, তবে শোভন একটা রূপ দেওয়া যেতে পারে। আমার সাধ আর সাধনা হচ্ছে এই শোভনতাকে নিয়ে। প্রাচীন যুগে শুনেছি, এ ধরনের দেবীপল্লী ছিল শিল্প, কাব্য ও সংস্কৃতির লীলা-ক্ষেত্র। এ যুগেই বা তা গড়ে উঠবে না কেন? মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার মতো চারুদত্তকে বিয়ে করে সংসারী হওয়ার সাধ এদের অনেকেরই থাকে, কিন্তু সাধ ও সাধনা তো এক জিনিস নয়। তাই সে জিনিস গড়ে ওঠে না, ভেঙে পড়ে।”[৩] মনে পড়বে উনিশ শতকের নটীদের কথাও, বিনোদিনী বা সুকুমারী (গোলাপ) সংসারে গিয়েও পরিপূর্ণ সংসারী হতে পারেননি। প্রাচীন ভারতে দেবীপল্লীকে ‘শিল্প, কাব্য ও সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র’ বলা হলেও পুরুষতন্ত্র ও পুরোহিত-তন্ত্রের লালসাময় লাঞ্ছনার শিকার তো হতেই হতো দেবদাসীদের। তাইতো একালের কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত লেখেন,

> “গণিকালয়, মীনাবাজার তৈরি করে কারা?
> প্রতিযুগেই ইন্দ্র কেন উর্বশীর অধীশ্বর হন?”[৪]

এ প্রশ্ন কবি তুলেছিলেন আম্রপালীর জবানিতে। আর নারায়ণ সান্যাল সুতনুকার প্রাকপর্বে দেবদাসীদের আগে কলমে ধরেছিলেন আম্রপালীকেই, ‘যিনি বৈশালীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ’ এবং তথাকথিত ‘সমগ্র আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ নারীরত্ন’।

আম্রপালীকে নিয়ে যে সংক্ষিপ্ত রচনাটি নারায়ণ সান্যাল লেখেন তা ঐতিহাসিক তথ্যকে যথার্থ মর্যাদা দিয়েই। মনে রাখতে হবে ‘দশ বছরের অনুজ এক কথাসাহিত্যিক’ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সেই সময়ে’র গুরুত্ব ও লেখকের কৃতিত্ব স্বীকার করেও তিনি বইটির ‘কঠোর সমালোচনা’ করেছিলেন— “লেখক বিম্ববতী-বিধুশেখরের অবৈধ সম্পর্কের অলীককাহিনি পরিবেশনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাতে যদি শিবহীন যজ্ঞ করতে হয় সো ভি আচ্ছা।”[৫] ঐতিহাসিক কথাসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তথ্যনিষ্ঠার ব্যাপারে অতিমাত্রায় সচেতন তিনি ছিলেনই। মহানামের ‘অযোনিসম্ভূতা’ পালিতা-কন্যাকে তার রূপের প্রাচুর্যের কারণে হতে হয়েছিল ‘জনপদকল্যাণী’; সে নির্দেশ দিয়েছিল ‘নগর-প্রধানদের পঞ্চায়েত’- গণ বা ‘সিটি কাউন্সিল’। নিজের রূপ আর সামাজিক বা রাজনৈতিক ‘গণ’ আম্রপালীকে ‘বহুভোগ্যা’ করলেও তিনি নিজ-ব্যক্তিত্বে হয়ে উঠলেন ‘জনপদকল্যাণী মহারাজার সমমর্যাদা সম্পন্না, ‘ফার্স লেডি’।’ নগর কেন্দ্রে নিজের প্রাসাদে রাখলেন ‘স্বনিযুক্ত প্রহরী ও সহচরী’ এবং

সেখানে প্রযোজ্য থাকলো আম্রপালীর নিজস্ব আইন। যদিও এই কঠিন শর্ত আরোপের পিছনে যুক্ত হয়েছিল আম্রপালীর ঐশী ক্ষমতা ‘সে যেমন স্বয়ম্ভু, তেমনি স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকারিণী। দেব-অংশে তার আবির্ভাব শাপভ্রষ্টা সে, গণ শর্ত মেনে না নিলে সে আত্ম-বিলুপ্তিতে বাধ্য হবে।’ “কামনাজর্জর লিচ্ছবি নাগরিকদের পীড়াপীড়িতে’ গণ স্বীকার করে আম্রপালীর শর্ত। এ ভাবনায় কবিকল্পনার চেয়েও আছে জৈব-বাস্তবতা; পরবর্তীকালে রোহিণী ধর্মপাল তাঁর ‘মণিমঞ্জুষায়’ লেখেন ‘গণ দেখলেন, সর্ব চক্ষু দিয়ে লেহন করে দেখলেন এই মেয়ের ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিতাগ্র কেশদাম থেকে ছবির মত আঁকা বঙ্কিম ভ্রুযুগল, গাঢ় নীলবর্ণ মণির মতো উজ্জ্বল চোখ থেকে শাঁখের মতো শ্বেতশুভ্র কণ্ঠদেশ, শরীরের সর্বস্থান থেকে ঝরে পড়ছে যৌবনমদ। গণের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য থেকে বয়োজ্যেষ্ঠতম সদস্য পর্যন্ত সকলের মনে একটি ইচ্ছেই লকলকিয়ে উঠল, এই রমণীটিকে কবে শয্যায় পাব, কবে এই উদ্দাম যৌবনকে নিজের আলিঙ্গনে পিষে ফেলতে পারব।”[৬]

নগরকল্যাণী আম্রপালীর জীবনে বিশেষ ঘটনা তার প্রাসাদে মগধরাজ বিম্বিসারের আগমন। এই প্রেক্ষাপটের প্রস্তুতিতে রাজবয়স্যের রসপূর্ণ বার্তা বাস্তবোচিত। কিন্তু লিচ্ছবির শত্রু মগধের শাসকের উপস্থিতি আম্রপালীর ঘরে! ‘গণ’ নিঃশব্দে তা মেনে নিতে পারেনি। তবু সেই প্রতিকূলতার মাঝে জয় হল নর-নারীর কামনা-বাসনার “ভস্ম হবার আশঙ্কায় কি মদন বিরত হয়েছিল পঞ্চশর বর্ষণে? আসন্ন সর্বনাশকে উপেক্ষা করে দুটি নরনারী সপ্ত-দিবস-রজনী বিভোর হয়ে রইল।” আর সেই গোপন অভিসারের বীজ উপ্ত হলো আম্রপালীর গর্ভে জন্ম হলে জীবকের। তবে ‘বিনয়পিটক’কারের অনুসরণে মগধাধিপতির ‘স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন’-এর বিবরণটি নারায়ণ সান্যালও এড়িয়েই গেছেন।

যদিও মগধরাজের সন্তান গর্ভে ধরে আম্রপালী ‘জাতিচ্যুতা’, তবুও তিনি ‘আনন্দিতা’। কথাকারের বর্ণনায় ‘পুরুষসিংহ বিম্বিসারের সিংহনাদের পর শিবাকুলের হুক্কাধ্বনি তার সহ্য হতো না সে যেন অগাধ জলসঞ্চারী রোহিতমৎস্যের জলকেলির পর সফরির ‘ফরফরায়ণ’। সে যেন মধ্যরাত্রির দরবারী কানাড়ার পর শেষ প্রহরের ক্লান্তিকর বায়স বাচালতা।’ সমগ্র বৈশালী তাঁকে উপেক্ষা করলেও ‘লোকুত্তম’ মহাকারুণিক সূর্যের মতোই সমাদর করলেন প্রাচীর-ছিদ্রের নাম-গোত্রহীন পুষ্পের মতো। নগরপ্রান্তে বুদ্ধদেবকে প্রণাম জানাতে গিয়েছিলেন কানীনপুত্রসহ আম্রপালী, সেখানেই শাক্যসিংহের সহাস্য অভিবাদন “আম্রপালীকে! বৈশালী নগরীতে অদ্য রাত্রি অতিবাহিত করতে চাই। তোমার সর্বতোভদ্রে আমার ঠাঁই হবে।” লিচ্ছবি সমাজের ‘ঘৃণিতা দুর্বিনীতা রাজনটী’র আবাস ভগবান বুদ্ধের পাদস্পর্শে হয়ে গেল মহাসঙ্ঘারাম। লেখকের বর্ণনায়—“বিম্বিসারের অভিসারে বৈশালী লাভ করেছিল একটি স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন : জীবক। শাক্যসিংহের অভিনিষ্ক্রমণে বৈশালী লাভ করল আরও একটি স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন : একটি মহাসঙ্ঘারাম, নগরীর কেন্দ্রস্থলে।” আর আম্রপালী? মস্তক মুণ্ডিত করে অঙ্গে তুলে নিলেন ভিক্ষুণীর চীরবাস, সন্তানসহ ভিক্ষাপাত্র

নিয়ে বেরোলেন পথে। খুব সচেতন ভাবে নারায়ণ সান্যাল এখানে রবীন্দ্রনাথের 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা'র প্রথম পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন- 'ভগবান বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি'। জনপদকল্যাণী হয়ে উঠছেন প্রকৃত 'নগরলক্ষ্মী'; তাই বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'থেরীগাথা'য় প্রথম স্তবটি যার নামে রচিত ও উৎসর্গীত হয় তিনি আম্রপালী।

৩

আরেক বৌদ্ধভিক্ষুণী সেবানন্রা, গল্পের শুরুতে তিনি সঙ্ঘারামের 'অগ্নবিনতা' মহাভিক্ষুণী, তাঁকে নিয়েই প্রথম নারায়ণ সান্যাল লিখলেন সুতনুকার কল্পিত প্রেম-কথা। গল্পের রচনাকাল ১৯৮৩, আর গল্পের কাল-পটভূমি ২৩৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। সুতনুকাকে লেখক পেয়েছিলেন মধ্যপ্রদেশের যোগিমারা আর সীতাবেঙা গুহামন্দিরের 'দুর্বোধ্য হরফে'র পাশে 'সহজ সরল গদ্যভাষে একটি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি'তে 'সুতনুকা নামে দেবদাসিক্যী তং কাময়িথ বালানশেয়ে দেবদিন্নে নাম লুপদকে'। এর বাইরে তথ্য বলতে 'ভাঁড়ে ভবানী', অতএব লেখককে কল্পনার অবকাশ নিতেই হতো। সেই সূত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'নৃত্যনাট্য শ্যামা' বা 'অভিসার' কবিতার প্রসঙ্গ এনে বিনির্মাণের ক্ষেত্রে (এখানে মূলত জাতককাহিনির প্রসঙ্গই আছে) সাহিত্যিকের স্বাধীনতার দিকগুলি স্পষ্ট করেছেন, "এত কথা কেন বলছি? সুতনুকা-দেবদিন্নের প্রেমকাহিনি কপোল কল্পনায় সাজিয়ে নেবার কৈফিয়ৎ হিসেবে।"

মৌর্যযুগ তথা অশোকের সমকাল সুতনুকার জীবন দেখালেন ফ্ল্যাশব্যাকে। কারণ গল্পের সূচনা প্রিয়দর্শী অশোকের মৃত্যু সংবাদে। আর সুতনুকা তখন "মহাভিক্ষুণী সেবানন্রা পঞ্চাশোর্ধা; তাঁর মস্তক মুণ্ডিত, পরনে পীতবাস, সর্বাঙ্গে নেই কোনও আভরণ। কিন্তু এখনও তাঁর দেহে জরা রেখাপাত করতে পারেনি। এখনো তিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। নিঃসন্দেহে যৌবনকালে তিনি অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন।" রামগড় পর্বতে যোগীমহেশ্বর ও সীতাবঙ্কিমায় তিনিই ছিলেন প্রধানা দেবদাসী রুদ্রাণী। যার প্রতি অধিকারবোধে সদা সচেতন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সহস্রাক্ষ। সম্রাট অশোক কলিঙ্গ বিজয়ের পথে যাচ্ছেন, মন্দিরে পূজা নিবেদন করতে চান। চিন্তিত সহস্রাক্ষ, তাঁর অধীনস্থ দেবদাসী রূপ-গুণের কারণে 'উর্বশী ঈপ্সিত' পদ পাটলিপুত্রের রাজনটী' হিসেবে অভিষিক্ত হয়ে যেতে পারে! না, শেষ পর্যন্ত 'আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ রাজনটী' হননি সেই সুতনকা। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর চণ্ডাশোক হলেন ধর্মাশোক, হয়ত সুতনুকাকে আংটি দেবার কথা মনেও রাখেননি আর। কিন্তু যুদ্ধযাত্রার সময় সম্রাটের কাছ থেকে যে তরুণ ভাস্কর সুতনুকার মূর্তি গড়ার দায়িত্ব নিয়েছিল সে দেবদিন্ন,—'শ্যামাঙ্গ। পেশীবহুল সুগঠিত তনু, উন্নতনাসা, আয়ত চক্ষুতে যেন অপার্থিব স্বপ্নলোকের আভাস'; সেই 'কন্দর্প'কে অস্বীকার করতে পারেননি সুতনুকা 'ছেনি হাতুড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রূপের কাঙাল দেবদিন্ন প্রথম সুতনুকার তনুদেহটি আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করেছিল, চুম্বনে চুম্বনে তাঁকে উন্মাদ করে দিয়েছিল।' দেবদিন্ন সুতনুকার যে ক্রটিহীন 'আদর্শ রমণীমূর্তি' ছেনি হাতুড়ি দিয়ে গড়তে চেয়েছিল, সজীব সুতনুকা দেবদিন্নের প্রেমে

একটি বছরে হয়ে উঠেছিলেন তেমনটাই 'ছেনি হাতুড়ি নয়, অন্য কী-এক অতনু মন্ত্রে সে সুতনুকানাম্নী একটি নারীর তনুতে তুলে দিয়েছিল অলঙ্কার, কেড়ে নিয়েছিল অহঙ্কার, সুতনুকার অন্তরে অবশিষ্ট ছিল শুধু প্রেমের দীপ্তি, দাহ নয়। তার সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেনি, ঘটেছিল বিকাশ।'

অতঃপর দেবদিন্নকে হত্যার জন্য সহস্রাক্ষের গুপ্তঘাতক নিয়োগ এবং সুতনুকার সাহায্যেই দেবদিন্নের আত্মগোপনের পথে যাত্রা। এরপর বিচ্ছেদ। দেবদিন্নকে খুঁজে পাননি সুতনুকা। তাঁর 'ব্যর্থ মানবপ্রেম সার্থক বিশ্বপ্রেমে রূপান্তরিত হল' মহাকারুণিকের কৃপায়। আর আর্যাবর্তের অরণ্যে পর্বতে আত্মগোপনকালে বিষফলের রসে দৃষ্টি হারিয়েছিল রূপদক্ষ দেবদিন্ন। খঞ্জ-নারীকে বিয়ে করে দেবদিন্ন সন্তানের পিতাও হয়েছিল। ছেলেটি বাপের মতই রূপদক্ষ, কাকনায় মহাবিহারে নির্মাণকার্যে বহাল করার জন্য অন্ধ দেবদিন্নের অনুরোধ অগ্নবিনতা সেবানন্দ্রার কাছে। দেবদিন্নের প্রকৃত পরিচয় সেবানন্দ্রা বুঝেছেন এবং তার প্রতি সমস্ত আগ্রহ হারিয়েছেন এমনটা উপলব্ধি করে শান্তিও পেয়েছিলেন। পরদিন এসেছে দেবদিন্নের ছেলে, বাবার যৌবনে প্রতিমূর্তি সে। নারায়ণ সান্যাল পিতৃরূপেরই পুনর্বর্ণনা দিয়েছেন। বৃদ্ধ দেবদিন্নকে দেখে সেবাব্রতার 'অতীত জয় সুসম্পন্ন' মনে হলেও তরুণ-রূপদক্ষকে দেখে সে ভ্রান্তি ঘুচেছে, 'প্রাকসন্ন্যাসজীবনের বেদনাবহ দুঃস্বপ্ন' তাঁর অন্তরে তখনও জ্বলছে। নিজের মানসিক অবস্থার কারণেই তরুণ ভাস্করকে কাকনায় নয়, উরুবিল্ব তথা বুদ্ধগয়ায় নির্মীয়মান সঙ্ঘারামে পাঠাতে চেয়েছেন সেবানন্দ্রা। পাথেয় হিসেবে দিয়েছেন প্রিয়দর্শী-প্রদত্ত অঙ্গুরীয় তাঁর পূর্বাশ্রমের একমাত্র অভিজ্ঞান।

৪

এরপর সুতনুকার সন্ধানে নারায়ণ সান্যাল পৌঁছেছেন 'কালিদাসের কালে' গুপ্তযুগ ৪০৩ থেকে ৪২২ খ্রিস্টাব্দ। এই সময়ে ভারতে এসেছিলেন বিদেশি পর্যটক ফা-হিয়েন; দেবদাসী সুতনুকাকে লেখক দেখিয়েছেন মহাকবি কালিদাসের 'পয়েন্ট অফ ভিউ' থেকে। কালিদাস এবং ফা-হিয়েন এর মধ্যে সংযোগ-সূত্র হিসেবে এসেছেন চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য-দর্শনের অধ্যাপক তাও চিঙ অবশ্য গল্পের কাল যখন শুরু হয়েছে তখন বৌদ্ধ ভিক্ষুক হয়ে তিনি এসেছেন ভারত ভ্রমণে; পঁচিশ বছরের কবির সঙ্গে পঞ্চাশোর্ধ ভ্রামণিকের এক বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছিল। এই কাহিনিতেও আছে সুতনুকা ও দেবদিন্নের প্রেম এবং যার প্রতিবন্ধক সহস্রাক্ষ। ভাস্কর দেবদিন্ন 'যক্ষিণীর মর্মরমূর্তি' রূপে নির্মাণ করতে চেয়েছিল সুতনুকাকে, প্রেমিকার নিরাবরণ রূপ কাম-লালসায় নয়, ধরতে চেয়েছিল ধ্যানে। কিন্তু দয়িতের 'মৃত্যুঞ্জয়ী শিল্পসৃষ্টি'র সহায়ক হতে কিংবা তাকে 'মানসিক যন্ত্রণা' থেকে মুক্তি দিতে অথবা 'নিজেই চেয়েছিল একটি মুগ্ধ প্রেমিকের দৃষ্টি সম্মুখে নিরাবরণা ফোটা কদমের মত আনন্দ শিহরণে রোমাঞ্চিততনু হতে।' যদিও সে ইচ্ছে পূরণ হয়নি, ধরা পড়েছিল কুশীদজীবী-পুরোহিত সহস্রাক্ষের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। বিনা পারিশ্রমিকে বিতাড়িত হয়েছিল দেবদিন্ন।

গল্পে নারায়ণ সান্যাল দেবদাসীদের বেশ কিছু শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন যেমন ভৃত্যা, দত্তা, হৃতা, ভক্তা প্রভৃতি। তেমনি দেউলের প্রধান দেবদাসী 'অলঙ্কারা'। যার অভিষেক হয় 'লাজহরণ' নৃত্যের মাধ্যমে। লেখক সূত্র-সংকেতে বিষয়টিকে 'ঔপন্যাসিক-কল্পনা' বলে জানিয়েও লিখেছেন 'এ জাতীয় উৎসব ধর্মের মোড়কে দর্শকদের আকৃষ্ট করার পরিকল্পনা অবান্তর নাও হতে পারে।' এই সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জনপদবধূ'র 'আরঙ্গেত্রেম'-এর কথাপুরুষোত্তমের সামনে নৃত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে 'গুরুবরণ' তথা 'দেববধূ' (একপ্রকার দেবদাসী) হিসেবে যাত্রা শুরু হত দেবীপল্লীর মেয়েদের। লাজহরণ নৃত্যে যেমন মিশে আছে এক নারীর প্রায় বেআব্রু হবার লাঞ্ছনা বা এক কামুক প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের কাছে ভোগের সামগ্রী হবার যন্ত্রণা; নারীর দেহ ও রূপ সর্বস্ব অস্তিত্বের চিহ্ন হয়ে থাকে মন্দিরের ধ্বজাদণ্ডে দেবদাসীর শেষ লজ্জাবস্ত্রের খণ্ডাংশ 'যতদিন ধ্বজাদণ্ডে ঐ নিশানটি অক্ষত থাকবে ততদিন সেই রুদ্রাণী থাকবে মন্দিরের 'অলঙ্কারা'। জীর্ণ হতে থাকবে। তারপর বছরে বছরে যেমন সেই প্রধান দেবদাসীর যৌবন তিল তিল করে ক্ষয়িত হবে, তেমনি বছরে বছরে জীর্ণ হতে থাকবে কলসদণ্ডের সেই ধ্বজা নিশান। এরপর একদিন! কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতে মহাকাল স্পষ্ট নির্দেশ দেবেন রুদ্রাণীর অবসর গ্রহণের কাল সমাগত। ঝড়ঝঞ্ঝার অবসানে সকলে অবাক হয়ে দেখবেন নিশানটি অপহৃত। রুদ্রাণীর কাল শেষ। শেষ নৃত্যে একবার প্রণতি জানিয়ে সে বিদায় নেবে।' আর এভাবেই তো নতুন কালের ভাবী রুদ্রাণী রূপে ডাক পড়ল সুতনুকার; শৈশবেই তাকে চুরি করা হয়েছিল, সে 'হৃতা'। পরবর্তী রুদ্রাণী করার জন্য নানা বিদ্যায় পারদর্শী করা হয়েছে তাকে 'পুষ্পমাল্য রচনা, পূজাবিধি, সংস্কৃত সাহিত্য, নৃত্য-গীত ও অন্যান্য চারুকলায়।' অভিষেক রাতেই সে অভিষিক্ত হবে রুদ্রাণী পদে, যা সেই মন্দির ইতিহাসে প্রথম।

সহস্রাক্ষ যদিও সফল হননি, প্রাক্তন রুদ্রাণী মাতৃমমতায় সুকৌশলে সুতনুকার মুক্তির ব্যবস্থা করেছে। সহস্রাক্ষের লালসাবহ্নি থেকে উদ্ধার করেছে 'অপাপবিদ্ধা'কে। এর জন্য অবশ্য কবি কালিদাস ছাড়াও সাহায্য করেছে তাও চিঙএবং ফা-হিয়েন, অন্তত গল্পের চরিত্র হিসেবে। আসলে এ তো গল্পকারেই অভিপ্রায়, যাঁর তীব্র সহমর্মিতা দেবদাসীদের প্রতি 'বহুভোগ্যার বিড়ম্বিত জীবনের সে কী নিদারুণ তিক্ততা!—ওরা স্বামী পায় না, সন্তান পায় না, শুধু ধর্মের অজুহাতে অযুত অজানা পুরুষকে দেহদান করে যায়।' গল্পের চরিত্র কবি কালিদাসের প্রশ্ন তো আসলে লেখকেরই 'স্বীকার্য, এই ব্যবস্থাটা সহস্রাব্দিকাল সমাজ মেনে এসেছে। মেনে এসেছেন রাজেন্দ্রবর্গ, মেনে এসেছে 'গণ', মেনেছে পঞ্চায়েত, 'সভা', 'সমিতি'। এবং আজ পর্যন্ত কোনও জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত এ নিয়ে প্রতিবাদ করেনি। ঋষি ভার্গব, মনু, বাৎস্যায়ন, ভরত কেউই বলেননি কোন যুক্তিতে ওই অনাঘ্রাতাকে বলি দিতে হবে তার পিতার বয়সী এক কামার্ত বৃদ্ধের লালসার যূপকাষ্ঠে।' প্রাচীন ভারতের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েও কথাকার তাই সশ্রদ্ধায় উল্লেখ করেন মাদ্রাজের ডক্টর মিসেস মুথুলক্ষ্মী রেড্ডির

নাম, 'যাঁর একক প্রচেষ্টায় ১৯৪৭ সালে ভারত সরকার আইন করে বন্ধ করে দিয়েছিল দেবদাসী প্রথা।'

গল্পের সমাপ্তি মিলনান্তক গান্ধর্ব বিবাহের বিধান দিয়েছেন কবিবর কালিদাস। এই আবহে শরদিন্দুর কালজয়ী গল্প 'চুয়াচন্দন'এর নাম স্মরণে আসে, যার প্রেক্ষাপট অবশ্য মধ্য-বাংলার নবজাগরণের কাল, যুগপুরুষ নিমাই পণ্ডিত যেখানে উপস্থিত। সুতনুকার এই আখ্যানের ইতিবাচক পরিণতির সঙ্গে কুমারসম্ভবের কবি-মানস যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

৫

১২৩৭ থেকে ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোণার্ক তথা কলিঙ্গের সুতানুকর কথা বলতে গিয়ে গল্পকার ভাস্কর বিশ্বকর্মা মহাপাত্র (কথাকারের কল্পিত নাম) ও তার যোগ্য সন্তান দেবদিন্নের কথাই বলেছেন বেশি। কোণার্কের ষোলোটি দেবদাসী মূর্তি নির্মাণের জন্য বন্দী করে আনা হয়েছিল বিশ্বকর্মা মহাপাত্রকে 'তার সমতুল্য প্রতিভাবান ভাস্কর ছিল না সমকালের ভারত ভূখণ্ডে।' বারো বছর প্রাণপাত পরিশ্রম করে কলিঙ্গরাজ নরসিংহদেব লাঙ্গুলিয়ার নির্দেশমতো তল-পোতালের দেবদাসীর মূর্তি নির্মাণ করে মৃত্যু হয়েছিল ভারত সেরা শিল্পীর। অতঃপর উপর-পোতালের মূর্তি নির্মাণের জন্য একাধিক রূপদক্ষের ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর সন্ধান মিলেছে দেবদিন্নের পিতার যোগ্য উত্তরসূরী সে। যার রূপ মৌর্যযুগের দেবদিন্নেরই অনুরূপ, একই বাক্যবন্ধের পুনর্ব্যবহার করেছেন নারায়ণ সান্যাল 'শ্যামাঙ্গ। পেশীবহুল সুগঠিত তনু, উন্নতনাসা, আয়তচক্ষুতে যেন অপার্থিব স্বপ্নলোকের আভাস।' সে বাড়িতেই গড়েছে অশ্বারোহী এক মূর্তি, যা কোনও দেবতার নয়, আপন পিতার প্রতিমূর্তি; সন্তানের কাছে যিনি স্বর্গ, ধর্ম এবং 'পরমংতপঃ', 'সূর্য অপেক্ষাও তিনি গরীয়ান'।

মন্দিরের মহামাত্র-পুরোহিত সহস্রাক্ষ পিতার অসমাপ্ত কাজের ভার দিতে চান পুত্রকেই। পিতৃমূর্তির অসমাপ্ত কাজ ছেড়ে দেবদিন্ন যেতে না চাইলেও শেষ পর্যন্ত যেতেই হয়। স্বামী বিচ্ছেদে চোখের জল ফেলে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন বিশ্বনাথ-পত্নী, রাজশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি কোথায় তাদের! তবু শিল্পীর বেদনা আর স্বাভিমান মিশে থাকে দেবদিন্নের কথায় "আপনারা যে মন্দির গড়ছেন, উত্তরকাল তাকে বলবে নরসিংহদেবের সূর্যমন্দির। তারা জানবে না, এই মন্দিরের প্রধান ভাস্করের নাম! তারা চিনবে না বিশ্বনাথ মহাপাত্রকে। যিনি আজীবন প্রোষিতভর্তৃকা-হিসেবে সেই সূর্যমন্দিরে ছেনি-হাতুড়ি চালাতে চালাতে নিজেই ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের অবকাশ পাননি। আমার এই মূর্তি তাই ভাবীকালকে ডেকে বলবে তোমরা শোন! কোণার্ক তীর্থে নভচারী মার্তণ্ডদেবের রথাশ্বের বলগা একদিন চেপে ধরেছিলেন বিশ্বকর্মা মহাপাত্র। ... চরৈবেতি মন্ত্রে দীক্ষিত স্বর্গের 'ভাস্করের' অশ্ব মর্ত্যের ভাস্করের হাতে নিশ্চল গতিহীন পাষাণ।" যদিও দেবদিন্নর পরিণতি

বিশ্বনাথের চেয়ে আলাদা হবার সম্ভাবনা কমই ছিল, ‘পিতার অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করে হয়তো সেও কালে হয়েছিল প্রৌঢ়, বৃদ্ধ এবং অবশেষে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল অর্কতীর্থেই।’

এই শিল্পী জীবনের বেদনা ও করুণ পরিণতির কাহিনিতে সুতনুকা কোথায়? পোতালে নারীমূর্তি কি ভাস্করগণের কপোল-কল্পিত? না, আছে তো দেবদিনের বাগদত্তা লক্ষ্মী ; “সত্যিই লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। লক্ষ্মীর সঙ্গে দেবদিন্নের শিশুকাল থেকেই বন্ধুত্ব। খেলাঘরের বর-বউ হত ওরা। ওদের গভীর প্রণয়ের কথা গ্রামবাসী সকলেরই জানা। আহা, দুটিতে ভারী সুন্দর মানায়।” কিন্তু ‘প্রলয় ঝড়ে’ ভেঙে পড়তে চলেছে খেলাঘরে বাঁধা সেই স্বপ্ন! অন্ধ মায়ের আকুল অনুরোধ আর লক্ষ্মীর পিতার অসহায়তা ‘কন্যাদায়গ্রস্থ অর্ধোন্মাদ’ বাবা পরমাসুন্দরী কন্যাকে টেনে আনেন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সহস্রাক্ষের সামনে। কয়েকদিন পরেই যে দেবদিন্নের সঙ্গে তার বিবাহ। সেই ‘নারীরত্নে’র ভবিতব্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল সহস্রাক্ষের ‘লালসাজর্জর’ চোখে। বৃদ্ধ গাইডের জবানীতে কথক শোনালেন মেয়েটির পরিণতি “লক্ষ্মীকে আর কেউ কোনদিন দেখেনি। মহামাত্রের মতো মহারাজও বলেছিলেন, এমন সুলক্ষণা সুতনুকার অন্যত্র বিবাহ অসম্ভব। মাতা আম্রপালীর মতো লক্ষ্মীর লৌকিক বিবাহ হয়নি। জানিনা কে তার ‘অভিষেক’ করেছিলেন বৃদ্ধ নরসিংহদেব লাঙ্গুলিয়া অথবা লালসাজর্জর পুরোহিত সহস্রাক্ষ। কিন্তু সে অন্তিমে হয়েছিল কোণার্ক মন্দিরের রুদ্রগণিকা! ‘অলঙ্কারা’! মজা এই, রাজাদেশে দেবাদিন্নকেই গড়তে হয়েছিল সেই সুতনুকার মূর্তি।”

আসলে সুপ্রাচীনকাল থেকে মন্দির গাত্রে, পাথরে খোদিত হয়ে আছে যেসব নারীমূর্তি, তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন নারায়ণ সান্যাল তাঁর সুতনুকা সিরিজে। প্রেম-প্রাপ্তি, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, ত্যাগ-তিতিক্ষায় ভরা পাথর-প্রতিমাদের এই বেদনগাথা ভারতবর্ষের নারী ইতিহাসের একটি সমান্তরাল ধারাকেই তুলে ধরেছে।

সূত্র সংকেত :

১. অসীম চট্টোপাধ্যায়, ‘নকশালবাড়িনামা’, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০২২, পৃ ২
২. তদেব, পৃ ১-২
৩. শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘জনপথবধূ’, সাহিত্য বিহার, কলকাতা, দশম সংস্করণ, ১৪০৯, পৃ ৭০
৪. মল্লিকা সেনগুপ্ত, স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৪, পৃ ২১
৫. নারায়ণ সান্যাল, ‘অবিস্মরণীয়া’, দে’জ, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ২০১৯, পৃ ৪১
৬. রোহিণী ধর্মপাল, ‘আম্রপালী’, রোহিণী ধর্মপাল (সম্পাদিত) : মণিমঞ্জুষা, বইচই, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০২০, পৃ ৯৪

ই ন্দ্রা ণী হা জ রা

ছিন্নমূল জীবনে নারীর জীবন-সংগ্রাম : 'বল্মীক' ও 'মেঘে ঢাকা তারা'

'উদ্বাস্তু' শব্দের সঙ্গে 'সংগ্রাম' শব্দের সংযোগ যে কতখানি গভীর, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম উদ্বাস্তু সমস্যার সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ ও ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের মধ্য দিয়ে। দেশভাগের আগে, বিশেষত ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নোয়াখালি দাঙ্গার সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের আগমন শুরু হয়। তারপর দেশভাগ আর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পুনরায় দাঙ্গার কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ বন্যার স্রোতের মতো বাস্তুহারা হয়ে এদেশে আসতে থাকেন। প্রাণ বাঁচাতে, পরিবারের নারীর সম্মান রক্ষা করতে ও নিরাপত্তার আশায় পিতৃপুরুষের ভিটেমাটির মায়া ত্যাগ করে চলে আসতে বাধ্য হন তাঁরা। এই উদ্বাস্তু মানুষদের অসহায়তা, জীবনযন্ত্রণা ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিদারুণ জীবন সংগ্রামের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে ইতিহাসে ও সাহিত্যে। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই যে, তিনটি শ্রেণিতে উদ্বাস্তুদের চিহ্নিত করে পরিচয়পত্র দেওয়া হত। তার মধ্যে যাঁরা সংখ্যায় সর্বাধিক, তাঁরা আর্থিক সঙ্গতির অভাবে সম্পূর্ণরূপে সরকারি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, আর্থিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক বা রাজনৈতিক, যে-কোনো বিপন্ন সময়ের অভিঘাত সবলের চেয়ে দুর্বলকে আন্দোলিত করে অধিক মাত্রায়। তাই নারী, শিশু, বয়স্ক মানুষদের পরিস্থিতি এই বিপর্যস্ত সময়ে কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তা সহজেই অনুমেয়। বিশেষত লিঙ্গবৈষম্যে পূর্ণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক ছিন্নমূল নারীদের অস্তিত্বের সংকট হয়ে উঠেছিল সুতীব্র। উদয়চাঁদ দাশের মতে, "সম্পূর্ণ নিরপরাধ হয়েও দেশবিভাগের ফলে সবচেয়ে বড়ো আঘাত নেমে এসেছিল মেয়েদের ওপর। ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হবার যন্ত্রণাবোধ, মানসিক ভরকেন্দ্র থেকে বিচ্যুতি সবথেকে বেশি সইতে হয়েছে মেয়েদের।"[১] তিনি বলেন যে, দেশবিভাগ পরবর্তী দুঃসময়ে সাধারণ মানুষের দঃখ-দুর্দশার সঙ্গে মেয়েদের সহ্য করতে হয়েছিল অতিরিক্ত অসম্মান ও অবমাননা। শারীরিক ও মানসিকভাবে নারীত্বের উপর নেমে এসেছিল ভয়াবহ আঘাত। বিপর্যস্ত সেই সময়ে মেয়েদের নিরাপত্তাহীন অসহায় অবস্থা ও দুর্বিষহ সংগ্রামের কাহিনি বারবার উঠে এসেছে সাহিত্যে, আত্মকথায়, সাক্ষাৎকারে। সংবেদনশীল শিল্পীমন অপার সহমর্মিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন উদ্বাস্তু নারীর বিপন্নতা ও সংগ্রামের কাহিনি। নারায়ণ সান্যাল এবং শক্তিপদ রাজগুরু এমন দুজন লেখক যাঁদের একাধিক রচনার বিষয়বস্তু হল উদ্বাস্তু জনজীবন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা নারায়ণ সান্যাল রচিত 'বল্মীক' (১৯৫৮) এবং শক্তিপদ রাজগুরু রচিত 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৫৮) উপন্যাস দুটি অবলম্বনে উদ্বাস্তু জীবনের শত প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে নারীর যে অনমনীয় জীবন সংগ্রামের ছবি লেখকরা এঁকেছেন, তা আলোচনা করব।

দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর প্রবন্ধে 'রিফিউজি' শব্দের দুটি প্রতিশব্দের কথা বলেছেন — শরণার্থী এবং উদ্বাস্তু। শরণার্থী অর্থে যিনি জীবনধারণের জন্য উর্ধতন কোনো শক্তির শরণ অর্থাৎ আশ্রয় এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা করছেন, আর উদ্বাস্তু অর্থে গৃহহীন, 'বাস্তু' (বাড়ি) বা 'ভিটে' (ভিত্তি বা ভিত) হীন। "উদ্বাস্তু তিনিই, যাঁকে তাঁর ভিটে থেকে, ভিত্তিভূমি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাস্তুভিটার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারাটাকে সৌভাগ্যের প্রতীক বলেই ধরা হয়। সেই ঠাঁই ছেড়ে যদি কারওকে উদ্বাস্তু হতে হয়, তা নিশ্চিতভাবেই অতীব দুর্ভাগ্যজনক।"[২] চূড়ান্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সপরিবারে গৃহত্যাগে বাধ্য হয়ে এদেশে চলে আসা দুই পরিবারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাস দুটিতে। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার নারায়ণ সান্যাল চাকরিসূত্রে বেশ কিছুটা সময় পূর্ব-বাংলার ছিন্নমূল মানুষদের ক্যাম্প-কলোনীর জীবন কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর অনেক কাহিনিতে সেই অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য মেলে।

'বল্মীক' উপন্যাসের উমাশশী গার্লস স্কুলের হেডপণ্ডিত প্রৌঢ় হরিপদ চক্রবর্তী স্ত্রী দুই পুত্র দুই কন্যা পুত্রবধূ নাতির হাত ধরে একবুক সংশয় আর দুশ্চিন্তাকে সঙ্গি করে মতিগঞ্জের সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে সহস্র হতভাগ্য নরনারীর দলে মিশে এসে পৌঁছান এপার বাংলায়। সাত-আট বছর শেয়ালদহ স্টেশন, বিভিন্ন ট্রান্সিট ক্যাম্প ঘুরে উদয়নগর উদ্বাস্তু কলোনীতে অসমাপ্ত এক ডেসার্টার বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন তীব্র অর্থাভাবে। একটি ঘরের মধ্যে শাড়ি টাঙিয়ে দুই অংশে ভাগ করে অতি কষ্টে বসবাস করে পূর্ববঙ্গের স্বচ্ছল এই গৃহস্থ পরিবার। স্ত্রী বিন্দুবাসিনী, বড়ো মেয়ে নমিতা, ছোটো মেয়ে লতু এবং পুত্রবধূ কামিনী — পরিবারের বিভিন্ন বয়সের চার নারী জীবনের এই বদলকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য অহরহ মনের সঙ্গে লড়াই করে।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে উল্টোরথ পত্রিকায় 'চেনামুখ' নামে একটি বড়ো গল্প প্রকাশিত হয় যা পরবর্তীকালে 'মেঘে ঢাকা তারা' উপন্যাসের রূপ লাভ করে। এখানেও আগের উপন্যাসটির মতো উদ্বাস্তু ব্রাহ্মণ পরিবারের দারিদ্র্যের চিত্র প্রতিফলিত। পীরগঞ্জের স্কুলের জনপ্রিয় হেডমাস্টারমশায় মাধব সান্যাল স্ত্রী ও চার ছেলেমেয়ের হাত ধরে নিজের দেশ, ঘর, জমিজমা, আশ্রয়, মানসম্মান সব খুইয়ে খড়কুটোর মতো এসে পড়েন অজানা জায়গায়। অভাব জর্জরিত পরিবারের তিনটি নারী চরিত্র — মা কাদম্বিনী ও দুই বোন নীতা ও গীতা। উল্লিখিত গ্রন্থদুটির পাঠ নিলে দেখা যায়, দুটিতেই কাহিনির সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে উদ্বাস্তু নারী, তার বিপন্নতা ও সংগ্রামের গল্প। শিক্ষিতা, কর্মরতার সংগ্রামের পাশাপাশি গৃহবধূ ও গৃহিনীর করুণ লড়াইয়ের ছবি অতি জীবন্ত ও বাস্তবসম্মতভাবে অঙ্কিত হয়েছে কথাকারদের নিপুণ লেখনীতে।

নমিতা ও নীতা দুজনেই মেধাবী ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও দেশছাড়া হয়ে এসে পরিস্থিতির প্রতিকূলতায় পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চাকরি নেয়। নমিতার পরিবারে একমাত্র রোজগেরে বড়ো দাদা অনিমেষ অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হলে কেবল ফ্রি রেশনের সাহায্যে দিনাতিপাত

কষ্টসাধ্য হয়ে উঠলে সেই সময় নমিতা স্কুলে চাকরি নেয়। তার সঙ্গে ভূষণের কাছে অর্ডার নিয়ে রাত জেগে সেলাই করে কিছু বাড়তি উপার্জনের আশায়। প্রায় অন্ধ বৃদ্ধ বাবা ও মা-বোনের দায়িত্বের পাশাপাশি আলাদা হয়েও টাকা পাঠায় দাদা-বৌদি অনিমেষ- কামিনীর সংসারে। বিয়ে না করে অন্ধ বাবার পরিচর্যায় বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়ার কথা ভাবে সে। চাকরি পেয়ে সংসারের জন্য প্রথম মাসের বেতন অগ্রিম নিতে হয় তাকে। মায়ের নাকছাবির বিনিময়ে কেনা হয় তার স্কুলে যাওয়ার একমাত্র শাড়ি। কলোনীর স্কুলের দুরবস্থা ও তার শিক্ষিকাদের করুণ অবস্থার ছবি অঙ্কিত হয় প্রসঙ্গক্রমে। অন্যদিকে নীতাও একইভাবে উদয়াস্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করে, চাকরি ও টিউশানি করে বাবা-মা-দাদা-ভাই- বোন-প্রেমিক সকলের মুখে হাসি ফোটাতে চায়। সংসারের স্বার্থপর চাহিদার জোগান দিতে শারীরিক সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে টিউশানির সংখ্যা বাড়ায়। তবু সংসারের একান্ত প্রিয়জনদের কাছ থেকে আঘাতে জর্জরিত হয়। নিজের শরীরকে অবহেলা করে সংসারের জন্য নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়া নীতা শেষে একদিন যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়। মণিকুন্তলা সেন উদ্বাস্তু ক্যাম্পের জীবন কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করে এই মেয়েদের মধ্যে অদ্ভুত এক নবজাগরণ লক্ষ করেন, "ছোট ছোট মেয়েরা পর্যন্ত স্টেশন থেকে একলা ওঠানামা করছে, নিজের কাজে একলা যাচ্ছে — কোনো ভয়ডর নেই। দেশে থাকলে বোধ হয় এত দ্রুত ও সহজে এরা জীবনের হাল ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। শুধু নিজের জীবনের কেন — ঐসব মেয়েরা শক্ত হাতে পরিবারের হাল পর্যন্ত ধরেছে এবং নিজের জীবনের কথাটা আলাদা করে ভাবতেও ভুলে গেছে।"[৩] অশ্রুকুমার সিকদার বলেন, "বাঁচার তাগিদে, পরিবারের অন্যদের বাঁচানোর তাগিদে 'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতার মতো মেয়েরা দলে দলে প্রবেশ করেছিল কাজের জগতে।"[৪] নমিতার ও নীতার জীবন সংগ্রামে তাই কত শত সর্বহারা মেয়েদের লড়াইয়ের কাহিনি মিশে থাকে, তা এইসব বাস্তব ছবির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তু মেয়েদের জীবন ও জীবিকার তাগিদে বাইরের জগতে পদার্পণ প্রসঙ্গে মণিকুন্তলা সেন বলেন, "পূর্ববঙ্গের এইসব মেয়েরা শিক্ষিকা, নার্স, কেরানী — কোন কাজে নেই? বরং পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের তুলনায় এরাই সম্ভবত রুজির ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই একটা ব্যাপারে একদিনের সর্বস্বহারা মেয়েরা পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের যে কি উপকার করেছে তা হয়তো কেউই টের পায়নি। ঐ মেয়েদের নির্ভীক চলাফেরা এবং রুজির জন্য ঘা মেরে মেরে সমস্ত বদ্ধ দুয়ারগুলি খুলে দেওয়া, সম্ভত এদের প্রয়োজনের চাপ ও সংখ্যার চাপে ছাড়া সহজ হতো না।"[৫]

একথার সত্যতার আরও প্রমাণ মেলে সেই সময়ের নারীর স্মৃতিচারণায়। পড়াশোনা বা কাজের জন্য বাইরে বের হওয়ার অনুমতি অনেকেরই সহজে মিলত না। শুনতে হত, "কলেজে গেলেই হাতে ঘড়ি চাইবে আর বাঙালদের মতো চটি ফ্যাটাং ফ্যাটাং করে ঘুরে বেড়াবে।"[৬] অর্থাৎ পরিস্থিতিগত বৈষম্যই হয়তো পূর্ববঙ্গীয় পরিবারে পিতৃতান্ত্রিক অনুশাসনকে শিথিল করে দিয়েছিল। মধুমিতা আচার্য তাঁর আলোচনায় বলেন, "পূর্ববঙ্গের কৃষিভিত্তিক সমৃদ্ধ সমাজ

থেকে চলে আসা বাস্তুহীন পরিবারগুলি অনেকেই বাধ্য হয়ে মেয়েদের কাজে পাঠিয়েছেন। 'পরিবারের প্রতি আর্থিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এদের অনেকেরই বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি, বয়স বেড়ে গেছে, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব বেড়েছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করতে করতে খাদ্যের স্বল্পতায়, অধিক পরিশ্রমে, মানসিক শান্তির অভাবে এরা অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে।"[৭] তাই নীতার বাবা মাধববাবু মুখচোরা, দায়িত্বশীল প্রিয় সন্তানের করুণ পরিণতির জন্য সময়ের সামগ্রিক বিপর্যয়কেই দায়ী করেন। ভাবেন, "নীতা এই যুগের একটি বলি মাত্র— একা নীতা নয়— আরও অনেককে দেখেছেন তিনি।"[৮] কাহিনির শেষে নীতার দাদা শঙ্কর নীতার মতোই আর একটি মেয়েকে ব্যস্তভাবে ছেঁড়া চটি সামলে ট্রেনের জন্য দৌড়াতে দেখে। অর্থাৎ নীতা বা নমিতা যে আসলে এই বিপর্যস্ত সময়ের অসংখ্য ছিন্নমূল মেয়েদের প্রতিনিধি মাত্র, তা বুঝিয়ে দেন দুই লেখকই।

শিক্ষিতা ও চাকুরিরতা নারীর সংগামের পাশাপাশি আর্থিক দুর্দশাগস্ত বাস্তুহারা পরিবারের গৃহবধূর কঠিন জীবন সংগামের ছবি চিত্রিত হয়েছে নারায়ণ সান্যালের কলমে। 'বল্মীক' উপন্যাসে হরিপদ পন্ডিতের পুত্রবধূ কামিনী। বাবা মায়ের আদরে প্রতিপালিত একমাত্র কন্যা সন্তানটি বিয়ের পর উচ্চশিক্ষিত মহোপাধ্যায় বংশের যৌথ পরিবারের স্নেহচ্ছায়ায় শান্তির স্পর্শ পেয়েছিল। জীবনের আকস্মিক ছন্দপতনে বিপর্যস্ত মেয়েটি দিশেহারা হয়েও ভেঙে পড়েনি। নিজে অনাহার সহ্য করে পরিবারের মানুষগুলিকে অনাহার থেকে বাঁচাতে সবাইকে লুকিয়ে রাত্রি জেগে চিঁড়ে-চানাচুর ভেজে ছোটো দেওরটিকে তা ট্রেনে বিক্রি করতে পাঠাত সে। তার দৈনন্দিন সংগামের ছবি জীবন্ত হয়ে ওঠে ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়, "র‍্যাশান-মেয়াদের শেষ কটি দিন কামিনীর প্রায় অভুক্তই কাটে। অনাহারক্লিষ্ট শরীরে সে তখন গিয়ে বসে কাঠের উনানের সামনে। ভিজা কাঠের উনানে ফুঁ দিতে চোখে জল আসে। তাতে দুঃখ নেই কামিনীর। কাঁদবার এ একটা ভালো অছিলা।"[৯]

যাদের উপর তার নিশ্চিন্ত জীবনের ভার ছিল, তাদের কাছ থেকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের ন্যূনতম চাহিদাগুলোর অপ্রাপ্তিতেও কখনও মুখ ফুটে কোনো অভিযোগ জানায় না সে। শতচ্ছিন্ন শাড়িতে আব্রু রক্ষা না হওয়ায় বিব্রত বোধ করে, শাড়ির অপরাংশে শ্বশুর-শাশুড়ির উপস্থিতিতে এক ঘরে সসংকোচে দাম্পত্য যাপনে বাধ্য হয়। তবুও কামিনী সহ্য করে, লড়াই চালিয়ে যায়। শিক্ষিত উচ্চবংশের মূল্যবোধ আঁকড়ে অনাহারে মরার চেয়ে সৎপথে যে-কোনো জীবিকা অবলম্বনই যে তাদের ঐ ভয়ঙ্কর দুঃসময়ে শ্রেয়, এই প্রখর বাস্তববোধ ছিল তার মধ্যে। কিন্তু পরিবারের কাউকেই বাবলুর হয়ে একথা বোঝাতে সমর্থ হয় না সে। বরং সংসারের জন্য তার ঐকান্তিক প্রয়াসকে পুরো পরিবার যখন ভুল বোঝে, কুৎসিত ইঙ্গিত করে ঘৃণাভরে তাদের ত্যাগ করে যায়, তখন অভিমানাহত নারী ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে, "দ্বিগুণ উৎসাহে জ্বলে ওঠে কামিনী, তাকে লড়াই ক'রে প্রমাণ দিতে হবে। কিন্তু লড়বে যে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে - সেই দারিদ্র যে অসীম শক্তিশালী।"[১০] অসুস্থ স্বামী, দুধের শিশুকে

নিয়ে খালি হাতে এই অসীম বলশালী দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়তে চায় সে, তবু তার কাছে আত্মসমর্পণ করে না। মাথা উঁচু রেখে ফিরিয়ে দেয় ননদের মানি অর্ডার। অরক্ষিত অসহায় সুন্দরী যুবতী নারীর সংগামের প্রতিপক্ষ তো শুধু দারিদ্র্য নয়, মাংসলোলুপ পিশাচ বিষ্ণুপদ নতুন শাড়ির প্রলোভন দেখিয়ে তাকে ক্রমাগত উত্যক্ত করে। সেখানেও সমানভাবে সততার সাহসে রুখে উঠে প্রতিবাদ জানায় এই অপরাজেয় নারী। জননেতা নিতাই ঠাকুর্দার সহযোগিতায় রুগ্ন স্বামীকে সুস্থ করে, নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে, হারানো স্বজনদের ফিরে পায়। নমিতা বা নীতার মতো কর্মরতা না হলেও, সংসার টিকিয়ে রাখতে ছিন্নমূল পরিবারের এই বধূটির কঠোর জীবন সংগাম পাঠকের কাছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরে।

সংসারবৃত্তে আবদ্ধ আরও দুই নারীর কথা উল্লেখ্য, সময়ের কাঠিন্য যাঁদের বাৎসল্যরসকেও হরণ করে নেয়, তাঁরা হলেন কাদম্বিনী ও বিন্দুবাসিনী। তাঁরা উভয়েই বেঁচে থাকা ও সংসারকে বাঁচানোর তাগিদে মরিয়া হয়ে ব্যবহার করেন সন্তানকে। বড়ো মেয়ের উপার্জন হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে হৃদয়হীনভাবে সন্তর্পণে নীতা বা নমিতার পছন্দের মানুষটির সঙ্গেই ছোটো মেয়ের বিবাহের উদ্যোগ নেন। গীতার বিয়ের পর একটি মানুষের খাওয়ার খরচা কমলো ভেবে স্বস্তি অনুভব করেন কাদম্বিনী। বাইরে বেরোনোর মত অক্ষত বস্ত্রের সংস্থান না থাকায় যুবতী মেয়ে বউকে লোলুপ পুরুষের দৃষ্টি থেকে বাঁচাতে রুগ্ন অশক্ত শরীরে রাস্তার কল থেকে জল বয়ে আনার দায়িত্ব তুলে নেন বিন্দুবাসিনী। অকারণ আক্রমণে পর্যুদস্ত করেন বৌমা কামিনীকে। বাস্তুহারা জীবনের অভাব অনটনই যে এর মূল কারণ ছিল, তা বোঝা যায়। মাধববাবু ভাবেন, "কাদম্বিনীকে দেখেছেন, পীরগঞ্জের বাড়িতে সে ছিল প্রাচুর্যের মধ্যে গৃহলক্ষ্মী। আজ জীবনের কঠিন সংগ্রামের কালো ছায়া তার মুখে-চোখে। বাঁচবার জন্যই নিষ্ঠুর হতে নিষ্ঠুরতর হয়ে উঠেছেন। সেই লক্ষ্মীশ্রী মুছে গেছে ওর মুখ থেকে, চারিদিকের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য অহরহ চেষ্টা করে চলেছেন। নীচতা — শঠতাকেও মেনে নিয়েছেন।"[১১] অসহায় এই মায়েরা নিরুপায় অক্ষমতায় শাশ্বত মাতৃত্বের ব্যর্থতার জ্বালা বুকে নিয়ে গুমরে মরেন। অন্যদিকে দিদির ভালোলাগার কথা স্পষ্টভাবে জানার পরেও তার প্রেমাস্পদকে অধিকার করার অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নামে নীতার বোন গীতা বা নমিতার আদরের বোন লতু। তাতে কোথাও গিয়ে একথা মনে হয় যে, আসলে চূড়ান্ত স্বার্থপরতার পাশাপাশি এও যেন এক প্রকার তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রামই। কম বয়সের সৌন্দর্যকে অস্ত্র করে দিদির কাছ থেকে লড়াই করে ছিনিয়ে নেওয়া ভবিষ্যৎ জীবনের নিরাপত্তার আশ্বাস।

উদ্বাস্তু কলোনী জীবনের অপরিসীম দারিদ্র্য, অনাহার, অসুখ, মৃত্যু, কাজের অভাব, বঞ্চনা, সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ ও সংগ্রামের অতীব বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে 'বল্মীক' উপন্যাসে। সেই সংগ্রামের অন্যতম অংশীদার যে ছিল মেয়েরা, তা সযত্নে বর্ণনা করেছেন লেখক। সংসারের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করা নমিতার লড়াই শুধু নিজের পরিবারের স্বার্থের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। কলোনীর মানুষের ভালোমন্দের জন্য গঠিত কমিটির মহিলা সদস্য, শান্ত

সহৃদয় মেয়েটি কলোনীতে আশ্রয় নিতে আসা নতুন উদ্বাস্তু মানুষগুলিকে আশ্রয় দিতে চেয়ে অফিসারের সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় তর্ক করে। কলোনীতে গন্ডগোলের মধ্যে পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনির লাঠিচার্যের সময় এক বৃদ্ধা উদ্বাস্তুকে বাঁচাতে গিয়ে মাথায় লাঠির আঘাত খেয়ে গুরুতর আহত হয় ও হাসপাতালে মারা যায়। অন্য কাহিনিটিতেও দুর্জয় আত্মশক্তি নিয়ে সকলের জন্য লড়তে লড়তে, সংসারের সবার মুখে হাসি ফুটিয়ে একসময় ফুরিয়ে যায় যক্ষারোগে আক্রান্ত নীতা। নিজেদের জীবনকে ব্যর্থ করে চারপাশে সৌরভ সিঞ্চিত করে এই নারীরা। তাই পঁচিশ বছরের কুমারী নমিতাকে শেষ সম্মান জানাতে সমগ্র কলোনী সমবেত হয়। কলোনী জীবনের অবিস্মরণীয় সমারোহপূর্ণ শোকযাত্রায় তার আত্মত্যাগকে গৌরবজনক স্বীকৃতি জানায় তারা। এইভাবেই নিজেদের জীবন দিয়ে অপরকে বাঁচার সঞ্জীবনী মন্ত্র শিখিয়ে যায় এই অমৃতদাত্রী নারীরা, এই পথেই সফল হয় তাদের দুর্বার জীবন সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ।

তথ্যসূত্র :

১। উদয়চাঁদ দাশ, ‘ছিন্নমূল মানুষ ও বাংলা আখ্যান’, উদয়চাঁদ দাশ (সম্পা.), দেশবিভাগ ও বাংলা আখ্যান, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মে, ২০১৬, পৃ. ৫৮।

২। দীপেশ চক্রবর্তী, ‘বাস্তুহারার স্মৃতি ও সংস্কার : ছেড়ে আসা গ্রাম’ (অনুবাদ — শোভন তরফদার), সেমন্তী ঘোষ (সম্পা.), দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০০৮, দ্বিতীয় মুদ্রণ : বইমেলা ২০০৯, পৃ. ১৬৪।

৩। মণিকুন্তলা সেন, সেদিনের কথা, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৫৯, পৃ. ১৮৩।

৪। অশ্রুকুমার সিকদার, ‘ভাঙা বাঙলার সাহিত্য’, সেমন্তী ঘোষ (সম্পা.), দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০০৮, দ্বিতীয় মুদ্রণ : বইমেলা ২০০৯, পৃ. ২০৭।

৫। মণিকুন্তলা সেন, সেদিনের কথা, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৫৯, পৃ. ১৮৩।

৬। জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘মেয়েলি জীবন, ভাগাভাগির পরের যুগ’, সেমন্তী ঘোষ (সম্পা.), দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০০৮, দ্বিতীয় মুদ্রণ : বইমেলা ২০০৯, পৃ. ১০৯।

৭। মধুমিতা আচার্য, স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত কর্মরতা মেয়েদের ভূমিকা, কমলিনী প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৬৩।

৮। শক্তিপদ রাজগুরু, মেঘে ঢাকা তারা, দে’জ পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম দে’জ সংস্করণ, কলিকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ৭২।

৯। নারায়ণ সান্যাল, বল্মীক, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬৫, পৃ. ১০।

১০। তদেব, পৃ. ৫৯।

১১। শক্তিপদ রাজগুরু, মেঘে ঢাকা তারা, দে’জ পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম দে’জ সংস্করণ, কলিকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ৬৯।

দু র্গা দা স মি দ্যা

লেখক সমরেশ, মানুষ সমরেশ

চিকিৎসক ও সাহিত্যিক পুত্র নবকুমার বসু কথায় বলা যেতে পারে যে—"দিনক্ষণ মিলিয়ে নিশ্চিত করে বললে, উনিশশো অষ্টাশি সালের মার্চ মাসের বারো তারিখে দুপুর আড়াইটের সময়, মধ্য-কলকাতার তৎকালীন অভিজাত চিকিৎসাকেন্দ্র বেলভিউ ক্লিনিকের ইন্টেন্সিভ করোনারি কেয়ার ইউনিটে আমার বাবা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র চৌষট্টি বছর।" তাহলে হিসেবমত তাঁর জন্ম ১৯২৪ সালে। তাঁর মৃত্যু হয়ত এত ত্বরান্বিত হত না যদি চিকিৎসা বিভ্রাট না হত। তাহলে হয়ত আমরা রামকিঙ্করের জীবনোপন্যাস সম্পূর্ণরূপে পেতে পারতাম যা অবশ্যই অন্য এক মাত্রা সংযোজিত হতে পারতো 'দেখি নাই ফিরে' উপন্যাসটি। একথা কিন্তু আমার কল্পনাপ্রসূত কোনো কথা নয়, এই কথা জানতে পেরেছি তাঁর সাহিত্যিক পুত্র নবকুমার বসুর মুখ থেকে। তিনি খুব স্পষ্টভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে তাঁর বাবা সমরেশ বসুর মৃত্যু চিকিৎসকদের অধিক সন্ন্যাসিতে গাজন নষ্টের মতো। তিনি বলছেন যে—তাঁরা অর্থাৎ চিকিৎসকরা এতো বেশি প্রফেশনাল ছিলেন যে সময়ানুগ পদ্ধতিগত পরিবর্তশীল চিকিৎসা তাঁদের অধিগত ছিল না। এইসব কথা থেকে স্পষ্ট যে সমরেশ বাবুর মৃত্যুর জন্য দায়ী সেই সমস্ত খ্যাতনামা ডাক্তাররা। থাক বাংলা সাহিত্যের যা ক্ষতি হবার তা তো হল। দেখতে দেখতে তাঁর শতবর্ষে তিনি উপনীত হলেন আর আমাদের আলোচনা সেই মহামানবকে ঘিরে যিনি বাংলা সাহিত্যের বাগানে এমন সব ফুল ফুটিয়েছিলেন যা আজও আমাদেরকে নাড়া দেয়। তৃপ্ত করে আমাদের মনকে। সেই মানুষের জীবন সে যে এক সংগ্রাম তা আমাদের সকলের হয়ত জানা নেই। কিছু আলোকপাত করা বোধহয় আমাদের কর্তব্য। আসুন তাহলে আলোকপাত করি—জীবনের পাতায়। জন্ম-১১ ডিসেম্বর ১৯২৪, মৃত্যু আগেই উল্লেখিত হয়েছে। তিনি সম্পূর্ণ এক বোহেমিয়ান চরিত্রের মানুষ ছিলেন—তিনি কী করেন নি। "বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা পূর্ণ জীবন। মাথায় ডিমের ঝাঁকা নিয়ে ডিম বিক্রি, আট আনা রোজে কাজ। ইছাপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে আগ্নেয়াস্ত্রের নকশা আঁকার কাজও করেছেন। পরে সাহিত্যই সর্বক্ষণের জীবিকা। কম্যুনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন একদা। জেলও খেটেছেন।" এমন এক বৈচিত্রময় জীবনের সাক্ষী ছিলেন সমরেশ বসু।

সেই মানুষকে নিয়ে আমাদের আলোচনা, আলোচনা তাঁর সাত্যিকর্ম নিয়ে। বিশাল এবং বিস্তৃত এক পটভূমিকায় তিনি বিচরণ করেছেন। তাই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যও যেন এক 'রামধনু'ময় রঙিন। দুঃখ-সুখের জীবন-ভেলার সামগ্রিক চিত্র উঠে এসেছে তাঁর লেখনিতে। সাহিত্য তো লেখকের মানসিক অবস্থার উৎপাদিত ফসল। তাই তাঁর সমস্ত লেখার মধ্যে

অবশ্যই উঠে এসেছে চোখে দেখা সমাজ ব্যবস্থার কদর্য রূপ, শুধু কদর্যই বা বলি কেন? এক স্বার্থমগ্ন স্বার্থপরতায় চিত্রও স্থান পেয়েছে তাঁর লেখায়। আতশ কাঁচ দিয়ে তিনি বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন মানুষের চরিত্রকে।

'দেখি নাই ফিরে' পড়ছিলাম আজ এই সময়ে। সত্যি অবাক হতে হয় কত নিযুত ছিল তাঁর দেখার চোখ। 'অল ইন্ডিয়া আর্ট একজিবিশনে'র লক্ষ্ণৌয়ের উদ্যোক্তারা একটা চিঠি পাঠিয়েছে আচার্য রবীন্দ্রনাথের নামে। সেই চিঠিতে খবর এসেছে—"লক্ষ্ণৌ চিত্র প্রদর্শনীতে: কলাভবনের অধ্যক্ষ নন্দলালের চিত্র স্বর্ণপদক পেয়েছে। কলাভবনের এক ছাত্রের চিত্র ও সেই প্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক পেয়েছে। তার নাম রামকিঙ্কর প্রামাণিক।" এই বর্ণনার মধ্যে যে খুঁটিনাটি পরিলক্ষিত হয় তাতে স্পষ্টতই প্রকাশিত হয় যে রামকিঙ্কর প্রামাণিকের ভবিষ্যত একেবারে উজ্জ্বল। সেই ঔজ্জ্বল্যের চিত্র উঠে এসেছে লেখকের লেখায়।

আমরা জানতে পারছি লেখকের লেখা থেকে যে রামকিঙ্করকে কম হেনস্থা হতে হয়নি, তাঁর উচ্চবর্ণের সহপাঠীদের দ্বারা; যা লেখকের সমাজসচেতন দৃষ্টি এড়ায়নি। আমরা সবাই ইতিমধ্যে জেনে গেছি যে রামকিঙ্কর বাঁকুড়ার যুগীপড়ায় একটি দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা একজন ছাত্র, তাঁর এই অবহেলা অপমান সমরেশের দৃষ্টি এড়ায়নি। 'স্বর্ণপদক' পাওয়া উপলক্ষে কলাভবনের অধ্যক্ষকে তাঁর ছাত্ররা অনুরোধ করছেন 'বোথেনিয়ান' ক্লাবের সদস্যদের ডিম্বভক্ষণ করাইতে হইবে।' ওনার পক্ষে ছাত্র- ছাত্রীদের ডিম খাওয়ানোর খুব একটা অসুবিধে নেই, কিন্তু রামকিঙ্কর? কোথা থেকে খাওয়াবে? সেই নিয়ে একটি হেনস্থার চিত্র তুলে ধরছেন সংবেদনশীল মানসিকতার লেখক 'সমরেশ বসু'। হেনস্থাটা কোন পর্যায়ের ভাবতে গেলে গা শিউরে ওঠে। 'নিশিকান্ত' নামে একজন ছাত্র ওর দাবিটা আবার প্রকাশ করলো, "মাষ্টারমশাই, কিঙ্করকে তো ডিম খাওয়াতে পারবে না। তা হলে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে। ওর স্বর্ণপদক আসবে। সেটা বিক্রি হবে। তবে খাওয়া জুটবে।" এই অংশের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে লেখক বুঝিয়ে দিলেন রামকিঙ্করের অর্থনৈতিকভাবে দুরবস্থার কথা। বিনোদবিহারী তিনিও একজন ছাত্র ছিলেন কলাভবনের—তাঁর উপহাসের মাত্রাটা কত বেশি মারাত্মক এবং নিম্নমানের তাও লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই তিনি উল্লেখ করেছেন বিনোদবিহারীর বক্তব্য—"তবে তরজা গায়কের মতো সোনার মেডেল যেন কেউ গলায় ঝুলিয়ে না বেড়ান"। এই কথায় যে উপহাস প্রকাশ পেল তাতে বিনোদবিহারীর মানসিকতার স্তর কত নিম্ন তা বুঝতে অসুবিধা হল না।

'রামকিঙ্কর' কত উদার মানসিকতার মানুষ ছিলেন তা বেশ বোঝা যায় সমরেশ বসুর এই অংশটি থেকে। এই মননশীলতা তিনিই ধরতে বা বুঝতে পারেন যাঁর মানসিক স্তর প্রায় সমপর্যায়ের! রামকিঙ্করকে কীভাবে সমাদৃত করা হবে এই স্বর্ণপদক প্রাপ্তির জন্য সে কথার প্রসঙ্গ উঠতেই একজন সহপাঠী সত্যেন বিশি প্রস্তাব দিলেন—"আমরা রামকিঙ্করকে একটা মানপত্র দিতে পারি। কলাভবনে একটা অনুষ্ঠান করে.....রামকিঙ্কর মাথা নেড়ে অস্বীকার

জানালেন এবং বললেন—তার চেয়ে ধীরেনদা এস্রাজ বাজান। আর কথা না শেষ করে ইন্দুলেখার দিকে তাকালেন। যদি ইন্দুলেখা গান শোনায়।" এর থেকে স্পষ্টতই রামকিঙ্করের মানসিকতা যেমন প্রকাশ পায় তেমন প্রকাশ পায় লেখকের বোধ। কারণ এই লেখা তো সমরেশ বসু লিখছেন মানস সরোবরে সাঁতার কাটতে কাটতে। তাই তাঁর মানসিকতার কিছু আভাষ কি আমরা পাচ্ছি না?

কী অসম্ভব অনুসন্ধিৎসু ছিলেন লেখক সমরেশ। রামকিঙ্কর প্রামাণিক কীভাবে রামকিঙ্কর বেজ হয়ে গেলেন সেই সংবাদও তাঁকে প্রাণিত করেছে—এই জীবনের উপন্যাস রচনায়। অর্থাৎ একেবারে ঠাস বুনোনে বুনতে চাইছেন তাই প্রামাণিক থেকে বেজ কেমন করে হলেন তাও জানা চাই! এই রকম আত্মজিজ্ঞাসা না থাকলে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা মাথায় ওঠে না। এই পদবী নিয়ে কত কথা শান্তিনিকেতনের বাতাসে ঘুরপাক খায় সেও মাথায় ছিল সমরেশ বাবুর। ফলে বিচিত্র এক স্বাদে উত্তরিত হয় 'দেখি নাই ফিরে'। তবে আমার মতে এ শুধুমাত্র জীবনোপন্যাস নয়, এ এক ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণে যে ভাবে সময় এবং কালকে ধরা হয়েছে তাতে তৎকালীন শান্তিনিকেতনের প্রাত্যহিক চিত্র ধরা পড়েছে। সেই সময়ের শান্তিনিকেতনের শাসন, পঠন-পাঠন, এমনকি পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন সব উঠে এসেছে। 'দেখি নাই ফিরে' পড়লে অনেক অদেখাই দেখা হয়ে যাবে বলে আমার ধারণা।

আমার এই ধারণা যে কত সত্য তা এই অংশ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে। রবীন্দ্রনাথ হাতে নাতে শিক্ষায় বেশি গুরুত্ব দিতেন তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি রথীন্দ্র এবং বন্ধুর ছেলে সন্তোষকে এক সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন আমেরিকায়, তাঁরা দুজনে কৃষি ও গোপালন বিষয়ে স্নাতক হয়েছিলেন। এই সমস্ত কথা এই উপন্যাসে লেখা আছে। এ তো শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-ভাবনার ইতিহাস। এমনকি গোশালা তৈরি হয়েছিল সন্তোষচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে। রবীন্দ্রনাথ উৎসাহ দিয়েছিলেন। এইভাবে রামকিঙ্করের জীবন ঘিরে কত ঘটনায় কথা উঠে এসেছে, আর এগুলো নিখুঁতভাবে বর্ণনা করছেন সমরেশ বসু! কত খুঁটিনাটি সংবাদ জানতে পারছি এই উপন্যাস পড়ে। রামকিঙ্কর তো অবাক হয়েছিলেন শুনে যে—চাষ, গোপালন শিখতে যে আমেরিকায় যেতে হতে পারে, আর তা শেখার জন্য সে দেশে কলেজ থাকতে পারে সেটাই অবিশাস্য।

আর একটা তথ্য আমরা পাচ্ছি তা হল—"অবিশ্যি শমীন্দ্র কুটিরের সামনে মাটি দিয়ে ডোবা ভরতি করেও ছাত্ররা ভালো টাকা পেয়েছিল। গত মহাযুদ্ধের সময় পূর্ববঙ্গের পাটচাষীদের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছিল। ডোবা বোজানোর টাকা পাঠানো হয়েছিল পাটচাষীদের সাহায্যার্থে।" এই কথা জানা গেল যা সত্যিই খুব উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাই এই উপন্যাস শুধুমাত্র জীবনোপন্যাস নয়। শান্তিনিকেতনের তৎকালীন সময়ের একটা নৈতিক অবস্থার প্রতি দিক, নির্দেশ করা, এটাও কিন্তু লেখকের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে।

আর একটা জিনিষ লক্ষ্যণীয় যে এতো লোকের মাঝে কেন্দ্রীয় চরিত্র রামকিঙ্করকে কত নিবিড় কুশলতায় সকলের থেকে আলাদা করে দেওয়ার পদ্ধতিগত দিক। যেমন রামকিঙ্কর প্রামাণিক থেকে বেজ'-এ উত্তরণ। তেজেশচন্দ্র খান বলছেন—"দেখি তার হাতের মাপটা। এ তো অর্জুনের হাতের মত আজানুলম্বিত।" এইভাবে রামকিঙ্কর যে সকলের থেকে আলাদা এই দিকটা লেখক বোঝাতে গেছেন এই ছোট ছোট ঘটনার মধ্যে দিয়ে, যা কিন্তু লেখকের বিশেষ কুশলতার উদাহরণ। তারপর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ যখন বলছেন—"নন্দলালের মুখে শুনেছি, তুই নাকি বাঁকুড়া থেকে তৈরি হয়েই এসেছিস। ওখানে হাত পাকালি কেমন করে?"— এই কথা থেকেও প্রমাণিত হয় যে রামকিঙ্কর বেজ (প্রমাণিক) কতটা প্রতিভাধর ছিলেন! কত স্বশিক্ষিত ছিলেন।

'দেখি নাই ফিরে' লিখতে গিয়ে লেখক সমরেশও একেবারে ধ্যানস্থ হয়েছিলেন বলেই এমন একটা ঐতিহাসিক জীবনোপন্যাস সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এই উপন্যাসের মূল চরিত্র রামকিঙ্কর যেমন তাঁর জীবনযাপনে বোহেমিয়ান ছিলেন, লেখক সমরেশ বাবুও সেই ধারার মানসিকতার লোক ছিলেন। একথা তাঁর সাহিত্যিক ছেলে নবকুমার বসু বলেছেন—'দেখে নাই ফিরে' রচনার সৃষ্টির ইতিহাস বিচার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে। নবকুমার বসু বলেছেন—"আমার বাবা যতই তাঁর 'কালকূট' রচনাধারায় তাঁর উদাসী বাউল ঘরছাড়া মুক্ত বিহঙ্গের মতো মানসিকতার কথা লিখেছেন, বলেছেন একটু খেয়াল করলেই কিন্তু বোঝা যায়। আসলে মানুষটা ভীষণই সংসারী, ভালবাসা আর মায়ায় জড়িয়ে রয়েছে সারাক্ষণ। কালকুটের লেখা হচ্ছে তাঁর দোটানা আর মনে মনে পালানোর গোপন ইচ্ছার শিল্পীত প্রকাশ, ভাষা যার অন্যতম বাহক। তাঁর গোটা জীবনটাই আসলে টানা পোড়েনের।"

ঠিক একই চরিত্রগত গুণাবলীর মানুষ ছিলেন রামকিঙ্কর, যাকে বলে 'সেয়ানো সেয়ানে কোলাকুলি'। জীবনোপন্যাস রচনা করা—সেতো খুব সহজ কাজ নয়। উপন্যাস এবং জীবনোপন্যাসের মধ্যে দুস্তর ফারাক। নবকুমার বসু বলছেন—"মানুষটা যেমন থাকার তেমনই থাকে কিন্তু লেখকের মনন-মেধা আর মন্ত্রে এবং কল্পনায় সে চরিত্র হয়ে ওঠে। কিন্তু নিবিড় সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় সেই বিচিত্র নির্মাণকল্পে। লেখকের কল্পনার রাশ টেনে ধরতে হয়, ভাবনা আর আবেগকে প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।" এই ক্ষমতা ছিল বলেই সমরেশ বসু এই রকম একটা দুরূহ কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তবে এটার পিছনে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ। এসব তথ্য আমাদের জানা। তবুও আজ এই শতবর্ষের পাদপ্রদীপে দাঁড়িয়ে এই অতীত রোমন্থন বিলাসভ্রমণ নয়। এর থেকে স্পষ্টতই একটা বিশেষ চরিত্রের দিক উন্মোচিত হয় যা সমরেশ বসুর পক্ষে এক গৌরবের অধ্যায়, আর সেই গৌরব স্মরণ করা আমাদের বিস্মিত করে। এই মানুষের হাত দিয়ে বেরিয়ে এসেছে 'বিবর', 'প্রজাপতির' মতো লঘু সামাজিক উপন্যাস। যা নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। তিনি স্ব-নামেই এই সব রচনা পাঠকের

সামনে এনেছেন। এও এক দুঃসাহসিক প্রয়াস। বিশেষ করে আমাদের সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে ইনিই লিখেছেন 'কালকূট' ছদ্মনামে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', 'কোথায় পাবো তারে' এবং 'শাম্ব'। আবার রাজনৈতিক উপন্যাস রচনাতেও তিনি সমান সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' এমন এক রাজনৈতিক উপন্যাস, যা বামপন্থী রাজনীতি আধারিত ভুল ত্রুটির দিকে তিনি দিক্ নির্দেশ করেছেন। তিনি কম্যুনিস্টপার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এসব আমাদের জানা, তা সত্বেও তিনি তাদের দলের ব্যবহারিক প্রয়োগে ত্রুটির কথা তুলে ধরতে পিছপা হননি। অর্থাৎ তিনি সৎ ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিতে।

এইরকম একজন মানুষের শতবর্ষে পদার্পণ সে তো এক গৌরবময় অধ্যায়। বংলা সাহিত্য যতদিন থাকবে ততদিন সমরেশ বসুর সাহিত্যকে নিয়ে আলোচনা হবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমার ভালোলাগার একজন সাহিত্যিক নিয়ে আমার এই শ্রদ্ধা-তর্পণ। অনেক কথা আরও লেখা যায় কারণ তিনি ঊষর মরুভূমির ঝর্ণা নন, তিনি গঙ্গোত্রীর মতো চিরন্তন এক প্রসবন—যা থেকে বের হয় গঙ্গার মতো দীর্ঘ প্রবাহিত নদী।

প্র ণ ব কু মা র মা হা তো

'নয়নপুরের মাটি' : সমরেশ বসুর সংগ্রামী চেতনা

সাহিত্যে অনুগামী বা অনুসারী বা ভাবশিষ্য বা উত্তরসূরী এই শব্দবন্ধগুলি লেখক বা কবিমাত্রের ক্ষেত্রেই কমবেশি প্রযোজ্য। যদিও প্রত্যেক মহৎ লেখক বা কবির রচনার মধ্যেই স্বতন্ত্রতা অবশ্য লক্ষণীয়। সমরেশ বসু এমনই একজন সাহিত্যিক যিনি আক্ষরিক অর্থেই ব্যতিক্রমী। প্রথম থেকেই তিনি পূর্বতন কোনো সাহিত্যিকের উত্তরসূরী হতে চাননি। সর্বদা তিনি এ বিষয়ে সজাগ ও সতর্ক থেকেছেন। তিনি যে সময়ে লেখালেখি শুরু করেছিলেন সেই সময়ে দাঁড়িয়ে এই কাজটি ছিল অত্যন্ত দুরূহ এবং রাস্তা ছিল অত্যন্ত দুর্গম ও সংকীর্ণ। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যাকাশে দুই চন্দ্রের (বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র) অনুপস্থিতি এবং সূর্যসম রবীন্দ্রনাথের অস্তাচল সত্ত্বেও এক উজ্জ্বল নক্ষত্র (তারাশঙ্কর) তখনও সাহিত্যাকাশে আপন প্রভায় সমুজ্জ্বল। মানিক তাঁর প্রতিভার দ্যুতিতে উদ্ভাসিত। বিভূতিভূষণ জনপ্রিয়তার শীর্ষে আসীন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুবোধ ঘোষ, বনফুল প্রমুখ প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের বলিষ্ঠ লেখনী বাঙালি পাঠক সমাজকে আবিষ্ট করে রেখেছে। এমনই এক প্রতিকূল পরিবেশে বাংলা সাহিত্যকে পেশা হিসেবে নিয়ে নিজেকে ব্যতিক্রমী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চ্যালেঞ্জটা নিয়েছিলেন সমরেশ। সে কাজে যে তিনি চূড়ান্ত সফল হয়েছিলেন তা বলা বাহুল্য। জন্মশতবর্ষেও তিনি বাংলা সাহিত্যে সমান প্রাসঙ্গিক ও জনপ্রিয়। ১৯২৪ সালের ১১ ডিসেম্বর ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার রাজনগর গ্রামে জন্ম সমরেশের। বাবার কর্মক্ষেত্র ঢাকাতেই সমরেশের শৈশব থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত কাটে। এরপর দাদা মন্মথ কর্মস্থল চব্বিশ পরগনার নৈহাটিতে তিনি চলে আসেন ১৯৩৯ সালে। অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন নৈহাটির মহেন্দ্র স্কুলে। বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ প্রথাগত পড়াশুনায় মন বসেনি তাঁর। বরং ছবি আঁকা, বাঁশি বাজানো, গান গাওয়া, থিয়েটার করা প্রভৃতির দিকে ছোটবেলা থেকেই ঝোঁক ছিল বেশি। এই সঙ্গে স্কুল পালানো, চায়ের দোকানে আড্ডা, লুকিয়ে সিগারেট খাওয়া এসব বদভ্যাসও তৈরি হয়েছিল। তথাকথিত নিম্নবিত্ত মানুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশলেও বইপড়া এবং ঘুরে বেড়ানোর নেশাও কম ছিল না তাঁর। প্রথাগত পড়াশুনায় অমনযোগী হওয়ার জন্য অষ্টম শ্রেণিতে ফেল করে পুনরায় ঢাকায় ফিরে যান এবং কাপড় মিলে চাকরি শুরু করেন। সেখানেও তিনি স্বভাবচঞ্চলতার কারণেই থিতু হতে পারেননি। আবার ফিরে আসেন নৈহাটিতে। স্কুলে ভর্তি হয়ে অকৃতকার্য হলে, দাদা অত্যন্ত হতাশ হন। ১৯৪১ সালে তিনি ম্যালেরিয়া ও জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি হন। দাদার আর্থিক সংকট ও উদাসীনতা থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন স্কুলের বন্ধু দেবশঙ্করের দিদি গৌরী মুখার্জী। যিনি একসময় স্বামীর বাড়ি ছেড়ে পাকাপাকি ভাবে চলে এসেছিলেন। গৌরী দেবী তাঁর সমস্ত সোনার গহনা বিক্রি করে ভ্রাতৃবন্ধু সমরেশকে চিকিৎসা

করিয়েছিলেন। সদ্য রোগমুক্ত দশম ক্লাসের সমরেশ তাঁকে নিয়ে পালিয়ে যান জগদ্দলের আতপুরের বস্তিতে। সেখান থেকেই ব্যক্তি সমরেশের জীবন সংগ্রামের সূচনা। সত্য মাস্টারের সঙ্গে পরিচয় এবং সেইসূত্রে ইছাপুরের বন্দুক কারখানাতে চাকরি। তার আগে তিনি ফেরি করতেন পোলট্রির ডিম ও মুরগি। সত্য মাস্টারের অনুপ্রেরণায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করার পরেই তাঁর সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে পালটে গেল জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি। ১৯৪৬ সালে, ইছাপুর বন্দুক কারখানায় কর্মরত অবস্থায় লিখে ফেললেন 'নয়নপুরের মাটি'(১৯৫২) উপন্যাসটি। যেটি একসময় প্রকাশ পেয়েছিল 'পরিচয়'-এর পাতায়। এই উপন্যাসের উপপাদ্য একজন শিল্পীর জীবন। শিল্পীর জীবনকে নিয়ে তিনি পরবর্তীকালে লিখেছিলেন—'ছিন্নবাধা'(১৯৬২) 'টানাপোড়েন'(১৯৮০) ও শেষ অসমাপ্ত উপন্যাস 'দেখি নাই ফিরে'। শিল্পীদের প্রতি ছিল লেখকের গভীর শ্রদ্ধা। অল্প বয়সে তিনি নিজেও একজন চিত্রশিল্পী হতে চেয়েছিলেন। সেইকারণে হয়তো শিল্পীর যন্ত্রণা ও লেখকের যন্ত্রণা উপন্যাসের কথাবয়ানে মিলেমিশে একাকার। 'নয়নপুরের মাটি' উপন্যাসে মহিমের জীবনবোধ ও সংগ্রামী চেতনার সঙ্গে লেখকের জীবনবোধ ও মার্কসীয় চেতনা ভিন্ন নয়। কারণ বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে তরুণ বয়স থেকেই তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। সত্য মাস্টারের হাত ধরে তাঁর বামপন্থী লাইনে পথ হাঁটা।

উপন্যাসের নায়ক মহিম। সে একজন শিল্পী। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার চেয়ে শিল্পচর্চার দিকেই তার ঝোঁক বেশি। স্কুল পালিয়ে সে দেখতে যেত প্রতিমা গড়া। হাজার বারণ বা শাসানি কোন কিছুই তাকে এসব থেকে বিরত করতে পারেনি। অর্জুন পালের মূর্তি তৈরি সে নিষ্পলক চোখে দিনভর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতো। প্রয়োজনে তাদের ফাই ফর্মাসও খাটতো। অতিকৌতূহলী বালক মাঝে মাঝে তাদের বিরক্তিরও কারণ হয়ে বিতাড়িতও হয়েছে। তবে কোন বাধায় তাঁর এই উৎসাহ, উদ্দীপনাকে ব্যর্থ করতে পারেনি। কুমোরশ্রেষ্ঠ অর্জুন পালই হয়ে উঠেছে তাঁর মানসগুরু। প্রতিটি মুহূর্তে মহিম পর্যবেক্ষকের চোখ দিয়ে উপলব্ধি করেছে মূর্তি নির্মাণের কৌশল। তাল তাল মাটি এনেছে, মূর্তি গড়েছে ভেঙেছে। কিন্তু থামেনি সে। দাদা ভরতের হাতে মার খেয়েছে, বৌদির বকুনি খেয়েছে তবু পুতুল গড়া ছাড়েনি। বৌদি অহল্যার প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় সব সময়ই ছিল মহিমের প্রতি। এইভাবে ধীরে ধীরে সে নিজে কিছু কিছু মূর্তি তৈরি করতে শুরু করে। কিন্তু তা তখনো পূর্ণতা পায়নি। একবার তো সে সত্যিকারের দুর্গা মূর্তি তৈরি করে পুজো পর্যন্ত করেছে। নয়নপুরের ছোট বড় সকলেই তা দেখে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছে। শিল্পী হওয়ার বাসনা তখন তাকে পাগল করে তুলেছে। এইসময় এসে জুটলো শিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবক গৌরাঙ্গসুন্দর। মহিমের চেয়ে বড় হলেও বন্ধুত্বে আটকালো না দ্বৈত-শিল্পীর। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন শিল্পীদের বিচিত্র সব জীবনকাহিনী তার বাসনা ও স্বপ্ন আরও দৃঢ় করেছিল। বন্ধুর সঙ্গে মহিম পাড়ি দিল কলকাতা। কলকাতার মিউজিয়াম সমস্ত কিছু নিজের চোখে দেখে বিস্মিত হল। কিন্তু তার নিজের

শিল্পচর্চা থেমে থাকে নি। বুদ্ধদেব, হরপার্বতী প্রভৃতি আরো অনেক মূর্তি গড়েছে সে। তবে কলকাতার দম বন্ধ করা পরিবেশে তার শিল্পী স্বভাবের অনুকূলে থাকেনি কখনই।

মহিম আবার ফিরে আসে নয়নপুরে। কলকাতায় গিয়ে তার যে শুধুমাত্র শিল্পচর্চার ক্ষেত্রেই উন্নতি হয়েছিল তা নয় পাগলা গৌরাঙ্গের মার্কসীয় চেতনাও উদ্বুদ্ধ করেছিল তাকে। এই সংগ্রামী চেতনার ফলেই শিল্পী মহিমের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন লক্ষণীয়। জমিদার বাবুর দুর্গা প্রতিমা গড়ার প্রস্তাব সে অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম হয়েছে। শুধুমাত্র পয়সার জন্য সে এসব করতে পারবেনা। তাছাড়া এতদিন দুর্গাপ্রতিমা করে আসছেন তার গুরু অর্জুন পাল মশাই। সেক্ষেত্রে গুরুর প্রতি অসম্মান করা হবে বলে তার মনে হয়েছে। এমনকি মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি তৈরি করতেও সে অস্বীকার করেছে। জমিদারের বৌমা উমার রবীন্দ্রনাথের মূর্তি গড়তে সে রাজি হয়নি। কারণ সে একজন শিল্পী ভাব রাজ্যেই তার বিচরণ। এ সকল মূর্তি তৈরি করে সে রোজগার করতে চায় নি। কারণ এসব মূর্তি তৈরি করতে তার মন সায় দেয় নি। জমিদার হেমবাবু ছিলেন গান্ধী ভক্ত। কিন্তু প্রতিনিয়ত ওঠা বসা জোতদারদের সঙ্গে। কৃষক বিদ্রোহকে দমন করা, প্রজাদের উচ্ছেদ করা এমনকি বিদ্রোহী প্রজাকে খুন পর্যন্ত করতে এরা পিছুপা হন না। জমিদার, জোতদারদের বিরুদ্ধেই নয়নপুরের সমস্ত প্রজাকে উৎসাহিত এবং একত্রিত করতে সমর্থ হয়েছিল মহিম। তার এই শিল্পীসত্তাকে চিনতে করেননি ভুল করেননি হেমবাবু। তাই তাকে চাকরি দিতে চেয়েছে জমিদার বাড়িতে। কিনে নিতে চেয়েছে তার শিল্পকে। অন্যদিকে জমিদারের বৌমা উমার পৃথিবীর প্রতি টান বেশি। শিল্পীকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী করার লোভ দেখিয়েই ক্ষান্ত হয়নি সে। তার ভরা যৌবনের লোভও দেখিয়েছে। কিন্তু তাতেও টলানো যায়নি দৃঢ়চেতা মহিমকে। তার শিল্পসত্তাকে সে কখনোই বিক্রি করতে চায় না। এ প্রসঙ্গে নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় অভিমতটি স্মরণীয়—'শিল্প শুধু শিল্পের জন্য (Art for art sake) এ সমরেশে বসুর প্রথম থেকেই চরম অশ্রদ্ধেয় বলে মনে হয়েছে। শিল্পের একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকবে, তার নিজস্ব একটা বক্তব্য থাকবে। তা না হলে মূলছেড়া আদর্শহীন শিল্প উচ্ছৃংখল গন্তব্যহীন দুর্নইতিক ও দিগভ্রষ্ট হয়ে উঠবে। শিল্প মানুষের লড়াইয়ের হাতিয়ার সংগ্রামের শানিত অস্ত্র। গৌরাঙ্গ সুন্দর এর উক্তি মহিমের সারা জীবনে বীজ মন্ত্রের মত কাজ করেছে : শিল্প সাধনা পথ ধরবে যদি না তুমি তাগিদে ভাস। "তাই বুদ্ধ বা শিব পার্বতী বা দুর্গা প্রতিমার মূর্তি তৈরি আকুতি তার শিল্পী মণির ক্ষুধাকে তৃপ্ত করতে পারল না। তাই সে বাড়ির প্রতিমা গোড়ার আহবান অগ্রাহ্য করেছে। তার শিল্পই সোনা শ্বেত শ্রম মিশ্রিত খেটে-খাওয়া কায়ক্লিষ্ট মানুষের রূপকে ফুটিয়ে তোলার জন্য অন্তরে আত্যন্তিক তাগিদ অনুভব করেছে।"[১]

মহিম প্রকৃত শিল্পী এবং প্রকৃতির শিল্পী। তাই তার শিল্পের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিদ্রোহ লক্ষ্য করা যায়। জমিদার সরকারকে দীর্ঘদিন কর ফাঁকি দিয়ে এসেছে। সেই

বকেয়া করের টাকা তুলতে চাই ভাগচাষী ও চাষীদের মধ্যে থেকে। অন্যথায় জমিদার অন্য লোককে জমি হস্তান্তরের নির্দেশ দিয়েছে। এই শোষণ নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে মহিম। সে নিজেই দায়িত্ব নিয়েছে হরেরামের ধর্মঠাকুরের মূর্তি গড়ার।

অক্ষয় জোতদার ঋণের দায়ে অখিলের প্রিয় মহিষকে কিনে নিয়েছে। সেই মহিষ একদিন অবহেলায় অনাহারে মারা যায়। প্রিয় মহিষের এই অবহেলায়, অনাহারে মৃত্যুকে মেনে নিতে পারেনি অখিল। মহিষকে জড়িয়ে অখিলের নিদারুণ কান্নার ছবি মহিমের শিল্পী-মনকে আন্দোলিত করে। এই নিদারুণ দৃশ্যের মূর্তি তৈরি করে সে। প্রতিবাদ জানায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে।

জমিদারের কর ফাঁকি দেওয়ার বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার ছিল হরেরাম। তার নেতৃত্বেই প্রজারা একত্রিত হয়েছিল। তাকে চক্রান্ত করে গলাটিপে খুন করা হয়। তার সেই মূর্তিকে শিল্প রূপ দেয় মহিম। হরেরামকে খুন করেই বিদ্রোহ দমন করা যায়নি। বরং সকল প্রজা আরো সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। হরেরামের নেতৃত্বে ভাগচাষীরা বন্ধ করে দিয়েছে খাজনা দেওয়া ও বেগার খাটা। তাই তার এই পরিণাম। কিন্তু বিদ্রোহ থেমে থাকেনি। ভজনের কথায়—"ওরা বুঝি ভাবছে, হরেরামেরে মেরে ফেলে মোদের চুপ মারিয়ে দেবে। কিন্তুক আগুন ওরা জ্বালল ভাল হাতে। হরেরামের মন্তর মোরা ভুলবো না।"[২]

বন্ধ হল বেগার খাটা নজরানা দেওয়া। পুরনো খাজনা মকুব করা হলো। ভাগ চাষীদের খাটনির দাম দিতে রাজি হল জমিদার। কিন্তু তাতেও বিদ্রোহ থেমে থাকল না। বিদ্রোহের আগুন জ্বলে থাকলো মহিমের গড়া মূর্তির মধ্য দিয়ে।

মহিমকে নিরস্ত্র করতে জমিদার বাড়িতে চাকরির টোপ দেওয়া হয়েছে। তাকে প্রচ্ছন্নভাবে শাসানো হয়েছে। তবু অটল থেকেছে মহিম। কিছুতেই সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে শোষণের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপস করেনি। তাই দেখা যায়—"জমিদার জননেতা বলে গান্ধীজীর একখান আবক্ষ প্রতিমূর্তি চেয়েছিলেন। কিন্তু মহিম তাতেও নারাজ হয়েছে। তিনি হরে রামের মূর্তিটা চেয়েছিলেন মহিম তাতেও অস্বীকৃত হয়েছে।"[৩] জমিদারের ডাকে জমিদার বাড়িতে যেতে অস্বীকার করে সে। এ বিষয়ে মহিমের হয়ে কথা বলে তার বৌদি অহল্যা। জমিদারের সঙ্গে বিবাহ করাটা ঠিক হবে না বলে শাসায় দীনেশ সান্যাল। অহল্যা তার প্রতিবাদ করে—"বিবাদ চাই না সুবাদও চাই না। যেমন আছি তেমনি থাকব।"[৪]

মহিনকে আবার শেষবারের জন্য ডাকতে আসে সান্যাল। মহিম আজ যেতে পারবে না বলে জানিয়ে দেওয়ার পর অহল্যা জানিয়ে দেয় সে আর কোনদিনই যেতে পারবে না। এরমধ্যেই মামলায় হেরে যাওয়ার ধাক্কায় ভরতের মৃত্যু হয়েছে। মহিম এবং অহল্যার পরবর্তী জীবন দিশাহীন হয়ে পড়েছে। অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে কুজো কানাইয়ের। মহিমের শিল্প সাধনার শরিক কুজো কানাইয়ের মূর্তি গড়া শুরু করেছে মহিম। আবার উমা এসেছে

তাকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার জন্য। শুধু তাই নয় মহিমকে বাহুডোরে আবদ্ধ করে তার চোখে উমা এঁকে দিয়েছে চুম্বন। কলকাতা যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে।

আবার তাকে ভিটেমাটি রক্ষার জন্য জমিদারের চাকরি নিতে পরামর্শ দিয়েছে। মহিম বলেছে —"জমিদারের ঘরে চাকরি মুই নিব না। নিজের মন ছাড়া মুই গড়তে তে পারবো না কিছু।"[৫] তার চোখের সামনে জমিদারের পেয়াদা কুজো কানাইয়ের মূর্তি, হরেরামের মুখ, পাগলা ঠাকুরের মূর্তি শিবসতী সমস্ত কিছুকে উঠানে আছড়ে ফেলে দিল। মাটিতে ভেঙ্গে গড়াগড়ি যাচ্ছে বৌদি অহল্যাকে দেওয়া শিশুমূর্তি। পাথরের মত নিষ্পলক চোখে অহল্যা তাকিয়ে আছে সেদিকে। আগুনে ভরা সে চোখ। বৌদির এই ছবি আঁকবে মহিম। মহিম ও অহল্যার নতুন জীবন শুরু হবে এই আশ্বাসের মধ্য দিয়ে। তার শিল্প সাধনা শুধু শিল্পের জন্য নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে জীবনের নানা সংঘাত, সংগ্রাম। তার শিল্প জীবনকে নিয়েই। শিল্পের জন্য নিজেকে ধ্বংস করতেও সে প্রস্তুত। কিন্তু হার স্বীকার সে কখনোই করবে না। লেখক সমরেশ বসুর ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে অনেক মিল আমরা পাই মহিম চরিত্রের মধ্যে। শ্রদ্ধেয় সমালোচকের মতে, "মহিম চরিত্র অনেকটাই সমরেশের ব্যক্তিজীবনের প্রথম পর্বের বেদনার উপাদানে নির্মিত, বাকিটা তার নবলব্ধ রাজনৈতিক চেতনার দ্বারা স্পৃষ্ট।"[৬]

এই উপন্যাসের নিয়ন্ত্রক পাগলা গৌরাঙ্গ। মার্কসীয় সংগ্রামী চেতনায় সে উদ্বুদ্ধ করেছে নয়নপুরের সমস্ত প্রজাকে। আধ্যাত্মবাদী গোবিন্দ, কুজো কানাই, হরেরাম সকলেই যেন সংগ্রামী চেতনায় ঋদ্ধ হয়েছে। এক আপসহীন সংগ্রামের জন্য নয়নপুরের সমস্ত প্রজাই শুধু নয় পাশাপাশি সমস্ত গ্রামের প্রজার সেই আন্দোলনে শামিল হয়েছে। আর এই আন্দোলনকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে শিল্পী মহিমের সংগ্রামী চেতনা। এই সংগ্রামী চেতনা শুধু মহিমের নয়, এই চেতনা লেখক। নয়নপুরের পবিত্র মাটি গায়ে মেখে সমরেশ বসু পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে অসংখ্য অবিস্মরণীয় মূর্তি নির্মাণ করেছেন।

তথ্যসূত্র :

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাই। 'প্রাক-বিবর' পর্বে সমরেশ বসু', পুস্তক বিপণি;১৯৯৬,পৃ-১০।
২। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। 'সমরেশ বসু রচনাবলী ১', আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯৯৭, পৃ-৮৯।
৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ৯১।
৪। তদেব, পৃষ্ঠা-৯২।
৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ৯৮।
৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম। 'সমরেশ বসুরঃ সময়ের চিহ্ন', র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১৭।

পা র মি তা চ্যা টা র্জি
গোয়েন্দা গোগল : সমরেশ বসু

সমরেশ বসুর বিশাল রচনা সম্ভারের মধ্যে আমাদের আকর্ষণের বিষয়টি হলো কিশোর গোয়েন্দা গোগোল চরিত্রটি। ভাবতে অবাক লাগে যে লেখকের কলম থেকে আমরা 'অমৃত কুম্ভের সন্ধান'-এর মত রচনা পেয়েছি, তাঁরই মনের মধ্যে এত সহজ সরল একটি কিশোর যেন লুকিয়ে ছিল। তবে একথা বলা যেতে পারে গোগোল চরিত্রটি আদতে কিশোর হলেও তা লেখকের মনের অতি প্রিয় একটি সত্তা। এর পরিচয় আমরা লেখকের নিজের বক্তব্যের মধ্যে পাই। "অনেক কাল ধরে বড়দের গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে আমি নিজেও কেমন যেন হাঁপিয়ে পড়েছি অথচ যাদের সাথে গল্প করতে পেলে আমার মন খুশিতে ভরে ওঠে তাদের একটা গল্প নিজে থেকে শোনাতে পারি না। শোনাবার খুব সাধ, কিন্তু সাধ থাকলেই তো আর সাধ্যে কুলায় না। বড়দের গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে মনটা কেমন যেন মরচে ধরে গিয়েছে। মনের সেই তাজা টাটকা ভাবটা যেন হারিয়ে ফেলেছি। যা না থাকলে তোমাদের আসরে এসে বসবার কোন মানেই হয় না।"[১] অর্থাৎ ছোটদের জন্য বা বলা ভালো কিশোরদের জন্য লেখক মনে মনে হয়তো একটা প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সম্ভবত তারই ফলশ্রুতি এই গোগল চরিত্রটি। লেখক বা কবি তার মনের মাধুরী মিশিয়ে অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে সাজিয়ে দেন পাঠকের সামনে। তৈরি হয়ে ওঠে অমর এবং কালজয়ী উপন্যাস ও গল্প। পাঠক লেখকের চোখে দেখতে থাকেন, লেখক সৃষ্ট পৃথিবীকে। আমরাও সমরেশ বসুর এই ছোট্ট গোগোল চরিত্রটিকে স্থান দিয়েছি আমাদের মনের মণিকোঠায়।

গোগোল ছোট্ট একটি ছেলে। মাত্র ছয় বছর বয়স তার। মা-বাবার একটিমাত্র সন্তান। আদরের সঙ্গে সংযম ও শাসনের গণ্ডির ভেতর তার বড় হয়ে ওঠা। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় গুণ হলো সে পড়ার বইয়ের বাইরের জগতটিকে জানতে চায়। এর জন্য প্রচুর গল্পের বই পড়তে পারে। সেই সুযোগটিও সে পায়। তার সবচেয়ে বড় সাপোর্টার তার বাবা। গোগোলের বাবা গোগোলের মনের সমস্ত অনুসন্ধিৎসা মেটান। তিনি গোগোলকে কখনো ছোট হিসেবে দেখেন না, সমবয়সী বন্ধুর মত গুরুত্ব দেন। একটি শিশুর বড় হয়ে ওঠায় এই বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার বাড়িতে যে ধরণের পরিবেশ ও কথাবার্তা শুনে সে বড় হয় পরবর্তীকালে জ্ঞাতে -অজ্ঞাতে সেই বিষয়গুলি তার চরিত্রে ফুটে ওঠে। গোগোলের বাবা ছিলেন রাশিয়ান সাহিত্যিক 'গোগোলের' বড় ভক্ত। তাই তাঁর নাম-কে স্মরণীয় ও প্রিয় ক'রে রাখতে নিজের সন্তানের নামকরণ করেছেন গোগোল। গোগোল পড়ে ক্লাস থ্রি-তে। গোগোলের নাম কেন গোগোল হল—এ বিষয়ে আমরা 'গোগোল অমনিবাস' (সম্পাদনা; নিতাই বসু) থেকে ভূমিকার খানিকটা অংশ উলেখ করে নিচ্ছি।

"গোগলের স্রষ্টা সমরেশ বসু ওর নাম গোগোল রাখলেন কেন? অন্য নামও তো রাখতে পারতেন। সমরেশ বসু গোগোল নামটি পেয়েছিলেন ওঁরই অভিন্ন সত্তা কালকূটের কাছে, যখন কালকূট কুম্ভ মেলায় গিয়ে প্রথমে এলাহাবাদে যার বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন সেই ড. অরুণ কুমার মিত্রের ছেলের নাম গোগোল বলে জানতে পারেন। কিন্তু গোগোলের বাবা সমীরেশ চ্যাটার্জী তা জানতেন না। তিনি রাশিয়ার বিখ্যাত গোগোল-এর ভক্ত। অতএব ছেলের নাম রাখলেন গোগোল।"[২]

সমরেশ বসুর রচনা সম্ভারের মধ্যে আমরা গোগোল কেন্দ্রিক ১৮ টি গল্প এ যাবৎ পেয়েছি। এর মধ্যে আয়তনের দিক থেকে কোনো গল্পটি ছোট, আবার কোনোটি বেশ বড়। তবে খুব ছোটগল্প কোনোটিই নয়। সাধারণত গোয়েন্দা গল্পগুলিতে গোয়েন্দার সঙ্গে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট এর দেখা মেলে, হয় সে গোয়েন্দার সাহায্যকারী নয়তো বা তারই ব-কলমে আমরা গল্পগুলি জানতে পারি। তবে গোগোলের রহস্য সমাধানের জন্য কোনো এসিস্ট্যান্ট-এর ভূমিকা আমরা এখনও পাইনি। যদিও 'কাইরং মঠের' গল্পে একটি বাচ্চা মেয়ে তার সঙ্গে উপস্থিত ছিল। তবে এরকম আরো অনেক বন্ধু-বান্ধব সে যেখানেই গেছে সেখানেই তার সঙ্গে জুটে গেছে। তাদেরকে ঠিক অ্যাসিস্ট্যান্ট বলা যায় না। গোগোল যেখানেই যায় অথবা ঘটনাচক্রে তার চোখে এমন কিছু দৃশ্য ধরা পড়ে যা তাকে অন্যদের তুলনায় ওই ব্যাপারটিতে বেশি সচেতন ও মনোযোগী করে তোলে। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য খ্যাতনামা গোয়েন্দাদের মত হয়তো তার কাছে কোনো কেস আসে না, তবে জিজ্ঞাসু মন ও লেখক এর দ্বারা সৃষ্ট ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে তার সময় মোটেও বেশি লাগে না। গোগোল বেড়াতে ভালোবাসে, সে যেখানেই যাক না কেন সেই জায়গাটা সম্বন্ধে একটা প্রাক্ ধারণা বাড়িতে বাবার কাছ থেকে অথবা বই পড়ে সে নিয়ে নিতে চায়। ফলে তার বেড়াতে যাওয়াটা হয়ে ওঠে বেশ মজাদার।

আবার কখনো বা অদৃষ্ট তাকে টেনে নিয়ে আসে রহস্যমায়ার মায়াজালে। যেমন 'রত্ন রহস্য ও গোগোল' গল্পটিতে তারই পকেটে চোরাকারবারিরা হিরে চালান করে দেয়। সেই সূত্রে সে জড়িয়ে পড়ে দুষ্কৃতীদের নজরে। লেখক গোগোলকে ধরা বাঁধা স্টিরিওটাইপ ছন্দে একদমই বেঁধে রাখতে চাননি। বারবার তাই পাঠকের সামনে এসেছে নতুনত্বের স্বাদ। এখনকার শিশু, সে বড় হয়ে উঠেছে ইট কাঠের মহানগরে। তাই গোগোলের গ্রাম দেখার ইচ্ছেকে পরিপূর্ণ করে তুলতে লেখক তাকে পাঠিয়ে দেন গ্রামে। 'রায় রাজা আবিষ্কার' গল্পের মধ্যে যেখানে সে খুঁজে পায় তার মনের মতন বন্ধুবান্ধবদের। প্রাণ ভরে ঘুরে নেয় গ্রাম। দেখে দুর্গাপূজা গ্রামের আঙিনায় কেমন করে হয়। সেখানেও জুটে যায় তার বেশ অনেক বন্ধুবান্ধব।

সাধারণত শিশুরা থাকে মা-বাবার ও পরিবারের নিরাপদ আশ্রয়ে। তবু তার মধ্যেও সে জড়িয়ে পড়ে কোনো না কোনো রহস্যজনক ঘটনার মধ্যে, এটা সত্যি একটু অবিশ্বাস্য।

তবে লেখক গোগোলর চরিত্র চিত্রণ করেছেন এ কথা ভেবেই, শিশুরাও যাতে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ নিতে পারে। শিশু-কিশোর উপযোগী এত অনাবিল সাহিত্য রচনা হয়তো সমরেশ বসুর মত এত বড়ো মাপের লেখক বলেই সম্ভব। গোগোলের অ্যাডভেঞ্চারের গল্পগুলি আমরা যদি বিচার করি তাহলে দেখা যাবে সমস্ত অ্যাডভেঞ্চারই যে একদমই যে নিরামিষ তা কিন্তু নয়। বেশ কিছু গল্পে গোগোল যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ কাজকর্ম করেছে, বা বলা যেতে পারে তাকে করতে হয়েছে। যেমন 'টেলিফোনে আড়ি পাতার বিপদ'—এই গল্পটিতে গোগোলের কাণ্ডকারখানা ছোটদের মতন নয়। এখানে গোগোল কিডন্যাপ হয়ে যায়। তবে সে যেভাবে উদ্ধার করে নিজেকে ও ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সেটা সত্যি বড়দের পক্ষে ঘটলে হয়তো বেশি মানাত। তবে ওইটুকু অংশকে নজর-আন্দাজ করলে স্মৃতিশক্তি এবং বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সে অপরাধীকে সনাক্ত করে ফেলেছিল।

লেখক আমাদের কাছে যেমন গোগোল-এর শিশু মনের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি তার সূক্ষ্ম অবজারভেশন এবং বিপদকে আঁচ করার ক্ষমতাও আমরা অনেকবার পেয়ে থাকি। নিজেকে বিপদের মধ্যে জড়িয়ে ফেলে পাঠকের চিন্তা যেমন সে বাড়ায়, তেমনই গোগোল আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠে ঐ রহস্যের জাল কেটে বেরিয়ে। গোগোল বাবাকে ভীষণ নকল করতে ভালোবাসে। সে ছবি আঁকে, বাড়ির নিচে বন্ধুদের সাথে গিয়ে খেলাধুলা করে। একজন সাধারণ কিশোরের মত সেও স্কুলে যায়, মায়ের প্রতি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। কিন্তু এ সবের সঙ্গে সঙ্গে লেখক তাকে বারবার এমন ঘটনাচক্রে জড়িয়ে ফেলেন যার মাধ্যমে সে রহস্যের ঘনঘটার মধ্যে ঢুকে পড়ে। 'গোগোল কোথায়' এই গল্পের মধ্যে আমরা দেখি লেখক যেন খানিক কৈফিয়তের সুরেই বলেন ," কিন্তু গোগোল কোনদিনই কোন ঘটনার মধ্যে ইচ্ছে করে জড়িয়ে পড়ে না । চোখের সামনে হঠাৎ করেই এমন ঘটনা ঘটে যায়, কিছু বুঝে ওঠবার আগেই দেখা যায়, ও যেন কেমন করে তার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। আর সেই সব ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়া মানেই বিপদ। বিপদে কি কেউ ইচ্ছে করে পড়তে চায়? গোগোলও চায় না। কিন্তু বিশেষ করে, মা সে কথাটা বিশ্বাসই করতে চান না। অবশ্য গোগোল-এর সব বিষয়েই কৌতুহল একটু বেশি। কোথাও কিছু সন্দেহজনক চোখে পড়লেই ওর দৃষ্টি সেখানে আটকে যায়। এমন-কি কোনো লোকের চলাফেরা চোখ-মুখ দেখে সন্দেহ হলেও, সেই লোকটাকে ও ভুলতে পারে না। চারিদিকে নজর তো আটকে যায়ই, মনের মধ্যে অনেকরকম চিন্তার জট পাকিয়ে ওঠে। কৌতুহল আর আকর্ষণ যাই হোক, সে ঘটনা আর লোকেরা ওকে যেন টানতে থাকে। তার ফলে ওর কোনো বিপদ ঘটতে পারে, তখন সে কথা মনে থাকে না। আর বিপদ যে ঘটে সেটা তো বেশ কয়েকবার প্রমাণ হয়ে গিয়েছে।"[৪]

তবে গোগোলের বারবার বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়া বা তার এডভেঞ্চারাস মন তাকে রহস্যের ঘনঘটায় দিকে যে ঠেলে দেয় সেই সমগ্র কাহিনী পাঠক মনকে আকৃষ্ট করে,

এ কথা কিন্তু সত্য। বাংলা সাহিত্যে কিশোর গোয়েন্দা হিসাবে আমরা আরো বেশ কিছু জনকে পেয়ে থাকি। তাদের মধ্যে ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের পান্ডব গোয়েন্দারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও নলিনী দাসের গোয়েন্দা গন্ডালুকেও আমরা স্মরণ করতে পারি। তবে গোগোল এদের থেকে বয়সে অনেকটাই ছোট, এবং লেখক তাঁর সুনিপুণ তুলির আঁচড়ে গোগোল চরিত্রটিকে পাঠকের মনে এঁকে রেখে গেছেন।

তথ্যসূত্র :

১। সমরেশ বসু, গোগোল অমনিবাস। (সম্পাদনা ঃ নিতাই বসু) পৃষ্ঠা ঃ ১
২। ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২
৩। ঐ, পৃষ্ঠা ঃ
৪। ঐ, পৃষ্ঠা ৪৪৪

চ ন্দ্রি মা মৈ ত্র দু বে

সন্তানের চোখে সমরেশ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক কালজয়ী সাহিত্যিক সমরেশ বসু। ১৯২৪ সালে তাঁর জন্ম, অর্থাৎ তিনি বেঁচে থাকলে আজ বয়স হত একশো বছর। তিনি ছিলেন একজন বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তি। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি থিয়েটার করা, বাঁশি বাজানো, ছবি আঁকা সবকিছুতেই ছিলেন সমান পারদর্শী। পরবর্তীকালে কঠিন সিদ্ধান্তের সঙ্গে শুধুমাত্র সাহিত্যচর্চাকেই বেছে নিয়েছিলেন, শপথ করেছিলেন শুধু লিখেই বাঁচবেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে তাঁকে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হয়েছে। সাফল্যও এসেছে তাঁর, সাহিত্য জগতে তিনি রেখে গেছেন অসামান্য সব সৃষ্টি। এরকম স্বনামধন্য একজন সাহিত্যিকের সাহিত্যজগতে সাফল্যের সাথে সাথে ব্যক্তিগত সাংসারিক জীবনে এসেছে নানান টানাপোড়েন। তাঁকে সম্পূর্ণভাবে জানতে হলে শুধুমাত্র তাঁর সাহিত্যজগতের সাফল্যের দিক নয় তাঁর পুরোটাই জানা প্রয়োজন। আর সেই জানার মাধ্যম যদি হয় নিজের সন্তান তাহলে তার থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না। কারও কাছে জীবন সম্পর্কিত গল্প শোনা এবং সন্তানের বয়ানে সাহিত্যিকের জীবন সম্পর্কে জানতে পারার মধ্যে অনেক পার্থক্য তো আছেই। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং বইয়ে নানান সময়ে পিতার সন্তানরা তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য দিয়েছেন। সমরেশ পুত্র নবকুমার বসুর কাছে পেয়েছি 'চিরসখা' এবং 'ফিরে দেখা, দেখি নাই ফিরে'-র মত দু'খানি অসামান্য সৃষ্টি।

সমরেশ বসুর সন্তান নবকুমার বসু একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। কখনও তিনি পিতাকে দেখেছেন সাহিত্যিক হিসেবে আবার কখনও নিজের পিতা হিসেবে। এর ফলে কোথাও আছে নির্লিপ্তি তো কোথাও আছে আবেগ। বাবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বারংবার সমরেশ বসুর বদভ্যাসগুলোকে তুলে ধরেছেন। আর তাঁর এই প্রকাশের কারণে আমরা সম্পূর্ণ সমরেশ বসুকে খুঁজে পেয়েছি। সমরেশ বসু তাঁর সমগ্র জীবনে 'কালকূট', 'ভ্রমর' ছদ্মনামে সাহিত্য রচনা করে গেছেন। নবকুমার বসু জানিয়েছেন 'কালকূট' ছদ্মনামা যে লেখাগুলো সমরেশ বসু লিখেছেন তার মধ্যে প্রকাশ পায় তাঁর দু'রকম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, একদিকে তিনি মুক্ত বিহঙ্গের মতো উড়ে যেতে চান অপরদিকে সংসারের মায়া জড়িয়ে থাকতে চান সকলের সঙ্গে। এর থেকে বোঝা যায় তাঁর সারা জীবন ছিল ভীষণ রকম টানাপোড়েনের।

নবকুমার বসু এবং আরও তিন পুত্রকন্যা সহ ছিল সমরেশ-গৌরীর সংসার। ১৯৪৬ সালে মাত্র বাইশ বছর বয়সে 'পরিচয়' পত্রিকায় সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্প প্রকাশিত হয় এবং চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে যায়। লেখকের সন্তানরা জন্ম থেকে দেখেছেন তাঁকে লেখালেখি করতে। একটু বড় হতে মায়ের মুখে বাবাকে লেখক হিসেবে জেনে এসেছেন তাঁরা। যদিও

লেখক সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তখন তাদের ছিল না। সমরেশ বসু কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে এই পার্টি বেআইনি ঘোষিত হওয়ায় সমরেশ বসু বন্দী হন। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি তাঁর ইছাপুর গান এন্ড সেল ফ্যাক্টরির চাকরিটা চলে যায়। পার্টির সদস্য পদ বাতিল হয় তাঁর নিষ্ক্রিয়তার কারণে। ছোট ছোট চার সন্তান এবং স্ত্রী গৌরীকে নিয়ে সংসার প্রতিপালন করতে তাঁর তখন দিশেহারা অবস্থা। সেই সময় যাবতীয় আশঙ্কাকে দূরে ঠেলে রেখে একমাত্র সাহিত্যচর্চাকে অবলম্বন করে, তাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার ভরসা যুগিয়েছিলেন গৌরী বসু। তিনি ছেলেবেলায় যেমন সন্তানদের মনে বাবা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করেছেন ঠিক তেমনভাবেই পরবর্তীকালে সমরেশের শারীরিক অসুস্থতা, টানাপোড়েনের কথা ভেবে লেখকের দ্বিতীয় স্ত্রীকে তাঁর সন্তানসহ আপনও করে নিয়েছেন। নবকুমার বসু তার মা গৌরী বসুকে সমরেশ বসুর 'আশ্রয়, রক্ষাকর্ত্রী, বন্ধু, প্রেমিকা, স্ত্রী'[১]—সবরকম সম্বোধনে ভূষিত করেছেন। এমনকি সমরেশ যে বিখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ বসু হয়ে উঠেছেন শুধুমাত্র গৌরী বসুর জন্য সেকথাও অকপটে স্বীকার করেছেন। সন্তানের চোখে সমরেশ বসুকে তুলে ধরতে গেলে গৌরী বসুকে ছাড়া তার অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বুলবুল বসু-র (সমরেশ-গৌরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা) কথায়, 'বাবাকে নিয়ে যাই লিখি না কেন, মাকে বাদ দিলে সেটা হবে নুন ছাড়া তরকারির মত।'[২]

১৯৫৪ সালে গৌরী-সমরেশ চার সন্তানসহ আতপুর থেকে নৈহাটি আসেন। সমরেশ বসুর টাকায় এবং গৌরী বসুর শ্রমে গড়ে ওঠে 'সমরেশ বসুর বাগানবাড়ি'।[৩] গৌরী বসুর সঙ্গে এহেন সখ্যের সম্পর্ক থাকার পরেও সমরেশ বসু পরবর্তীকালে বিবাহ করেছিলেন গৌরী বসুর ছোট বোন ধরিত্রী বসুকে। এই বিষয় নিয়ে পারিবারিক ঝগড়াঝাটি-অশান্তির মধ্যেই বড় হচ্ছিলেন গৌরী-সমরেশের সন্তানরা। সন্তানদের মনে ছিল বহু অভাব অভিযোগ। বাবার প্রবল আত্মসম্মানবোধ, মানসিক দৃঢ়তা, এবং সাহসিকতার সঙ্গে প্রথম স্ত্রীর কাছে সবকিছু স্বীকার করে দ্বিতীয়া স্ত্রীকে গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে সন্তানদের মনে ভালোবাসা এবং সম্মানের ঘাটতি হয়নি কখনও। নবকুমার বসু জানিয়েছেন, 'বাবার সঙ্গে আমাদের ভাইবোনের বরাবরই প্রিয় এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আবার বন্ধুত্বও ছিল। কিন্তু বিশেষ করে আমার সঙ্গে, খুব সামান্য হলেও ব্যক্তিত্বের সংঘাত না বললেও একটু-আধটু বিতর্ক হতই।'[৪]

সমরেশ বসু যেদিন থেকে লেখাকেই নিজের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন সেদিন থেকে নিজেকে একটি রুটিনে আবদ্ধ করেছিলেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি লিখতেন এবং তার পরের সময়টা ছিল বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আড্ডা দেওয়ার। এই আড্ডা ছিল অত্যন্ত মূল্যবান আড্ডা। এখানেই উঠে আসত সমরেশ বসুর পরবর্তীকালে গল্প উপন্যাসের চিন্তাভাবনা, নানান অভিজ্ঞতা, মজার মজার কথা। এই আড্ডায় উপস্থিত থাকতেন সমরেশ বসুর বন্ধুরা, পারিবারিক কিছু মানুষ এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ। মাঝেমধ্যে সান্ধ্য আড্ডায় উপস্থিত থাকতেন সমরেশ পুত্র নবকুমার বসুও। সমরেশ বসুর লেখালেখির পাশাপাশি

একদিন নির্দিষ্ট রুটিন ছিল বাড়ির কাজকর্ম করার। তাঁর কন্যা জানিয়েছেন সারাদিনের পর যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ত সেই সময় ছিল গৌরী-সমরেশের সাংসারিক আলোচনা করার সময়। টাকা-পয়সার হিসাব থেকে শুরু করে বাজারের জিনিসপত্রের কথা, ছেলেমেয়েদের স্কুলের কথা, বাথরুমের জমাদারের জন্য মিউনিসিপালিটিতে খবর দেওয়া, পুজোর জন্য যাবতীয় বাজার করা, অতিথি আপ্যায়ন এইসব সাংসারিক দায়িত্বগুলি পালন করতেন খুবই গুরুত্বের সহকারে। ঠাকুর দেবতার বিশ্বাস থাকলেও কোন মন্দিরে তিনি কখনও যাননি। কিন্তু বাড়ির কোজাগরি লক্ষ্মী পূজার সমস্ত নিয়মকানুন তিনি মানতেন। আবার সরস্বতী পূজার সময় নিজের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সাথে নিজেও তাঁর মায়ের নির্দেশানুসারে চলতেন। ঘোরতর নিষ্ঠার সঙ্গে কমিউনিজমে বিশ্বাসী হয়েও প্রতিদিন লিখতে বসার আগে মা সরস্বতীকে প্রণাম করতেন।

নবকুমার বসু যখন মাত্র বছর পাঁচেকের সেই সময় সমরেশ বসুর পিতৃবিয়োগ ঘটে। অল্প বয়সে সমরেশের বড় সংসার এবং দারিদ্র্যের কারণে নৈহাটির বাড়ি থেকে তাঁরা ছিলেন বিচ্ছিন্ন। তাঁদের বাসস্থান ছিল আতপুরের আটাবস্তিতে। অন্য সবার সঙ্গে সেই সময় যোগাযোগ না থাকলেও সমরেশের পিতা মোহিনীমোহন বসু তাঁর নাতি-নাতনী এবং বৌমার টানে সেই বাড়িতে আসতেন। কন্যা বুলবুল বসু এবং পুত্র নবকুমার বসু দু'জনের স্মৃতিচারণাতেই পিতৃহারা সমরেশের শোকার্ত অবস্থার কথা উঠে এসেছে।

সমরেশ বসুর সন্তানদের মধ্যে তৃতীয় সন্তান নবকুমার বসু পেশায় ডাক্তার হলেও সাহিত্যচর্চা রয়েছে তাঁর রক্তে। তিনি তাঁর লেখায় সাহিত্যিক সমরেশ বসুর ভূয়যী প্রশংসা করলেও বাবা ছেলের সম্পর্কের ক্ষোভের কথাও তুলেছেন বারংবার বিভিন্ন জায়গায়। তিনি সাহিত্যিক হলেও সাহিত্যজগতে কখনই বাবার নামে পরিচিত হতে চাননি। নবকুমার বসু জানিয়েছেন জ্ঞান হবার পর থেকেই অন্যান্য ভাই-বোনদের থেকে বাবার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অন্যরকম। ভালোবাসা-শ্রদ্ধা-আবেগের সঙ্গে ছিল একরাশ ক্ষোভ-দুঃখ অভিমান। তিনি নিজেকে সমরেশ বসুর 'এলেবেলে গোছের সন্তান'[৫] বলে পরিচিত করেছেন। অকপট ভাবে জানিয়েছেন ছাত্রাবস্থায় দাদার উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন, নানান ভুল আচরণবিধির খেসারত শুধু দাদা দেবকুমারকে দিতে হয়েছিল তা নয়, নবকুমারের জীবনযাত্রার উপরও তার প্রভাব পড়েছিল। মায়ের সঙ্গে নবকুমারের অন্তরঙ্গতা খুব বেশি থাকলেও বাবার থেকে তিনি খানিকটা ব্যবধানে ছিলেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যদিও সে ব্যবধানের অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছিলেন দু'জনেই। পরবর্তীতে নবকুমার বসু তাঁর বাবা এবং মাকে নিয়ে যে উপন্যাস লিখেছেন তার নাম দিয়েছেন 'চিরসখা', এ যেন এক স্নেহের উচ্চারণ।

সমরেশ বসুর সাহিত্যজীবনকে তাঁর পুত্র চারটি পর্বে ভাগ করেছেন; ১৯৪৮-১৯৫৮, ১৯৫৮-১৯৬৮, ১৯৬৮-১৯৭৮ এবং ১৯৭৮-১৯৮৮। ১৯৪৮-১৯৫৮ এই সময়কালে গৌরী বসুর সমর্থনে সমরেশ বসু সবথেকে বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়েছিলেন এবং লেখাকেই

পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তগ্রহণ যে কতখানি ইতিবাচক ছিল তার প্রমাণ কথাকারের পরবর্তী জীবনের সৃষ্ট সাহিত্য। এই দশকে তিনি কালকূট ছদ্মনামে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' রচনা করে সাহিত্যজগতে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তার সঙ্গে তাঁর প্রথম লেখা ছোটগল্প 'আদাব' তো ছিলই। এই গল্প 'পরিচয়' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার পর সমরেশ বসু সেই বয়সে (মাত্র বাইশ বছর) এক ধাপে খ্যাতিবান সমসাময়িক সাহিত্যিকদের ছুঁয়ে ফেলেছিলেন। সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাস ইতিমধ্যে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। নৈহাটির নারকেলবাগান অঞ্চলে ঝোপ-জঙ্গল ঘেঁষা তিন কাঠা জায়গার উপর ছিল সমরেশ-গৌরীর টালির বাড়ি। সেখানে 'গঙ্গা' উপন্যাসকে ঘিরে নানান ঘটনা, যেমন ছবির ইউনিট আসা, স্ক্রিপ্ট পড়া, রাজেন তরফদার-দীনেন গুপ্ত-সন্ধ্যা রায়-সীতা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তির সংলাপ পাঠ এবং সমরেশ বসুর তাঁদের উচ্চারণ ঠিক করে দেওয়া এসব স্মৃতিচারণার মাধ্যমে বারংবার নস্টালজিক হয়ে উঠেছেন তাঁর পুত্র।

এরপরে আসে ১৯৫৮-১৯৬৮ সময়কাল। এই সময়ে সাহিত্যজগতে সুবোধ ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মত বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের আনাগোনা। একটি ভন্ড-ধাপ্পাবাজ-নিজেকে অত্যধিক শক্তিশালী ভাবা শ্রেণি দ্বারা নিষ্পেষিত হয়ে মধ্যবিত্ত সমাজ এ সময় দিশেহারা। ঠিক সেই সময় সমরেশ বসু নতুন ভাষায় নতুন আঙ্গিকে সাহিত্যজগতে হয়ে উঠলেন ব্যতিক্রমী। ছয়ের দশকে শুধুমাত্র সাহিত্যজগতে তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন এমন নয়, চ্যালেঞ্জ এসেছিল তাঁর ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনেও। ১৯৬৪ সালে সমরেশ-গৌরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা, বুলবুলের বিবাহ দেন ভাটপাড়ার অতি পরিচিত ছেলে বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। একই সময়ে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছিল লেখকের নিজস্ব অতিরিক্ত একটি সম্পর্ক। যে সম্পর্ককে তিনি বহন করেছিলেন বহুদিন ধরে। ১৯৬৭ সালে সেই সম্পর্ককে পরিণতি দিতে বাধ্য হন তিনি। আবার বড় পুত্র দেবকুমারও পড়াশোনা ছেড়ে প্রকাশক হওয়ার আশায় বুক বাঁধছিলেন এবং সেই সঙ্গে প্রেমিকাকে বিবাহ করার জন্য উতলা হয়ে উঠেছিলেন। পুত্রের পায়ের তলার মাটি শক্ত না হওয়ায় বড় পুত্রের বিবাহের চাপও এসে পড়ে সমরেশের উপর(১৯৬৮ সাল)। নবকুমার বসু তখন ডাক্তারি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র এবং বোন মৌসুমী বি.এ পাঠরতা। অতএব দুই সন্তানের বিবাহের খরচ, দুই সন্তানের পড়াশোনার নিয়মিত খরচ এবং কলকাতার অভিজাত এলাকায় নিজের দ্বিতীয় সংসারকে প্রতিষ্ঠা করা এসব চ্যালেঞ্জ জয় করেছিলেন একসঙ্গে। সবগুলো চ্যালেঞ্জ জয় করার পেছনে আছে সমরেশ বসুর আত্মবিশ্বাস, ডিসিপ্লিন এবং পরিশ্রম। তার সাথে আছে গৌরী বসুর মতো স্ত্রীর সর্বদা সমর্থন। আত্মসম্মান গ্লানিতে ছারখার হয়ে গিয়েছিলেন সমরেশ বসুর 'বুড়ি', কিন্তু কখনই স্বামীর পাশ থেকে তিনি সরে যাননি।

সমরেশ বসুর জীবনের তৃতীয় পর্ব অর্থাৎ ১৯৬৮-৭৮ সালে সব দায়-দায়িত্ব মিটিয়ে সমরেশ বসুর সংসার থেকে মুক্তি পাওয়ার সময়, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। নানান

রাজনৈতিক টানাপোড়েনে সমরেশ বসুর দ্বিতীয় সংসারের ঠিকানা তখন হয় দিল্লি। সাংসারিক দায়িত্ব কমে যাওয়ার বদলে বেড়ে যায়। বিলাসবহুল সংসারের নতুনভাবে গড়ে ওঠা,নিজের জনপ্রিয়তা, স্ট্যাটাস রক্ষা সবকিছু বজায় রাখার জন্য অনেক লিখতে হত সমরেশ বসুকে। সাতের দশকের শুরু থেকেই তাঁর গল্প উপন্যাসের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল তাঁর খ্যাতি সুনাম। প্রফেশনাল লেখা ছাড়াও তিনি পত্রপত্রিকার দাবি অনুরোধ মেনেও লিখে গেছেন এই সময়ে। শারদীয়ার ‘দেশ’, ‘আনন্দবাজার’ এবং ‘আনন্দমেলা’তে তিনি উপন্যাস লিখলেও অন্যান্য পত্রিকায় গল্প বা অন্য কিছু লিখতেন। সেইসময় নৈহাটির বাড়িতেও যেতেন নিয়মিত। চোখে মুখে ধকলের স্পষ্ট ছাপ নিয়েও একের পর এক লিখে দিয়েছেন গল্প-উপন্যাস-ভ্রমণ কাহিনি-কিশোর কাহিনি এবং গোয়েন্দা কাহিনি। সমরেশ বসুকে এত কাছ থেকে দেখার পরেও পুত্র নবকুমার বসুর বক্তব্য, ‘না, মানুষটাকে ঠিক মেলাতে পারি না। মনে হয় বৈপরীত্যের মধ্যেই জীবনের আকাশ ছুঁতে চান এক ব্যতিক্রমী শিল্পী।’[৬] ১৯৭৩ সালে সমরেশ বসুর নৈহাটির বাড়িতে পুত্র নবকুমারের বিবাহ দেন হৈ হৈ করে। এই দশকে একটা হিরোইজমের আবেগ ঘিরে ধরেছিল সমরেশ বসুকে, মাথায় ঢুকেছিল মোটরর‍্যালিতে যাওয়ার ইচ্ছা। সমরেশ-ধরিত্রী (দ্বিতীয় স্ত্রী)র পুত্রের লেখাপড়ায় অনীহা, সাউথ পয়েন্ট স্কুল থেকে তাঁর বিদায়, ছোট বোনের তখনও বিবাহ না হওয়া এসব কিছু সমরেশের মনে যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করেছিল। এরপর ১৯৭৬ সালে পুজোর দু'মাস আগে সমরেশ বসুর ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়, হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। সমরেশ বসুর জীবনের তৃতীয় পর্বের শেষ লগ্নে অর্থাৎ ১৯৭৮ সালের রামকিঙ্কর বেইজের সঙ্গে সমরেশ বসুর প্রথম সাক্ষাৎ। অনেক আগে থেকেই রামকিঙ্কর বেইজের জীবন অবলম্বন করে লেখার জন্য প্রস্তুত হলেও এই সময়কালে সমরেশ বসু রামকিঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তার ইচ্ছার কথা রামকিঙ্করকে জানান। পরবর্তীকালে রামকিঙ্কর বেইজের সম্মতিতে তাঁকে নিয়ে লেখা ‘দেখি নাই ফিরে’ সমরেশ বসুর ভারতশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই অসামান্য সৃষ্টির অসমাপ্ত থেকে যাওয়া আমাদের সকলের কাছেই খুব দুঃখজনক একটি ঘটনা।

বিংশ শতাব্দীর আটের দশকে অর্থাৎ জীবনের চতুর্থ পর্বে এসে সমরেশ বসু ‘দেখি নাই ফিরে’র মতন কঠিন, স্বল্প আলোচ্য এবং পরিশ্রম সাপেক্ষ একটি কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে যে এক নতুন ধরনের লেখার পরিকল্পনা সমরেশ বসু নিয়েছিলেন তার ধারণা নবকুমার বসু তাঁর মা গৌরী বসুর কাছেই পেয়েছিলেন। নানান সান্ধ্য আড্ডা, শান্তিনিকেতনে যাওয়া আসা সূত্রে গৌরী বসু একথা জানতে পারেন। আমরা সমরেশ কন্যা বুলবুল বসুর কাছেও জানতে পারি,’ “.......আড্ডাতে যে মূল্যবান আলোচনাগুলো হতো তা রেকর্ড করে রাখলে শেষ না হওয়া ‘দেখি নাই ফিরে’র অনেক তথ্য জানা যেত। দুঃখের বিষয় আমার সে বুদ্ধি ছিল না। মোবাইল থাকলেও কিছু ছবি ও আড্ডার কিছু কথা ধরে রাখতে পারতাম। স্মার্টফোন তখন ছিল না।’”[৭] তাঁর জীবনের এই

শেষ দশ বছরে তিনি ‘শাম্ব’ উপন্যাসের জন্য ‘সাহিত্য আকাদেমি’ পুরস্কার পান। এই সময়কালেই সমরেশ বসুর বন্ধু, রক্ষাকর্ত্রী গৌরী বসুর মৃত্যু হয়। শেষের এই দশ বছরে সমরেশ বসু ইচ্ছা-অনিচ্ছায় অনেক কিছুই করে গেছেন, কিন্তু এই সময় তিনি রামকিঙ্কর থেকে বেরিয়ে আসেননি। তাঁর পুত্রের স্থির বিশ্বাস যে বাইরের যে কাজের চাপের অজুহাতে সমরেশ ‘দেখি নাই ফিরে’ শুরু করতে পারেননি তা আসলে ছিল ‘অকাজ’।[৮] ১৯৮৭ সালের অনেক আগেই সমরেশ বসু এই উপন্যাসের কাজ শুরু করতে পারতেন। ১৯৮২-৮৩সালে সমরেশ বসু ‘মহানগর’ নামে এক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনার কাজে উঠে পড়ে লেগেছিলেন যা তাঁর পুত্রের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। ১৯৮০ সালের আগস্ট মাসে রামকিঙ্কর বেইজ মারা যান। যেসব তথ্য সমরেশ এক জায়গায় বসে, শুনে সংগ্রহ করতে পারতেন সেই তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তাঁকে তার অসুস্থ শরীরে দৌড়- লাফ-ঝাঁপ করতে হয়েছে। তাঁর পুত্রের বিশ্বাস ১৯৮৪-৮৫ সালেই ‘দেশ’ পত্রিকায় ‘দেখি নাই ফিরে’ শুরু হতে পারত।

সমরেশ পুত্র নবকুমার বসু বাবার কৃতিত্বগুলি যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে ধরেছেন ঠিক তার পাশাপাশি একজন সন্তান হিসেবে যে আচরণগুলি মেনে নেওয়া কখনই সম্ভব নয়, সেকথাও তুলে ধরেছেন। সন্তান হিসেবে বাবার কাছে অনেক চাহিদাই থাকে যা নবকুমারের কাছে অপূর্ণ থেকে গেছে। তিনি জানিয়েছেন সমরেশ বসুর ‘দেখি নাই ফিরে’ ১৯৮৮ সালে হঠাৎ করে থেমে যাওয়ায় লক্ষ লক্ষ পাঠকের ন্যায় তিনিও শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছিলেন। অভিমানবশত তিনি অনেক কথাই জানিয়েছেন, তিনি বলেছেন সমরেশ বসু ‘দেখি নাই ফিরে’ লিখবেন বলে শারদীয়া পত্রিকায় লেখা কখনই কম করতে পারেননি। তিনি একথাও জানান—“শেষ বছর দশেক বাবা এমন কিছু লিখেছেন, যার অনেক লেখাই হালকা,অগভীর এবং একমাত্র সংখ্যা বাড়ানো ছাড়া সমরেশ সাহিত্যে টিকে থাকার মতো নয়”।[৯] তিনি জানিয়েছেন সমরেশ বসুর শেষ জীবনের লেখার কোয়ান্টিটি থাকলেও কোয়ালিটি সেই মানের ছিল না। সমরেশ বসুর যে ডিসিপ্লিনড লাইফে চলা প্রয়োজন ছিল তিনি শেষ বয়সে সেগুলোর কোনটাই মেনে চলেননি। পুত্র নবকুমার আক্ষেপের সুরে বলেছেন, “এই অবস্থার জন্য তিনি নিজেই দায়ী, সবকিছু বুঝেও তিনি অবহেলা করেছেন শরীরের প্রতি।” সমরেশের দ্বিতীয়া পত্নীকে গৌরী বসু আপন করে নিলেও সমরেশ-গৌরীর সন্তানদের মনে তিনি কখনই স্থান করে নিতে পারেননি। সমরেশের ছন্নছাড়া জীবনযাত্রার জন্য সব সময়ই তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীকেই দায়ী করেছেন তাঁর সন্তান। তিনি জানিয়েছেন বেঁচে থাকাকালীন “গৌরী বসুর উদ্বেগের কথা, ও অন্য ধরনের মানুষ, ওর চাহিদা, মনের জগৎ আমরা কি আর সবটা বুঝতে পারি। কিন্তু এখন তো বয়স হয়েছে, একটা হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। ডিসিপ্লিনড

না হলে চলবে! রামকিঙ্কর পড়ে রয়েছে।.......... টুনি ওকে মোটেও ম্যানেজ করতে পারেনা।"[১০] সবথেকে বড় কথা পুত্র নবকুমার বসু ডাক্তার হয়ে বাবার শরীরের ভালো-খারাপ সবটা বুঝেও কিছু করতে পারতেন না। কারণ তাঁকে আউটসাইডার হিসেবেই ভাবা হত এবং তাঁর কথার মান্যতা দেওয়া হত না। ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও কী চিকিৎসা হবে, কোন চিকিৎসক সমরেশ বসুর জন্য ভালো, কোন ওষুধ খাওয়া হবে সে বিষয়ে তাঁর কোন মতামতই নেওয়া হত না। এ প্রসঙ্গে নবকুমার নিজেকে 'ঘরকা মুরগি ডাল বরাবর"[১১] বলেও ব্যঙ্গ করেছেন। নবকুমার এবং তাঁর স্ত্রী রাখি দু'জনেই যখন জীবন সংগ্রামে নেমে তাঁদের পায়ের তলার মাটি একটু একটু করে শক্ত করতে চেয়ে নৈহাটির বাড়িতে ফিরতে চেয়েছেন তখন সমরেশ তাঁদের প্রান্তবাসী করেছেন। অবশ্য ১৯৮০ সালে গৌরী বসুর মৃত্যুর পর একটু একটু করে যোগাযোগ বাড়তে থাকে পিতা-পুত্রের। ঘরবাড়ি- একাকিত্ব-অতীতচারণা-রামকিঙ্কর হয়ে ওঠে তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু। এতকিছু অভিযোগ-অভিমানের পরেও নবকুমারের স্বীকারোক্তি মনকে নাড়া দিয়ে যায়। তিনি বলেন, "বাবা আমাকে যে কোনও কারণেই হোক দূরে রাখতে চাইলেও, আমি তো কোনদিনই তাঁকে মন থেকে এতটুকু সরাতে পারিনি! বরং মা চলে যাওয়ার পরে, বাঁধনের অনেকটা টানই গিয়ে পড়েছে ওই একটা মানুষের ওপর।"[১২]

এরপর ১৯৮৫ সালের হৃদরোগের আক্রমণ সমরেশ বসুকে আরও দুর্বল করে তুলেছিল। ১৯৮৬ সালে শারীরিক এবং মানসিকভাবে আরও বেশি করে ভেঙে পড়েন। মনে মনে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা বোধ করলেও মুখে কখনই মৃত্যুর কথা আনতেন না। ধূমপান,মদ্যপান, ঘন্টার পর ঘন্টা বসে লেখা, মানসিক চাপ সবকিছু নিয়ে ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে গেছেন মৃত্যুর দিকে। যে মানুষ মন থেকে বিশ্বাস করতেন 'সাহিত্য থেকে জীবন বড়'[১৩], তিনি সবটা জেনেও নিজের জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি।

ব্যতিক্রমী মানুষ ও সাহিত্যিক সমরেশ বসু ১৯৮৮ সালের ১২ই মার্চ প্রয়াত হন তাঁর অসম্পূর্ণ সৃষ্টি রেখে। আজীবন তিনি ছিলেন তৃষ্ণার্ত। সারা জীবন নিজের সাহিত্য-সৃষ্টি নানান টানাপোড়েনের মধ্যেও কাউকে ত্যাগ করেননি। তাঁর মত মহীরূহসম সাহিত্যপ্রতিভাকে নিয়ে এখনও অনেক চর্চা বাকি। তাই তো তাঁর মৃত্যুর ৩৫ বছর পরেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে আছেন লক্ষ লক্ষ পাঠক হৃদয়ে এবং অবশ্যই তাঁর পুত্রের কাছে। আমরা বিভিন্ন গবেষণা, সাক্ষাৎকার এবং লেখকের স্মৃতিকথা থেকেও লেখকের ব্যক্তিজীবনকে ধরার চেষ্টা করি। কিন্তু তাঁর সন্তানরা যেভাবে তাঁকে খুব কাছ থেকে পেয়েছেন বা দেখেছেন সেভাবে কারোর পক্ষেই পাওয়া বা দেখা সম্ভব হয়নি। তাই লেখকের মৃত্যুর এতকাল পরেও তাঁর জনপ্রিয়তায় একটুত টোল পড়েনি। তাঁর সন্তানদের জবানবন্দির মধ্যে দিয়ে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া পাঠকের অতিরিক্ত পাওনা।

তথ্যসূত্র :

১। নবকুমার বসু, 'ফিরে দেখা দেখি নাই ফিরে', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ:এপ্রিল ২০২৩,পৃষ্ঠা- ৮৬

২। পরিচয় (শতবর্ষে সমরেশ বসু) চৈত্র ১৪৩০-আষাঢ় ১৪৩১, মার্চ-জুন ২০২৪,৯-১২ সংখ্যা, ৯৩ বর্ষ,পৃষ্ঠা-৩১

৩। নবকুমার বসু, 'ফিরে দেখা দেখি নাই ফিরে', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,কলকাতা, প্রথম সংস্করণ:এপ্রিল ২০২৩, পৃষ্ঠা-৯৪

৪। ষান্মাসিক রবীন্দ্রনাথ, সংকলন ৩২, সমরেশ বসু জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, দূর্বা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-১০

৫। নবকুমার বসু, 'ফিরে দেখা দেখি নাই ফিরে', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ:এপ্রিল ২০২৩, পৃষ্ঠা-৬

৬। 'রেখে গেলেন অসম্পূর্ণ সৃষ্টি'-নবকুমার বসু (শেষ আপডেট : ১৫ই জুলাই ২০১৭, ০৯:৫০)

৭। পরিচয় (শতবর্ষে সমরেশ বসু) চৈত্র ১৪৩০-আষাঢ় ১৪৩১, মার্চ-জুন ২০২৪,৯-১২ সংখ্যা, ৯৩ বর্ষ, পৃষ্ঠা -৩২

৮। নবকুমার বসু, 'ফিরে দেখা দেখি নাই ফিরে', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,কলকাতা, প্রথম সংস্করণ:এপ্রিল ২০২৩,পৃষ্ঠা-১৩৯

৯। তদেব, পৃষ্ঠা-১২১

১০। তদেব, পৃষ্ঠা-১৪৭

১১। তদেব, পৃষ্ঠা-৭

১২। তদেব, পৃষ্ঠা-২৩৯

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা-১১৭

বি ভা স বি শ্বা স

শিকড়ের খোঁজে : সমরেশ বসুর উপন্যাসে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অস্তিবাদী দর্শন ভাবনা

ভারতীয় সাহিত্য তত্ত্বের অবয়ব যেমন গভীর তেমনি বিশাল। সাহিত্যতত্ত্বে স্রষ্টাকে দ্বিতীয় বিধাতা বলা হয়েছিল। সুপ্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে ভরত থেকে শুরু করে আধুনিক মনীষীগণ সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে বহু বিচিত্র ও মননশীল ভাবনা বিষয়কে আলোচনায় সমৃদ্ধ করে আসছেন। প্রাচীন সংস্কৃত আলংকারিকগণ পাশচাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিকগণ পাঠক ও দর্শকদের যে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তার সমর্থন পাওয়া যায় একালের পশ্চিমের সমালোচনা তত্ত্বে। পাঠকের হৃদয় ও সাহিত্য সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে অনুসন্ধান করতে করতে ধনাত্মক জীবন দর্শন আবিষ্কার করেছেন সাহিত্য তাত্ত্বিকগণ। এরই পাশাপাশি দার্শনিকগণ একের পর এক তত্ত্ব আবিষ্কার করতে করতে আবিষ্কার করে ফেললেন অস্তিবাদী দর্শন। এই অস্তিবাদী দর্শনের প্রভাব পড়েছে স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে। অস্তিবাদীরা কোন গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নন। তাই বিভিন্ন অস্তিবাদী দার্শনিকদের বক্তব্য পৃথক পৃথক রকম। এখানে যুক্তি নয়, মানব মনের অনুভূতি ও কর্মই প্রধান। এটি বিষয়ের দর্শন নয়,বিষয়ীর দর্শন। অস্তিবাদ জানায় যে, মানব অস্তিত্বের সন্ধান বেঁচে থাকার বাস্তবতার মধ্যে পাওয়া যায়। অস্তিবাদ অনুসারে ‘বেঁচে থাকা’ আর ‘অস্তিত্বশীল হওয়া’ এক নয়। অস্তিবাদ অনুসারে অস্তিত্বের অর্থ হল স্বাধীনভাবে ও সক্রিয়ভাবে মানুষের দ্বারা নির্বাচিত হওয়া। ব্যক্তি প্রথমে অস্তিত্বশীল এবং পরে তার সারধর্ম। ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়ে অস্তিবাদীদের নিজেদের মধ্যে আপাত বৈসাদৃশ্য থাকলেও অস্তিবাদ সম্পর্কিত মূল বক্তব্যের ক্ষেত্রে তারা অনেকটাই একমত। সেই সূত্র ধরে বিভিন্ন অস্তিবাদীর অভিমত অনুসরণ করেই প্রবেশ করব সমরেশ বসুর উপন্যাসে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অস্তিবাদী প্রেরণা বিচারে।

স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন, সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার ভাঙ্গন, মধ্যবিত্তের দ্বিধাদ্বন্দ্ব পূর্ণ ভাব-ভাবনা, অস্তিত্ব বিপন্নতার ইঙ্গিত, মূল্যবোধের সংকট, বেকারত্ব, আশা ও আশাহীনতার টানা পোড়েন, মনস্তাত্ত্বিকতার বৈচিত্র্য প্রভৃতি বিষয়ে স্বাধীনতা উত্তর-পর্বের বাংলা কথাসাহিত্য ধারণ করেছে। বাংলা উপন্যাসে মানুষের জীবনের সংকট ও অস্তিবাদী জীবন চেতনার দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর স্বাধীনতার স্বপ্ন যারা প্রত্যাশা করেছিল, সেই স্বপ্নভঙ্গের চিত্রটা ছিল অনেক বেশি বাস্তব। স্বাধীনতার স্বাদ অনেকেই লাভ করলো ঠিকই, কিন্তু এই সময় দেশ বিভাগ, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দাঙ্গা, প্রেম, যৌনতা—সবকিছু মিলিয়ে আদর্শ হীনতার ষড়যন্ত্রে লাঞ্ছিত হল সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের কথা এবং তাদের জীবনচর্যা তৎকালীন লেখকদের মধ্যেও সৃষ্টি করল এক

শূন্যতার বোধ। মানুষের ব্যক্তিগত ভাবনা ও চিন্তার বিভিন্ন অনুসঙ্গ কিভাবে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিঃসঙ্গ করে তুলেছে, সমাজ ও ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব কিভাবে মানুষকে বিপর্যস্ত করেছে, সেই সংকটের কথা প্রকাশ হতে দেখি সমরেশ বসুর (১৯২৪-১৯৮৮) বেশ কিছু লেখায়। আদর্শ হীনতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ব্যক্তির মননে সৃষ্টি করেছিল হতাশা। এই ধরনের বোহেমিয়ানিজম জীবন থেকে বিশেষভাবে বলতে গেলে পারিবারিক দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেতে চেয়েছে উপন্যাসের চরিত্রগুলি। উপন্যাস এভাবেই দশ দিক আয়তবান হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসের এই পর্বের বৈশ্বিক আবহ স্বতন্ত্র এই কারণেই। মধ্যবিত্তের স্বপ্ন ভেঙে গুড়িয়ে গেছে বিশ্ব সময়ের বিষনীল ধোঁয়ায়। সহজ সরল মানুষজনের আত্মাকে খন্ড খন্ড করে মুছে ফেলার কৌশলে শানিত থেকে শানিততর হয়েছে রাজনীতি ও সামাজিক আবহ।

সমরেশ বসুর সাহিত্য সৃষ্টির কর্ষণ ভূমিতে জ্য-পল সর্ত্রের 'অস্তিবাদী দর্শন' খুব সূক্ষ্মভাবে ছাপ ফেলেছিল একথা বলা যায়। সমরেশ বসুর সাহিত্য জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা যখন ঘটলো তখন তার লেখনীতে প্রকাশ পেল নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষদের জীবন বৃত্তান্ত। ছয়ের দশকের কলকাতায় সামাজিক সংস্কার ও রাজনৈতিক অস্থিরতা যেভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবন্ত দলিল হয়ে উঠে এসেছে সেখানে সমরেশ বসুর নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবিও সাহিত্যে পরোক্ষভাবে রূপ পেয়েছে। এই সময় লেখক জগদ্দল ও আঁতপুর এলাকায় বসবাস করতেন। সংসার চালানোর জন্য সামান্য মজুরিতে কখনো বন্দুক কারখানায় কাজ করেছেন, আবার কখনো ডিম মুরগি শাকসবজি চটকলের কোয়ার্টারে ফেরি করতেন। মধ্যবিত্ত সমাজের ভঙ্গুর আবহ প্রতিফলিত হয়েছে এই সময়ের বেশ কিছু লেখনীতে। এই সময়ে লেখা 'বিবর'(১৯৬৫),'প্রজাপতি'(১৯৬৭), 'পাতক'(১৯৬৯) উপন্যাস গুলিতে বিকারগ্রস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের আত্মপ্রবঞ্চনা যেমনভাবে প্রতিফলিত, অনুরূপ সেই মানুষগুলোর মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতাও একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম বিষয় হলো দ্বৈত ব্যক্তিত্বের সংকট। মানব মনের স্ববিরোধিতা এই দ্বৈত ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ। দস্তয়েভস্কির 'Notes From The Underground's (১৮৬৬), 'The Gambler' (১৮৬৭), 'Crime And Punishment' (১৮৬৬) ইত্যাদি উপন্যাসে এই ধারার প্রথম সার্থক সূত্রপাত। 'ফ্রান্সের আলব্যের ক্যামুর', 'আউট সাইডার', 'দ্য স্ট্রেঞ্জার', জ্যা-পল সর্ত্রের 'দি নসিয়া' ইত্যাদি উপন্যাসে যুক্ত হয়েছিল শূন্যতা এবং বিচ্ছিন্নতাবোধের অনুভূতি। সমরেশ বসুর 'বিবর' উপন্যাসে স্বাধীনতা বোধের যে তত্ত্বটি উপস্থাপিত হয়েছে তা আসলে এই অস্তিবাদী দর্শনের প্রেরণা জনিত ফল। 'বিবরে'র নায়ক প্রকৃতপক্ষেই সসআউট সাইডারে'র মারসোর যথার্থ উত্তরাধিকারী। অস্তিবাদী দর্শনের অন্যতম প্রবক্তা সার্তরে মতই সমরেশের নায়ক ফ্রয়েড এবং কার্ল মারের 'Theory of Determination' কে অস্বীকার করেছে। ফ্রয়েড বলেছেন যে, চেতনা সম্পূর্ণ স্বাধীন

নয়। কারণ নির্জ্ঞান স্তর Unconscious চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। মারে বলেছেন যে, মানুষের চেতনা উৎপাদন নীতির (Mode of Production) ওপর এবং শ্রেণী সংগ্রামের (Class Struggle) উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সার্ধে বলেন মানুষের চেতনা এসব ঘটনাময়তার উর্ধে। চেতনায় রয়েছে স্বাধীনতা। চেতনার জৈবিক, মনোবৈজ্ঞানিক অথবা সমাজ-বৈজ্ঞানিক ঘটনাময়তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। মানুষ তার ইচ্ছা অনুসারে কোন কিছু পছন্দ করে এবং সেই মতই কাজ করে। সমরেশের নায়ক তো এই স্বাধীন চেতনা নিয়েই পিতার সাথে বিতর্কে অংশ নেয়, উত্তীর্ণ হয়।

ষাটের দশকের উত্তাল সময়ের ছবি ‘বিবর’ উপন্যাস। সমাজ ও রাষ্ট্রের নানাবিধ চাপে আক্রান্ত সমরেশের সৃষ্ট চরিত্রদের মনোলোক নানা বিসঙ্গতি বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত। সংকটাদীর্ণ নৈরাজ্যময় পরিবেশ মধ্যবিত্তের সত্তাকে চরম সংকটে নিপতিত করে। সমরেশ বসুর মধ্যবিত্তের এই মূল্যহীনতাকে ফেরাতে চেয়েছিলেন বলা যেতে পারে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন মধ্যবিত্তের ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধকে। এই পর্বের উপন্যাস গুলিতে উন্মোচিত হয়েছে আত্মিক সংকটাদীর্ণ, অন্তঃসারশূন্য মধ্যবিত্তের স্বরূপ। এই পর্বে নায়কদের আত্মসমালোচনা এবং সমাজ সমালোচকের ভূমিকা প্রতিভাত হয়েছে। শুধুমাত্র ‘বিবর’ উপন্যাসের অনামা নায়ক নয়, ‘প্রজাপতি’ উপন্যাসে সুখেনের বোধের উত্তরণ, ‘পাতক’ উপন্যাসে অনামা নায়ক প্রতিবাদ করেছে প্রেম, রাজনীতি, যৌনতা সবকিছুর বিরুদ্ধে। বিবর, প্রজাপতি, পাতক উপন্যাসের নায়কেরা সকলেই ভন্ড মধ্যবিত্তের মুখোশ উন্মোচন করেছে। মরচে পড়া সমাজের অবক্ষয়িত ক্লান্তিময় দিক অসাধারণ দক্ষতায় প্রকাশ পেয়েছে।

‘বিবর’ উপন্যাসটি আত্মকথন রীতিতে রচিত। ১৯৬৫ সালের শারদীয়া দেশ পত্রিকায় উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। সাগরময় ঘোষ যখন তাকে পুজোর উপন্যাস লিখতে বললেন, তখন প্রচলিত প্রথা ভেঙে তিনি লিখতে চান একথাই সাগরময় বাবুকে তিনি জানিয়েছিলেন। এই প্রথা ভাঙ্গার কাহিনী হয়তো ‘বিবর’। উপন্যাসটি হাতে নিয়েই পাঠককে প্রথম হোঁচট খেতে হয় প্রচ্ছদের দিকে তাকিয়ে। আর তারপর উপন্যাসের উৎসর্গ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন — “আচ্ছা, আমরা যদি সবাই, সত্যি কথা বলতে পারতাম...”[১] আক্ষরিক অর্থে একটি উৎসর্গ পাতা নয়, বা কাউকে বা কারো নামে উৎসর্গ করা হয়নি। উপন্যাসটির শুরু হয়তো এখান থেকেই। তবে সমরেশ বসু বিবর উপন্যাস লিখে বাংলার সাহিত্যে বিশেষ করে কথাসাহিত্যে প্রথম ‘সতীচ্ছেদ’ ঘটিয়েছিলেন। ব্যক্তির মধ্যে চূড়ান্ত সামাজিক সংকট, জীবনের সংকটকে ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছিল অস্তিত্বের সংকট। বিবর উপন্যাসে নামহীন নায়ক যাকে দুশ্চরিত্র বলেই মনে হতে পারে, সে হয়তো সমরেশ বসুর মতো সাহসী লেখকের হাতে পড়ে মর্যাদা পেতে পারে। এই উপন্যাসের নায়িকা নীতার সাথে সেক্স করার পর তাকে যখন নামহীন নায়ক মেরে ফেলে, সে মেরে ফেলার কোন কারণ ছিল না। শুধু রাত্রি শুরুর পর মিলনের পর তার মনে ঘৃনা হচ্ছিল, থুতু ছিটিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল ওর মুখে।

কনুই দিয়ে গলা চেপে ধরে নীতাকে যখন মেরে ফেলা হল, তখন একথা আমাদের মনে বাসা বাঁধলো অনেক সংস্কার মুক্তির মতো যৌনতার সংস্কার মুক্তি ও আধুনিকতার একটি বড় ছাপ। ছয়ের দশকে সমাজের পুরুষেরা যেমন একাধিক নারীর সংসর্গে লিপ্ত, নারীরাও পুরুষের সঙ্গে অবৈধ শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত থাকতেন। বিবরের নায়ক নিঃসঙ্গ একা। সে স্বাধীন হতে প্রেমিকা নীতাকে খুন করেছে। পরিবার থেকে, সমাজ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। উপন্যাসিক সমরেশ বসু এই নায়ক চরিত্রটির মধ্য দিয়ে বিকারগ্রস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মপ্রবঞ্চনাকেই তুলে ধরেছেন। সমরেশ বসু এই উপন্যাসে নায়ক ও নায়িকা চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ষাটের দশকের কলকাতা শহরের যুবক - যুবতীদের চারিত্রিক অধঃপতনের দিকটিকে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনই ব্যক্তির ব্যক্তি স্বাধীনতাবোধকে ও পরোক্ষে সবার সামনে উন্মোচন করতে চেয়েছেন। উপন্যাসে নায়কের আত্মকথন—"কী জানি, ওর মধ্যেই সতীত্ব-টতীত্ব ইত্যাদি ব্যাপারও আবার আছে কি না। বোধহয়, আসল মানে ওটাই। কিন্তু শরীর তো অনেক দেখেছি। বাড়িতে কখনও সখনও অসতর্ক মুহূর্তে নিজের বোনকে দেখেছি।"[২] সমাজে ভদ্রলোক হতে গেলে মিথ্যার আশ্রয়, অন্যায়কে সমর্থন, ভন্ডামিকে সংগ্রহ করতে হবে। সম্পর্কের টানা - পোড়েন, স্বামী-স্ত্রীর বিশ্বাস ও ভালোবাসার মধ্যে মিথ্যাচার প্রতারণা সবই এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন সমরেশ বসু।

সমরেশ বসুর দ্বিতীয় পর্বের 'বিবর' উপন্যাসের অনতিকাল পরেই প্রকাশিত হয় 'প্রজাপতি' উপন্যাস খানি। উপন্যাসটি প্রকৃতপক্ষে আমলাতন্ত্রের রুপচিত্র হলেও এই উপন্যাসের মধ্যে রাজনীতি সর্বস্বহীনতা, আদর্শহীনতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, গুন্ডামি সবকিছু যেন মিলেমিশে এক পাত্রে উঠে এসেছে। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কথাশিল্পী রশিদ করিমের মন্তব্যটি এখানে স্মরণীয়। তিনি বলেছেন—"সমরেশ বসু একজন অসামান্য কীর্তিমান সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন, সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক নেই। সেই সঙ্গে তিনি আমাদের কালের অদ্বিতীয় গদ্য - শিল্পী। শুধু তাই নয়, তিনি মর্চে - পড়া, ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যাওয়া, বাংলা ভাষার বাহুতে এমন এক রক্ত সঞ্চার করলেন, যে ভাষা প্রাণ লাভ করে লাভ দিয়ে উঠলো।"[৩] 'প্রজাপতি' লেখার সময় সমরেশ বসু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গুন্ডা' গল্পটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। উপন্যাসটি সমগ্র অংশ জুড়েই সুখেনের তীব্র মানসিক যন্ত্রণার দহন আমরা অনুভব করতে পারি। উপন্যাসে সুখেন নিজের কথা বলে। গ্রাজুয়েশন সম্পূর্ণ করতে না পারা সুখেন রাজনীতির আদর্শহীনতাকে অপছন্দ করেছে, নিজেকে সুখেন গুন্ডা নামে সকলের সামনে পরিচিত করেছে। সুখেন প্রতিবাদী। সুখেনের প্রেমিকা শিখা মজুমদার। শিখাকে সে ভালবাসে। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত মেয়ে শিখা। কিন্তু একাধিক পুরুষের সঙ্গে শিখার যৌন সম্পর্ক সুখেন মেনে নিতে পারেনি। সুখেনও একাধিক নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে। সুখেনের দাদাদের সঙ্গে শিখা যখন যৌন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, সুখেনের পক্ষে তা মেনে নেওয়া সহজ হয়নি। দাদাদের প্রতি ঘৃণা এবং রাগ, সুখেনকে

মানসিক কষ্টে নিমগ্ন করে। দাদাদের এই ব্যবহারে সুখেন যখন প্রতিবাদী হয়ে ওঠে, তখন সুখেনের এই ব্যবহারে দাদা তাকে গালিগালাজ করে—"তোর দাঁত ভেঙে ফেলবো, লোফার কোথাকার। রাসকেল।"[৪] বিবরের নায়কের মত প্রজাপতির সুখেনও ব্যক্তি স্বতন্ত্রতায় স্বাধীন। এ কথা বলার কারণ কলেজের অধ্যাপকদের চারিত্রিক অধঃপতন ও মূল্যবোধহীনতাকে তুলে ধরেছেন লেখক। সুখেন 'গুন্ডা'নামে পরিচিত হলেও, সে প্রতিবাদী। অন্যায়কে সে সমর্থন করে না। সে আত্মমর্যাদা সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব। সে স্বাধীনচেতা। উপন্যাসের একেবারে শেষে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সুখেন শিখাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিল। কামনা-বাসনা, অশ্লীলতা, যৌনতা সবকিছুকে অতিক্রম করে এ যেন সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রতিফলন। সুখেন এখানে এই সময়ের বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ চরিত্র। যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির দ্বৈত ব্যক্তিত্বের সংকট এবং তারই অন্তর্বয়ন 'প্রজাপতি' উপন্যাস খানি।

সমরেশ বসুর বেশ কয়েকখানি উপন্যাসে আধুনিক যুব সম্প্রদায়ের নিঃসঙ্গতা, আত্মযন্ত্রণা, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। বিবর ও প্রজাপতি উপন্যাসের মতোই পাতক উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর সমালোচনার ঝড় ওঠে। এই উপন্যাসের নায়ক একাকী, নিঃ সঙ্গ, প্রতিবাদী বিদ্রোহী। তার প্রতিবাদ মধ্যবিত্ত সমাজের ভন্ডামি, মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা, যৌনতার বিরুদ্ধে। সমাজের বৃহত্তর পটভূমির দিকে না তাকিয়ে ব্যক্তিবৃত্তেই উপস্থাপন করেছেন যুব সমাজের অন্তরদাহের কথা। নায়কের মনে সমাজের প্রতি যে বিরুদ্ধাচরণ তা একদিনে তৈরি হয়নি। নামহীন নায়কের স্বাগত কথনে উঠে এসেছে নীতিহীন রাজনীতির ভন্ডামি, সমাজের অন্তর্গত সন্দেহ, অবিশ্বাস, যৌনতা এবং সামাজিক মূল্যবোধ হীনতার কথা। সমাজের সার্বিক অবক্ষয় তার মধ্যে বিরুদ্ধতার বীজ বপন করেছে। শৈশব থেকেই অনামা নায়কটি তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। শৈশবে মায়ের অসুস্থ যৌন জীবন দেখে তার মধ্যে প্রথিত হয়েছে মায়ের প্রতি বিরূপ মনোভাব। মা হচ্ছে সন্তানের পরম ভালবাসার মমতার স্থান। সেখানে সেই স্থানটি দখল করেছে অন্য এক পুরুষ। তখন নায়কের কাছে তার মায়ের অবস্থান হয়ে উঠেছে, এক অপরিচিতা বান্ধবীদের আর এক মূর্তি। এখান থেকে উপন্যাসের শুরু এখানেই শেষ। 'পাতক' উপন্যাসের মা চরিত্রটির সাথে অদ্বৈত মল্লবর্মনের "রাঙামাটি" উপন্যাসের মনোরমা চরিত্রটি সাদৃশ্য বিদ্যমান। নায়ক শুধু নিম্ন মধ্যবিত্তের চরিত্রের সমালোচক নন, উচ্চবৃত্তির ব্যভিচারীতা নায়ককে আহত করেছে। বন্ধু রঞ্জনের মায়ের বয়েজ কাট চুল আর স্লিভলেস ব্লাউজ ছেলের বন্ধুদের আকর্ষণ করে। সমাজটাই নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে নষ্ট, পচা হয়ে গেছে।পাতকের নায়ক এই অবক্ষয়িত সমাজের স্বরূপকে চান করতে চেয়েছেন। নায়ক তার প্রেমিকা বেবি, অদিতি, রিনা, মল্লিকা ও রঞ্জনের মায়ের মত নিজের মায়ের যৌন অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। নায়ক তার মাকে খুন করে। মাকে খুন করে সে প্রেমিকা বেবীর কাছে যৌন আনন্দ উপভোগ করতে আসে। কিন্তু পূর্বের মতো সে যৌন সঙ্গমে তৃপ্তি পায় না। প্রজাপতির নায়কের যেমন

পবিত্রতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তেমনি পাতকের নায়কের একটা তীব্র সংশয় মনের মধ্যে গড়ে উঠেছে। এক বিপন্ন চিত্র সমরেশ বসুর উপন্যাসে যেমন দেখা দিয়েছে, ঠিক তেমনি মানুষের অস্তিত্বের প্রতি যে সংগ্রাম তাও প্রকাশ পেয়েছে।

সমরেশ বসু মূল্যহীন মানুষজনদের এই সামাজিক ভ্রষ্টাচারের জগত থেকে বের করতে চেয়েছিলেন নিজেকে। লেখক এই সময় কালে কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শের প্রতি আস্থা হারিয়ে রাজনৈতিক নীতি ও মতবিরোধের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। এই কারণেই হয়তো তার লেখার মধ্যে রাজনৈতিক নেতাদের ভন্ডামি, স্কুল-কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকদের মিথ্যাচার, আদর্শহীনতা সবকিছু তার উপন্যাসে চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে সোচ্চার হয়েছে। উপন্যাসে অনেক স্থানে যৌনতার প্রসঙ্গ এসেছে, তবুও তার সাহসী মনোভাব তাকে কোথাও আটকে রেখে থামিয়ে দিতে পারেনি। মধ্যবিত্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা এবং তার সংকট সমগ্রতাকে তিনি সুচারুভাবে উপন্যাসে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, বাংলা কথাসাহিত্যে একজন বলিষ্ঠ কথা সাহিত্যিক হিসেবে তাকে স্মরণে ও মননে রাখা যায় এ কথা দীপ্ত কণ্ঠে বলা যায়।

তথ্যসূত্র :

১. বসু,সমরেশ,বিবর, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭০০০০৯, জানুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা -৫.
২. তদেব, পৃষ্ঠা - ২২.
৩. করীম, রশীদ, আর এক দৃষ্টিকোণ, সমরেশ বসুর সঙ্গে, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, এপ্রিল, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা - ২৫.
৪. বসু,সমরেশ, প্রজাপতি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭০০০২৬, জুন, ২০২২, পৃষ্ঠা-৪৭.

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বসু, নিতাই,"কালকূট সমরেশ", জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স, ১৩৯৪(বঙ্গাব্দ)।
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ প্রতিম, "সমরেশ বসু: সময়ের চিহ্ন", রডিক্যাল ইমপ্রেসন, ১৯৯৭।
৩. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, দে'জ পাবলিশিং,২০০৯।
৪. চাকমা, নীরু কুমার, অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০।
৫. ঘোষ, প্রসূন, "উপন্যাসের নানাস্বর", এবং মুশায়েরা,২০০৫।
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়,সরোজ, সমরেশ রচনাবলী ৪, সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০।
৭. মিত্র, হিতেন্দ্র,সমরেশ বসু মুক্তি পন্থা সন্ধান, প্রাইমা পাবলিকেশন,১৯৯৫।

তাপস মণ্ডল

'টানা-পোড়েন' উপন্যাস : শিল্প ও শিল্পীর একটি সমীক্ষা

সমরেশ বসু বাংলা সাহিত্যের রাজপুত্র। সকলেই একথা স্বীকার করবেন, সাহিত্যে তিনি ছিলেন বনস্পতির মতো এক বিশাল প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর সাহিত্যে ছিল বিষয় বৈচিত্র্যে ভরপুর। এটা সম্ভব হয়েছিল স্বভাবস্বতন্ত্র জীবনাচরণ থেকেই। জীবন ও সাহিত্য এক হয়ে গিয়েছিল বলেই তাঁর সৃষ্টিতে কোনও ফাঁকি ছিল না। নিজেই এক জায়গায় লিখেছেন—

"সাহিত্যের যা কিছু দায়, সে তো জীবনেরই কাছে। সাহিত্যের থেকে জীবন বড়, এ সত্যের জন্য, সাহিত্যিককে গভীর অনুশীলন করতে হয় না, তা সততই অতি জীবন্ত।"[১]

রক্তমাংসের নারীপুরুষ যারা সব অর্থেই মৃত্তিকাসংলগ্ন তারাই এসেছে তাঁর সাহিত্যের টানাপড়েনে। কাউকে তিনি বাদ দেননি, ফেরাননি। এই মাটি এই প্রতিকূলতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন শিল্পীর অবিচলতার কথা ভাবতে ভাবতেই বোধ হন সমরেশের মনে জন্ম নিল এক মহৎ শিল্পীর প্রসঙ্গ। সেই প্রথম উপন্যাস 'নয়নপুরের মাটি' (১৯৫২), শেষ উপন্যাস 'দেখি নাই ফিরে' মাঝখানে 'টানাপোড়েন' (১৯৮০), তিন তিনবার তাঁর রচনায় প্রাধান্য পেল শিল্পীর সংগ্রাম। আমার আলোচ্য 'টানাপোড়েন'।

'টানাপোড়েন'এর নায়ক শিল্পী। সে স্বপ্ন দেখে, সে বালুচরি শাড়ি বুনবে। টানা'র সুতো আর পোড়েনে'র সুতো মিলিয়ে যে দ্বান্দ্বিক সমগ্রতা—সেটাই এ উপন্যাসকে প্রাণচঞ্চল করে তুলেছে। এই কাহিনীর এক দিকের প্রধান কথা শিল্পের সংকট ও শিল্পীর সংকট। বিলুপ্ত প্রায় এই অতুলনীয় শিল্পধারাটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে যে ক'জন শিল্পী প্রাণপাত করেছেন পঞ্চানন তাদেরই মধ্যে একজন। সময়ের পরিবর্তনে অতুলনীয় একটি শিল্প ও সেই শিল্পের সঙ্গে জড়িত শিল্পীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্রটিকে এই কাহিনীর মধ্যে ধরতে চেয়েছেন লেখক। তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মিলন-বিরহ নিয়েই গড়ে উঠেছে এ উপন্যাস। বিশ্লেষণ করলে প্রতিচ্ছবিটা আগে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বিষ্টুপুরের তাঁতির ঘরে তিনশো বছরের বাদশাহি আমলের ভূত তাঁতে জড়িয়ে আছে। তাই এখানকার তাঁতির বালুচরি শাড়ি জগৎ বিখ্যাত। বাদশাহী আমল থেকে ভোটকাড়ানি সরকারের দেশেও এর বড় কদর। বড় বড় শহরে-বোমরের, দিল্লির মার্কেটেও এর চাহিদা খারাপ না। এইসব জায়গায় লোকের শখও আছে, শখ মেটাবার পয়সাও আছে। পঞ্চানন কীত এই বালুচরি শাড়ির নকশা শিল্পী হিসাবে যথেষ্ট সুনাম করেছেন। তার মত বাদশাহী আমলের লসফদার বেনারসেও মিলবেক নাই।

"খবর লাও ক্যানে দিল্লি মুব্বাই, কলকাতায়। দরিদ্র খড়ের চাল, মাটির দেওয়াল, তবু সে জাত শিল্পী, এটাই তার শেষ পরিচয়।"[২]

তবু আপশোস হয়, শাড়ির দাম আকাশ ছোঁয়া — কিন্তু শিল্পী পেটে খিদে নিয়ে ছেঁড়া ট্যানার উপর ঘুমায়। এ যুগের বড় বড় শহরে অনেক বেগম আছে যাদের প্রাণমন চোখ তুমি অর্ধপোতা হয়ে মাটির ঘরের খড়ের চালার নীচে বসে তিল তিল করে হরণ করছ। বাদশাহের মুঠিতে বিস্তর টাকা। তাই হে অর্ধপোতা তোমার সুখ। বাদশাহের মুঠি খুলে যায় বেগমদের ঝিলিক হানা চোখের দিকে তাকিয়ে। আর তুমি একাধারে নকশাদার বানিদার। বিস্তর টাকার সন্ধান তুমি জান না। তোমার সন্ধান জানে না বাদশাহ বেগমরা। পঞ্চানন থাকে নকশার কাজে ব্যস্ত। আর তার স্ত্রী থাকে ঘর গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত।

"জগত কীতের বিটা পঞ্চানন কীত কেবল বানিদার, না নকশাদারও। নকশা থাকলে বানিদারের কাজ। নকশা সবকিছুর আগে।"[৩]

পাঁচুর ঘরে তাঁতে তখন শাড়ির কাজ চলছে। তার নকশা দেখলে লোকের চোখে জেল্লা দেবে। কিন্তু যে কোনও নকশাদারের মাথা ভিরমি যাবে। আঁজলার ঠিক মাঝখানটিতে আছে মুখোমুখি জোড়া বাদশা বেগম। কিন্তু এই পাঁচু কীত অশিক্ষিত হওয়ার জন্য অনেকেই তাকে ঠকিয়েছে প্রথম প্রথম। এর ফলে এখন সে অনেকটা বুঝতে শিখেছে।

"গোড়ায় গোড়ায় পাঁচুও ঠকেছে। পাঁচু তো আর মাস্টারের কাছে লেখাপড়া শিখে নাই। কিন্তু এখন লসকাদারের মতোই নিজের নামটা দস্তখত করতে পারে। ওজনের জায়গায় ঠিক ঠিক হিসাবটি পড়তে পারে। হাতে কলমে, ঠেকে শিখা করেছে। আছাড় পিছাড় না খেলে চলতে শিখা যায় না, চুরি চামারিতে দরকার নাই। কাঁচামালটি দিয়া কর, পাকামালটি বুঝে লাও। বালুচরি যদি হয়, শাড়ি পিছু তিনশো টাকা মজুরি।"[৪]

ঈশ্বরদাস বাবুর মত লোকের হাতেই পাঁচুর জীবিকা নির্ভর করে। কেননা বিষ্ণুপুরের এই তাঁতিদের নিয়ে তাঁর তিন পুরুষের ব্যবসা। তাই তাঁতিদের নাড়ি-নক্ষত্র তার জানা কাঁচামাল দেবার সময়ই তিনি মজুরির হিসাব থেকে শাড়ি আর থান পিছু কিছু টাকা কেটে রাখেন। তারপরেও আছে সারা মুলুকের বাজার তার হাতে। বাজারের নজর ওজর হালহদ্দ তার জানা। সে যদি বলে হুঁ হুঁ নকশাটি চলবেক তা হলেই চলবেক। ঈশ্বরদাসের বাণিজ্যিক স্বার্থ এখানে প্রকট হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরদাস বলেছেন —

"আজকালকার লোক এত টাকা দামের শাড়ি কাপড় আর কিনতে চায় না। শাড়ির দাম শুনলেই সব ভেগে পড়ে। সবাই সস্তা জিনিস চায়। ... আজকাল অল্প দামের রেশমের ছাগা শাড়ির খুব কদর। নাইলেন টেরিলিনের নকশা তোলা কাপড়ের চাহিদা কিছু কম না। তবে হ্যাঁ বালুচরির কথা আলাদা।"[৫]

শুধু বাণিজ্যিক স্বার্থই নয়, রাজনৈতিক দিক থেকেও ঈশ্বরদাস তাঁত শিল্পের সেক্রেটারী ছিলেন। ফলে তাঁত শিল্প এবং এর শিল্পীদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত করত এরাই। অশিক্ষিত তাঁতিদের সরকার থেকে যে সমস্ত টাকা আসত এরাই লুটেপুটে খেত। তাঁতিরা সেটা জানতেও পারতো না।

"ঈশ্বরদাস দেওড়া বাবুজি পাঁচুকে বেনারস নিয়ে গিয়েছিলেন সেখানকার নকশাদার,

বানিদারদের কাজ দেখাতে। না, নিজের ট্যাঁকের কড়ি খরচ করে নিয়ে যাননি। রেশম খাদি সেবা সদনের নাকি সব ব্যানার আছে। তাঁতিদের কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য এ দেশে ও দেশে গেলে সরকারই নাকি টাকা দেয়। তবে সে টাকার চেহারা কেমন, গোছায় কত, তাঁতিরা জানে না। যা জানবার ঈশ্বরদাসেই জানেন। উনি হলেন সেকরেটারি। সরকারের সঙ্গে যাবতীয় লেনাদেনা তিনিই করেন। সরকার তাকে মাইনে দিয়ে সেক্রেটারি করেছেন।"[৬]

অথচ ঈশ্বরদাস মারোয়াড়ির ঠাকুরদা চন্দরবাবুই তাঁতি দিগে ডেকে বালুচরি বুনতে বলেছিল। তিনিই তাঁতিদের জন্য জেকার্ড মেশিন এনে দিয়েছিল। খরচ খরচা করে। এবং নিজের উদ্যোগে তাঁতিদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন দেশে ও বিদেশে। ওস্তাদ অভয় খান সে লাট সাহেবের কাছেও নিয়ে গিয়েছিলেন।

"অই হে লাট বেলাটি বলে কথা। ওস্তাদের বুকেও নাকি মাকু ফাবড়াচ্ছিল। তবে হুঁ মানুষটিকে দেখে মনে হইচিল কি কাছের মানুষ। হুঁ চিমিস্টার ত্যাখন বিধান রায় মশাই। ওঁয়ারও আসবার কথা ছিল। কাজে পড়ে আসতে পারেন নাই। কিন্তু আর একজন এসেছিলেন। শুনিচি উনি নিজে এক বড় লসকাদার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনেচিস ?"[৭]

কলকাতায় তখন ওস্তাদের (অভয় খান) ভারী কদর। রেশম তসরের বড় বড় গদিওয়ালা আর মিল কম্পানিগুলানের নজর ওয়ার উপর পড়েছিল' এক মেম সাহেবের ধরে নিয়ে গিয়েছিল দার্জিলিং না কালিংপন। লসকাদারের চাকরির জন্য আমেদাবাদ থেকে ডাক এসেছিল। ওস্তাদ বমবাই সরকারের কাজে গেছিল। তারপরেও অনেকদিন কলকাতায় কাজ করেছে ওস্তাদ। দুই পুরুষে ওস্তাদের ঘরে জাত পালটে লিয়েছে। এখন ওস্তাদের ঘরে তাঁত নেই। কিন্তু তাঁর জাতি গোষ্ঠিরা এখনও যে অর্ধপুতা, সেই অর্ধপুতাই আছে।

এই তাঁতিদের মধ্যে বাদবিদাও দেখা যায়। অভয় খান ওস্তাদকে নিয়ে তিন পুরুষের বিবাদ। এখনও সে বিবাদ থামেনি। পাঁচু ও যোগেনের মধ্যে বিবাদ সেই সাক্ষী বহন করে। যোগেনও একজন লসকাদার। কালীচরণ হেঁসের চ্যালা। কালীচরণ হেঁস বেনারসে গেছে। ব্যাঙ্গালোরে গেছে। বেনারসি ব্যাঙালোরের লসকা বানিদারের কাজ ভাল জানে, উয়ার নাম আছে। কিন্তু বালুচরিতে সুবিধা করতে পারে না। অথচ যোগেন হল বংশীলাল বীটের নাতি। উয়ার কপাল মন্দ, বয়স হবার আগেই বংশীলাল মারা গেছিল। বংশীলালই বিষ্টুপুরের প্রথম লসকাদার। আর উটিই কাল করেছে। অভয় খান উয়াদের কাছে চিরকালের শত্রু। না হলে যোগেন কি অভয় খানের চ্যালা হতে পারত না? পাঁচু এখন ওস্তাদের আসল চ্যালা। এজন্য যোগেন পাঁচুকে দেখতে পেলে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে —

"অই দ্যাখ, চোরের সাগরেদ যাঁইচে হে।"[৮]

সবাই বোঝেও যোগেন পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করতে চায়। কিন্তু বিষ্টুপুরের লোকের কাছে অভয় খান ওস্তাদের নামে খারাপ গাইবে উটি কেউ শুনতে চায় না। যোগেন বীট সেটাও খুব ভাল জানে। তবুও এক একদিন ধুদুঁমার লেগে যায় আর কি। পাড়া পড়শিরা

সামাল দিতে আসে। "দু একবার ছোটখাটো হাতাহাতি হয়্যা গেঁইচে। ইবারে কুনদিন একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হয়্যা যাবেক। শালা পাঁচুকে দু'চক্ষে দেখতে লারে।"[৯]

এই তাঁতিদের জীবনে প্রেম-ভালোবাসা, কামনা-বাসনা, আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখা যায়। পাঁচু কীতের বেটি পুনি তাদের ঘরে মজুর খাটা বানিদার অজিত দাকে ভালোবাসে।

"হুঁ অজাদার পায়ের শব্দের লেগে পুনির কান খাড়া হয়ে থাকে। হুঁ, উয়ার চোখের দিকে তাকালে বুকে মীনার নকশা ফোটে। হুঁ, গলানির কাজে উয়ার পাশে বসলে, পচি ঝড়ের মাতন লাগে, বুক ভিজে যায়।"[১০]

কিন্তু পুনির পায়ে তার নিজের মনের বেড়ি। ঘরের বাইরে যাবে না সে। অজাদা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল —"ক্যান তুমি আমাকে আঁতে বাস নাই! জোয়ান বানিদার যেন মগুরের ঘা খেয়্যা বুলা করছিল। অই, কী জবাব দিবে গ পুনি ! পুনি যে সত্যি জানে না, ও অজাদাকে ভালবাসে কি না। ও মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে বলেছিল, জানি নাই।"[১১]

পুনি মনে মনে সত্যি তাকে ভালোবেসে ছিল, অথচ একটা ভয় ধুকধুক করে বাজতে থাকে। যা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আবার পাঁচু কীতকে যোগেনের সন্তানহীনা সুন্দরী স্ত্রীর যৌবন তাকে বড়ো আকর্ষণ করে। বর্ষাকালে এক সন্ধ্যায় সে টুকির সংস্পর্শে আসে। টুকিকে নির্জনে নিভৃতে জড়িয়ে ধরে। —"এখন শিয়রচাঁদার জোড়া অঙ্গে চন্দ্রবোড়া যেন আপন শরীরে বিশাল হয়ে ওঠে। নিঃশ্বাসে ফোঁস ফোঁস করে। শিয়রচাঁদার সঙ্গে মেঝেতে লুটায়, জড়ায়, গড়ায়।"[১২]

তবে প্রেমিক পাঁচু কীতের শিল্পীসত্তাই উপন্যাসে বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে আছে। এই পাঁচু কীত বালুচরি শাড়ির নকশা আঁকত। নকশা আঁকা হয়ে গেলে খোস মেজাজে সুর করে ছড়া কাটত —

"তাঁতি ভুজনি জোড় বুন বুনবুন
তাঁতি কৃষ্ট কথা শুন।"[১৩]

সর্বোপরি যাঁরা চিত্তের বিস্ময়, আতুলনীয় শিল্পসৃষ্টি করেছেন রেশমী সুতো বুনে অথচ যাঁদের নিজেদের অঙ্গে বস্ত্র নেই, ঘরে ঘরে অন্নের হাহাকার। মাথা গোঁজার মতো একটি অটুট ঘরের অভাব সেই বিস্ময়কর স্রষ্টা শিল্পীদের — এ উপন্যাস উৎসর্গ করেছেন শিল্পী সমরেশ বসু। আর তাদের সুখ — দুঃখ, হাসি-কান্না, মিলন-বিরহ নিয়ে গড়ে উঠেছে এ উপন্যাস। বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সমরেশ বসুকে এজন্য সমাজ ও শ্রেণী সচেতন ঔপন্যাসিক বলা হয়।

শু ভে ন্দু রা য়

কালকূটের অরণ্য-ত্রয়ী উপন্যাসে আরণ্যক জীবন ও অরণ্য-চেতনার স্বরূপ

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা সাহিত্যের যে কয়েকজন সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যকে নানা বর্ণে, গন্ধে সুশোভিত করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম হলেন সমরেশ বসু। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, শ্রমজীবী মানুষের জীবনের কথা তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় তুলে ধরেন। নিজের নাম ছাড়াও কখনও কালকূট নামে আবার কখনও ভ্রমর নামে লিখতেন। দেশভাগের পরবর্তী সময়ে যখন সাধারণ মানুষের জীবন হিংসা, বিদ্বেষ হানাহানিতে সংকটময় হয়ে উঠেছিল তখন তিনি সাহিত্যেই তার মুক্তির পথ সন্ধান করেছিলেন। এই শ্রমজীবী মানুষকে তিনি মহীয়ান করে তুলেছিলেন। তাঁর বিবিধ সত্ত্বা দিয়ে সমাজকে দেখতে চেয়েছিলেন, সমাজে বাঁচতে চেয়েছিলেন। তাঁর কালকূট সত্তা ছিল এই মুক্তিপথ সন্ধানী সত্তা। জীবনের ভয়ংকর গরলকে পাশে ঠেলে দিয়ে চলেছেন অমৃত কুম্ভের সন্ধানে। তাঁর ভ্রমণপিপাসু মন এই অমৃতকে খুঁজে পেয়েছে অরণ্যের কোলে। শুনতে পেয়েছেন অরণ্যের ডাক। তাঁর এই অরণ্যভ্রমণ বা বনভ্রমণ পর্ব তার সাহিত্য জীবনে একটি বিশেষ মাত্রা এনে দিয়েছে। বিশেষ করে তাঁর অরণ্য-ত্রয়ী উপন্যাস যথাক্রমে 'মন চল বনে'(১৯৭৩) 'বনের সঙ্গে খেলা'(১৯৭৪), 'প্রেম নামে বন'(১৯৭৫)-এ তিনটি উপন্যাস একসঙ্গে সম্পৃক্ত। একই পটভূমিকায় ধারাবাহিক কাহিনী যুক্ত অরণ্য নির্ভর উপন্যাস বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে ইতিপূর্বে অনুপস্থিত। উপন্যাসগুলি অরণ্যের সরলতা ও মুগ্ধতায় পরিপূর্ণ। বিহার ও উড়িষ্যার সীমান্তের জোরাইকেলায় লেখকের বন্ধুর বাড়ি থেকে তাঁর অরণ্যভ্রমণ বা বনভ্রমণ শুরু। পরবর্তীকালে ছোট নাগরাসারেন্ডার অঞ্চল তাঁকে মুগ্ধ করেছিল এবং অরণ্যের তিন নারী তিপু, সুরসতিয়া এবং তৃপ্তি ভৌমিক যেন অরণ্য সত্তার প্রতিরূপ। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা করে লেখককে প্রকৃতির সাথে নব নব রূপে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

'মন চলো বনে' উপন্যাস দিয়ে লেখকের অরণ্য যাত্রা শুরু। অরণ্যের প্রতি তাঁর এই অমোঘ টান, অন্তরের আকুতি সমস্ত কিছুই পেয়েছেন বাংলা অরণ্য সাহিত্যের দ্বারোন্মচক, অরণ্য সাহিত্য সম্রাট বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। উপন্যাসের বিভিন্ন জায়গায় বারে বারে তিনি এই কথা স্বীকার করেছেন।

উৎসর্গ পত্রে তার এই স্বগতোক্তি —"স্বর্গতঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে যার পদচিহ্ন ধরে বনের মনকে স্পর্শ করতে চেয়েছি।"[১]

বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু যে সকল লেখকরা প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব পরিবেশ রক্ষার্থে অরণ্য সংরক্ষণ বা গুরুত্বকে প্রকৃতই উপলব্ধি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সমরেশ বসু। 'মন চলে বনে' উপন্যাসে এই প্রকৃতি চেতনা বা অরণ্য চেতনার স্বরূপ লক্ষ্য করা যায়। যখনই এই অরণ্যের ঘ্রাণ আস্বাদনের প্রসঙ্গ আসে, বা তার মুগ্ধতার কথা

আসে, তখনই সকলের মনে বিভূতি বাবুর কথা চলে আসে। উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে তিনি বিভূতিবাবুকে নানাভাবে নানা বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। জরাইকেলায় যার আতিথেয়তায় তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন সেই গাঙ্গুলী মশাইয়ের অতিথি হয়েছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—

"বন সাহিত্যের সৃষ্টিরাজ্যে যিনি রাজা, সেই রাজা গাঙ্গুলী মশাইয়ের অতিথি হয়েছিলেন।"[২]

গাঙ্গুলী মশাইয়ের কথায়—

"অমন বন পাগল মানুষ দেখিনি! কি বলবো বাবা আপনাকে? মায়েদের দেখেছেন তো ছেলে কোলে করে তার গোটা শরীর আতি পাতি করে দেখে কোথায় একটা তিল, কোথায় একটা জড়ুল, কোথায় একটা ফুসকুড়ি দেখতে দেখতে কেমন মায়েদের দেখেন না কেমন যেন ওনাদের চোখ জুড়িয়ে যায়, বিভূতি বাবুর কাছে বন ছিল সেই রকমের সব একেবারে হাত দিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন।"[৩]

এইভাবে কালকূট বারে বারে স্থানে স্থানে তার অনুপ্রেরণা বিভুতিবাবুর পাদ স্পর্শ করেছেন। তাঁর দেখানো পথেই হেঁটেছেন পাহাড়, জঙ্গল, নদী। মর্মে মর্মে স্পর্শ করেছেন এদেলবা, জরাইকেলা ও সারেন্ডার অরণ্য।—

"আমিও যাব সেই গভীর সারেন্ডার বনের পথে পথে, ছায়ায় ছায়ায়, ঝর্ণার ধারে পাহাড়ি নদীর কূলে কূলে।"[৪]

আধুনিক বিশ্বে অনেকেই একটি ভ্রান্তির শিকার। তারা মনে করে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করেছে। এই ভ্রান্তির ফল আজ আমরা ভুগছি। বিশ্ব প্রকৃতি আজ ধ্বংসের প্রহর গুনছে। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন—

"প্রকৃতিকে জয় করা যায় না। চাঁদের বুকে জুতো পায়ে হাটলেও না।"[৫]

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে লেখক বেরিয়ে পড়েছেন কোয়েলের টানে, জরাইকেলার টানে, যে ডাক তিনি অনেক দিন আগেই শুনেছেন—

"তার ডাক শুনেছি অনেক দিন"[৬]

সেই ডাক তিনি শুনেছেন—

"ডাক শোনা যাচ্ছে, দূর নীল পাহাড় থেকে, সবুজ বনের গভীর থেকে।"[৭]

"ডাক এসেছে সেই নীল পাহাড় থেকে সবুজ বন থেকে ইস্পাত রং নদী নির্ভর থেকে নানা রং ফুল পাখি পতঙ্গ প্রজাপতির কাছ থেকে।"[৮]

এই ডাক মন ভরে বনভোজনের ডাক। যেন—"প্রকৃতির ধন প্রকৃতির সঙ্গে মিলতে চায়। তাই পাখি হয়ে বনভোজন।"[৯]

কালকূটের ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল। এই সহজ সাবলীল ভাষায় তিনি অরণ্যে প্রাপ্ত সকল অনুভূতিগুলিকে ব্যক্ত করেছেন।—

"তবে আমার কথা গুঢ় ভাষা না। যাকে বলে সন্ধ্যা ভাষা। আমার ভাষা দিনের ভাষা। দিনের আলোর মতন সচ্ছ।"[১০]

জোরাইকেলায় ঘুরতে এসে লেখক-এর বনপিপাসু মন যাদের সান্নিধ্য পেয়েছিল তাঁরা হলেন গাঙ্গুলিমশাই, নিতুত, মংলা, সুরিন দা, সিংজি, মোহনবাবু এবং আরও দু'জন যারা লেখককে তার প্রেম নামে বনকে এক সূত্রে বেঁধে দিয়েছে। তারা হল তিপু ও তৃপ্তি ভৌমিক। তিপু ও তৃপ্তি দুজনেই লেখকের হাত ধরে তাকে জরাইকেলার নিবিড় অরণ্যের পাখির ডাক, বনের গন্ধ এই সমস্ত কিছুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এই তিপুই লেখককে উইলিয়াম সাহেবের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য দিয়েছিল। তার বাংলোর কথা, তার মুন্ডা হওয়ার কাহিনী সমস্ত কিছুই। তিপুই পরিচয় করে দেয় কোয়েলের চরে 'সোনাখোঁচার'। আবার তৃপ্তি লেখককে ঘুরিয়ে দেখায় ছোট নাগরার জঙ্গল। পরিচয় করিয়ে দেয় বিষ ফল বুনো জামের সাথে, বুরু, সারজঙ এবং বনবাসীদের আরাধ্য অপদেবতা বোঙ্গার কথা।

একথা সকলেরই জানা যে অরণ্য মানে শুধুই অরণ্য মুগ্ধতা বা তার মোহে আবেশিত হওয়া নয়; তার নিষ্ঠুরতা তার সংঘর্ষময় জীবযাত্রাকে আমরা আরণ্যক জীবন বলি। যেখানে রয়েছে সব ভয়ংকর পশুপাখি জীবজন্তু। বন শুধু বন না, সেখানে বন্যপ্রাণীরাও আছে। কখনও হাতির দল দাঁড়িয়ে থাকে রেললাইনের ধারে, আবার কখনও গাছের ডালে ঝুলে থাকে অজগর। আর এরা চিড়িয়াখানার মতো বাঁধা বা পোষা নয়। রয়েছে হিংস্র পশুর দল, দাঁতাল বন্যা বাইসন, কেউটে সাপ যারা যাকে দেখে তাকে আক্রমণ করে—

"বন্য বাইসন-মহিষ যাদের বলে, অথবা কেউটে সাপ, এরা যাকে দেখে তাকেই আক্রমণ করে। কেউটে সাপ তো তার নিজের আন্দোলিত ছায়াকেও ছোবল মারে।"[১১]

এ বন্য পশুরা বনের রাজ্যে মানুষের আধিপত্য ভালোবাসে না। তাই তাদের কাছে সকল মানুষই তাদের কাছে হন্তারক।......

"সেজন্য তারা নিজেরা আগেই সেই ভূমিকা নিতে চায়।"[১২]

অরণ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আদিবাসী শব্দটি। যদিও লেখকের এই আদিবাসী শব্দটি ব্যবহারে আপত্তি রয়েছে—"আদিবাসী বললেই কেমন যেন দূরে ঠেলে দেওয়া হয়। আজকের সমগ্র ভারতের সঙ্গে মেলানো যায় না। ভারতবাসী থেকে আলাদা করে রাখার মত শোনায়। তাতে বিদেশি সরকারের কতখানি স্বার্থ ছিল জানিনা। আজকের ভারতের কোন স্বার্থ থাকতে পারেনা থাকা উচিত না।"[১৩]

তারা অত্যন্ত সহজ সরল। লেখকের কায়—

"এই হচ্ছে বনের মানুষের বন্য সরলতা।"[১৪]

তাদের বিবিধ জীবনাচরণ, রীতিনীতি, সংস্কার, জীবনযুদ্ধের নানা কৌশল এই উপন্যাসটিতে লেখক সুচারুভাবে বর্ণনা করেছেন। কত ফল, ফুল গাছের নাম আমরা জানতে পারি। পান জান 'তিলুয়া' গাছ, রাজরানী ফুল, ডাক পাখি, সড়গা ফল। এই ফল

আদিবাসীরা শুকিয়ে ঘরে তুলে রেখে গুড়ো করে ছাতুর মতন খায়। এরা সমস্ত কিছুই গানের মাধ্যমে ব্যক্ত করে, এমনকি ওরা— "উকুন বাছতে বসেও গান করে"[১৫]

লেখক এর কথায়—"এ হলো বন তত্ত্ব"[১৬]

আদিবাসীদের একটি রীতি, যা কিনা লেখকের সাথে সাথে সকল পাঠক বর্গকে অবাক করে দেয়—"ওদের সিস্টেম হলো মেয়েকেই পণ দিয়ে বিয়ে করতে হয়।"[১৭]

বদরিকাপ্রসাদের সাথে লেখকের এদেলবা যাত্রার কথা দিয়ে কালকূটের অরণ্য ত্রয়ীর প্রথম অংশ 'মন চলো বনে'-র সমাপ্তি। এই এদেলবা যাত্রা লেখকের হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল তৃপ্তি ভৌমিকের চোখের জল। লেখকের হৃদয়ে রয়ে যায় তৃপ্তির প্রতি প্রেমের বিষাদময় অনুভূতি। তিপু, তৃপ্তি এরা তো অরণ্যেরই প্রতিরূপ। তিপু থেকে তৃপ্তি আর তৃপ্তি থেকে সুরসতিয়া এ যেন অগভীর জঙ্গল থেকে আরও গভীরে ছোট নাগরা, সারেন্ডার অরণ্যে প্রবেশ। তিপু, তৃপ্তি ভৌমিক ও সুরসতিয়ার প্রতি প্রেমানুভূতির একটি ইঙ্গিত পূর্ণ মন্তব্য এখানে আমরা পাই—

"অরণ্য আমাকে খেলতে ডেকেছে তার নিবিড় গভীর রূপ সাগরে। এ খেলার নিয়ম কানুন সব আমার জানা নেই। খেলতে খেলতে জানবো। জানতে জানতে খেলব। সে আমাকে যেমন করে খেলা দেবে আমি তেমনি করে খেলব। খেলতে খেলতে আঘাত যদি লাগে, চোখের কুল ছাপিয়ে আসে জল, খেলার কানুন মেনে চলবো।"[১৮]

অর্থাৎ কখনও তিপু কখনও তৃপ্তি ভৌমিক আবার কখনও সুরসতিয়া এই তিন নারী হল অরণ্যের মানসী রূপ। থেমে থাকলে তো চলবে না, চোখের কোন এক ফোঁটা জল এলেও না, কারণ তিনি এসেছেন বনের সঙ্গে খেলতে। আর এই খেলায় থামলে চলেনা। তিনি এসেছেন মুগ্ধতার লোভে।—

"অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে সোনার কোলের উপর নদীর হাসোয়া গীতি দেখেই মনে হয়েছিল, লাখো লাখো যুগ হিয়াতে রাখলেও, রূপমুগ্ধ হিয়া জুড়োবে না"[১৯]

আধুনিক সভ্যতার করাল গ্রাস অরণ্যচারী মানুষকেও ছাড়েনি। "আধুনিক জগত তাদের সবটুকু শোষণ করে নিয়েছে।"[২০]

যারা ছিল গভীর অরণ্যের আদিবাসী যাদের প্রধান কাজই ছিল শিকার, আদিম প্রথার চাষ, নানা বনজ খাদ্য উৎপাদন, নানা অপ দেবো তাদের নিয়ে বাস। তাই আজ আধুনিক সভ্যতার শিকার। লেখক শুনতে পেয়েছেন সেই অশনি সংকেত। আধুনিক সভ্যতার আঘাতে বিদীর্ণ হয়ে যাবে এই গহীন অরণ্যের বুক।—"শাবল গাঁইতির আঘাতে রঙিন মৃত্তিকা যাবে কারখানায়, নগরে নগরে। তখন বন পাহাড়ের রঙ-মৃত্তিকা আর থাকবে না।"[২১]

বড়ই আশ্চর্য এই গভীর অরণ্য। কখনও মুগ্ধতা আবার পরক্ষণেই ভীতি।—

"এতক্ষণের দর্শনেন্দ্রিয় আর অনুভূতির মধ্যে ছিল একটি মুগ্ধতা। কিন্তু যাকে দেখে

মুগ্ধ হই, ভুলে যাই, তার গভীরে বসবাসকারী আরো অনেক আছে যারা শেষ পরোয়ানা নিয়ে হাজির হতে পারে।”[২২]

তবে লেখক মনে করেন এই সবই অরণ্যেরই সৌন্দর্য। বনবালাদের কাছে এসবই অতি স্বাভাবিক। এরা জানে কিভাবে হাতি বাঘ এদের থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হয়। তাই তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন—“লোকে বলে বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশু মাতৃক্রোড়ে”[২৩]

বনের সঙ্গে খেলা উপন্যাসে লেখকের এক অন্য রূপ আমাদের চোখে পড়ে। সেখানে দেখা যায় সুরসতিয়ার কাছে লেখক নিজেকে আত্মসমর্পণ করে দিয়েছেন। এও অরণ্যের এক আদিম রূপ। সুরসতিয়াই যেন অরণ্যের সেই প্রকৃত সত্তা। যার সাথে তিনি মেতে উঠেছেন এক আদিম খেলায়, যার কারণে তার সাথে নগ্ন শরীরে স্নান করতে দ্বিধাবোধ করেন না।.....

সুরসতিয়া কাছে এসে বলল জামা ‘কাপড় রেখে দাও’। বলে, নিজেই আমাকে পোষাক মুক্ত করল। হাতে ধরে নিয়ে গেল জলে ডোবা পাথরের উপর। অঞ্জলি ভরে জল তুলে আমার বুকে কাঁধে ছড়িয়ে দিল।— আদিম জলের স্পর্শ আমার গায়ে। ...

“আদিম আরণ্যক জলাশয়ে, এখন পূজার লগ্ন!”[২৪]

সুরসুতিয়ার মধ্যেই যেন লেখক অরণ্যকে খুঁজে পায়।—“সুরসুতিয়া যেন আমাকে অরণ্যের আদি মন্ত্রে মুগ্ধ করে।”[২৫]

বিচ্ছেদ অনিবার্য জেনেও এই একাত্মতা পাঠক বর্গকে আবেশিত করে। লেখক ও সুরিয়া উভয়েই এই অনিবার্য বিচ্ছেদ সম্পর্কে অবহিত ছিল। সুরসতিয়ার কথায়—

“আমি তো এই বন গুরুর মেয়ে। তুমি এখানে থাকবে না, আমি জানি। আমি তোমার সঙ্গে কখনো যাবনা তাও জানি।”[২৬]

পরক্ষণেই তার আফসোস—“ মি কেন মুন্ডা হলে না”[২৭]

লেখক হৃদয় জানে যে সে কোনও বনবালাকে কষ্ট দিতে বনভ্রমণে আসেনি, এসেছে বনের সঙ্গে খেলতে। তাইতো তিনি বলেন..—“বনের সঙ্গে খেলার,এটাও একটি রীতি”[২৮]

তাই লেখক এবার চললেন এদেলবা থেকে থলকোবাদের উদ্দেশ্যে, গভীর থেকে গভীর অরণ্যে। এখান থেকে শুরু তৃতীয় উপন্যাস ‘প্রেম নামে বনের’ গল্প। এবার শুধু চেনা বা জানা নয় বোনের প্রেমে মেতে ওঠা। বনই যে তার পরম পাওয়া।

কালকূটের অরণ্য প্রেম, নিসর্গ প্রেম, অরণ্যবালাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা এই সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে গেছে তার অরণ্য চেতনা, প্রকৃতি চেতনা। মন চলো বনে উপন্যাসের প্রথমেই সে কথা তিনি বারবার বলেছেন। মানব সমাজ যে প্রকৃতির কোলে বেড়ে উঠেছে সে সত্যকে তিনি উপলব্ধি করেছেন। তাই তিনি বলেছেন প্রকৃতিকে আবিষ্কার করা যায় জয় নয়। প্রকৃতিকে জয় করার যে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা তার ফল আজ মানব সমাজ ভালো করে টের পাচ্ছে। লেখক এখানে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে মায়ের ঋণ কখনো শোধ করা যায়

না—"ঋতুতে ঋতুতে বনে কত গাছে কত ফল ফলে। মানুষকে কত সে দান করে, কোনো পালনের প্রত্যাশা না করে মানুষকে পেট ভরে খাওয়ায়।"[২৯]

গাছের মধ্যেও যে প্রাণ রয়েছে এ কথা বোধহয় কেবল কালকূট সত্তাই উপলব্ধি করতে পারে। গাছ কাটা যে প্রাণী হত্যার সমান, এই অনুভূতি সত্যিই সকল পাঠক হৃদয়কে স্পর্শ করতে বাধ্য। অরণ্য ধ্বংস মহাপাতকের কাজ এ তো কেবল কালকুটের ই ভাবা সম্ভব।

সে কথা আমরা শুনেছি—"মহাপাতকের কাজ তো। প্রাণী হত্যার দায় যাবে কোথায়?"[৩০]

"গাছ তো প্রাণী।..... যে তারে মেরে খায় তার অভিশাপ লাগবেই।"[৩১]

জঙ্গল আমাদের ফুসফুস একে রক্ষা করার দায়ও আমাদের। যুগ যুগ ধরে আদিবাসীরা এই রক্ষার কাজ করে চলেছে। সুরসতিয়ার কথায় সেটা পরিষ্কার—"জঙ্গল পরিষ্কার রাখি। পাতা জমে জমে, জঙ্গলে আগুন লেগে যায় না?"[৩২]

এই পরিবেশ সচেতনতার ভাবনা আমাদের বিভূতিভূষণের আরণ্যকের সত্যচরণের কথা মনে করিয়ে দেয়।

আজ একবিংশ শতকের বিশ্ব পরিবেশের বিপন্নতার আঁচ বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বসে যিনি পেয়েছিলেন তিনি আর কেউ নন কালকুটেরই পথপ্রদর্শক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বিষয়ে সমরেশ বসু তথা কালকূটকে প্রকৃত উত্তরসূরী বলতে পারি। এই প্রকৃতি চেতনা বা পরিবেশ চেতনা বা অরণ্য চেতনা যাই বলি না কেন বাংলা সাহিত্য আকাশে কালকূটকে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থান করে দিয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১) মন চল বনে,কালকূট, প্রথম সংস্করণ, বিশ্ববাণী প্রকাশণী,৭৯/বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০,০০৯, উৎসর্গ পত্র।

২) কালকূট রচনা সমগ্র, চতুর্থ খন্ড, মৌসুমী প্রকাশনী, ১এ,কলেজ রো, কলকাতা ৭০০,০০৯,পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৬৫

৩) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৬৬ ৪) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৬৬ ৫) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৪৩
৬) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৪২ ৭) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৪৪ ৮) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৪৪
৯) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৪৫ ১০) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৪৩ ১১) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩২৬
১২) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩২৬ ১৩) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৭৭ ১৪) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৭৩
১৫) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৩৭ ১৬) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩২১ ১৭) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৮৩
১৮) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৪৫ ১৯) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৪৬ ২০) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৫০
২১) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৫৫ ২২) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৫৫ ২৩) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৫৫
২৪) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৩২ ২৫) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৮৬ ২৬) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৩২
২৭) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৩২ ২৮) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪১৪ ২৯) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৭৭
৩০) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৯৩ ৩১) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৯৩ ৩২) তদেব,পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪২১

অ ব ন্তি কা খাঁ

সমরেশ বসুর ছোটগল্পে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবিকা

"ছোট গল্প হলো লেখকের ব্যক্তিত্বেরই এক-একটি অভিব্যক্তি। নিজের সমাজ-পরিবেশ, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং চারিত্রিক গঠন অনুযায়ী ছোট গল্পের লেখক যে প্রতীতি জীবন থেকে গ্রহণ করবেন, তারাই তাঁর রচনায় ধরা দেবে।"[১] তেমনি বাংলা কথা সাহিত্যের অন্যতম বিতর্কিত লেখক সমরেশ বসু ও তাঁর জীবন। তিনিও "নাম গোত্রহীন সাধারণ মানুষদের"[২] জীবন যন্ত্রণাকে চোখে দেখে গল্পরূপ দিয়েছেন। তাই প্রথম জীবনে লীলা রায়ের প্রশ্নের উত্তরে সমরেশ বসু বলেছেন 'মানুষকে জানবার জন্য লিখি'।

সমরেশ বসুর যৌবনের প্রারম্ভ ঘটে আতপুর বস্তির একটি টালির ঘরে। সেখানে গৌরী বসুর সঙ্গে সংসার শুরু করেন। নৈহাটি জগদ্দল এলাকায় শিল্পাঞ্চল জুড়ে বিচিত্র পেশার মানুষদের পেটের খোরাক জোগাড়ের কাজ এই লেখকের নজর এড়ায়নি। যারা দৈহিক পরিশ্রমে কোনমতে খাবারটুকু জোটায় সেই চটকল কারখানার শ্রমিকরাও ছিল লেখকের অতি কাছের। তিনি রাজনীতিতে যোগদান করে ঘুরে দেখেছেন শ্রমিকদের বস্তিতে তাদের জীবদ্দশাকে, অভাব অভিযোগগুলিও। কিন্তু পরে তিনি পার্টি থেকে সরে আসেন। তিনি উপলব্ধি করেন—"অন্তর্দন্দ্বের নৃশংস চেহারা",[৩] লেখেন—'বন্দি জীবনই আমার দৃষ্টিকে করেছিল স্বচ্ছ আর সুদূরপ্রসারী "। তিনি রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে কিংবা প্রেম বা রোমান্টিকতা, মধ্যবিত্তদের চর্চায় প্রাধান্য না দিয়ে লেখার চিলেকোঠায় স্থান দিয়েছেন খেটে খাওয়া নিম্নশ্রেণির মানুষগুলোকেই। এই প্রসঙ্গে তার উল্লেখযোগ্য গল্প গুলি হল—'দুলে বাড়ির ভাত', 'এসমালগার', 'আদাব', 'লড়াই', 'পাড়ি'-প্রভৃতি।

'দুলে বাড়ির ভাত'[৪] গল্পে সমরেশ বসু দেখিয়েছেন এক হত দরিদ্র পরিবারকে। সবসময়ই তাদের অভাব। তাদের পরিবারের মেয়ে অমলা ভাতের খিদে মেটানোর জন্য একটি আড়াই কেজি ওজনের ডিঙলে (কুমড়ো) সিদ্ধ করতে দিয়েছে। জ্বালানি জোগাড় করার মতোও তেমন সামর্থ্য নেই তাদের। ভেজা কাঠ জ্বাল দিলে তা থেকে ধোঁয়া পর্যন্ত উঠতে চায় না।বাড়ির কর্তা চক্রবর্তী চিন্তিত কারণ ব্রাহ্মণ বাড়ির বৌমা শিবানী পেটের জ্বালায় গোবরা দুলের বাড়িতে ভাত খেয়েছে।

ছেলে বৃন্দাবন যাত্রা দলে থাকে, গান শিখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। পরিবারের সকলে যখন ভাতের পরিবর্তে ডিঙলে খেয়ে খিদে মেটায় তখন বৃন্দাবন ছাত্রের বাড়ি থেকে উপার্জন বলতে আনে দু কিলো চাল। এভাবেই কষ্ট করে তাদেরকে বেঁচে থাকতে হয়, করতে হয় 'উদরান্নের জোগাড়'। দেখতে হয় সুখস্বপ্ন। সব ভুলে বৃন্দাবন বউ-এর মন ভাঙিয়ে 'বউকে সে হাত ধরে ঘরের দিকে নিয়ে যায়'।

'এসমালগার'[৫] গল্পে সমরেশ বসু দেখিয়েছেন কিছু হতদরিদ্র অল্প বয়সী ছেলে এবং মেয়েদেরকে, যারা বে-আইনী চাল বহন করে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের মধ্যে গৌরাঙ্গচন্দ্র দাশ একজন, যার বয়স তেরো। এই অল্প বয়সী ছেলেটি তিনবার জেল খেটেছে ;পুলিশের ভয়ে—"গাড়ি স্টেশনে ঢোকবার আগেই গোরা প্রথমে ফেলে দিল তার পনের সেরের ব্যাগ, তারপর লাফ দিয়ে পড়ল নিজে।"

এত কষ্ট করার পরেও "ষাট মাইল দূর থেকে পনের সের চাল আনলে, প্রতি সেরে কোনোদিন দু-আনা, দশ পয়সা, কখনো বা মেরে কেটে তিন আনা তার থাকে। 'এতে টিকিট কাটবার কথা চিন্তা করা যায় না; কারণ সারাদিনে বরাদ্দ চার আনা থেকে পাঁচ আনা। সেটা বাদ দিয়ে পুরোটা বাড়িতে দিতে হয়। কারণ এই ছোট ছেলেটার ওপরই পরিবারের ভার;বাড়িতে তার ছোট ছোট পাঁচ ভাই বোন ও একটি তার মায়ের পেটে বাড়ছে। তাই হতদরিদ্র গোরাচাঁদের কষ্ট মিশ্রিত লেখকের আক্ষেপ—"এর উপর ষাট মাইলের ভাড়া দুটো টাকা যদি গোরা খরচই করতে পারবে তবে আর এস মালগার হওয়ার কি দরকার ছিল।"

তবুও জীবনের চাহিদা ছিল একটু আনন্দ পাবার রসদ খোঁজার। তাই গোরার স্মাগলার দল গান ধরে, একে-ওকে নিয়ে ঠাট্টা করে, মারামারি খেলা করে, আনন্দের একটু অংশ ভাগা-ভাগি করতে চায় তারা। কিন্তু সবসময়ই মনে ভয় কাজ করে যে আবার কোথায় ওত পেতে থাকবে পুলিশ, ক্রু, মোবাইল কোর্ট এবং সিভিল সাপ্লাইয়ের গুপ্তচরেরা। হঠাৎ সামনের জংশনে মোবাইল আর সিভিল সাপ্লাই রয়েছে শুনে ব্যাগসুদ্ধ চালবহনকারীরা লাফিয়ে নামতে আরম্ভ করলে গোরাও বিহ্বল হয়ে পড়ে। ধরা পড়ে সব কেড়ে নিলে গোরার চিন্তা হয় বাড়িতে তার বোবা মা, ভাই বোনের পরিবারের জন্য। এইভাবে সমাজ পরিস্থিতির সাথে নিরন্তন লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয় গোরাদের।

'আদাব'[৬] গল্পটির পটভূমি ১৯৪৬-এর হিন্দু- মুসলমান দাঙ্গা। সমরেশ বসু এ গল্পে নিচু শ্রেণীর মানুষদের পরিণতিকে দেখাতে চেয়েছেন। অসাম্প্রদায়িক মনোভাব গড়ে তুলতে চেয়েছেন। বোঝাতে চেয়েছেন গরিবদের জাত হয় না। দরিদ্রদের সমাজ কীট-পতঙ্গের মতো মাড়িয়ে চলে যায়। সমাজে তাদের মূল্য নেই। তাদের দুটো পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য কষ্ট করতে হয়। তবুও তাদের সখ পূরণ হয়না। এখানে এই জাতির দাঙ্গায় দুই মানুষকে আশ্রয় নিতে হয়েছে অন্ধকার গলির ডাস্টবিনের মধ্যে। তারা সমাজের জটিলতা বোঝে না, কেবল বোঝে বেঁচে থাকতে হন। একজন নায়ের মাঝি, অপরজন সুতাকলের মজুর। একজন মুসলিম, অন্য জন হিন্দু। তারা জানে যে এই দাঙ্গায় তাদের মতো হা-অন্ন মানুষের লাভ নেই, এই সম্বন্ধে তাদের ধারণা জন্মায—"তুমি মরবা, আমি মরুম, আর আমাগো পোলা-মাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেড়াইবে।" তাদের চিন্তা এতে জীবিকার ক্ষতি। পেটের খিদে দাঙ্গা দিয়ে ভরবে না। মুসলিম মাঝি বলে আর কী হিন্দু বাবুরা তার নায়ে

উঠবে! জমিদার রুপ বাবুর নাঙ্গম নৌকায় চেপে কাছারি করতে যেত, মাসের খোরাকি জুটত; যাতে গরিব মাঝির সংসারটা চলত।

অন্যদিকে সুতা মজুরের পরিবারের দশাও করুণ। বিধবা বোন, ছেলে-মেয়ে নিয়ে তার ঘাড়ে এসেছে ;তাকে মজুরি খেটে তাদের দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়েছে। এ গল্পের শেষে সমরেশ বসু কোথাও দেখিয়েছেন শ্রমজীবী মানুষের কষ্টকে, তাদের অবস্থানকে;যাতে কিছু শ্রেণির মানুষ নিজেদের স্বার্থ কায়েম করতে দাঙ্গা লাগায় অথচ এই নিম্নশ্রেণির মানুষের রুজি রোজগারে ভাটা পরে, পরিবারে নেমে আসে অন্ধকার।

'লড়াই'[৭] গল্পে লেখক দেখিয়েছেন ক্ষুধার জ্বালায় মাছ মারাদের জীবন-মরণের কঠিন লড়াইকে। দক্ষিণের বাদা অঞ্চলে পটভূমিতে এই গল্প। জলচর এবং বদি দুজনেরই বেঁচে থাকবার জন্য লড়াই। বাঁদিকে দুঃস্বপ্ন তাড়া করে বেড়ায় তবুও তাকে বাঁচতে হবে, সে বাঁচবেই। তাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাকে যেতে হয় মাছ ধরতে। চলে জীবন সংগ্রাম, —"প্রায় দু-মন বোঝা টেনে টেনে নামল বদি। পাটাতন তুলল। খোলের মধ্যে জোয়ান মানুষের বুক সমান বাঁশ।...শাবল দিয়ে গর্ত করে বাঁশ পুঁতল। কয় হাত দূরে। একটা করে বাঁশ গোল করে ঘিরে পুঁতল। তারপর হঠাৎ চমকে ঘিরে তাকাল।...ভাঁটা শেষ হয়ে আসছে। সময় নেই, সময় নেই আর। তাড়াতাড়ি।" কিন্তু জলচরটি আবার এলে বদি ভয় পেলেও জীবন-জীবিকার টানে তাকে ভয়শূন্য হতে হয়, রাখতে হয় জীবনের বাজি; তাই সে বুকে সাহস নিয়ে বলে—"কিন্তু আমি মাছমারার ছেলে, তোর সঙ্গে আমার এই হারজিতের খেলা।" বদি এই ভয় জয় করলেও তার জীবন-জীবিকার কাছে অসহায় হয়ে যায় একটি বড় পাঙাস মাছ বদির বুকে বিঁধলে বদি মৃত্যুসজ্জায় ঢলে পড়ে।

'পাড়ি'[৮] গল্পটি দুই কাজহীন নর-নারীর বেঁচে থাকার খোরাক জোগানের লড়াইয়ের গল্প। দারিদ্র্য নিয়ে তাদের নেই কোন অভিযোগ। তাদের 'কাজ নেই, খাওয়াও নেই,' তারা দুইদিন আগে শেষ খাবার খেয়েছিল। আসলে তারা আগের সপ্তাহে শেষ কাজ করেছিল। এখন তারা জীবিকাহীন মানুষ। কারণ 'মিসিপালাটির' দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কাজ নেই!

গ্রামের সাধারণ মানুষ নুনকু ঝাড়ুদারদের সর্দার। সে তাদের কাজের সন্ধান দেবে বলে এনেছিল, বলেছিল দুজনে মাস গেলে ষাট টাকা রোজগার করবে, কিন্তু দেড় মাস কাজের পর তার কোথায় কী! আগে গ্রামে তারা শুয়োর আর ভেড়া চরিয়ে পেটভাতায় ছিল কিন্তু ননকু তাদের বড় অঙ্কের টাকা রোজগারের আশা জাগিয়ে শহরে আনে।

সোনার মাকড়ি তাদের কাজের কথা বললে তাদের মনে হয় "কাজ মানে খাওয়া!" কিন্তু এ কাজ সহজ নয়, কারণ নৌকা ছাড়াই যেতে হবে ভরা নদী পার হয়ে। কিন্তু কাজহীনতা এবং অনাহারের কারণে দুই নরনারী রাজি হয়। দুজনের মজুরী ঊনত্রিশটি জানোয়ারের জন্য ঊনত্রিশ আনা এবং কিছু কেড়ুয়া তেল গায়ে মাখার জন্য। অন্যথায় একটি খোয়া গেলে ছমাস হাজত।

পুরুষটি হাতে লাঠি এবং মেয়েটি কালকাসুন্দের ছপটি নিয়ে নামে গঙ্গার বক্ষে। মেয়েটির কাপড় দড়িয়ার টানে ভাসলে পুরুষটি গামছা পড়ে ছোট কাপড়টি মেয়েটিকে খুলে দেয়। কঠোর সংগ্রামের পর তারা তীরে ওঠে। এখানে সমরেশ বসু দেখিয়েছেন নিচের তলার মানুষদের সংগ্রামপূর্ণ জীবিকাকে, বেঁচে থাকবার লড়াইকে। তাতে কোথাও তাদের অনুতাপ নেই। এভাবেই তারা কোথাও হয়তো সুখী।

কথা সাহিত্যিক সমরেশ বসু তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি থেকে তিনি নিম্নশ্রেণির মানুষদের, তাদের পেশা, আকাঙ্ক্ষাহীন জীবনকে পরখ করেছেন। সামনে দেখেছেন নিম্নবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষগুলোকে, তাদের বেঁচে থাকাকে। যাদের সুখ হল দুমুঠো পেট পুরে খাওয়া এবং প্রতিমুহূর্তে জীবন মৃত্যুর সাথে লড়াই করে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখা। তাই অন্য লেখকরা যখন মধ্যবিত্তকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের জটিলতা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন, সেসময় সমরেশ বসুর লেখায় ফুটে উঠেছে নিম্নবিত্ত মানুষগুলি, তাদের খেটে খাওয়া জীবনের কথা। আসলে তিনি বুঝেছিলেন সমাজ যে শ্রেণী পরিচয় কোনো ব্যক্তির গায়ে বুলিয়ে দেয় তা ব্যক্তিটিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার কৌশল।[৯] তাইতো তার ছোটগল্পগুলি হয়ে উঠেছে সার্থক।

তথ্যসূত্র:

১। সাহিত্যে ছোটগল্প, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৌষ ১৪২৩,পৃ.১৭৪
২। অন্তরীপ, 'নিয়ম-ভাঙ্গার কারিগর', গৌতম সেনগুপ্ত, ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ.১৩
৩। সমরেশ বসু-শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়, 'ঘরের পাশে আরশিনগর সেথায় পড়শি বসত করে'
৪। সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রমা প্রকাশনী, ১৯৬১, পৃ.১৫৮
৫। তদেব: পৃ.১২২
৬। একালের গল্প, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, আগস্ট ২০২৬, পৃ.১১৭
৭। সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রমা প্রকাশনী, ১৯৬১, পৃ.৮৪
৮। তদেব: পৃ.৪৬
৯। সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প, জীবনকে জানতে জানতে নিজেকে —সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমা প্রকাশনী, ১৯৬১, পৃ.১০

বি বে কা ন ন্দ হাঁ স দা

প্রসঙ্গ সারন্দা বনভূমির আদিবাসী সমাজ-জীবন : সমরেশ বসুর 'দুই অরণ্য'

ব্রিটিশ কবলিত উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার হাত থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার প্রাক লগ্নে তথা চল্লিশের দশকে সমগ্র বিশ্ব ছিল নানা বিশৃঙ্খলায় জর্জরিত। সেই সময় ভারতবর্ষের সাথে সাথে পশ্চিম বাংলার ভিতটিও ছিল নানা দিক থেকে বিপর্যস্ত। ১৯৩৯ খ্রি: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ৪২-এর গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন আগস্ট আন্দোলন, ১৯৪৩ খ্রি: অতিভয়ানক দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তর, এছাড়াও দেখা দেয় সমগ্র বাংলা জুড়ে হিন্দু-মুসলমানের রক্ত ক্ষয়ী দাঙ্গা। সমগ্র ভারতবর্ষের এরূপ নানা বিশৃঙ্খলায় ভরপুর আবহেই সাহিত্যিক সমরেশ বসুর উদয় ঘটে বাংলা সাহিত্যাকাশে। ১৯৪৬ খ্রি: হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে লেখা প্রথম গল্প 'আদাব' লিখেই বাংলা সাহিত্যে সাড়া পড়ে যায়। ছোটগল্পের হাত ধরেই বাংলা সাহিত্য জগতে উত্থান ঘটে তাঁর।

ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় অতি সুপরিচিত নাম। বাংলাদেশের ঢাকা জেলার রাজ নগরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দৈনন্দিন জীবনে কোনো স্বচ্ছন্দ ছিল না। জীবনের রেশ টানতে তাকে বহু বিচিত্র পেশাকে অবলম্বন করতে হয়েছে। কর্মসূত্রে ব্যক্তিগত জীবনে সঞ্চিত বাস্তব অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন উপন্যাসগুলিতে। উপন্যাসের বাস্তবতা সম্পর্কে তিনি জানান—"অবশ্য এটা ঠিক যে, উপন্যাস যদি অত্যন্ত বাস্তব হয় উপন্যাস হচ্ছে বাস্তবের রূপান্তরিত রূপ এটাই আমি মনে করি।...একজন সাহিত্যিক আমি হয়তো আজকে অন্যভাবে লিখতে পারি কিন্তু আমার যদি অভিজ্ঞতা না থাকে তা হলে তো আমি গল্প লিখতে পারবো না।"[১]

একটা সময় তিনি রাজনীতির দৌলতে গ্রাম-বাংলা থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের নদী-পাহাড়-সমুদ্র-অরণ্যাঞ্চল সমস্ত ক্ষেত্রে অবাধে বিচরণ করেছিলেন। আর এই পরিভ্রমণ সূত্রে নদী পাহাড় বা অরণ্যাঞ্চল দেখেই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি। নদী-পাহাড় অরণ্যের বাহ্য পরিবেশের সাথে সাথে লেখক এই অঞ্চলের মানুষগুলির প্রতিও যে গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন তা উপন্যাসিকের কথার মধ্য দিয়ে জানা যায় : "তত্ত্বতালাস যা কিছু মানুষকেই চাই। যে কালে সন্ধানে পথে বেরিয়েছিলাম, মানুষ ছিল আমার লক্ষ্য।"[২]

ভ্রমণ বিলাসী স্রষ্টা স্বাধীন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় দশকে বিহার তথা বর্তমান ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যা সংলগ্ন সারন্দা বনভূমি দর্শনে পাড়ি দিয়েছিলেন। আর এই সারন্দা বনভূমি পরিদর্শন কালে তিনি এ অঞ্চলের বন্যপ্রকৃতির সাথে সাথে এখানকার আদিবাসী মুণ্ডা সমাজ জীবনের প্রতি গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। সারন্দা বনভূমি পরিদর্শন কৃত অভিজ্ঞতারই এক উৎকৃষ্ট ফসল হল 'দুই অরণ্য' উপন্যাস। তাই 'দুই অরণ্যে'র বিষয় বা ঘটনাবস্তু নিছক বা

কাল্পনিক নয়। উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্র লেখকের কানে শোনা, চোখে দেখা বাস্তব চরিত্র। তাই এই উপন্যাসের 'ব্যক্তির সংকট ও চ্যালেঞ্জ' অংশে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন, "'দুই অরণ্য' এর বিষয় অধ্যয়ন লব্ধ নয়। তিনি ভারতবর্ষের বহুখ্যাত নানা অরণ্য ভূমিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সারন্দার জঙ্গলের পটভূমি এবং সেই পট বিধৃত চরিত্র এই উপন্যাসের মুখ্য হয়ে উঠেছে।"[৩]

এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় উপন্যাসিক সমরেশ বসু সারন্দা ভূমিতে কয়েকদিন পরিভ্রমণ করে এখানকার আদিবাসী মুণ্ডা সমাজ জীবনের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার খুঁটিনাটি বিষয় সংক্রান্ত যে বিবিধ জ্ঞান অর্জন করেন, তারই প্রেক্ষিতে রচিত 'দুই অরণ্য' উপন্যাস।

বসতি :

শত মাইল জুড়ে বিস্তৃত সারন্দা বনভূমির গভীর-অগভীর বনাঞ্চলে স্থানে স্থানে মুণ্ডাদের গ্রাম এদেলবা (শিমূলফুল), লোয়াকদা (ঝিনুক জল), করমপদা, হেন্দা, ছোটো নাগড়ার মতো ছোট-বড়ো গ্রাম বসতিগুলি গড়ে উঠেছে। অরণ্য বেষ্টিত উঁচু পাহাড়ের মধ্যখানে যথাসম্ভব বন না কেটে ছাড়া ছাড়া মুণ্ডাদের ওড়া (ঘর) দেখা যায়। ঘরগুলির দেওয়াল সারন্দার সাত রং মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি এবং দেওয়ালগুলিতে কালো রং দিয়ে আঁকা নানা পশুপাখি, জন্তুজানোয়ার, দেবদেবীর চিত্র পরিলক্ষিত হয়। জানা যায় এককালে এদের দেওয়া চিত্রের মাধ্যমে নিজ জাতি গোষ্ঠীর টোটেম চিত্রই পরিস্ফুটিত হত।

দৈনন্দিন জীবন-জীবিকা :

সারন্দা বনভূমির মুণ্ডা জনজাতির নারীপুরুষের দৈনন্দিন জীবন জীবিকার তেমন কোন পার্থক্য নেই। জীবন-জীবিকার তাগিদে একটা সময় এরা 'ঝুম' চাষ করত। একদা অতীত কালে অস্ট্রিক বা কোল জাতির মানুষেরা 'ঝুম' চাষ করত তা জানা যায় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে—"এই জাতির লোকেরা প্রথমটায় 'জুম' চাষের মতো চাষ করিত, সূক্ষ্মাগ্র বৃহদাকার যষ্টি খণ্ড দারা ভূমিতে গর্ত খুঁটিয়া তাহাতে বীজ দিয়া চাষ করিত।"[৪]

তবে এখন আর করা হয় না। সারন্দার রুক্ষ, সূক্ষ্ম মৃত্তিকার বনভূমি পরিষ্কার করে কিছু কিছু চাষের জমি তৈরি করে ভুট্টা, যব, জোনার, মকাই, কুরথি ডালের মতো শস্য সমূহের চাষ আবাদ করে। ধান চাষের যোগ্য কোন জমি এদের নেই। চাষ আবাদ ছাড়াও এখানকার মানুষেরা নানান কাজের সঙ্গে যুক্ত। দৈনন্দিন জীবনে যৎসামান্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বাড়াতে এরা অনেকে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী প্রতি পালন করে। নারীরা সাধারণত বাড়ির আশেপাশে শুকনো কাঠ পাতা, গেঁড়ি, গুগলি, ঝিনুক, শামুক, শাকপাতা সংগ্রহ করে। বনজঙ্গল থেকে আহরণকৃত পাতা দিয়ে এরা বিচিত্র রকমের থালাবাটি, ঘাস দিয়ে তৈরি ঝাঁটা বিক্রির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ধারা বজায় রাখার চেষ্টা করে।

এছাড়া অরণ্যচারী মুণ্ডা জনমানুষ পশু শিকার করা অতি প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত।

বনজ ফলমূল, মধু সংগ্রহের সাথে সাথে এরা তীর-ধনুক-টাঙ্গি দিয়ে হরিণ, খরগোশ, বাঘ, ভালুক শিকার করে শিকার কৃত পশুর চামড়া, চর্বি, নখ, বিক্রির মাধ্যমে যৎকিঞ্চিত অর্থনৈতিক সচলতা আনার চেষ্টা করে। এ সমস্ত কাজ ছাড়া মুণ্ডারা অনেকে গাছ কাটার কাজেও যোগ দিতে দেখা যায়। এজন্য এদেরকে কোনো অর্থ দেওয়া হয় না। তবে গাছ কাটতে এরা বিশেষ আগ্রহী নয় তা ঔপন্যাসিকের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে জানতে পারি—"বনের কাজে গাঁয়ের কেউ কখনো ভালবেসে যায় না। একটু জমির জন্য বনবিভাগের এই গ্রামে গ্রামে লোকেরা থাকে। খাজনা তাদের দিতে হয় না ঠিক, কিন্তু বন বিভাগের কাজে তারা ছুটি পায় না। বাইরের মানুষের মতো কখনোও পয়সা পায় না। আসলে বনবিভাগের খাতায় তারা সুলতানি রেজা কুলি। যে কোনো সময়, দিনে, রাত্রে, শীতে বৃষ্টিতে ডাকলেই যেতে হয়।"[৫]

এর থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় সারন্দা বনভূমির মুণ্ডাদের বসতি বলে কিছু নেই। একটু জমিতে বসবাসের ঠিকানা নিশ্চিত করতে বন বিভাগ এদের সুলতানি রেজা কুলি হিসেবে কাজ করতে হয় বিনা পরিশ্রমে।

খাদ্য :

সারন্দা বনভূমির মুণ্ডা আদিবাসীদের খাদ্য পানীয়র সঙ্গে বাইরের সভ্যজগতের বিশেষ কোনো সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। এখানকার মাটিতে ধান চাষ হয় না। তাই দৈনন্দিন জীবনে দু-মুঠো ভাতের জন্য হাহাকার লেগেই থাকে, তা ঔপন্যাসিকের উদ্ধৃতির মধ্য দিয়েই জানা যায়—"পেটের ভাতে টান পড়ে যায়। কতচাল আর সারন্দার মানুষের ঘরে থাকে যে পেট ভরে ভাত খাবে, আবার প্রাণভরে হাড়িয়া শুষবে। তবুও মানুষ অনাহারে মরে না।"[৬]

সারন্দা বনভূমির মুণ্ডারা রাত্রিতে একবার মাত্র রান্না করে গরম ফ্যান ভাতের সঙ্গে নুন মিশিয়ে খায়। আর বাকি অবশিষ্ট ভাত হাড়িতে জল দিয়ে রাখে সকালে খাবার জন্য। এ অঞ্চলে ভাতের মতো লবণও যেন অতি মূল্যবান সম্পদ যা সচরাচর পাওয়া যায় না। তা ধরা পড়ে ঔপন্যাসিকের কথায়—"নুন বড় পরম সম্পদ, পাওয়া যায় না। তুমি খাবার চাইলে দিতে পারি, কিন্তু নুন চেয়ো না।"[৭]

এরূপ শত দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করলেও এদের আহার দ্রব্যের প্রায় সিংহ ভাগই আসে বনজঙ্গল, নদীনালা-খালবিল থেকে। সারন্দা বনভূমি থেকে প্রাপ্ত ফলমূল, পেচকি, সাংগা ভেরেন্ডা কুকড়ি, পাতালকোড় ছাতু, বনকচু, মহুয়াপুল এরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে আবার দুর্দিনের কথা ভেবে মহুল ফুল, ছাতু, বনকচুর পাতা শুকিয়ে রাখে। এছাড়া নদী-পুকুর বা জলাশয় থেকে ছোটছোট নানা ধরণের মাছ, শামুক, গেঁড়ি-গুগলি, ঝিনুক পাওয়া যায়। বর্ষাকালে পাখাখসা পিঁপড়ে, গ্রীষ্মকালের কুরকুট পটম (ডিমেল পিঁপড়ে) এগুলি এদের পরম আহার্য বস্তু।

টোটেম :

সমগ্র বিশ্বের আদিবাসী জনসমাজের কাছে টোটেম অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাক্

ঐতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষ প্রকৃতির সহচার্যে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে দিন যাপন করত। নিজ নিজ গোষ্ঠীকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করতে তারা ব্যবহার করত টোটেম। টোটেম সম্পর্কিত বিশদ ধারণা নেবার চেষ্টা করব ড. অতুল সুরের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে—"টোটেম বলতে গোষ্ঠীর রক্ষক স্বরূপ কোনো কোনো শুভ সাধক পরমাত্মাকে বোঝায়। এই পরমাত্মা কোনো বৃক্ষ, প্রাণী বা জড় পদার্থের মধ্যে নিহিত থাকে। আদিবাসীদের বিশ্বাস যে গোষ্ঠীসমূহের উৎপত্তি হয়েছে এই সকল বিশেষ প্রাণী, বৃক্ষ বা জড় পদার্থ থেকে। যে প্রাণী বা বৃক্ষ, যে গোষ্ঠীর 'টটেম' তাকে তারা বিশেষ শ্রদ্ধা করে। কখনও তাকে বিনাশ করে না সেই প্রাণীর মাংস বা সেই বৃক্ষের ফল কখনও খায় না।"[৮]

'দুই অরণ্য' উপন্যাসে দেখা যায় মুণ্ডাদের টোটেম হল হাতি। উপন্যাসিক সমরেশ বসু উপন্যাসের চরিত্র গোমা হোরোর স্বরূপ ফুটিয়ে তুলার সাথে সাথে তা দেখিয়েছেন"হাতি তার বংশের পদবী মারাং হোরো থেকেই একদা তাদের বংশের উদ্ভব হয়েছিল।"[৯]

মিথকল্প :

আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলি যেমন নিজস্ব টোটেম, ট্যাবু রয়েছে তেমনি নিজস্ব পৌরাণিক আখ্যান বা মিথ রয়েছে। পৃথিবী ও মানব জাতির সৃষ্টি সংক্রান্ত মিথগুলি আদিবাসী সমাজের মধ্যে প্রায় একই রকম। সারন্দা বনভূমির মুণ্ডাদের মধ্যেও যে পৃথিবী সৃষ্টি ও মানব জাতির দৃষ্টির রহস্য সম্পর্কিত মুণ্ডারি মিথের উল্লেখ করেছেন ঔপন্যাসিক। গোমা বুড়ো তার নাতি চেকোকে শোনানোর মধ্য দিয়ে তা পরিস্ফুটিত হয়—"হুঁ আমাদের রূপকথায় বলে, ঠাকুর বলে নাকি একজন মহাদেবতা ছিলেন। তিনি কচ্ছপকে হুকুম করেছিলেন সমুন্দর থেকে মাটি তুলে নিয়ে আসতে। সেই মাটি তুলে তুলে জগৎ তৈরি হয়।"[১০]

পৃথিবী সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে আধুনিক জীববিজ্ঞানীরা জলের গুরুত্ব স্বীকার করেন। তাই আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান বর্জিত আদিম আদিবাসীদের মিথ বা উপকথা একটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

বিশ্বাস-সংস্কার :

সারন্দা বনভূমির মুণ্ডারা নানা প্রকার ভূতপ্রেত, ডাইনি, যুগিন সংক্রান্ত অন্ধ সংস্কারের ঘেরাটোপে আবদ্ধ। মুণ্ডারা সাতবহিনীর অপদেবীর অস্তিত্ব কল্পনা করে ভীতিগ্রস্ত হয়। এই সাতবহিনী সম্পর্কিত মুণ্ডাদের ভয়বিপত্তি জানা যায় ঔপন্যাসিকের উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে—"সাতবহিনী, সর্বনাশী; জলের স্রোতে ওরা বাজনা হয়ে বাজে। বাতাসে গান হয়ে বাজে। মেয়েদের মনের শান্তি যায়। আর ভয়ঙ্কর সুখের হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে যায়। মন পাগল পাগল করে। সাতবোন ঘাটে চেপে সাতপথে টানে।"[১১]

এই সাতবহিনীর হাত থেকে বাঁচতে মুণ্ডারা হাতের চেটোয় থুতু ফেলে শরীর অপবিত্র করে। তাদের বিশ্বাস দেহ অপবিত্র থাকলে অপদেবী সাতবহিনী মানুষের কাছে ঘেঁষে না।

'সাতবহিনী' সম্পর্কিত অন্ধবিশ্বাস ছাড়া মুণ্ডারা আরো নানা বিশ্বাস-সংস্কার রয়েছে—

ক) মুণ্ডারা বিশ্বাস করে কোনো নারী বা পুরুষের মন পেতে হলে গুণিনকে দিয়ে তুক-তাক-মন্ত্রতন্ত্রের জোরেই পাওয়া যায়। গুণিন যদি একফোঁটা মোহিনী সিঁদুরের সাথে ডাইনির দেওয়া এক ফোঁটা রক্ত মিশিয়ে কেউ কপালে টিপ পরলে, যার নামে টিপ পরবে তাকে 'সাতবহিনীরা' সাত রূপে ধরে ছুটিয়ে নিয়ে যায়।

খ) সারন্দা মুণ্ডারা কোথাও শুভকর্মে যাত্রাকালে, যাত্রাপথে গাছের ডাল ভেঙে পড়লে, গরু কিংবা কুকুর ডাকলে তা কুলক্ষণ বলেই বিশ্বাস করে।

গ) বিবাহের দিন বা রাত্রে বরকে একলা থাকতে বা যেতে নেই। একলা গেলে দুষ্টু আত্মা বরের শরীরে ভর করে।

ঘ) সারন্দার বেতবনে দুষ্টু আত্মারা থাকে। সেখানে কেউ গেলে দুষ্টু আত্মারা তার প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। আর বেতবনে দুষ্টু আত্মারা থাকে বলে সেই আত্মাদের বাহক বলেই বিশ্বাস করে মুণ্ডারা।

এছাড়া সারন্দা বনভূমি অঞ্চলের মুণ্ডারা বিশ্বাস করে ডাইনির অস্তিত্ব। যে বা যারা ডাইনি, সেই ডাইনি তার চোখ দিয়ে গরু, মহিষ, ছাগল এমনকি মানুষের রক্ত পান করে মেরে ফেলে। ডাইনি সংক্রান্ত এরূপ বিশ্বাস সমগ্র আদিবাসী সমাজে রয়েছে। স্বাধীনতা লাভের এতকাল পরেও সারন্দা বনভূমির মুণ্ডা উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে ভূতপ্রেত ডাইনি সংক্রান্ত বিশ্বাস-সংস্কারগুলি পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। ডাইনি সন্দেহে মানুষকে পিটিয়ে মারার ঘটনা প্রতিনিয়তই শোনা যায়।

বিবাহ রীতি :

বিবাহ হল একটি সামাজিক বন্ধন বা বৈধ চুক্তি। যার মাধ্যমে দুটি নারীপুরুষ দাম্পত্য জীবন স্থাপিত হয়। মুণ্ডা ভাষায় বিবাহকে বলা হয় আন্দড়ি। 'দুই অরণ্য' উপন্যাসে সারন্দা বনভূমির মুণ্ডা সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায় মুণ্ডা সমাজে বাল্য বিবাহের প্রচলন নেই। তারা উপযুক্ত বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় পিতামাতা বা অভিভাবকদের সহমতে। কখনো বা ছেলেমেয়ে নিজেদের স্ব-ইচ্ছায় বিবাহ করতে পারে। মুণ্ডাদের মধ্যে একই গোত্রে বিবাহ হয় না। মুণ্ডা সমাজে নারীপুরুষ একাধিক বার বিবাহ করতে পারে তেমনি তারা ছাড়বিচারও করতে পারে। উপন্যাসের নায়ক চেকো ও মাংরির সামাজিক বিবাহকে কেন্দ্র করে মুণ্ডা সমাজ প্রদত্ত নানা রীতিনীতির পরিলক্ষিত হয়। ধার্যকৃত বিবাহের দুদিন আগে থেকে পাত্রপাত্রীকে নিজ নিজ বাড়িতে তেল-সিঁদুর মাখানো হয়। বিবাহের দিন বরযাত্রী যাবার আগে নানান বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গ্রামের মেয়েরা পুকুর বা কোনো জলাশয় থেকে কলসিতে জল নিয়ে আসে। জল নিয়ে ফেরার সময় কলসির সাথে ধানের গোছা মাটিতে লুটিয়ে দেওয়া হয়। বরযাত্রী কন্যা বাড়িতে উপস্থিতি হলে দুই দলের মধ্যে এক বিরাট পাইকা নাচের শুরু হয়ে যায়। তারপর চাঁদকে সাক্ষী রেখে পাত্র-পাত্রীকে মাড়োয়াতলায় এনে মুণ্ডাদের নিজস্ব পুরোহিত সিন্দুরের পুটলি পাত্রের হাতে দিয়ে মারাংবুরুকে স্মরণ

করে পাত্রীর মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দেয়। তারা এ সময় পুরোহিত অস্পষ্ট ভাবে মন্ত্র আওড়াতে থাকেন এবং মেয়েরা গোটা হলুদ, ধান ও খই ছিটাতে শুরু করে। বিবাহে সিঁদুর দানই মূল অনুষ্ঠান। বিবাহের মতো আনন্দদায়ক উৎসবে বুড়োবুড়ি (যুবক-যুবতী) সকলে ডিয়েং (হাড়িয়া) খেয়ে ধামসা-মাদল সহযোগে নাচগানে উন্মাদ হয়ে ওঠে—

"কাঁনসা পিতল ফোবং জানরে
কাঁনসা পিদল বদল না মোগা'
নে জীবন নাতিড
নেজীবন কাহিন বদলায়ো।
কুম্বার চাটু পোবয় জানরে।
কুম্বার তানে কা রুবাড়া।"[১২]

অর্থাৎ কাঁসা-পিতল ভাঙলে পরে বদলানো যায় কিন্তু জীবন যে তেমন বদলানো যায় না। যেমন কুমোরের মাটির পাত্র ভাঙলে তা কুমোরের কাছে ফিরে আসে না। জীবনকেও তেমন আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

মুণ্ডা সমাজের বিবাহের ক্ষেত্রে আর একটি বিশেষ রীতি লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য আদিবাসীদের মতো এদের সমাজে বরপণের পরিবর্তে কন্যাপণ দেওয়ার রীতি পরিলক্ষিত হয়। উপন্যাসে দেখি চেকো মাংরিকে বিয়ে করে কন্যাপণ স্বরূপ বলদ, গাভী, দুটো বড় মোরগ দিতে। চেকোর বাবা কান্দ্রা গোমা হোরোর কন্যার জেমাকে বিয়ে করে একটি দুধেল গাই, দুটো খাসি, মোরগ ও দশ হাঁড়ি হাঁড়িয়া দিতে হয়েছিল।

দেবদেবী :

অন্যান্য আদিবাসীদের মতো মুণ্ডারাও প্রকৃতির পূজারী। এদের দেবদেবীর কোন মূর্তি বা প্রতিকৃতি নেই। বনজঙ্গল, গাছপালা, নদী, পাহাড়, চাঁদ, সূর্যের মতো প্রকৃত জাত বস্তুকেই এরা দেবদেবীর আসনে বসিয়েছে। ঔপন্যাসিক মুণ্ডাদের যে সমস্ত কল্যাণকামী ও অকল্যাণকামী দেবদেবীর উল্লেখ করেছেন সেগুলি হলসিংবঙা বা সূর্য দেবতা, মারাংবুরু (বড়পাহাড়), বুরুবোঙা, আন্দরি বোঙা, বাগিয়াবোঙা, আঙ্গরিবোঙা, নাগেএরা।

- **সিংবোঙা :** মুণ্ডাদের একটি প্রধান দেবতা হলেন সিংবোঙা বা সূর্যদেবতা। তিনি মানুষকে দৈনন্দিন জীবনে সুখ, সম্পদ দান করেন। সমগ্র রকম বিপদ-আপদ থেকে সদাসর্বদা রক্ষা করে চলেন। তিনি সব সময় মানুষের মঙ্গল কামনা করেন। তাই মুণ্ডারা প্রতিনিয়ত সিংবোঙাকে স্মরণ করে।

- **মারাংবুরু :** মুণ্ডা জনকল্যাণকামী আর এক দেবতা হলেন মারাংবুরু বা বড় পাহাড়। তিনিও মুণ্ডা সমাজে পূজিত হন, কারণ মুণ্ডাদের সমগ্র রকম বিপদ আপদ থেকে সদাসর্বদা রক্ষা করে চলেছেন। তাই দৈনন্দিন জীবনে বিপদ-আপদ বা কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে স্মরণ করা হয়। এমনকি মুণ্ডারা বিবাহের সময় মারাংবুরু দেবতাকে সাক্ষীজ্ঞান

করে বর কনেকে সিঁদুর দান করে। তাই মুণ্ডা সমাজের মারাংবুরু পূজিত হন ধূপ-ধুনা, নারকেল, বাতাসা প্রভৃতি উপকরণ সহযোগে। সারন্দার মুণ্ডারা মারাংবুরুর উদ্দেশ্যে লাল মোরগ-ছাগল প্রভৃতি পশুর বলি দেয়। পুজোয় প্রচুর পরিমাণে ডিয়েং তথা হাড়িয়া খায় মুণ্ডারা, তারা মনে করে হাড়িয়া মারাংবুরুর দান।

● **বুরুবঙা :** মুণ্ডা জন সমাজের এক জঙ্গল দেবতা হলেন বুরুবোঙা। মুণ্ডারা বুরুবোঙাকে বনজঙ্গলের গাছপালার দেবতা মনে করে। প্রতিটি গাছই বুরুবোঙার অধিষ্ঠান। "বুরুবোঙাই জানে কারণ সে জঙ্গলের দেবতা। ভাই গাছ, মানুষকে তুমি মাপ করো। সে তোমাকে মেরে বাঁচতে চায়। কিন্তু দেখো, সেও চিককাল বাঁচে না।"[১৩] গাছের মধ্যে বুরুবোঙার উপস্থিতি কল্পনা করে, ফলে মুণ্ডারা নিতান্ত অভাব ব্যতীত কেউ গাছ কাটে না। ঠিকাদারেরা নতুন ইজারা নিয়ে গাছ কাটার আগে মুণ্ডা পুরোহিত গুণিনকে দিয়ে একটি গাছকে পূজা না দিলে মুণ্ডা কুলি-রেজারা বুরুবোঙার কল্পনায় কেউ গাছ কাটে না। তাই বুরুবোঙাকে পরিপুষ্ট করতে পুজো নিবেদন করতে হয় নতুবা বুরুবোঙার রোষের মুখে পড়তে হয়। তারা মনে করে বুরুবোঙার বড় বাহন হল হাতি। সেই হয়তো পাতার বাড়িঘর মাড়িয়ে তছনছ করে দিয়েছে কিংবা গাছ কাটতে কাটতে কারো মাথায় পড়ে গেল কিংবা কেউ মুখ দিয়ে রক্ত বমি করতে করতে মারা গেল। তাই গাছকাটার আগে বুরুবোঙার উদ্দেশ্যে পূজা দিতে হয়। পুজোর অতি আবশ্যিক উপকরণ নারকেল, ধূপ, ধূনা, বাতাসা। এছাড়াও পুজোর মূল অঙ্গ হল বলি। বুরুবোঙার উদ্দেশ্যে তাই মুরগি বা ছাগলের বলি দেওয়া হয়।

● **আন্দরিবোঙা :** মুণ্ডাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের পথে এক শক্তিশালী দেবতা হল আন্দরিবোঙা। তিনি শিকারের দেবতা নামে পরিচিত। আন্দরিবোঙার কৃপায় মুণ্ডারা কাজকর্ম বা অর্থ সংগ্রহের কাজে সহায়ক হয়। যার মধ্য দিয়ে দৈনন্দিন জীবনে তাদের নৈতিক অভাব অনটন পূরণ হয়।

এ সমস্ত দেবদেবী ছাড়াও মুণ্ডা সমাজে আঙ্গরিবোঙা, বাগিয়াবোঙা, সাতবহিনীর মতো অপদেবী রয়েছে যারা মানুষের কোন না কোন বিপদ ঘটায়। তাই মুণ্ডারা ভীতিগ্রস্ত হয়।

উৎসব অনুষ্ঠান :

সারন্দা মুণ্ডা ওঁরাও জনসমাজের মানুষেরা দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় বন্য জীবজন্তুর আক্রমণের মতো বিপদজনক জায়গায় বসবাস করে এবং কায়িক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করলেও, সরল-আনন্দ প্রিয় মানুষগুলির জীবন থেকে আনন্দ স্ফূর্তি যে একেবারে নির্বাসিত হয়েছে তা কিন্তু আদৌও নয়। মুণ্ডা জনসমাজের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায় এদের সমাজে ঋতু ভিত্তিক নানা উৎসব অনুষ্ঠান প্রচলিত রয়েছে। 'দুই অরণ্য' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক মুণ্ডাদের বেশকিছু উৎসব অনুষ্ঠানের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

● **মাগে পরব :** মুণ্ডা সমাজের সবচেয়ে বড় পরব হল মাগে পরব। মাগে পরব মাঘ

মাসের শুক্লাপূর্ণিমায় পালন করা হয়। এই পরবের দিন মুণ্ডারা গ্রামের দেবস্থান সারনাতে গিয়ে আতপ চাল, গুণ্ডি, ডিয়েং, সিঁদুর দিয়ে পূজা করে বুরুবোঙার উদ্দেশ্যে। এ পূজোয় তারা লাল মোরগ বলি দেয়। এদিন আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে আনন্দ উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে, সারাদিন অবাধে হাঁড়িয়া নামক রস পান করে। ছেলে মেয়েরা মাগে পরবে অবাধ যৌনাচারের ছাড়পত্র পেয়ে থাকে। ঔপন্যাসিকের কথায় : "মাগে পরব হল বাধা নিষেধহীন পরব। সমস্ত সম্পর্করহিত সম্পর্ক শুধুএ পৃথিবীর নারী ও পুরুষ তারা।"[১৪]

● **ফুল পরব :** ফুল পরবকে আবার বাপরবও বলা হয়। বাপরব ফাল্গুন মাসে অনুষ্ঠিত হয়। সারন্দার নানান গাছপালায় যখন নতুন কচিপাতা গজাতে শুরু করে, বনভূমির গাছপালায় যখন শাল, কুসুম, গাই সুন্দরী, মধুফুল, আস্ফলফুল, পলাশ, শিমূল নানা ফুল ফোটে চারিদিকে যখন ফুলের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে ভ্রমরের গুঞ্জনে সারা বনভূমি মুখরিত হয়ে পড়ে তখন মুণ্ডাদের মন আনন্দে ভরে ওঠে। এরূপ বিচিত্র ফুল ফোঁটায় মনমুগ্ধ মুণ্ডারা ফুলপরব বা বাপরবের আয়োজন করে। তখন তারা দেবস্থান বা সারনায় গিয়ে লাল ফুল তুলে, ডিয়েং ও সিঁদুর ইত্যাদি উপকরণ সহযোগে পূজো করে। পূজোর অবিচ্ছেদ অঙ্গ বলিদান তাই পশুবলি দিয়ে ফুল পরবের সূচনা করা হয়। উৎসবটি মুণ্ডা সমাজে তিন-চারদিন ধরে চলতে থাকে। উৎসবকে মুখরিত করে তুলতে ছেলে মেয়েরা নতুন পোষাক পরে মাথায় ফুল গুঁজে, ডিয়েং পান করে নাচে-গানে মেতে ওঠে—

"দোলাং দোলাং সবেন কুড়ি
গাড়ারেবু জুড়াজুড়ি
হ হোরে কুড়ি
বানো তাম্‌মুড়ি
নেয়ালেকেন সোময় সেনোতানা।"[১৫]

চলো চল সব মেয়েরা। নদীতে গিয়ে জুড়াজুড়ি করি। ওরে মেয়ে একটু বোঝো না, মধুর সময় যাচ্ছে।

● **ফাগুয়া পরব :** মুণ্ডাদের ফুল, বাপরবের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ফাগুয়া পরব। বাপরব তিন চারদিন ধরে চলার শেষদিন ফাগুয়া পরব অনুষ্ঠিত হয়। এ পরবে দেবস্থানে কোনো পূজো বা বলিদান দেওয়া হয়না। দিকু বা বাঙ্গালীদের হোলি উৎসবের মতো এ উৎসবে মুণ্ডারা সারন্দার নানা বিচিত্র বর্ণের লাল, নীল, হলুদ রং এর মাটি গুলে একে অপেরের গায়ে ছোড়াছুড়ি করে আনন্দ উপভোগ করে। ফাগুয়া পরবের জন্য কোনো বিশেষ গান নেই; মাঘেপরব, বাপরবের গানগুলিই গেয়ে থাকে এ উৎসবে। তবে হাড়িয়া নামক মধুর রসের স্রোত তারা সামনে টেনে চলে এ উৎসবে। তার সাথে সাথে নারী-পুরুষদের সীমাহীন যৌনাচারের সাড়া পড়ে যায় গোটা সারন্দা বনভূমিতে। এই বাধা নিষেধ হীন মিলনকে সভ্য জগৎ কুৎসিত মনে হলেও তা কিন্তু নয়। সৃষ্টির আদিকাল থেকে তারা

প্রকৃতিকে অনুসরণ করে আসছে। তারা মনে করে মানুষ মনুষ্য ধর্ম পালনের জন্য পৃথিবীতে আসেনি। তারা প্রকৃতির নিয়ম ও ধর্ম পালনের জন্য এসেছে। তাই জীবনে যে কটি দিন জীবিত আছে, সেকটি দিন প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে যেতে চায়। গোমা হোরোর কথা মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক সেকথাই বলতে চেয়েছেন—"ওরে চেকো, এখন বনের মতনই হ। তার যেমন ঘর নাই, সম্পর্ক নাই, সেই রকম, সবাই ফুলের মতন ফুটুক, নতুন পাতা ছাড়ুক, নতুন ফসলের জন্যে এই মাটির তলায় শিকড়ে শিকড়ে যে খেলা চলেছে, সেই খেলা সবাই খেলুক। যাতে বনের গর্ভ হয়, সে আমাদের যাতে অনেক ফল দেয়। কাঠ দেয়, আর আমাদের অনেক সন্তান হয়। মানুষের নিয়মটা বারো মাস চলে না। প্রকৃতির নিয়ম না পাললে মানুষ শেষ হয়ে যাবে।"[১৬]

- **করম উৎসব :** মুণ্ডা সমাজে করম উৎসব পালিত হয় শ্রাবণ-ভাদ্রমাসে। করম একটি শস্য দেবতা। কৃষি ভিত্তিক গ্রাম সমাজ ব্যবস্থায় মুণ্ডারা চাষবাসের মধ্য দিয়ে সুখ সমৃদ্ধির আশায় করম ঠাকুরের পূজা করে। ছেলেমেয়ে বা যুবক-যুবতীরা বনের মধ্যে একটি করমের গাছকে নির্বাচন করে তাকে নিবেদন জানিয়ে, সেই গাছের দুটি ডাল সিঁদুর মাখিয়ে হলদে ও লাল সুতো জড়িয়ে দেয়। তারপর একজন ডাল দুটিকে কেটে নিচের দিকে লাল কাপড় জড়িয়ে সবাই মিলে নাচগান করতে করতে গ্রামের সারনাতে নিয়ে আসে। সেই করমের ডাল দুটিকে নিয়ে নাচগান করতে থাকে।

শিক্ষা-স্বাস্থ্য :

সারন্দা বনভূমি অঞ্চলের আদিবাসীদের জীবন-জীবিকার মান যেমন অনুন্নত তেমনি এ অঞ্চলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতারও খুবই অভাব রয়েছে। গোটা সারন্দা বনভূমিতে যে কটি ব্লক রয়েছে সে কটিতে নামমাত্র সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। কিন্তু সেখানে কোনো ঔষধপত্র পাওয়া যায় না। তা ছাড়া এখানকার মানুষের অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহারের মতো কোনো মানসিকতা সাহস গড়ে ওঠেনি। তারা অসুখ-বিসুখে ডাক্তার দেখায় না। চিরাচরিত গুণিন, ওঝাদের ঝাড়ফুঁক, তুকতাকে বিশ্বাসী। বনজ লতাপাতা, শিকড়-বাকড় সহযোগে তৈরি ঔষধই তারা ব্যবহার করে। এরূপ পরিস্থিতিতে তারা নানা রোগ-অসুখে পার্যুদস্থ হয়ে সঠিক চিকিৎসা ও ওষুধপত্রের অভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়।

শিক্ষাই আনে চেতনা। শিক্ষার মূল সোপানই হল সচেতনতা। শিক্ষার অভাবে এদের সচেতনতার দুরুস্ত অভাব রয়েছে। সমগ্র সারন্দা বনভূমিতে মাত্র দু-একটি সরকারি স্কুল দেখতে পাওয়া যায় ব্লক অফিসের সামনাসামনি জায়গায়। গ্রামগঞ্জ থেকে দুর্গম পাহাড়ি রাস্তায় বনজঙ্গল ডিঙ্গিয়ে কয়েক মাইল দূরবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া যেমন দুষ্কর হয়ে ওঠে তেমনি অভিভাবকদেরও কোনো ইচ্ছা নেই। এ অঞ্চলের খ্রিষ্টান মিশনারিরা যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিল সেখানে শুধু খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারী মুণ্ডা ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার সুযোগ দেওয়া হত। ফলে বেশিরভাগ ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার কোনো

সুযোগ ছিল না। শিক্ষা-স্বাস্থ্য সম্পর্কিত মুণ্ডা জনজাতির যে চিত্র ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন, তা বর্তমান সময়ের দিক থেকে দেখলে সেই জনজাতির জীবনাচরণের কিছু পরিবর্তন ঘটলেও তাদের শিক্ষাদীক্ষা-স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে।

যাইহোক মুণ্ডা সমাজ জীবন শীর্ষক আলোচনার শেষাংশে এসে বলা যায় স্বাধীনতা পরবর্তীকালে লেখক সারন্দা বনভূমি পরিভ্রমণ করেছিলেন। আর এই 'সারন্দা' বনভূমি পরিদর্শন কালে তিনি বনভূমির বাহ্য প্রকৃতির রূপ, রং, বৈচিত্র্য দেখেই থেমে থাকেননি। বন্যপ্রকৃতির রূপ-রং-বৈচিত্র্যের পাশাপাশি তিনি এখানকার আদিবাসী মুণ্ডা সমাজ জীবনের প্রতিও গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। সেই চাক্ষুষ দর্শিত মুণ্ডা সমাজজীবনের দৈনন্দিন কর্মধারা-রীতিনীতি-বিশ্বাস-সংস্কার সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলি তিনি গভীর সহমর্মিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন 'দুই অরণ্য' উপন্যাসে। এদিক দিয়ে এ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্রের দাবিদার।

তথ্যসূত্র :

১। দত্ত ড. বীরেন্দ্র, "সমরেশ বসু : পালাবদলের কথাকার", সান্যাল ড. অরুণ (সম্পা.), প্রসঙ্গ : বাংলা উপন্যাস, ওয়েস্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০, পৃ. ৭০১।
২। বসু নিতাই (সম্পা.), কালকূট রচনা সমগ্র (সপ্তম খণ্ড), মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, কলকাতা বইমেলা ২০০৯, পৃ. ৩২৩৯।
৩। বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ (সম্পা.), সমরেশ রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ : ১৯৯৯, 'ব্যক্তির সংকট ও চ্যালেজ' অংশ দ্রষ্টব্য।
৪। চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার, সাংস্কৃতি কী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা-০৯, অখণ্ড সংস্করণ : ২০১৭, পৃ. ৫২।
৫। বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ (সম্পা.), সমরেশ রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮।
৬। তদেব।
৭। তদেব, পৃ. ২৫১।
৮। সুর ড. অতুল, ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, সাহিত্যলোক, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৯৫, পৃ. ৬০।
৯। বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ (সম্পা.), সমরেশ রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।
১০। তদেব, পৃ. ১৮৮।
১১। তদেব, পৃ. ১৮৫।
১২। তদেব, পৃ. ২৫৫।
১৩। তদেব, পৃ. ১৯৪।
১৪। তদেব, পৃ. ২৭২।
১৫। তদেব, পৃ. ২৭২।
১৬। তদেব, পৃ. ২৭৩।

উ জ্জ্ব ল শী ল

দেবেশ রায়ের বৃত্তান্তমূলক উপন্যাস : জীবনসংগ্রামের গতিপথ

বাংলা সাহিত্যে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী দেবেশ রায় (১৯৩৬-২০২০)। তাঁর শৈশব কেটেছে পাবনা জেলার বাগমারা গ্রামে। মাত্র সাত বছর বয়সেই সপরিবারে চলে আসেন উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে। স্কুল ও কলেজ জীবন অতিবাহিত হয় জলপাইগুড়ি শহরে। এরপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে জলপাইগুড়ি চলে আসেন এবং পরে আনন্দচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। বসবাস এবং কর্মস্থল — তাঁর কাছে উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পারিবেশ ও জনজীবনকে জানতে ও বুঝতে সহায়ক হয়েছিল। একদা কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী থাকার সুবাদে সমাজের সর্বস্তরের সর্ব শ্রেণির মানুষের সঙ্গে সাধারণ জীবনযাপন করেছিলেন। এই সাধারণ জীবনযাপনই তাঁকে নিয়ে গেছে বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্রে। একের পর এক সাহিত্য সৃষ্টিতে নিমগ্ন থেকেছেন। লেখনীতে উঠে এসেছে একক জীবন অভিজ্ঞতা দিয়ে গড়া বহুস্তরীয় জীবনের স্বাদ।

বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁর আবির্ভাব গল্পকার হিসেবে। ১৯৫৫ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'হাড়কাটা' গল্পটি প্রকাশের মধ্যদিয়েই সাহিত্যাঙ্গনে পা রাখেন। একজন কলেজ পড়ুয়ার লেখা এই গল্পটি পাঠক সমাজের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। পরবর্তী সময়ে লেখা অজস্র গল্প পাঠকের চাহিদা পূরণে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি সাফল্যের শিখর স্পর্শ করেছেন একজন ঔপন্যাসিক হিসেবে— তা বলার অপেক্ষা রাখে না। গল্প লেখার পাশাপাশি উপন্যাস নিয়েও ভাবতে শুরু করেন ১৯৬৯-এর পর। যদিও ১৯৬৫-তেই তিনি 'মানুষ খুন করে কেন' উপন্যাসটির প্রথম খসড়া তৈরি করেছিলেন, যা অনেক পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেয়েছিল। এর মধ্যেই তিনি 'যযাতি' উপন্যাসটি লিখে ফেলেন (১৯৭৩-এ প্রকাশিত হয়)। সেই দিক থেকে বিচার করলে 'যযাতি' লেখকের প্রথম উপন্যাস যার রচনাকাল ছিল ১৯৬৮। এরপর থেকে তাঁর উপন্যাস লেখার গতি শ্লথ হয়ে যায়নি। বাংলা সাহিত্যের পাঠক সমাজকে উপহার দিয়েছেন একের পর এক কালজয়ী উপন্যাস। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল 'যযাতি' (১৯৭৩), 'মানুষ খুন করে কেন' (১৯৭৬), 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' (১৯৮০), 'বেঁচে বর্তে থাকা' (১৯৮৪), 'সহমরণ' (১৯৮৮), 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮), 'আত্মীয় বৃত্তান্ত' (১৯৯০), 'ইতিহাসের লোকজন' (১৯৯২), 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত' (১৯৯৩), 'খরার প্রতিবেদন' (১৯৯৩), 'দাঙ্গার অ সম্পূর্ণ প্রতিবেদন' (১৯৯৪), 'একটি ইচ্ছা মৃত্যুর প্রতিবেদন' (১৯৯৫), 'শিল্পায়নের প্রতিবেদন' (১৯৯৬), 'তিস্তা পুরাণ' (২০০০), 'যুদ্ধের ভিতরে যুদ্ধ' (২০০৩), 'অতল জলের তলে' (২০০৭),

'যৌনলেখ' (২০০৯), 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল' (২০১০), 'সিনেমার মতো খুনোখুনি' (২০১৩) প্রভৃতি।

দেবেশ রায় সাহিত্য জগতে এক বিকল্প পরিসর নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন। খ্যাতি-যশ, প্রতিপত্তির তোয়াক্কা না করে জীবনকে জানার তাগিদে ছুটেছেন গভীর থেকে গভীরতর বাস্তবের দিকে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর লেখনী ধারণ করে বর্তমান সমাজের নগ্ন প্রতিচ্ছবি। তিনি মনে করেন এমন কিছু তথ্য গল্প উপন্যাসে উঠে আসা উচিত যা অপ্রিয় হলেও সত্য। সত্তরের দশকে সাহিত্য যে নতুন পথ খুঁজছে তা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বাস্তবকে কল্পনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন শুধু তাই নয়, ছাত্রজীবন থেকেই বাস্তবিক তথ্য সংগ্রহ করা অভ্যাস ছিল। ঝোঁক ছিল রাজনৈতিক প্রসঙ্গে। পরবর্তীতে তিনি কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন। কিশোর বয়সে রাজনীতির প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা হবার পর জলপাইগুড়িতে প্রথম জনসমাবেশ হয় ১৯৫০ সালে মাদ্রাসার ময়দানে—

"মাদ্রাসার ময়দানে একটা ছোট্ট লাল ঝাণ্ডা পুঁতে মাঠের ভিতর বসে আছেন অনিল মুখার্জী। মনে আছে শুধু এইটুকু যে আমি পায়ে-পায়ে রাস্তা থেকে ঐ শূন্য মাঠের ভিতর নেমে পড়েছিলাম-অনিলদা'র দিকে যাচ্ছিলাম না ঝাণ্ডার দিকে তা আজ মনে নেই,সম্ভবত তখনও তা জানতাম না।"[১]

কিন্তু পরবর্তীতে তিনি জানতে পেরেছিলেন রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত। যোগ দিয়েছিলেন সাংবাদিকতার কাজে। সাংবাদিকতা জীবন তাঁর সাহিত্যিক হয়ে ওঠার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে যায়। সাহিত্য রচনার পাশাপাশি সাংবাদিকতার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

"সাংবাদিকতার কাজ তথ্য নিয়ে,গল্প উপন্যাসের কাজও তথ্য নিয়ে। সাংবাদিকতা তথ্যের সেই ভিত্তিটা তৈরি করে দিতে পারে, যে ভিত্তির ওপর নির্ভর করে গল্প-উপন্যাসে তথ্যের একটা মানব দলিল নির্মাণ করা যায়। সাংবাদিকতা ভাষাকে নষ্ট করে না, ভাষাকে পুষ্ট করে। তথ্য নির্ভরতায় আর তথ্য বর্ণনায় ব্যবহৃত হতে হতে ভাষার একটা শক্ত ভিত তৈরি হয়ে যায়।"[২]

আর এই শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে সাহিত্য জগতে তাঁর পদচারণা। বাস্তবকে জানার আগ্রহ ক্রমাগত প্রবল হয়। আমরা পাই একের পর এক উপন্যাস। দেবেশ রায় ছেদহীন পর্ব-পর্বান্তরের সমন্বয়ে অন্তত তিনটি বৃত্তান্ত লিখেছেন—'মফস্বলি বৃত্তান্ত' (১৯৮০), 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮), 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত' (১৯৯৩)। আর আত্মীয় বৃত্তান্ত (১৯৯০); বৃত্তান্ত নামধারী হলেও এগুলি একটু ভিন্নধর্মী রচনা। এই উপন্যাসগুলিতে তিনি প্রচলিত ধারণাকে অবহেলা করে ব্যতিক্রমী চিন্তাচেতনার বহিপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। উপন্যাসগুলি নতুন ধরণ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে এক বিশিষ্ট দিক নির্দেশ করেছে। সামাজিক রাজনৈতিক

অর্থনৈতিক আঞ্চলিক প্রভৃতি দিক থেকে মানবসমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটতে পারে। আর এই পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া পাঠকসমাজের কাছে বোধগম্য করা কঠিন কাজ। আর তা তিনি করেছেন এক অনন্যভঙ্গীতে। চোখে দেখা কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিদিন ঘটে চলা সত্য ঘটনা ও তার প্রতিক্রিয়া নিপুণ দক্ষতায় উঠে এসেছে এই উপন্যাসগুলিতে। প্রথমে তিস্তাপারের বৃত্তান্ত (১৯৮৮) উপন্যাসটির কথায় আসা যাক। উপন্যাসটি শেষ হয়—

"এ-বৃত্তান্ত এখানেই শেষ হোক।

এই প্রত্যাখ্যানের রাত ধরে বাঘারু মাদারিকে নিয়ে হাঁটুক, হাঁটুক, হাঁটুক"।[৩]

"বৃত্তান্ত — যার আদি নেই, অন্ত নেই। বৃত্তান্ত কবে শুরু হয়েছে যেমন বলা যায় না, কবে শেষ হবে তাও অনিশ্চিত দেবেশের উপন্যাসেও সেই চলমানতার রূপই ক্রমশ শিল্পের মাহাত্ম্য অর্জন করেছে। যেখানে জমি বাড়তে থাকে, চেনা-অচেনা অসংখ্য চরিত্র যাওয়া-আসা করে, দেশ ও কাল নির্ভর প্রসঙ্গের অভ্যন্তরে আসে নতুন নতুন রহস্য, প্রতিনিয়ত বিচ্ছিন্নতা ও সংলগ্নতা ঘটতে থাকে পরস্পরের মধ্যে-এই নিয়েই তাঁর মহাকাব্য, এই নিয়েই তাঁর বৃত্তান্ত।"[৪]

অর্থাৎ বাঘারুর জীবনপথে চলার শেষ নেই। এই প্রত্যাখ্যানের রাতের জীবনাভিজ্ঞতা বাঘারুকে নিরুদ্দেশের পথে নিয়ে গেল। কিন্তু কেন? আমাদের পরবর্তী কাহিনি জানার আগ্রহ শেষ হয় না। কারণ তিস্তাপারের বৃত্তান্ত আমাদের মোহিত ও বেদনাহত করে তোলে। তিস্তাপারের বনজঙ্গল ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রা, তাদের প্রতি শোষণ, রাজনৈতিক প্রভাব সবমিলিয়ে এক অকল্পনীয় বাস্তববোধ পাঠকসমাজের কাছে চিরকাল অধরা ছিল। যে প্রান্তিক মানুষরা প্রতিটি মুহূর্তে কঠোর জীবনসংগ্রামে লিপ্ত, যাদের অস্তিত্ব বিপন্ন ইতিহাসে তাদের খোঁজ পাওয়া যাবে না। তাই লেখক একান্ত আপন মনোভাবে, আত্মিক ভালোবাসায় তিস্তাপারের বৃত্তান্ত-টিকে সেই সমস্ত মানুষের প্রতি উৎসর্গ করেছেন যারা কোনোদিন এই বৃত্তান্তটি পড়বে না। উৎসর্গ অংশে লেখকের ভাষায়—

"এই বৃত্তান্ত তারা কোনোদিনই পড়বে না, কিন্তু তিস্তাপারে জীবনের পর জীবন বাঁচবে।"[৫]

অর্থাৎ মানবজীবন কোনো এক নির্দিষ্ট জায়গায় থেমে থাকবে না। জীবনের আদর্শ, নীতি-নৈতিকতা, লোভ, স্বার্থপরতা, সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে যে যেমনভাবে জীবনে চলতে চায় সেভাবেই পা বাড়াবে। কিন্তু একজন মানবতাবাদী শিল্পীর জীবনকে জানার ও চিনিয়ে দেওয়ার একটা দায়বদ্ধতা থাকে। এই দায়বদ্ধতার ফসল বলতে পারি "তিস্তাপারের বৃত্তান্ত" (১৯৮৮)। উপন্যাসটি ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসে প্রাকাশিত হয় এবং ১৯৯০ সালে সাহিত্য অকাদেমী পুরষ্কার প্রাপ্ত হয়। উপন্যাসটিতে আদিপর্ব, বনপর্ব, চরপর্ব বৃক্ষপর্ব, মিছিলপর্ব, অন্ত্যপব—এই ছয়টি পর্ব ও পরিশিষ্ট নিয়ে বৃহৎ আকারে রচিত। উপন্যাসটিতে

রয়েছে সমকালীন জীবন, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আবর্তন যা একইসঙ্গে সাময়িক উত্তরিত বা সর্বকালীন জীবন-বিধৃত। উপন্যাসের শুরু উত্তরবঙ্গে আপলচাঁদ ফরেস্টের কাছাকাছি এক অতি নির্দিষ্ট স্থানে। এর প্রস্তুতিপর্বের স্মৃতিচারণ:

"তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'- সূচনাকাল সম্ভবত ১৯৬৩-৬৫ সাল, সে সময় দেবেশদা পার্টির কাজের দায়িত্ব নিয়ে প্রায় সর্বক্ষণের কর্মীর মতোই তিস্তাপারের উভয় তীরের ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করে বসবাসকারী সাধারণ কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষদের ভেতরে প্রবেশ করে তাঁদের জীবনযুদ্ধের প্রাত্যহিক ঘটনাগুলি তাঁর মানসপটে চিত্রায়িত করতে থাকেন। তারই ফলশ্রুতি তাঁর মহাকাব্যোপম উপন্যাস 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'। তিস্তাপারের সমাজ-সংস্কৃতির এমন বাস্তব চিত্র দুর্লভ।"[৬]

এর থেকে বৃত্তান্তটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা হয়ে যায়। তবে আপাতদৃষ্টিতে প্রতিটি পর্বের কাহিনিগুলি বিচ্ছিন্ন মনে হলেও শেষে তা আর বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয় না। তিস্তার জলের মতোই এক ছন্দবদ্ধ সুরে ধ্বনিত। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত-এ তিস্তা ও তিস্তাপারের প্রকৃতির সাথে তথা সেখানকার গাছগাছালি গরু-মহিষ,অনেক পশু-পাখি আর তিস্তার জল এই নিয়েই বাঘারুর জীবন। তিস্তার উপরে যে আকাশ তা বাঘারুর বাড়ির সুরক্ষিত ছাদ, আর তিস্তার জল তার ঘুমোনর বিছানা। এইগুলো থেকে সে কখনও পৃথক হতে চায় না, পৃথক হতে পারবেও না। তিস্তার পাশে দাঁড়িয়ে চারদিকে যা দেখতে পায় সেগুলোই যেন তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। গয়ানাথের মতো সুবিধাভোগী মানুষ তার জমিজমা যা ছিল নিয়ে নিয়েছে। নেংটি পরা সুঠাম দেহের বাঘারু কোনো এক অমোঘ আকর্ষণে তিস্তানদী নদী তীরবর্তী প্রকৃতি ও জীবজন্তু তাদের সাথে আত্মিক সম্পর্কে বাঁধা পরে। এরাই যেন তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সে বেশি কথা বলতে জানে না। কিন্তু যান্ত্রিকসভ্যতা আর অরণ্যকেন্দ্রিক সভ্যতার মধ্যে একটা বৈপরীত্য সম্পর্ক আছে। তিস্তায় ব্যারেজ তৈরির কাজ চলছে। এর ফলে সমাজের উন্নতি হবে, দেশের উন্নতি হবে। বাঘারুর মতো অশিক্ষিত বর্বর নদীপ্রেমী বন-জঙ্গলপ্রেমী পশু-পাখিপ্রেমী মানুষের অধিকার বা সামর্থ্য আছে বাঁধা দেওয়ার! কিন্তু ব্যারেজ হলে মানবজাতির উন্নতি হবে। পরিশিষ্ট অংশে লেখক তার আভাস দিয়েছেন—

"তিস্তা ব্যারেজের ফলে তিস্তার সঙ্গে গয়ানাথের সহবাসের রীতিনীতি সবচেয়ে বেশি বদলে যাবে। সে পুরনো মামলাগুলির কিছু জিতবে,কিছু হারবে। নতুন মামলাও কিছু করতে পারে। কিন্তু সে-ই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি অভ্রান্ত বুঝে যাবে ব্যারেজের অর্থ কী? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে ভাগের মামলায় সে জিতলেও পাবে এক চিলতে জমি আর কয়েকটা শালগাছ। আর তিস্তা ব্যারেজের ফলে সে পাবে এক জমিতে তিন ফসল গয়ানাথ পাওয়ার-টিলার কিনে ভাড়া খাটাবে। গয়ানাথের গাই-বলদ কমে আসবে, জমিও হয়তো একটু কমে আসবে,বাঘারুও কমে আসবেকিন্তু ফলন বাড়বে, বিক্রি বাড়বে, লাভ বাড়বে। ব্যারেজের ফলে তিস্তাপারের ফরেস্ট বদলে যাবে, আপলচাঁদ বদলে যাবে।"[৭]

উন্নতির আগমনী হাওয়ায় ব্যারেজ তৈরিতে বাধা-দান কে করবে? এতে কারোর ক্ষতি নেই। কিন্তু অন্যদিকের ক্ষতির হিসাব কে রাখবে! অরণ্যে শাল সেগুন অর্জুন সব উচ্ছেদ হবে। অরণ্যের পশুরা কিছু স্থান বদলাবে। কিন্তু মুনাফা হবে সুবিধাভোগী,স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষের ও শাসকগোষ্ঠীর। আর সেই মুনাফা লাভের আয়োজন যেন তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের। সেই অনুষ্ঠানে বাঘারু যায় ঠিকই কিন্তু সেখানে সে ব্রাত্য, প্রত্যাখ্যাত। কেননা তার কোনো গ্রুপ নেই, দল নেই, নেই কোনো সংগঠন। তার স্নেহের নদী-অরণ্যে, তার জন্মস্থানে সভ্যতার অগ্রগতির সোপান ব্যারেজ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সে যেন বহিরাগত। বাঘারু শুধু একা নয়, মাদারি, মাদারির মা-দের মতো যারা। তারা যেন বহিরাগত এক একটি খড়কুটো। এই অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ব্যারেজের জয়জয়কার ঘোষিত হবে,ব্যারেজের ঐশ্বর্য্য দেখবে আধুনিক সভ্যতা।

আপলচাঁদ ফরেস্টে বসবাসকারী প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছে বাঘারু। এরা সহজ-সরল মনের অধিকারী। জন্মের পর থেকে সে জেনে এসেছে সে একজন মানুষ। এছাড়া আর কোনো তার পরিচয় নেই। জীবনযাপনের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় প্রকৃতিকেন্দ্রিক যাবতীয় কাজ সে জানে। মিছিলে ঝাণ্ডা ধরতে পারে কিন্ত তার অর্থ সে বোঝে না। সহজ সরল মৌন স্বভাবের মানুষটি প্রকৃতির শান্ত পরিবেশেও বেদনাহত হতে থাকে। বাঘারু কি পারবে নদীর কৃত্রিম পরিবর্তনের ধারাকে মেনে নিতে? যে নদীর জল উন্মুক্ত পান করতো, সেই জলের এখন হিসাব হবে। জমির মূল্য বৃদ্ধি পাবে, অধিক পারিমাণে চাষ করা যাবে। কিন্তু এতে তিস্তার বাসিন্দাদের অধিকার থাকবে না। এই অপ্রিয় বাস্তবগুলো তিস্তাপারের বাসিন্দারা বুঝতে পারেনি। বুঝতে দেওয়াও হয়নি। বাহ্যিক চাকচিক্যে তাদের মন ভুলিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু বাঘারুর প্রবল বাস্তবতাবোধে সচেতন ব্যক্তিসত্ত্বা মন মাতানো বক্তব্যের আড়ালে অদূর ভবিষ্যতে লুকিয়ে থাকা কঠিন সত্যকে দেখতে পেয়েছিল। সে জানে উন্নয়নের পিছনে লুকিয়ে আছে স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষের মুনাফা। যেখানে নিজের উন্নয়ন নেই, সেখানে দেশের উন্নয়নের কোনো অর্থই সে বোঝে না। এই বৃত্তান্তে শোষণের ভয়াভয় রূপ দেখতে পাওয়া যায়। যে শোষণ কখনো কৃষকগোষ্ঠী কখনো বা মজুরগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে। আবার কখনো সর্বহারা বাঘারুদের কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়। রাধাবল্লভের কথায়—

“কথাটা হচ্ছে আমাদের এই মাল-লাটাগুড়ি-ক্রান্তি অঞ্চলে বহু কুখ্যাত জোতদার আছে। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য কৃষকদের শোষণ করা। কিন্তু কথাটা হচ্ছে কেন? ধরেন, আনন্দপুর চা-বাগানের জোতের জমিও আছে, চায়ের জমিও আছে। কিন্তু এই মালিকলোক চায়ের জমিতে ধান চাষ করেন আর ধানের জমিতে চা চাষ করেন। এই মালিকলোক চা-বাগানের মজুরদের দিয়ে ধান চাষ করান আর জমির আধিয়াদের দিয়ে চা-বাগানের কাজ করান। কিন্তু এই কৃষকরা মজুরদের মতন মাহিনা পায় না। ঠিকা মজুরি পায়। কোম্পানির সব দিকেই লাভ জোতদারিতেও লাভ, ডিরেক্টিতেও লাভ। আর মজুর-কিষানের সব

কিছুতেই ক্ষতিমজদুরিতেও ক্ষতি, হালুয়াগিরিতেও ক্ষতি'।"[৮]

সুতরাং বাঘারু, মাদারি, মাদারির মা, হৃষীকেশ ও অন্যান্যরা প্রত্যেকেই বিভিন্নভাবে শোষিত। কখনও জমিহারা কখনও বাস্তুহারা, কখনও ধর্ষিত হয়ে, কখনও অনাহারে কখনও বন্যার জলে ভেসে শোষিত হতে দেখা যায় তাদের। তবুও তাদের জীবন ভেসে চলেছে তিস্তার মতোই। তারা জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে না। তাই ইণ্ডিয়া— বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বিধ্বস্ত বাঘারু জানায় সে কারো নয়, তার বাড়ি নেই, তার লোকজন নেই, তার কোনো মানুষ নেই। তাই ব্যারেজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাঘারু কোনভাবেই পৌঁছাতে পারে না। অগণিত লোকের ভিড়ে ক্রমাগত পিছিয়ে পরে। ফ্লাড-লাইটগুলি তার আপাদমস্তক নগ্ন শরীরের পেছনের ওপর। তার কোনো ঝাণ্ডা নেই, কোনো দল নেই,কোনো মানুষ নেই। পুলিশের সঙ্গে বাঘারুর কথোপকথন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ :

"যাও, যাও, এখন ওখানে যাওয়া নিষেধ। মিছিল হারাইছ বুঝি-ই?

'না। মোর কুনো মিছিল নাই।"

"মিছিল নাই ত বানাও গিয়া। যাও যাও,এখন এখানে ঢোকা নিষেধ।"[৯]

বাঘারুর কোনো মিছিল না থাকায় আবছায়া অন্ধকারে তাকে পিছিয়ে যেতে হল। সে মিছিল বানাতে না পারলেও মাদারির হাত ধরে, মাদারির অজানা কৌতূহল মনের সাথে বোঝাপড়া করে রাতের অন্ধকারে পাড়ি দিয়েছে। কোথায়? আমরা জানি না। তবে তিস্তার জলধারার মতো তারাও চলতে থাকবে একথা ঠিক।

'মফস্বলি বৃত্তান্ত' (১৯৮০) শোষণ-শাসনের আর এক চিত্র দেখিয়ে দেয়। স্বাধীন ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের পতনের সাথে সাথে জমিদারশ্রেণি, মালিকশ্রেণি—কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ শাসনের নতুন মায়াজাল তৈরি করে। স্বাধীন ভারতে কৃষিব্যবস্থায় নিয়ম-নীতি পাল্‌টে যায়। কৃষক শ্রমিকের স্বার্থে নিয়মে যে পরিবর্তন তা সাধারণ জনগণ কতটা সুবিধা পেয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কেননা নয়া সামন্তশ্রেণির প্রতিনিধি ও কিছু স্বার্থান্বেষী দালালের উদ্ভব ঘটেছে। এরাই নানাভাবে চ্যারকেটু খেতখেতু টুলটুলির মতো সাধারণ গ্রাম্য নিরীহ মানুষদের শোষণ করেছে। সারাবছর ভাত খেয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন অনেক চাষী দেখতে পায়নি। এই বৃত্তান্তটি আদ্যোপান্ত শোষিত মানুষের নিয়ে রচিত। খেতখেতুর জীবন সংগ্রাম বৃত্তান্তটিকে অনন্য মাত্রা দান করেছে। দীর্ঘদিনের অনাহারক্লিষ্ট খেতখেতুর আলসার হয়। তিনদিনের উপবাসি রুগ্ন শরীর নিয়ে তাকে খাবারের খোঁজে বেরোতে হয়। ডাক্তারের কথায় সে যদি উপযুক্ত খাবার না খায় তা হলে রক্তবমি হয়ে মারা যেতে পারে। "মৃত্যুর আশঙ্কা ও পেটের ক্ষুধাকে সঙ্গী করে রমণী পঞ্চায়েতের বাড়ি গেলেও তাকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়। কেননা প্রাণ বাঁচানোর থেকে তার আত্মসম্মানবোধ তার প্রবল হয়ে উঠেছিল বলেই ফ্রি-রেশনের পুরচি আদায় করতে পারেনি। রমণী পঞ্চায়েত তাকে এমন যুক্তির দিয়ে ফাঁসিয়েছে যে সে আত্মসম্মান বিক্রি করতে চায়নি। সে কেবল নিজের বাস্তব অবস্থাটুকু

সবার সামনে তুলে ধরেছে। যেন নিজের অজান্তে সে নীরব লড়াই ঘোষণা করে দিয়েছে। রাজনৈতিক প্যাঁচকে সে অস্বীকার করে সাধারণ মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু সাধারণ মানুষের পরিচয়পত্রও তার কাছে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। কেন তার মুখের গ্রাস এইভাবে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে সে বুঝতে পারে না। রমণী পঞ্চায়েতের কথায় খেতখেতু অদূর ভবিষ্যতে—মৃত্যু ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না খেতখেতু জমি ছাড়ি যাবার নাগিবে। আর জমি ছাড়িলে বাড়ি ছাড়িবার নাগিবেই নাগিবেই। আর বাড়ি ছাড়লে ত টাড়ি ছাড়িবার নাগিবেই নাগিবে। আর টাড়ি ছাড়িলে ত গ্রাম ছাড়িবার নাগিবেই নাগিবেই। আর গ্রাম ছাড়িলে ত অঞ্চল ছাড়িবার নাগিবেই নাগিবে। আর অঞ্চল ছাড়িলে ত এই ভুবনই ছাড়ি যাবার নাগে।"[১০]

অন্যদিকে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী চ্যারকেটুর জীবনে কোনো কুটিলতা নেই, কোনো রাজনীতি নেই, আছে কেবল ভোখ। স্বাধীন দেশ উন্নয়নের পথে, জনগণের স্বার্থে কত আইন প্রণয়ন। ভারত রঙিন বিজ্ঞাপনের যুগে দাঁড়িয়ে। জনগণ তার মোহে আপ্লুত হয়। কিন্তু চ্যারকেটু বিজ্ঞাপনগুলি সংগ্রহ করে কেবল নিজের প্রায় ভঙ্গুর গৃহখানির অবশিষ্টাংশ রক্ষা করার জন্য। বিজ্ঞাপনগুলির ভেতরের অর্থ তার কাছে মূল্যহীন। চ্যারকেটু কিছুটা সচেতন, তার আত্মসম্মানবোধ আছে ক্ষুধা আছে আর অতিরিক্ত জিনিস আছে কল্পনার জাগরণ। সে কল্পনায় ধানক্ষেতে প্রবেশ করে ভাবে ভাত আর চাঁদ একই জিনিস। তার কাছে চাঁদের মতো দুর্লভ ভাত। সে সহজ সরল খেটে খাওয়া গ্রাম্য মানব সমাজের প্রতিনিধি। রাজনৈতিক প্যাঁচের নানা কৌশল তার আয়ত্তাধীন, শেখার লোভও নেই তার। ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে তার একমাত্র পরম আদরের সঙ্গী গরুটিকে বিক্রি করতে যায়। এছাড়া তার কোনো উপায় নেই। গৌরিহাটে পৌছানোর পথে গরুসহ তাকে প্রায় জোর করেই তুলে নিয়ে যায় আন্দোলনকারীরা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে। অনাহারক্লিষ্ট চ্যারকেটু কি করে হাটে যাবে! দম বন্ধ হয়ে আসে তার। সে কাতরকণ্ঠে মালিকশ্রেণির কাছে প্রার্থনা জানায়—

"হে এ বাবু, মোক ছাড়ি দ্যান হে এ বাবু
হে এ বাবু ছাড়ি দ্যান, মোক গৌরীহাট থাকা নাগিবে।"[১১]

তার কাতর প্রার্থনা মালিকশ্রেণির কর্ণগোচর হয়নি। মিছিলের সাথে তাকে জোর করেই নিয়ে যায়। চ্যারকেটু চলে, চ্যারকেটুর গোরুও চলে, মিছিলও চলে, ক্ষুধাও চলে। খেতখেতু চ্যারকেটু টুলটুলি বৈশাখু বেঙ্গু এদের কাহিনি চিরকাল প্রবহমান ধারায় এমনি করেই চলতে থাকে।

'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত' (১৯৯৩)- এ লেখক আটটি খণ্ডে পৃথক পৃথক আখ্যানকে কোনো বিধিবদ্ধ নিয়মে গ্রথিত করেননি। তবে একটা যোগসূত্র তো অবশ্যই আছে। আখ্যানের প্রথম খণ্ড থেকে অষ্টম খণ্ড পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত রূপরেখা—ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবান্বিত

আধুনিকতার ছাপ, তারপর আধুনিকতার পিছনে লুকিয়ে থাকা সাধারণ মানুষের আত্মবলিদান। প্রবর্তিত শাসনব্যাবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতেও এক নিবিড় শান্ত পরিবেশে মানুষ নিজের অস্তিত্ব খোঁজার তাগিদ অনুভব করেছিল। শেষ খণ্ডে দেখা যায় অস্তিত্বের সঠিক জায়গা নির্মাণে মানুষ ব্যর্থ। লেখক কিন্তু বাস্তবে ঘটে যাওয়া ঘটনার উপর সময় অসময়ের বৃত্তান্ত রচনা করেছেন। এই বৃত্তান্ত শুধু আমাদের কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করাননি, সেই সঙ্গে নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতা যে মৃত্যুর চেয়ে ভয়ানক তা দেখিয়েছেন। বাস্তবে ঘটে যাওয়া পাড়াড়িয়া গ্রামের ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। পুনাসি বাজার ও আনোপীহরণ পর্ব প্রেম ভালোবাসার উত্তেজনার মোড়কে গড়া। সেখানে রক্ষই ভক্ষকের ভুমিকা পালন করেছে। পুনাসি বাঁধের কাজ শুরু হয়েছে। তার জন্য যে জায়গা প্রয়োজন তা সরকারি অধীনস্থ। কিন্তু কিছু মানুষ সেখানে দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। এদের হিসেব সরকারি খাতায় নেই। এবার তাদের উচ্ছেদের পালা। উচ্ছেদের কাজে যারা বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাদের সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে এই হল সরকারি নীতি। আনোপী উদ্ধারের নামে চলে অরাজকতা, অমানবিক অত্যাচার। নারী ধর্ষণ, ঘরবাড়ি ভেঙ্গে ফেলা। এককথায় পাড়াড়িয়া গ্রাম উজার করে দেওয়া। নারীকে নারী হিসেবে চিহ্নিত করে ধর্ষণের মাধ্যমে। তৎকালীন প্রশাসন বাঁধ নির্মাণ কাজের সুযোগে আপন পৌরষত্ব জাহির করেছিল। ফলে ধংস হয় পাড়াড়িয়া, লুণ্ঠিত হয় নারীর আত্মমর্যাদা। লেখকের ভাষায় তার প্রমাণ মেলে

"মাত্র তো পঁচিশটি মেয়ে। পুলিশ কত ছিল তা পাকাপাকি জানা যায়নিপঞ্চাশ বা পঞ্চাশের ওপর কত। শাশুড়ি বউ, মা-মেয়ে তারা নিজেদের শুধু মেয়ে মানুষ বলে চিনে ফেলেছিল এক একটা অমোঘ মূহুর্তে। তাদের সারা শরীরে শুধু একটিমাত্র অঙ্গযা তাদের মেয়ে বলে চিহ্নিত করে। নদীকে ঘাড় ধরে মানুষের তৈরি খাতে নিয়ে আসছিল আধুনিক প্রযুক্তির যে বাঁধ,তার ঢালে একটি আইনত উঠে যাওয়া গ্রাম আর সভ্যতার আইন সঙ্গত হাজার বছরের ইতিহাস একই সঙ্গে লোপাট হয়ে যাচ্ছিল।"[১২]

নারীত্বের অবমাননার শিকার হয়ে দিনের আলোতেও নারীরা অন্ধকার ঘরের কোণ বেছে নেয়। এই নারীরা পাড়াড়িয়া গ্রামের বলে নিজেদের পারিচয় দিল না। কারণ সে যে ধর্ষিত হয়েছিল এটাই তাহলে প্রকাশ পাবে। কেবল পাঁচটি মেয়ে মামলা করেছিল। তারা চিৎকার করে ঘোষণা করতে পেরেছিল আমরা ধর্ষিত। কোর্টেও তাদের এমন কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, সেটাও একপ্রকার ধর্ষণ। এরা সুবিচার পাবে না অবস্থার প্রেক্ষিতে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু লুপ্ত পাড়াড়িয়ার প্রতিবাদী মুখ হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে থাকল। কেলু প্রেমময়ী রাধিয়ার অবমানানা, পাড়াড়িয়ার নারীদের অবমাননা মেনে নিতে পারেননি। পাড়াড়িয়া গ্রাম উজার হয়ে যায়। অকস্মাৎ সচেতন হয়ে কেলু পাড়াড়িয়ার ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দীর্ঘ অনির্দেশ যাত্রাপথে বের হয়। নকশালবাদী বিশ্বনাথ দেখে মানুষকে খাদ্য, ওষুধের অভাবে হাড়হীন পাঁজর নিয়ে হাসপাতালের রোগীদের সাথে।

সুতরাং সে সংকল্প করে তাকেও রাস্তায় নামতে হবে। অন্তরের জ্বালার বিস্ফোরণ ঘটাতে রাষ্ট্রের বিপক্ষে দাঁড়ায় বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের বিদ্রোহী চেতনার প্রকাশ।

"তিনি সংবিধান মানেন না। তিনি এই গণতন্ত্র মানেন না। তিনি এই নির্বাচন মানেন না। তিনি এই আইনসভা বিচারব্যবস্থা মানেন না। তিনি এই ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চান। নিজে ধ্বংস হয়ে গেলেও, এই ব্যবস্থার ধ্বংস তাঁর এক ও একমাত্র কর্মসূচি।"[১৩]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্র বিচারব্যবস্থা প্রশাসন সাধারণ মানুষের জীনযাত্রা সুনিশ্চিত করতে এগিয়ে আসেনি। বরঞ্চ তাদের জীবনকে ঠেলে দিয়েছে অনিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। কিন্তু তবুও অবহেলিত অত্যাচারিত মানুষ আমৃত্যু প্রতিবাদী হয়ে থেকে গেছে।

'আত্মীয় বৃত্তান্ত' (১৯৯০) উপরিউক্ত তিনটি বৃত্তান্ত থেকে আলাদা ভিন্নধর্মী রচনা। সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন ও তা থেকে উত্তরণের চেষ্টা উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। মানবজীবনে সামাজিক সম্পর্কের জটিলতা আধুনিক সভ্যসমাজের প্রত্যেকেই সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। বৃত্তান্তে শশাঙ্ক ও সুমিতা এবং শেখর ও অবন্তীর সম্পর্ককে কেন্দ্র করে সামাজিক সম্পর্কের জটিলতা সৃষ্টি হয়। শশাঙ্ক সুমিতাকে বিয়ে করে সুমিতার ফ্লাটে বসবাস করতে থাকে। শেখরের মা সুমিতা এমনকি সকলেই জানে অতীতের স্মৃতি তাদের কোনো কিছুর বিনিময়ে মুক্তি দেবে না। কিন্তু জীবনকে থেমে থাকলে চলবে না তাকে নতুন গতিপথে চালিত করতে হবে। শশাঙ্ক-সুমিতার প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন সহকর্মী তীব্র সমালোচনার গুঞ্জনে চারদিক মুখরিত করে তোলে। সুমিতার ফ্লাটে থাকা শশাঙ্ক যেন পুরুষ জাতির তীব্র অপমান। শশাঙ্ক-সুমিতা সম্পর্ক শেখর মেনে নিলেও সামাজিক পারিবেশে নানা কটূক্তি অজান্তে শেখরের মনে খারাপ লাগার জন্ম দেয়। শেখর ও অবন্তী সামাজিক সম্পর্কে ভাইবোন। কিন্তু শিশুবেলা থেকে তারা সেই সম্পর্ক পায়নি। আজ দীর্ঘদিন পরে যৌবনাগম দু'জন ছেলেমেয়ে স্বাভাবিক সম্পর্কে পথ চলছে। বাহ্যিক দিক থেকে সামাজের চোখে তাদের মেলামেশা সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু তারা পবিত্র সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। তারা সামাজিক বাধা নিষেধকে খুব একটা তোয়াক্কা করেনি। শেখর ও অবন্তীর সম্পর্কে ফাটল ধরানোর চেষ্টা প্রচলিত সমাজ অনেকবার নানাভাবে করেছে। কিন্তু হৃদয়ের টান যেখানে তীব্র সেখানে সামাজিক বাধা-নিষেধ কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। এরা সকলেই নিজেদের সম্পর্কের মধ্যে বাইরের বাইরের কদর্যতার স্পর্শ অনুভব না করে আগামীদিনগুলি আপন ছন্দে চলতে থাকে।

আলোচ্য দেবেশ রায়-এর চারটি বৃত্তান্ত-ই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য গুণে বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। ঐতিহাসিক সামাজিক রাজনৈতিক প্রভৃতি দিক থেকে মানুষের জীবনধারা সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের সমৃদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং তা রূপায়ণে বৃত্তান্তগুলি সাহিত্যকথায় বর্ণাভ। কোথাও নীরব প্রতিবাদ কোথাও সোচ্চার প্রতিবাদের মধ্যদিয়ে লেখক সাহিত্যজগতে

তৎকালীন সময়ের সাধারণ মানুষের জীবনের গতিপথ নির্দেশের এক দলিল হিসেবে বৃত্তান্তগুলি রেখে দিলেন।

তথ্যসূত্র :

১। রায় দেবেশ — গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশঃ শ্রাবণ ১৩৯৯, আগস্ট ১৯৯২, ভূমিকা,পৃষ্ঠা- ৫

২। রায় দেবেশ — গল্পসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড,দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩,জানুয়ারি ১৯৯৫, ভূমিকা,পৃষ্ঠা-৫

৩। রায় দেবেশ — তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, ষোড়শ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৩ পৃষ্ঠা- ৫০৪

৪। সেন অরুণ — দেবেশ রায়ের বৃত্তান্ত, কঙ্ক, দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা, স্বপন পাণ্ডা ও উৎপল সাহা সম্পাদিত (ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৪২১), পৃষ্ঠা- ১৮৪

৫। রায় দেবেশ — তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, ষোড়শ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৩ পৃষ্ঠা- ৫

৬। মজুমদার বিমলেন্দু — আমার শিক্ষক,অধ্যাপক দেবেশ রায়, কঙ্ক, দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা, স্বপন পাণ্ডা ও উৎপল সাহা সম্পাদিত (ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৪২১), পৃষ্ঠা- ৩৭

৭। রায় দেবেশ — তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, ষোড়শ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৩ পৃষ্ঠা- ৪৯৬

৮। তদেব - পৃষ্ঠা- ৭১

৯। তদেব - পৃষ্ঠা- ৫০০

১০। রায় দেবেশ — মফস্বলি বৃত্তান্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৮০, পৃষ্ঠা- ১২৭

১১। তদেব - পৃষ্ঠা- ১৭৯

১২। রায় দেবেশ — সময় অসময়ের বৃত্তান্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৮০, পৃষ্ঠা- ১৬৮

১৩। তদেব — পৃষ্ঠা- ৫৮২

মৌ সু মী র ক্ষি ত

'জলের মিনার জাগাও' : জেগে রয়েছেন ব্যক্তি দেবেশ রায়

১৯৪৭ সালের দেশভাগ আরও বহু কিছুর মতো বাঙালির সাহিত্যকেও দ্বিখণ্ডিত করেছিল। বাঙালির ইতিহাস নতুন পথে বাঁক নেওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্যের ভার যাঁরা হাতে তুলে নিয়েছিলেন দেবেশ রায় ছিলেন সেই নবীনদের দলে। নবীনদের মধ্যে তিনি ছিলেন বটে, তবে ঠিক দলের ছিলেন না - না ভাবনায়, না লেখায়, না সাহিত্যে, তার অনুসন্ধানে। ক্রমশ পাকা হয়ে ওঠা কথাসাহিত্যের রাজপথ ছেড়ে আস্তে আস্তে তিনি সরে আসেন নিজের গড়ে তোলা এক আলপথে এবং বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন। পাঁচের দশকের মাঝামাঝি কলেজে ছাত্রাবস্থায় রাজনীতির পাশাপাশি দেবেশ লেখা শুরু করেন। ১৯৫৫-তে 'দেশ' পত্রিকায় 'হাড়কাটা' গল্প প্রকাশের পর থেকে পাকাপাকিভাবে লেখক হয়ে যান। ১৯৯০ সালে 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি, আর ভারতীয় ভাষা পরিষদের 'ভুয়ালকা' পুরস্কার। তাঁর এই 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত' ভারতের প্রধান ভাষাগুলিতে অনূদিত। এই উপন্যাসটি আঞ্চলিক ও বিশেষ জনগোষ্ঠীর সম্পর্কিত উপন্যাস রূপে হয়তো তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' অথবা বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'-র সঙ্গে তুলনীয়। তাঁর 'স্বামী স্ত্রী' নামক উপন্যাসে লক্ষণীয় এক সুখী মধ্যবিত্ত পরিবারে অস্থির সময়ের প্রভাব। 'যযাতি' উপন্যাসের বিষয় নামেই প্রকাশ। অন্যদিকে ছোটগল্পে একইভাবে দেখা যায় বিষয় বৈচিত্র্য আর রচনার মুন্সিয়ানা।

এই বিকল্প ধারার লেখক দেবেশ রায়ের জন্ম পাবনা জেলার বাগমারা গ্রামে, ১৭ ই ডিসেম্বর ১৯৩৬ সালে। তাঁর শৈশবের কয়েকটি বছর কাটে উত্তাল যমুনার পারে। পিতা ক্ষিতীশ চন্দ্র এবং মাতা অপর্ণা রায়ের তৃতীয় সন্তান তিনি। ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে মুসলিম লিগের অতি সক্রিয়তায় বাংলাদেশে হিন্দুদের জীবনে কালো দিন নেমে আসে। দেশভাগের উত্তাল মুহূর্তে দেবেশ রায় ও তার পরিবার পাবনা থেকে জলপাইগুড়ি শহরে চলে এসেছিলেন। জলপাইগুড়িতে তার বড় হয়ে ওঠা এবং সেখানকার স্কুল কলেজেই তার পড়াশুনা। ১৯৫৮ সালের স্নাতকোত্তর পাশ করার পর জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। সাহিত্য সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে তিনি বড় হয়েছেন। পিতামহ উমেশচন্দ্র রায় ছিলেন আধুনিক মনস্ক, শিক্ষানুরাগী মানুষ। দাদা দীনেশ চন্দ্র রায় ছিলেন বাংলা সাহিত্যের এক খ্যাতনামা লেখক এবং রাজনৈতিক সচেতন মানুষ। দাদার অনুপ্রেরণাতেই তিনি কমিউনিস্ট দলে যোগদান করেন। রাজনীতি মানে দেবেশ রায়ের কাছে কোন একটি বিশেষ দলের মুখপাত্র হয়ে থাকা নয়। বরং এক বিপন্নতা থেকে মানুষের হার না মানা সত্তাকে নবচেতনার আলোকে তুলে ধরা। তাঁর কাছে রাজনীতি সমাজ ও মানুষকে স্বপ্নের ভিতর দিয়ে হাঁটতে শেখায়। তাঁর কথায় "রাজনীতি

মানে তো আমাদের এই দৈনন্দিন এর ভিতর এক স্বপ্নের সঞ্চার, তারপর সেই স্বপ্নকেই দৈনন্দিন করে তোলার ইচ্ছা আর কাজ ... স্বপ্নেরও তো রাজনীতি থাকে। কিন্তু যদি কেউ স্বপ্নসঞ্চার ঘটাতে না পারে, তাহলে তো আর তার ইচ্ছের সেই জোর তৈরি নাও হতে পারে। ইচ্ছেরও তো রাজনীতি থাকে। আর যদি ইচ্ছে তৈরি হয়, বা না হয়, তা হলে কর্মের ব্রত সকলে নাও নিতে পারে। স্বপ্ন থেকে কর্ম পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ার যে কোন একটি অংশই রাজনীতি।"[১] ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন। রাজনীতির সূত্রে শিখেছিলেন রাজবংশী ভাষা। তাঁর কর্ম এবং জীবনের অনুপ্রেরণার উৎস ছিল এই উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের তিস্তা নদী কেন্দ্রিক রাজবংশী সম্প্রদায়। তাঁর লেখায় বারবার উঠে এসেছে উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি, মানুষ। নিম্নবিত্ত মানুষদের জীবনযাত্রার ছবি তাঁর লেখনীতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। পাঠকের কাছে তাঁর লেখা এতটা কাছের হয়ে উঠেছিল তাঁর মানুষের সাথে একাত্মবোধের কারণেই। এই দেবেশ রায় একজন বড় 'কথোয়াল' ছিলেন। যদিও এই 'কথোয়াল' শব্দটি তাঁর নিজেরই দেওয়া। আমাদের দেশজ পুরাণ মঙ্গলকাব্য মহাকাব্যের মতো বড়মাপের ক্যানভাসে তিনি ধরতে চান তাঁর আখ্যান। দেবেশ রায়ের লেখা জুড়ে কেবল অন্তহীন মানুষ। পটভূমি জুড়ে দৃশ্যের পর দৃশ্য। তিনি দেখেন আর দেখান। মানুষ তাঁর রক্ত ও পেশির সঞ্চালনের ভেতর দিয়ে বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকতে থাকতে আস্ত এক জীবন ফুরিয়ে যায়। এই আবহমান এক চিরকালীনতা দেবেশের কথনবিশ্বের মহামহিম এক অংশ হয়ে ওঠে। এই কারণেই তিনি দেবেশ রায়।

'সারা জীবন যার কেটেছে গল্প বলে সে স্মৃতি বললে, গল্প হয়ে যাবে না? বিশ্বস্ততা ছাড়া স্মৃতি কি স্মৃতি থাকে?'[২] — 'জলের মিনার জাগাও' বইটি দেবেশ রায়ের আত্মকথা। স্তরে স্তরে সাজানো স্মৃতির ভেতর দিয়ে এক তীব্র পর্যটন। এই বইটির মধ্য দিয়ে তার জীবন উঠে এসেছে খুব সুন্দরভাবে। এই প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' বা মণীন্দ্র গুপ্তর 'অক্ষয় মালবেরী' র মতো এই বইটিকেও তাঁর জীবনী সাহিত্য হিসেবে এক জীবনপুরাণ হয়ে উঠতে দেখি। তাঁর বাল্য থেকে প্রান্ত বেলা—পুরোটাই ঘুরে ঘুরে এসেছে এই বই জুড়ে। তিনি শুধুমাত্র কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে থমকে দাঁড়াননি। দেশ কাল আর আন্তর্জাতিকতার ভ্রমণ সংগীত বাজাতে বাজাতে তিনি পাঠকের দিকে ক্রমাগত এগিয়ে দিয়েছেন ইতিহাস, ভূগোল, ইতিকথা, দেশ হারানো মানুষ আর স্মৃতিতাড়িত এক জলের মিনার। লেখক দেবেশকে সারা জীবন ধরে তাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়েছে তাঁর শৈশবের হারিয়ে যাওয়া সঙ্গী নিধি পাগলা আর নিধি পাগলার গলায় শোনা গান - 'আওর আমার হইল বিস্মরণ / আমার জলের মিনার জাগান হইল না।'[৩] এই পুরো বই জুড়ে তিনি নিয়ে এঁকেছেন তাঁর জীবনের নানান জীবন্ত আলেখ্য। তার হাত ধরে আমরা কখনো পৌঁছেছি বাংলাদেশের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে, আবার কখনো পৌঁছেছি উত্তরবঙ্গের মানুষদের কাছাকাছি। যেখানে তিস্তা নদীর অপরূপ সৌন্দর্য বা সেখানকার মানুষদের

সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যে অসাধারণত্বের ছোঁয়া পাই। সমস্ত বই জুড়ে কত মানুষ, কত ঘটনা, কত স্মৃতির টালমাটাল পথ ধরে আমাদের নিয়ে গিয়েছেন দেবেশ, যাতে আমরা ডুবেছি।

রাজনীতি-জীবনের অনেক গল্প তিনি আমাদের শুনিয়েছেন। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হিসাবে তাঁর জনবৃত্তে পদার্পণ সেকথা বারংবার মনে করিয়ে দেন তিনি। তবে তাঁর সমগ্র জীবন জুড়ে শুধু পার্টিতন্ত্র বা দলসৃষ্টি নয়, এক বহু বিচিত্র সুরসঙ্গতি ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ে। সমাজ-সংসার, অতীত-বর্তমান, ক্ষুদ্র তুচ্ছকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তিনি মহাকায় এক ভবিষ্যতের আভাস দেন। উত্তরবঙ্গে থাকার সূত্রে তাঁর লেখার মধ্যে এই অঞ্চলের গ্রাম, নদী, জঙ্গল এর ভেতরের জীবন অনেকটাই উঠে এসেছে। ঘুঘুডাঙ্গার হাটের মিটিং, যুক্তফ্রন্ট, নরেশদা, তিস্তা নদীর পাড়ের জীবন খুব ঘন হয়ে ছড়িয়ে আছে লেখায়। এতটাই জীবন্তভাবে উঠে এসেছে এসব গল্প যে আমরা এত দূরে দাঁড়িয়েও দেখি স্টিমার,স্টেশন, বড় বড় নৌকা, নদী, গঞ্জের আলো, নিধি পাগলার বউ, রাস্তায় হাঁটতে থাকার নওমা, নিধি পাগলার সব গল্প। বড় বেলার দেবেশ যখন এইসব গল্প এত সাবলীলভাবে তুলে ধরেন তখন আমরা খুব সহজেই তার ভেতর দিয়ে ধরতে পারি স্মৃতির মুকুরে লুকিয়ে থাকা ছেলেবেলাকে।

বাঘমারার বাড়ি, যমুনায় ভেঙ্গে যাওয়া সেই বাড়ির স্মৃতির পাশে ঘন হয়ে এগিয়ে আছে সোনা পদ্মার বাড়ি। সেই বাড়িকে জীবন্ত করে রাখেন পরবর্তীতে তার দাদা দীনেশচন্দ্র রায় তার আখ্যানে। ঠাকুর দাদা, অন্ধ দাদু, ভাই-বোন, দাদা দীনেশ, লালচাঁদ ভাই, তার ছেলে রমজান, ঠাকুমার বাপের বাড়ি, নতুন বিয়ে হয়ে আসা মায়ের কথা, গম্ভীর বাবা, পাবনার রাজেন, ডাক্তার দাদু, নলিনি মেসো, পূর্ব বাংলার এক রূপকথার জীবন কী এক মায়া নিয়ে তুলেছেন লেখক তাঁর এই আত্মকথায়। নাটোরের মামা বাড়ির কথা ঘুরে ঘুরে উচ্চারণ করেছেন। নাটোর রাজবাড়ীর গল্প, জল দিয়ে ঘেরা এই রাজ বাড়িতে যাওয়ার সময় রামপ্রসাদী গানের সুর, বুনো বাগানের ফুলের গন্ধ, কাঠগোলাপের ঝাড়ের সৌন্দর্য, গুলঞ্চর গন্ধ এমনভাবে লেখকের স্মৃতিতে আছে যা লেখকের লেখার মধ্য দিয়ে পাঠকের চোখের সামনে বাস্তবের প্রকৃতি হয়ে উঠেছে। পাঠক সেখানে না থেকেও পৌছে গেছে লেখকের হাত ধরে নাটোরের রাজ বাড়িতে। সেখানকার রাজবাড়ীর হাতি, রানীর নামে 'হেমাঙ্গিনী চতুষ্পাঠী', 'জগদীন্দ্র নারায়ণ' হাই স্কুল, টোলবাড়ি, পুথিভরা এক রহস্যময় ঘর, ডাক্তার দিদিমা এক তীব্র আকুতি নিয়ে পুরনো কালখন্ড থেকে হারিয়ে যাওয়া মানুষেরা ফিরে ফিরে আসেন।

"আমি যদি লেখক না হতাম তাহলে নিজের স্মৃতিকে এমন গুছিয়ে তোলার দরকার পড়তো কি? মনে হয় না। কবি হোন বা গল্পকার বা নাট্যকার বা আঁকিয়ে বা ভাস্কর বা অন্য যে কোন শিল্পী তাকে তার অভিজ্ঞতাকে দিনরাত্রি স্মৃতিতে লিখে নিয়ে যেতে হয় আর আবার তার রচনায় ফিরিয়ে আনতে হয়। কোন শিল্পীর স্মৃতি তার অতীত নয়।"[৪]

তাঁর এই 'জলের মিনার জাগাও' লেখাটি প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা নয়। অথচ তাঁর নিজেরই গল্প। সে গল্প আবার সবটা স্মৃতি নির্ভর নয় — স্মৃতির মধ্যে বর্তমান ঢুকে গেছে, বর্তমান থেকে আবার স্মৃতি আলগা হয়ে গেছে। এই অতীত বর্তমানের খেলায় তাঁর এই লেখাটি আমাদের মনে এক অসাধারণ মায়া তৈরি করে। কখনো পূব বাংলার জীবন, সেখানকার ছেলেবেলার স্মৃতি, আবার কখনো জলপাইগুড়ির অসম্ভব সুন্দর প্রকৃতির ছবি আমাদের এক রূপকথার গল্পের সামনে এনে দাঁড় করায়। চোখের সামনে এক লহমায় ভেসে ওঠে জলপাইগুড়ির গ্রামে ডুয়ার্সের সেই ঠান্ডায় কোন এক বারান্দায় কম্বল-লেপের মধ্যে প্রকৃতির সুন্দর মুহূর্তের ছবি দেখা।

এভাবেই 'জলের মিনার জাগাও' স্মৃতিকথা হয়েও হয়ে উঠেছে লেখকের জীবনের জীবনের জীবন্ত চলচ্চিত্র। তবুও পাঠকের মনে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়—এটা কি আদতেই আত্মকথা। নাকি স্মৃতিকথা। নাকি স্মৃতি ভ্রমণ। কথাকার নিজেই বলেছেন— "আমি কি আমার সেই আড়াল ভেঙ্গে দিলাম এই আত্মকথায়? আমি কি আড়ালটুকু রাখতে চাইছিলাম অথচ রাখলাম না?"[৫] পুরো বই জুড়ে আছে বেঁচে থাকার গল্প। গল্পের পাকে পাকে অনবরত বদলে যাওয়া জীবন মানুষের। পুরোটা জুড়ে যেন লেখকের সমস্ত জীবন জেগে উঠেছে পাঠকের কাছে অসাধারণভাবে।

তথ্যসূত্র :

১. রায়, দেবেশ, ভূমিকা, গল্পসমগ্র- ২ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, আগস্ত ১৯৯২,পৃঃ ৯
২. রায়, দেবেশ, জলের মিনার জাগাও, প্রাচী প্রতীচী, কলকাতা ৬১, পৃষ্ঠা ১
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৩
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ১
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৪

নাজমা ইয়াসমিন

‘বিধবাদের কথা’ : রাজনীতি ও সামাজিক দর্পণে নারীর অবস্থান

সাহিত্যের বিশ্বজনীন আবেদন কোনওদিন কাঁটাতারের সীমানায় আবদ্ধ হয়নি। তাই প্রতিবেশী দেশের জন্ম-মুহূর্তের সংগ্রাম অনায়াসে বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর প্রাঙ্গণে জায়গা করে নেয়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, হানাদার বাহিনির নৃশংসতা, রাজাকার-আলবদর-আলশামস সংগঠনের সক্রিয়তা নিয়ে বাংলা সাহিত্যের একটি ধারা আজও প্রবহমান। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা নিয়ে যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের অন্যতম হাসান আজিজুল হক—সমাজ সচেতন ও মুক্তবুদ্ধির কথাকার হিসেবে দুই বাংলায় চর্চিত।

তাঁর অজস্র লেখার মধ্যে এই প্রবন্ধে গৃহীত হয়েছে ‘বিধবাদের কথা’ আখ্যানটি। আলোচ্য আখ্যানের প্রাকপরিচয় সম্পর্কে জানা যায়—

“আখ্যানটি প্রথম প্রকাশিত হয় নাঈম হাসান সম্পাদিত সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ক সংকলন ‘নিরন্তর’- এর ষষ্ঠ সংখ্যায় (ঢাকা, পৌষ ১৪১২, ইংরেজি ডিসেম্বর ২০০৫)। পরে এটি গ্রন্থভুক্ত হয় ‘বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প’ গ্রন্থে (সময় প্রকাশন, ঢাকা ২০০৭)।”[১]

আখ্যানের ধরণ বা গোত্র নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদার আখ্যানটিকে ‘আকারে-ছোটো কিন্তু ভাববিস্তারে বড়ো উপন্যাস’ বলেছেন। আমরা এই আখ্যানকে ছোটোগল্প হিসেবে বিবেচনা করব।

প্রাথমিক পরিচয়ের পর আখ্যানভাগে প্রবেশ করতে গিয়ে সূচনা বাক্যে চোখ আটকে যায়— ‘পৃথিবীর একটেরে নিঝুমপুর’। গল্পকার গল্পের পরিধি বিস্তৃত করেছেন ‘পৃথিবী’ জুড়ে। ফলে পাঠকের দায়িত্ব বেড়ে যায়। তাঁকে হতে হয় নিবিড় ও যত্নশীল পাঠক। গল্পের প্রতিটি শব্দ ধরে ধরে বুঝে নিতে হয় গল্পের ভেতরের গল্পকে। নিঝুমপুর গ্রামের ‘ঠাণ্ডা’ নির্জনতায় বৈশাখের শেষ বিকেলের একফালি তেজি রোদ’ গায়ে মেখে দুই নারী একমনে কাঁথা সেলাই করতে মগ্ন। সম্পর্কে তারা দুই বোন - রাহেলা ও সালেহা। তারা অবিকল এক দেখতে হলেও যমজ নয়। তাদের মধ্যে দুই বছরের ব্যবধান। তাদের চেহারা এক হলেও গায়ের রং, চোখের দৃষ্টি, স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা। বড়ো বোন রাহেলা ‘সবুজে আর সোনালিতে ভারি ফর্শা’। তার শুকনো চোখে কটকটে দৃষ্টি। সে ‘কথা প্রায় বলেই না, গোঁজ হয়ে থাকে, দুএকটা কথা যখন বলে তখন যেন কাঠ-চেরাইয়ের আওয়াজ হয়’। ছোটো বোন সালেহা ‘রাত্রির মতো কালো’। তার ভেজা চোখ, নরম কণ্ঠস্বর আরাম ও স্নিগ্ধতা বয়ে আনে। চেহারা ছাড়া বাকি বিষয়ের পার্থক্য থাকলেও দুই বোনের শৈশবের ছবি একই। ছোট্টবেলার বাপের আদর, মায়ের শাসন, পুঁতির মালা, মোটা শাড়ি, রজস্বলার মধ্য দিয়ে একদিন হঠাৎ করেই তারা বড়ো হয়ে ওঠে। বিয়ের বয়স হলে একদিনেই তাদের বিয়ে হয়ে যায়। পাত্রেরাও দুই ভাই। তারাও যমজ নয়। একজন কটা, তার নাম জবর। আর

একজন কালো, নাম সবর। তাদের মধ্যে কিন্তু শুধু চোখের চাহনি আর কথাবার্তার পার্থক্য নয়, স্বভাবেও আসমান জমিন ফারাক আছে। জবর নিষ্ঠুর। বিড়ালের ফাঁসি দিত গাছে ঝুলিয়ে, পাখির মাথা টেনে ছিঁড়ে ফেলত। তাদের ডিম এনে পাথরে ফাটাতো পটকার মতো। এসব করার সময় একটিও কথা বলত না। একগুঁয়ে তার স্বভাব। সবর ছিল এর উল্টো।

উল্টো স্বভাবের দুই বোনের সঙ্গে তাদের বিয়ে ঠিক হল। কিন্তু ভুলবশত বড়ো ভাই জবরের সঙ্গে ছোটো বোন সালেহা এবং ছোটো ভাই সবরের সঙ্গে বড়ো বোন রাহেলার বিয়ে হয়ে গেল। ভুল ঠিক করার আর উপায় নেই, "আল্লার কালাম পাঠ করা হইছে, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়, আল্লাতালা নিজেই বাঁধা তাঁর কালামের কাছে, আল্লার সাধ্য নেই তাঁর কালাম ডিঙি মেরে পেরিয়ে যাবার।"[২] ফলে ভুল মেনে নিয়েই সংসার করতে আসে দুই বোন। বছর ঘুরতেই দুই বোন গর্ভবতী হয়। বড়ো ভাই ও ছোটো বোনের ঘরে জন্ম নেয় ঘন শ্যামল পুত্র, সাহেবালি। আর ছোটো ভাই ও বড়ো বোনের ঘরে আসে গৌরবর্ণ রাহেলিল্লাহ। এই পর্যন্ত পড়ার পরে পাঠক বুঝতে পারেন, গল্প যেন ছকে বাঁধা অথচ বৈপরীত্যে পূর্ণ। মাঝে ভুল বিয়ের ঘটনা ছাড়া গ্রামীণ মুসলমান নিম্নবিত্ত পরিবারের দুই দাম্পত্য সম্পর্কে কোথাও ছন্দপতন হয়নি। কিন্তু গল্পকার তো আমাদের রূপকথার গল্প শোনাতে চাননি। তাই গল্পে অলিখিত দ্বিতীয় পর্বের অবতারণা করতে হয়।

একটেরে নিঝুমপুরের 'পৃথিবী' বিস্তৃত নির্জনতা ভঙ্গ করে রেডিওর খবর। খবর পাওয়া যায়, পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামি লিগের নির্বাচনে জেতা নিয়ে দেশে রাজনৈতিক বিরোধের সূচনা হয়েছে। একদল চায়, শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হোক। তার সমর্থক হল সাহেবালি ও তার কাকা সবর। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ভুট্টোকে প্রধানমন্ত্রী পদে দেখতে চায় যারা, সেই দলে আছে রাহেলিল্লাহ ও কাকা জবর। একই পরিবারে দুটি ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে দুটি দল তৈরি হয়ে গেল। একদিকে রাহেলিল্লাহ চেঁচায় মুজিব হারামি, দেশের দুশমন, কুকুর। সে দেশ বেচে দিতে চায় 'ইন্ডের' কাছে। জবর বলে শেখ মুজিব 'দ্যাশটারে খাবি, ইসলামকে খাবি'। ভাই সবর উত্তর দেয়, তামাম দেশের লোক এখন প্রধানমন্ত্রী পদে দেখতে চায় শেখকে। রাহেলিল্লাহ নিজের উত্তরের সপক্ষে যুক্তি খাড়া করে সে রাজাকার। সে 'এছলামের খাদেম' বা চাকর। ইসলাম রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে রাজাকার ও ইয়াহিয়া সমর্থক পরিবারের দুই সদস্যের বিপরীতে দাঁড়িয়ে অপর দুই সদস্য মুক্তিযোদ্ধা ও মুজিব সমর্থক। রাজনৈতিক মতানৈক্যের জেরে তারা একে অপরের খুন করতেও পেছপা হবে না বলে জানায়।

ক্রমশ গৃহযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ফলশ্রুতিতে একদিন কাদাজলে ঠেসে ধরে পিতা সবরকে হত্যা করে রাহেলিল্লাহ ও রাজাকার বাহিনি। গল্প যত এগোয় তার নিষ্ঠুরতা বৃদ্ধি পায়। এক কুমারী ব্রাহ্মণ কন্যার

অপহরণ, ধর্ষণ ও হত্যা করে রাহেলিল্লাহ পাঠকের ঘৃণা কুড়োয়। অবশেষে মা'কে যখন জনাকয়েক মিলে ধর্ষণ করে রক্তাক্ত করছিল, তখন 'দেখা গেল অনেকদূরে একটা তেঁতুল গাছের তলায় রাইফেল হাতে নিয়ে কটা রাহেলিল্লাহ দাঁড়িয়ে আছে'। কিছুদিন পর সাহেবালি এই নৃশংসতার প্রতিশোধ নিলে রাহেলিল্লাহর ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া মৃতদেহ পাওয়া যায়। পরিবারের এক ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় যখন বিষণ্ণতা চারদিক ছেয়ে ফেলেছে তখন সালেহা সাহেবালির খবর পায়। সাহেবালিকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে মা শোনে কিছুক্ষণ আগেই ছেলে মারা গেছে। চাদর সরিয়ে মৃত ছেলের মুখ দেখতে চায়নি সালেহা। তার ভয় ছিল,

"মরা মুখটা যদি কাগজের মতো, শুকনো পাতার মতো খরখর করে ওঠে! এই বরং ভালো, না-ছুঁয়ে দেখা, এমন করে দেখা যেন বাকি জীবনে আর তাকে কিছুই না দেখতে হয়। এখন থেকে যতদিন সে বাঁচবে, শুধুই তাকিয়ে থাকবে, দেখবে না কোনো কিছুই। কারণ দেখার তার থাকবে না কিছু। সে যে মায়ের জন্য যুদ্ধে-মরা পুত্রমুখ একা পরিপূর্ণ সূর্যের আলোর মধ্যে দেখতে পেয়েছে।"[৩]

এইভাবে রাজনৈতিক মতবিরোধ, শত্রুতা এবং হত্যার মধ্য দিয়ে একটি পরিবার প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অবশিষ্ট থাকে কেবল দুই বোন, দুই বিধবা। বোঝা যায়, গল্পটি ক্রমশ হয়ে উঠছে 'বিধবাদের কথা'।

এই আখ্যান-প্রকৃতির সাদৃশ্য প্রসঙ্গে একটি উপন্যাস ও একটি ছোটোগল্পের অবতারণা করতেই হয়। ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইয়ের এই মনোভাব, রাজনৈতিক কারণে পারিবারিক মতানৈক্য এবং হত্যার ছবি বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ নয়। ইতিপূর্বে সতীনাথ ভাদুড়ীর রাজনৈতিক উপন্যাস 'জাগরী'-তে আমরা দেখেছি একটি আপাদমস্তক রাজনৈতিক পরিবারের চারজন সদস্যের মধ্যে বাবা-মা গান্ধীবাদী। তাঁদের শত চেষ্টার পরেও দুই ছেলে দুটি ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের ধারক হয়ে ওঠে। তাদের পারস্পরিক মতবিরোধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ভাইয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানের কারণে বড়ো দাদার জেল ও ফাঁসির আদেশ ঘোষণা হয়। ফাঁসি রদ হয়। কিন্তু গল্পের শেষ পরিণতি সুখকর হয়নি। পরবর্তী সময়ে নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে এবং কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনকে প্রেক্ষিত করে লেখা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শোকমিছিল'। আলোচ্য গল্পে দেখা যায়, এই পরিবারেও চার সদস্যের মধ্যে বাবা-মা এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে রাজনৈতিক ভিন্নতা। রাজনৈতিক সক্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুই ভাইয়ের মধ্যে শত্রুতাও বৃদ্ধি পায়। বাবা-মা সেই বিরোধিতার মধ্যে নীরব দর্শকমাত্র। 'শ্রেণিশত্রু' নিধনের মহোৎসবে এক ভাই অন্য ভাইকে হত্যা করে। তার প্রতিশোধ নিতে আবার খুন। হত্যার বদলে হত্যার রাজনীতিতে পরিবারটি শেষ হয়ে যায়। উল্লিখিত উপন্যাস এবং ছোটোগল্পের সঙ্গে 'বিধবাদের কথা' গল্পটির মিল রাজনৈতিক অতি সক্রিয়তার ফলে চরম মতবিরোধ ও হত্যার বিষয়টিতে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিবারের মধ্যে মানসিক বিভাজন এবং সংঘটিত হত্যা পাঠককে বিবশ করে তোলে।

জীবন রূপকথা নয়। 'আমার গল্পটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োল' বললেই গল্পের সরল পরিসমাপ্তি ঘটে না। মৃত্যুর পরও জীবন থাকে, কর্মের গতি থাকে, ভাবনার স্ফূরণ থাকে। আলোচ্য গল্পে স্বামী, পুত্রকে হারিয়েও বেঁচে থাকে দুই বোন। গল্পের শুরু তাদের কর্মব্যস্ততার ছবি দিয়ে, মাঝখানে কিছুটা অংশে অন্য চরিত্র ও তাদের ঘটনাবহুল জীবনের প্রকাশ ঘটে। এক সময় জীবনের রঙ্গমঞ্চে বাকিদের সময় শেষ হয়ে যায়। গল্পের সমাপনী অংশে অবশিষ্ট থাকে সেই রাহেলা-সালেহা। এ যেন এক পূর্ব নির্ধারিত জীবন চক্র। যার শুরু ও শেষ একই বিন্দুতে এসে মিলিত হয়। বাকি যা কিছু, মানুষ ও ঘটনা সবই কক্ষচ্যুত উপাদানমাত্র।

প্রতিবেশী দেশে যখন মুক্তিযুদ্ধের আগুন জ্বলছিল, পশ্চিমবঙ্গও নকশাল আন্দোলনের তীব্রতায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। দুটি আন্দোলনের ক্ষেত্রে গ্রাম-শহর নির্বিশেষে নারী-পুরুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। যদিও দুটি আন্দোলনের প্রেক্ষিত ছিল পৃথক ও স্বতন্ত্র। আমরা দেখেছি, প্রায় একই সময়ে দেশ ও প্রতিবেশী দেশে ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনার কথা, আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানুষের কথা বাংলা সাহিত্যে বারবার উঠে এসেছে। তবে, পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারীদের কথা, তাদের অবদান-বলিদানের বিষয়টি তুলনায় অনেক কম আলোচিত হয়েছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত পরিবারের মহিলারা সব সময় যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হতে পেরেছিল, এমনটা নয়। তারা আড়ালে থেকে, নিজেদের সীমাবদ্ধ অবস্থানে দাঁড়িয়ে পিতা-স্বামী-পুত্রের বিপদসংকুল যাত্রাকে বরণ করে নিয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যের আঙিনায় অন্তত তারা দ্বিতীয় শ্রেণির চরিত্র হয়ে থেকে গেছে।

আলোচ্য গল্পে মূল চরিত্র দুজন নারী। তারা দেশের বর্তমান রাজনীতির দোলাচলতা, দেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত ছিল না। শৈশবে পিতার, বিয়ের পর স্বামীদের এবং ছেলেরা বড়ো হলে তাদের শাসনেই তাদের জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটে যায়। স্বামী-পুত্রের মৃত্যুর পর তারা প্রকৃত অর্থে 'একা' হয়ে পড়ে। অপরিসীম শোক অন্তরকে ভারাক্রান্ত করলেও বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হয়। তাদের চরম দারিদ্র্য, আগুন জ্বালানোর উপকরণ অপ্রতুল, গরমে গলে যাওয়া ভাত-তরকারি খাওয়া, দরজার খিল দেওয়া, আত্মরক্ষার উপায় খোঁজা, এসব কিছুর মধ্যে গল্পকার তাদের দৈনন্দিনতার খুঁটিনাটি বিষয় জানিয়ে দেন। সারাদিন কাজকর্মের সবকিছু যথাস্থানে গুছিয়ে ঘুমোবার আগে—

> "একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করে, ঠিক করে রাখিচিস?
> হ্যাঁ, সিন্দুকের একেরে তলায়।"[৪]

পাঠক বিষয়টি সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। সেই কৌতূহল জিইয়ে রেখে গল্পকার 'Flash back' প্রক্রিয়ায় অতীত থেকে বর্তমানে চলে আসেন। দুই বোন তখন এক ভারি লোহাকাঠের সিন্দুক খুলতে চেষ্টা করে। সেখানে হারিয়ে যাওয়া সংসার জীবনের, দীর্ঘ ব্যবহারের স্মৃতির দাগ-লাগা চিহ্নগুলি শাড়ি, কাঁথার মধ্যে সযত্নে রক্ষিত আছে। তারা

মেঝের স্তূপাকার শাড়ি থেকে সুতো ছাড়িয়ে কাঁথা সেলাই করতে থাকে। আমরা জানি, গ্রামবাংলায় কাঁথা সেলাই একটি প্রাচীন শিল্প। বর্তমানে এই শিল্পের প্রসার হয়েছে। কিন্তু গল্পকার কাঁথা সেলাইয়ের বিষয়টি উত্থাপন করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। তারা কাপড়ের উপর কাপড় বিছিয়ে কাঁথা সেলাই-এর জমি তৈরি করতে চায়। কিন্তু এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে স্মৃতিমাখা সব কাপড় ওলটপালট হয়ে যায়। কাপড়ের মতোই স্মৃতি গোছানো যে দুরূহ কাজ, আমরা বুঝতে পারি। তবু তারা চেষ্টা চালিয়ে যায়। কাঁথা বসানো হলে দুজনে হলুদ-গোলা জল হাঁড়িতে ভাগ করে নেয় চুপচাপ—"ভিতরে কথা নেই তাদের, কথা যা আছে তা নিছক শব্দ। আগেই তো বলা হয়েছে কথারা যেখান থেকে আসে সেখানটায় তাদের কাঁকর বালি আর নুড়ি পাথর।"[৫] কথা-বিহীন শব্দেরা বাস করে সেখানে। হলুদ গোলা জল হাতে নিয়ে সালেহা আঁকিবুঁকি কাটে। প্রথমে কিছু বোঝা যায় না। পরে স্পষ্ট হয়ে আসে বিচিত্র লতাপাতা, ফুল, শিশুর ছবি, সন্তানের প্রিয় মুখচ্ছবি। জীবিত সালেহা জানে, কাঁথা সেলাই শেষ হলেই তাকে মরে যেতে হবে। মরে যাওয়ার পরেও সে স্বামী বা সন্তানের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে না। সে একাই থাকতে চায়, এখন যেমন আছে। এই চাওয়া কি নারীর নীরব প্রতিবাদ নয়? মৃত মানুষ দুজনেই কেবল নিজেদের ভাবনা, মতামতের মূল্য দিয়েছে। স্ত্রীর কথা, মায়ের কথা তারা ভাবেনি। নিঃস্ব, জীবোন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা কেবল কি নারীর প্রাপ্য?

এই প্রশ্ন অমীমাংসিত রেখে পাঠক আগ্রহী হয় রাহেলার বিষয়ে। রাহেলাও লতাপাতা, মানুষের ছবি আঁকে। তবে সেসব বড়ো বিকট দর্শন, অপুষ্ট। তবে কি ভাগ্যবিড়ম্বিত, অবিকল দেখতে দুই বোন দুটি কাঁথা সেলাই করবে? "মনে হয় তার ব্যবস্থাও করেছে রাহেলা, তার অংশের প্রান্তে সালেহার অংশ যেখানে শুরু সেখানে সে এঁকে রেখেছে বিরাট একটি শিকল, আটকে ফেলবে সালেহার সব নকশা।"[৬] সব কাজ শেষ হলে তারা কালো সিন্দুকের তলায় কাঁথা গুছিয়ে রাখবে। তাদের অপূর্ণ স্বপ্ন সাধ, ইচ্ছে কাঁথার ফোঁড়ে অঙ্কিত রইল। কিন্তু এখানেই গল্পের শেষ নয়, গল্পের শুরু বলেও কিছু ছিল না। মানুষের জীবনের এই চক্রাকারে আবর্তন আবহমানকাল ধরে সচল থাকে। সভ্যতা যতদিন থাকবে, যুদ্ধের, মৃত্যুর, শোকের ছায়া ঘিরে থাকবে জীবনকে, জীবিতকে।

এই গল্পে প্রতিটি চরিত্রের ব্যক্তিগত জীবনের যাবতীয় উথালপাথাল কিন্তু রাজনীতি-কেন্দ্রিক। অবশিষ্ট বিধবা দুই নারী "রঙিন শাড়ির নানা বর্ণের সুতোয় সেলাই করে চলে কাঁথাটি—অনাগত কালের মানুষের জন্য তারা রেখে যেতে চায় তাদের সৃজিত শিল্পকর্মটি, যা মুক্তিযুদ্ধের লোকশিল্পের নির্দশন।"[৭] কাঁথাশিল্পের মাধ্যমে মানবজীবনের অকথিত, অব্যক্ত অনুভবের প্রকাশ এর আগেও আমরা পেয়েছি জসিমউদ্দিনের বিখ্যাত 'নকশিকাঁথার মাঠ' কবিতায়। নিরুচ্চারিত ভালোবাসার সেই বয়ন কাঁথার প্রতিটি ফোঁড়ে অঙ্কিত হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গৌরবের ইতিহাস। গল্পকার সেই গৌরবকে অস্বীকার করেননি। কিন্তু সেই গৌরবের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বেদনা-বিচ্ছেদ, শোক-অসহায়তার কথা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে এই আখ্যানে সম্পৃক্ত। আমরা বুঝতে পারি—

"বাস্তবের বহুমাত্রিক তাৎপর্য সম্বোধিত পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাহিনি প্রয়োজনীয় আকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। হাসান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে যেমনভাবে চিনেছেন, বুঝেছেন সেই নিরিখে বহতা সময়ের দলিল তৈরি করেছেন যেন। গল্পবিশ্বে তাঁর ভূমিকা সক্রিয় পর্যবেক্ষকের। তাই তাঁর গভীর বেদনা, তিক্ত ক্ষোভ, তীব্র ক্রোধ নির্মেদ ভাষার মধ্য দিয়ে ঝলসে ওঠে।"[৮]

আখ্যানটির শেষ কয়েকটি বাক্যে গল্পকার গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে জুড়ে দেন মহাকাব্যিক দ্যোতনা—"আরম্ভ এক জায়গায় করতে হয়, তাই করা হয়েছিল। প্রথম শ্লোকের একটিমাত্র শব্দ দিয়ে, তাই বা কেন একটিমাত্র অক্ষর দিয়ে ব্যাস মহাভারত শুরু করেছিলেন, অক্ষরটি লিখে নিয়েছিলেন গণেশ। তলস্তয় যুদ্ধ ও শান্তি-ও শুরু করেছিলেন একটি অক্ষর একটি শব্দ দিয়ে।"[৯] ভারতীয় মহাকাব্য 'মহাভারত' এবং রুশ সাহিত্যিক Leo Tolstoy-এর 'War and Peace'- এর উল্লেখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'বিধবাদের কথা' আর সাধারণ গ্রাম্য আখ্যান থাকে না। দুই বিধবার অভিজ্ঞতা, অনুভব ও অপূর্ণ ইচ্ছের অকথিত প্রকাশ তাদের বেঁচে থাকার সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রচনা করে এক মহাকাব্যোপম বিস্তার।

'বিধবাদের কথা' রাজনীতি ও সমাজ বিবর্তনের এই অশান্ত প্রেক্ষাপটে নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান, দৈনন্দিন জীবনের টানাপোড়েন এবং আত্মিক সংকটকে নির্মোহ দৃষ্টিতে প্রকাশ করেছে। সেই প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে গল্পকার জানিয়েছেন,

"সমাজ-সংসার-রাষ্ট্র-অর্থনীতি-রাজনীতি কাদের উপর তীব্রতম প্রহার চালায় তা যে-সমস্ত লেখায় দেখাতে চেয়েছি সেগুলিই বোধহয় নারীকেন্দ্রিক হয়ে গেছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মায়ের চেহারা নিয়েছে। আমার এইসব লেখা নারীবাদী লেখা নয়, নির্বিশেষ নারী-কেন্দ্রিকও নয়। সব নারীই নির্দিষ্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পটভূমিতে বাঁধা।.... আমার ধারণা এটাই বাস্তব যে, অন্তত আমাদের এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় (নিজের দেশের কথায় বলছি) নারীরাই সবচেয়ে উপদ্রুত, সবচেয়ে নিঃস্ব, সবচেয়ে বঞ্চিত, অপমানিত, অধিকারচ্যুত। গোটা সমাজের বঞ্চনা দেখাতে গেলে এটাকেই সামনে আনা দরকার। এইখানেই হাহাকার, মারণাহতের আর্তনাদ, তীব্র প্রতিবাদ প্রতিরোধ দেখতে পাওয়া যায়।"[১০]

গল্পকারের উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, 'বিধবাদের কথা' কেবল একটি গল্প নয়, একটি দেশের বিশেষ সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক দলিল। ফলে এই গল্প পৃথক ও গভীর বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

তথ্যসূত্র :

১. কথামুখ, পাঠে-আন্তর্পাঠে হাসান আজিজুল হকের বিধবাদের কথা, সুশীল সাহা, মধুবন্তী সোম (সম্পা.), ডানা, ২০১০।
২. বিধবাদের কথা, পঞ্চাশটি গল্প, হাসান আজিজুল হক, আনন্দ, ২০১৭, পৃঃ ৪৪০।
৩. ঐ, পৃঃ ৪৬২।
৪. ঐ, পৃঃ ৪৩৮।
৫. ঐ, পৃঃ ৪৬৫।
৬. ঐ, পৃঃ ৪৬৬।
৭. পাঠে-আন্তর্পাঠে বিধবাদের কথা, পৃথ্বীশ সাহা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩।
৮. হাসান আজিজুল হকের গল্পবীক্ষা, তপোধীর ভট্টাচার্য, ছোটগল্পের সুলুক-সন্ধান (উত্তরার্ধ), দে'জ, ২০১৭, পৃঃ ৪৩।
৯. বিধবাদের কথা, পঞ্চাশটি গল্প, হাসান আজিজুল হক, আনন্দ, ২০১৭, পৃঃ ৪৬৬।
১০. সাক্ষাৎকার : 'মহাযান সাহিত্যপত্র'- এর কিছু প্রশ্নের উত্তরে হাসান আজিজুল হক, প্রধান বিষয় : হাসান আজিজুল হক, মহাযান সাহিত্যপত্র, অষ্টম সংখ্যা (নবপর্যায়), সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃঃ ৮৬।

মা ন স চ ক্র ব র্তী

দেশভাগ ও উন্মূল মানুষের জীবিকা সংকট : হাসান আজিজুল হকের গল্প

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে হাসান আজিজুল হক এক বলিষ্ঠ নাম। তাঁর ছোটগল্পগুলি নিখুঁত সমাজবিদ্যার ফসল। অধিকাংশ গল্পেই সমকালীন সমাজের চিত্র অত্যন্ত স্পষ্টরেখায় আঁকা। ব্যক্তিগত জীবনে সমকালীন সমাজের নানান উত্থান পতনের সাক্ষী থেকেছেন। তাঁর জন্ম এপার বাংলায়, বর্ধমানের যবগ্রামে ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯। লেখাপড়ার প্রথম পর্যায় এ দেশেই সমাপ্ত হয়। পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনার কাজ করেছেন। এপার বাংলায় জন্ম হলেও স্বাধীনতা ও দেশভাগের কিছু সময় পরে ওপার বাংলায় পাড়ি দেন। ততদিনে তাঁর বোধের মানচিত্র তৈরি হয়ে গেছে। এক দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে বসতি স্থাপনের ভালো-মন্দ স্বচক্ষে দেখেছেন। দেশভাগ বিষয়ে হাসান আজিজুল হকের মনোভাব সম্পর্কে জানিয়েছেন সাহিত্যিক অমর মিত্র—"হাসান আজিজুল হক রুক্ষ অনাবৃষ্টির দেশ রাঢ়ের মানুষ ছিলেন, গিয়েছিলেন সুন্দরবন সংলগ্ন ভিজে মাটির দেশ খুলনা জেলায়। কিন্তু মানুষটি ভুলতে পারেননি তাঁর জন্মভূমির কথা। প্রাজ্ঞ এই লেখকের সঙ্গে আলাপে টের পেয়েছি তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে না যে, দেশভাগের দরকার ছিল। মানতেন না পার্টিশন।"[১] সামগ্রিকভাবে না হলেও সাহিত্য অনেকাংশে সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল। হাসান আজিজুল হকও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁর গল্পগুলিতে দেশভাগ ও দেশভাগের পরের ঘটনাক্রম ঘুরেফিরে এসেছে।

দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রভাবে দেশভাগ, কাঁটাতারের মাধ্যমে ভূখণ্ড বিভাজন মানুষের মধ্যে অবস্থানগত দূরত্ব তৈরি করেছিল। কিন্তু অবস্থানগত দূরত্ব সর্বদা মানুষের মধ্যে মানসিক দূরত্ব তৈরি করে কিনা তা অনুধাবনযোগ্য, বিশেষ করে দুটি ভূখণ্ডের ভাষা, সংস্কৃতি যখন অনেকাংশে একই রকম। দেশভাগের নামে কিছু ক্ষমতালোভী মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার মাসুল গুনতে হয়েছিল তামাম ভারতের মানুষদের। সাত পুরুষের ভিটেমাটি ত্যাগ করে এক অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের মুখোমুখি হয়েছিল সাধারণ মানুষ। নতুন পরিবেশে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকার অপ্রতুলতা সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎকে প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। হাসান আজিজুল হকের গল্পে সেই অপ্রীতিকর সময়ের ছবি আমরা পাই।

তাঁর 'উত্তর বসন্তে'[২] গল্পে আছে এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলায় গিয়ে উদ্বাস্তু একটি পরিবারের বসতি স্থাপনের চিত্র। সমগ্র গল্পে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন লেখক। এই অন্ধকার আসলে গল্পের চরিত্রগুলির মনের অন্ধকার। নিরাশা যেন

গ্রাস করেছে গল্পের চরিত্রদের। রাজনৈতিক স্বার্থে দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু মানুষগুলো অপরিসীম ওরা শিকার হয়েছিল। উচ্চতর ক্লাসে পাঠরতা লিপি ও তাঁর পরিবারকে ওদেশে চলে যেতে হয় দেশভাগ জনিত কারণে। ফলে লিপির সাথে কবিরের প্রেম সম্পর্কের বিচ্ছেদ হয়, যা মেনে নেওয়া লিপির পক্ষে অসম্ভব ছিল। অবসাদগ্রস্ত লিপি মারা যায়। এই ঘটনার ব্যাপক প্রভাব পড়ে লিপির বোন বাণীর ওপর। বাণীও লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। আর্থিকভাবে সক্ষম হতে চায় সে, সেইসাথে পরিবারকে এই অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি দিতে চায়। গল্পে বাণীর বাবাকে কর্মহীন হয়ে কালাতিপাত করতে দেখা যায়। সংসার নির্বাহের উপযুক্ত কর্মসংস্থান তাঁর নেই। তার বাবা অশেষ হীনমান্যতার শিকার হয়ে স্বেচ্ছা নির্বাচন নিয়েছেন একটি অন্ধকার ঘরে। একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষের পক্ষে কর্মহীন হয়ে থাকার যন্ত্রণায় তিনি জীর্ণ। দেশত্যাগের দুঃখকে অঙ্গীকার করে নিয়েও আর্থিক অনিশ্চয়তার দুঃস্বপ্ন এই গল্পে আভাসিত হয়েছে।

'আত্মজা ও একটি করবী গাছ'[৩] গল্পে লেখক দেখিয়েছেন উদ্বাস্তু এক বৃদ্ধ ও তাঁর পরিবারের করুণ কাহিনি। গল্পের বৃদ্ধ এবং তাঁর পরিবার সকল উদ্বাস্তু মানুষদের প্রতিনিধিস্থানীয়। বৃদ্ধের কথায়—'দেশ ছেড়েছে যে তার ভেতর বাইরে নেই।'[৪] এ যেন পরবাসী মানুষদের আর্তনাদ। কিন্তু দেশ ছাড়ার দুঃখই এই মানুষগুলোর সব নয়, নতুন একটা ভূখণ্ডে জীবনধারণের প্রাথমিক শর্ত খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাদের। রুকুর বাবা বৃদ্ধ ও এজমা রোগা আক্রান্ত। অথচ পরিবার-পরিজন নিয়ে তাঁর সংসার। শারীরিক অক্ষমতার কারণে তাঁর পক্ষে তাই পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন অসম্ভব। পরিবারের সদস্যদের মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলে দিতে তিনি অক্ষম। অন্নসংস্থানের জন্য বাধ্য হয়ে নিজের মেয়ে রুকুকে দিয়ে পতিতাবৃত্তি করিয়েছে সে। ইনাম, ফেকু, সুহাসদের মতো সমাজের নিম্নরুচির প্রতিনিধিদের কাছে ক্রয়যোগ্য হয়ে উঠেছে রুকু। গল্পে রুকুর বাবার বক্তব্য—"রুকু রাগ করবে- চা করতে দিলে না ওকে। ওর সঙ্গে দেখা না করে গেলে আর কোনদিন কথা বলবেনা। দাঁড়াও, হারিকেনটা রেখে বুড়ো বেরিয়ে যায়। ছায়াটা ছোট হতে হতে এখন নেই।"[৫] —এ ছায়া আসলে বৃদ্ধের আত্মসম্মান, মেয়েকে পতিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত করে নিজের কাছে আত্মসম্মান লোপ পেয়েছে বৃদ্ধের। তাই আত্মদহনের জ্বালা বুকে চেপে আত্মহননের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়ে ইমামকে বৃদ্ধ বলেছে—"আমি একটা করবী গাছ লাগাই বুঝলে? বলে থামল বুড়ো, কান্না শুনল, হাসি শুনল, ফুলের জন্যে নয়, বুড়ো বলল, বিচির জন্যে, বুঝেছ, করবী ফুলের বিচির জন্যে। চমৎকার বিষ হয় করবী ফুলের বিচিতে।"[৬]

'দিবাস্বপ্ন'[৭] গল্পটিতে ওপার বাংলায় গিয়ে রহিম বখশের স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। স্বাধীনতা সমকালীন সময়ে এদেশের নিম্নবিত্ত মানুষের পরিস্থিতি খুব একটা সুখকর ছিল না। কিন্তু যারা এদেশের সর্বস্ব ত্যাগ করে ওপার বাংলায় গিয়েছিল তাদের পরিস্থিতি

হয়েছিল আরো মারাত্মক। গল্পে দেখা যায় নতুন ভূখণ্ডে নবজীবন শুরু করার যে স্বপ্ন রহিম দেখেছিল তা ক্রমশ দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে দেশ ছাড়ার সীমাহীন যন্ত্রণা বুকে নিয়ে তাঁর দিনযাপন। উপরন্তু আর্থিক অসচ্ছলতাও তাদের জীবনকে গ্রাস করেছে। পরিবারের হতদরিদ্র পরিস্থিতির চিত্র গল্পে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—"দেশ থেকে আনা কাঁসার বাটিতে দুটি মুড়ি আর ভাঙা কাপে একটু চা দিয়ে যায় ছেলের বউ। সেইটুকু খেয়ে রহিম বখশ বুকে হাঁটু গুঁজে কি করে দিনটা কাটাতে পারে তাই ভাবে।"[৮]

গল্পে রহিম বখশের কাছে তাঁর জীবনের অতীত অংশ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে, বর্তমান তার কাছে অস্পষ্ট। ক্ষুধার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত সর্বত্র আভাসিত। রহিম বখশের চিন্তায় বারবার ভেসে উঠেছে কৃষিজমি, হেমন্তের শস্যপূর্ণ মাঠ। নিজের পিতার বৈভবের কথা মনে পড়েছে তাঁর—"বাড়ির সামনে খোলা খামারে ধান স্তুপ করা আছে, ভর্তি আছে সমস্ত খামারটা। শীতের ভারী সন্ধ্যার কুয়াশা আর অন্ধকার আস্তে আস্তে নামছে গাঁয়ের ওপর। সেই অন্ধকারের মধ্যে ছোট ছোট পাহাড়ের মত জেগে আছে ধানের স্তূপগুলি।রুখু গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে ধানের।"[৯] দেশ ছাড়ার যন্ত্রণা সঙ্গী করে নতুন দেশে আশার আলো দেখতে পায়নি সে। এ যেন এক অন্ধকার থেকে আর এক অন্ধকারে পদার্পণ—"বুড়ো তার বাঁকাচোরা গাঁটওঠা আঙুলগুলোর দিকে তাকায়। কি সাংঘাতিক খাটুনি গেছে সারাজীবন অথচ বছরের পর বছরের সারিবদ্ধ মিছিল কি নোংরাভাবেই না একঘেয়ে!"[১০] জীবনের উপান্তে পৌঁছেও সুখের মুখ দেখতে পাননি রহিম বখশের মতো বহু মানুষ। ক্ষুধা আর পরবাসের যন্ত্রণাকে স্বীকার করে নিয়েই জীবন অতিবাহিত করেছেন তারা।

'মারী'[১১] গল্পটিতেও স্পষ্ট হয়েছে দেশভাগের ফলে রিফিউজি ক্যাম্পের করুণ দৃশ্য। নতুন দেশ থেকে কিছু নতুন মানুষ এসেছে, এসেছে জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করে রিফিউজি তকমা নিয়ে। যাদের ভবিষ্যৎ তো দূরের কথা বর্তমানই ডুবে আছে গভীর অন্ধকারে। মতলেব, নফর, রিয়াজদ্দি, কবীর সাহেবের মত মানুষ দুধ বিলি করতে গেলে উদ্বাস্তু মানুষেরা উদগ্রীব হয়ে উঠেছে সামান্য দুধের জন্য। কবীর স্কুল ঘরে পৌঁছে দেখেছে—"দুধের ঘড়াটা স্থির, ওপরে পাতলা সর জমেছে, হলঘর ভর্তি মানুষ -বুড়ো যুবক মাঝ বয়সি শিশু তরুণী যুবতী আর অকথ্য গোলমাল।"[১২] এই যুবক মাঝবয়সী মানুষগুলো কর্মক্ষম হলেও তারা একটি বানিয়ে তোলা পরিস্থিতির শিকার। তাদের বাসস্থান নেই, খাদ্য নেই, নেই জীবন নির্বাহের উপযুক্ত কর্মসংস্থান। মানুষগুলো যেন সমষ্টির অংশ, ব্যক্তি পরিচয় হারিয়ে তারা হয়ে উঠেছে কেবল সংখ্যা—"এই সময় কোথা থেকে মৌলভী সাহেব এসে হাজির হন, জিজ্ঞেস করেন, কত আইছে? আসলামো আলায়কুম, চারশো হবে নে।"[১৩] আত্মপরিচয়হীন, সামাজিক প্রতিষ্ঠাহীন, কর্মহীন এই মানুষগুলোর জীবন যন্ত্রণার ছবি সযত্নে এঁকেছেন আজিজুল হক।

এহেন উদ্বাস্তু মানুষের জীবন সংকটের ছবি সমকালীন বাংলা সাহিত্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে

আছে। যেমন সন্তোষ কুমার ঘোষের 'দ্বিজ' গল্পের চরিত্র নিশিকান্তকে কর্মসংস্থানের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হয় এবং সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষের কাছে ক্ষণে ক্ষণে অপদস্থ হতে হয়। দক্ষিণারঞ্জন বসু 'ছেড়ে আসা গ্রাম' বইয়ে এই উন্মূল মানুষদের জীবনের ট্রাজেডিকে স্পষ্ট করে লিখেছেন—"একটা দেশের লক্ষ লক্ষ সুখী শান্তিপ্রিয় মানুষ তাদের পিতৃ-পিতামহের পুণ্য স্মৃতি জড়িত বাস্তুভিটে, অভ্যস্ত জীবনযাত্রা, পরিবেশ ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণ উন্মূলিত হয়ে রাজনৈতিক ঝঞ্ঝায় ঝরাপাতার মতো উড়ে এসে পড়ল সীমান্তের অপর পারে, অন্য রাষ্ট্রে। তাদের না রইল অতীত স্বীকৃতি, না রইল স্থির ভবিষ্যৎ।"[১৪] এবং একথা দু'দেশের উদ্বাস্তু মানুষের পক্ষেই সত্য।

গল্পকার হিসেবে হাসান আজিজুল হক অদ্বিতীয়। তাঁর গল্প পাঠে সাধারণ পাঠক অনায়াসে বুঝতে পারেন তিনি হক একান্ত মনোযোগী দ্রষ্টা। সমাজের উত্থান পতনের সাপেক্ষে মানুষের অবস্থানকে গল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। গল্পগুলির ঘটনাক্রম থেকে গল্পকারের অবস্থান যেন অনেকটা দূরে। দূর থেকে ক্রমান্বয়ে ঘটনার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেন তিনি। গল্পকার হিসেবে তিনি বিচারকের আসন গ্রহণ করেননি। তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গল্পগুলিতে নেই। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে সহজে সরে দাঁড়ান। মূল্যায়নের যাবতীয় দায়ভার পাঠকের উপর বর্তায়। নিজের গল্প সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে হাসান আজিজুল হক জানিয়েছিলেন—"সাধারণভাবে আমার অভ্যাস হচ্ছে, ক্যামেরা থাকলে ফটো তুলে যে জিনিসটা দেখাতাম, ক্যামেরা না থাকার ফলে লিখতে গিয়ে জিনিসটাকে যদি অবিকল তুলতে পারি তার চেষ্টা, দুই ছবি যদিও একরকম হবে না; ক্যামেরার ছবি অবিকল এবং যান্ত্রিক। লেখার ছবি তেমন নয়। ছবিই সেটা, আমি সেই ছবিটা আনতে চাই। চিন্তা করার দিকে আমি যাব না। চিন্তা করার জন্য যে ছবিটা দরকার, সেই ছবিটা তুলি। মানুষ কত কষ্টে আছে, সেটা বলার আমার দরকার নেই, কষ্টের ছবিটা দেখাই। লেখাও ছবি, কিন্তু ক্যামেরার ছবি নয়। লেখার ছবি থেকে তুমি হয়তো এক হাজার ছবির অনুভূতি পেয়ে গেলে। ক্যামেরার ছবি ঠিক ওভাবে আসে না। আমি লিখতে চাই, অবিকল ছবিটা আঁকলে আমার উদ্দেশ্য সফল হবে। সেজন্য যে উপমাটা দিই, সেটা কতটা আমার কাজে সহায়ক হচ্ছে তা বিবেচনা করি। মনোহর বাক্য লেখার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় আমার নেই।"[১৫] —লেখকের এই মনোভাবই হয়তো তাঁর লেখার প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই যে প্রত্যক্ষ জীবনচিত্রের যথার্থ রূপায়ন-হাসান আজিজুল হককে চিত্ররূপের প্রতিষ্ঠাতা রূপে বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিক্রমী করেছে। একসাথে দুই-দেশের চিত্র-যাপনই তাঁর গল্প-সমুদ্দুর।

তথ্যসূত্র :

১. অমর মিত্র , হাসান আজিজুল হককে যেমন বুঝেছি, অথ পথ, মিঠে-রোদ্দুর সংখ্যা,মাঘ ১৪৩০ জানুয়ারি ২০২৪,পৃ.১৭

২. হাসান আজিজুল হক, উত্তর বসন্তে, গল্প সমগ্র (প্রথম খন্ড), অক্টোবর ২০০৩,কলকাতা, নয়া উদ্যোগ
৩. হাসান আজিজুল হক, আত্মজা ও একটি করবী গাছ, আত্মজা ও একটি করবি গাছ (সপ্ত মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৪ মে২০০৭),ঢাকা,সাহিত্য প্রকাশ,পৃ.১১-১৯
৪. তদেব,পৃ.১৭
৫. তদেব,পৃ.১৮
৬. তদেব.পৃ.১৯
৭. হাসান আজিজুল হক, দিবাস্বপ্ন, গল্প সমগ্র (দ্বিতীয় খন্ড), জানুয়ারি ২০০৪,কলকাতা, নয়া উদ্যোগ,পৃ.২৬১-২৬৪
৮. তদেব,পৃ.২৬১
৯. তদেব,পৃ.২৬২
১০. তদেব,পৃ.২৬৪
১১. হাসান আজিজুল হক, মারী, আত্মজা ও একটি করবী গাছ, (সপ্তম মুদ্রণ,বৈশাখ ১৪১৪ মে ২০০৭), ঢাকা,সাহিত্য প্রকাশ,পৃ.৪৬-৫১
১২. তদেব,পৃ.৪৯
১৩. তদেব,পৃ.৪৮
১৪. দক্ষিণারঞ্জন বসু, ছেড়ে আসা গ্রাম, ছেড়ে আসা গ্রাম, (প্রথম সংস্করণ ২০১৫, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ২০২০), কলকাতা, পারুল প্রকাশনী, পৃ.১০
১৫. হাসান আজিজুল হক: অক্ষরে ও উচ্চারণে (সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মাসউদ আহমাদ), অথ পথ, মিঠে-রোদ্দুর সংখ্যা, মাঘ ১৪৩০ জানুয়ারি ২০২৪, পৃ১৩-১৪

অনুময় মণ্ডল

হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্প : জীবনবোধ ও বাস্তবতা

ছ'য়ের দশকের বাংলা কথাসাহিত্যের আসরে হাসান আজিজুল হক অন্যতম বাস্তববাদী ও দার্শনিক লেখক। নিজেকে 'সার্বক্ষণিক লেখক-ক্লান্তিহীন লেখক' হিসাবে দাবি করা হাসান আজিজুল জীবনকে দেখিয়েছেন সাধারণ ভঙ্গিমায়। দেশ ও মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও ঐতিহ্য চেতনা তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকে সজীব করে তুলেছে। জন্মভূমি রাঢ়বঙ্গও তাঁর অনেক গল্পেরই পটভূমি। গ্রামজীবনের এই নিস্তরঙ্গ পরিবেশে লেখক এক নির্মম জীবন-জিজ্ঞাসার বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। সেখানকার সংগ্রামশীল পোড়-খাওয়া ও দরিদ্র মানুষদের বিবর্ণ জীবনের আখ্যান নির্মাণ করেছেন। দেশভাগের জন্য লেখককে ওপার বাংলায় যেতে হয়েছিল। সেইজন্য তাঁর লেখায় দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগজনিত উদ্বাস্তু জীবন-সংকট, জমিদার-জোতদারদের দৌরাত্ম্য, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর প্রতিচ্ছবি অত্যন্ত বাস্তবভাবে উঠে এসেছে। আসলে সমাজ, দেশ ও মানুষ যে বাস্তবতার মুখোমুখি এবং যে বাস্তবতার ভেতর দিয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত, সেই বাস্তবতাকে শিল্পায়িত করতে যে ধরণের আখ্যান ও গল্প ভাষার প্রয়োজন; লেখক ঠিক সেই ধরণের প্রেক্ষাপট নিজের মতো করে নির্মাণ করে নিয়েছেন। লেখক নিজেই তাঁর 'চালচিত্রের খুঁটিনাটি' গ্রন্থে বলেছেন—

"বাইরের বাস্তবতা আমার লেখার বিষয়ে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আমার অভিজ্ঞতার অংশ হতে গিয়ে কি বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে? আমি কি আমার লেখার ভিতর দিয়ে সংগোপনে টুকরো টুকরো বাস্তব গড়ে তুলছি যাকে লোকে শিল্পের বাস্তব বলে, যা প্রকারান্তরে বাস্তব থেকে পালাবার এবং লুকোবার একটা উপায়মাত্র না, বাস্তবকে অবলম্বন করে এরকম কোনো মোহ আমি তৈরি করতে চাই না।"[১]

অর্থাৎ তিনি সাহিত্যে কোনো কৃত্রিমতা বা কল্পনা সৃষ্টি করেননি। প্রান্তিক মানুষের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা গল্পে উঠে এসেছে। নিপীড়িত মানুষের ভয়ানক দুর্দশা ও অধিকারহীনতা লেখক'কে নিদারুণভাবে মর্মাহত করেছিল। সেইজন্য শোষণের বিরুদ্ধে এক সুস্থ সমাজের আশা করেছেন লেখক। কারণ সমাজের বিদ্যমান বৈষম্যের অবসান চান তিনি। আসলে এই সমাজই তো লেখককে বেঁচে থাকার উপকরণ জোগাচ্ছে; তাই কেবল এখান থেকে নিতে থাকলে তা লেখকের কাছে এক অপরাধবোধ হবে। সেইজন্যে সাহিত্যকে হাতিয়ার করে তিনি সমাজের ব্যক্তি-মানুষের মুক্তির কথা বলেছেন। তিনি বাস্তব জীবনে প্রত্যক্ষভাবে এইসব মানুষদের জীবনযাত্রা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই, তাদের প্রতিদিনকার মর্মব্যথা সাহিত্যে তুলে এনেছেন। লেখকের জীবনস্মৃতিমূলক রচনা 'ফিরে যাই ফিরে

আসি' এবং 'উঁকি দিয়ে দিগন্তে' নিজের চোখে দেখা জীবনকেই তুলে ধরার চেষ্টা। প্রসঙ্গত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'লেখকের কথা' গ্রন্থে বলেছিলেন—

"জীবনকে আমি যে ভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা জেনেছি এ জগতে কেউ তা জানে না (জল পড়ে পাতা নড়ে জানা নয়)। কিন্তু সকলের সঙ্গে আমার জানার এক শব্দার্থক ব্যাপক সমভিত্তি আছে। তাকে আশ্রয় করে আমার খানিকটা উপলব্ধি অন্যকে দান করি।"[২]

আসলে লেখকরা তাদের বাস্তব জীবনে প্রত্যক্ষভাবে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, সেটাই সাহিত্যে তুলে ধরবেন। তবেই তা সমাজের কাছে আরও বেশি করে সমাদৃত হবে। অবশ্য বাস্তবে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা জুড়ে দিলেই গল্পের সৃষ্টি হয় না। তার সঙ্গে শিল্পী বা সাহিত্যিকরা নিজস্ব বক্তব্য, অতীত অভিজ্ঞতা ও কিছু কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করে সেই বাস্তবতাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। বাস্তবের অনুকরণ নয়, সেখান থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সাহিত্য সৃষ্টি মূল লক্ষ্য। যার ফলে সেই সাহিত্য অধ্যায়ন ক'রে পাঠক-সমাজ সত্য অনুসন্ধান করতে পারে। তাই এই বিষয়ের ক্ষেত্রে মানিকের মতো হাসান আজিজুল হকও ব্যতিক্রম হননি।

দুই

হাসান আজিজুল হক পশ্চিমবাংলার বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা গ্রামে ১৯৩৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। লেখক স্মৃতিকথা'তে লিখেছিলেন, "অজ অজ এই পাড়াগাঁ যবগ্রাম"। শুধু শৈশব নয়, কৈশোরের একটা বড় অংশই এই জেলাতে তিনি অতিবাহিত করেছিলেন। যবগ্রাম মহারাণী কাশীশ্বরী ইনস্টিটিউশনে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন। এখানে পড়াকালীন তিনি বিদেশী বহু বইয়ের অনুবাদ অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উপর লেখা বই 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট', দস্তোয়েভস্কির 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট', আলেকজান্ডার ডুমার 'দি ব্ল্যাক টিউলিপ', পুষ্পময়ী বসুর অনুবাদে গোর্কির 'মা' উপন্যাস, গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের অনুবাদে টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' প্রভৃতি পড়ে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। যা পরবর্তীকালে তাঁকে দর্শন চর্চায় আগ্রহী করে তুলেছিল। সেইজন্য তাঁর লেখায় বারে বারে সাম্যবাদী মনোভাব উঠে এসেছে। বিদেশী বইয়ের অনুবাদের পাশাপাশি বাংলা বইও পড়েছিলেন। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গল্প-কবিতা পড়েছিলেন, তারাশঙ্করকে চিনেছিলেন তাঁর 'ডাইনি' গল্প পড়ে। এছাড়াও রাঢ় অঞ্চলের লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল।

হাসান আত্মস্মৃতিতে জানিয়েছিলেন যে অল্প বয়স থেকেই তিনি কবিতা লিখতেন মৃত্যু ও দুশ্চিন্তা বিষয়ক। পরবর্তীতে তিনি গল্প-উপন্যাস লিখেছেন দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর ও দেশভাগকে কেন্দ্র করে। আসলে কৈশোরে পশ্চিম বাংলায় থাকাকালীন তিনি রাঢের রুক্ষ জীবন, অনাবৃষ্টিজনিত দুঃসহ পরিবেশ, সামন্তশ্রেণির বিরুদ্ধে অন্ত্যজ মানুষদের লড়াই এবং পরে

স্বাধীনতা ও দেশভাগ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেদিনকার সেই সাধারণের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার, দাঙ্গা, চারিদিকের বারুদের গন্ধ ও রক্তের দাগ তাঁকে মুমূর্ষু করে তুলেছিল। বাস্তবে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাগুলির প্রভাব তাঁর ছোটগল্পে লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গত, আত্মজীবনীর তৃতীয় পর্ব 'এই পুরাতন আখরগুলি' গ্রন্থে তিনি বলেছিলেন—

"তখন আটচল্লিশ-উনচল্লিশ সাল। সময়টা খুব খারাপ। মন্বন্তরের সময় আমার বয়েস বছর চারেকের বেশি হবে না। দু-চারটি স্মৃতি যা আছে, খুবই আবছা। মন্বন্তর হাহাকারের কাল, আমার কাছে কিন্তু ঐ আটচল্লিশ-উনচল্লিশ সাল। পাকিস্তানে 'অপশন' না কি দিয়ে আমার ছোট চাচা, ফুফাত ভাই কচিভাই পুব পাকিস্তানের খুলনা আর রাজশাহীতে চলে গেলেন আর ছ-মাসের বেশি টিকতে না পেরে বেকার হয়ে ফিরে এলেনএই রকম সময়!"[৩]

জীবনের এই বাস্তব নানা অভিজ্ঞতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে তাঁর ছোটগল্পগুলো। অল্প বয়স থেকেই লেখালিখি শুরু করেছিলেন। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সমুদ্রের স্বপ্ন: শীতের অরণ্য' (১৯৬৪)। তাঁর অন্যান্য গল্পগ্রন্থের মধ্যে 'আত্মজ ও একটি করবী গাছ', 'জীবন ঘষে আগুন', 'নামহীন গোত্রহীন', 'আমরা অপেক্ষা করছি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সমকালীন অন্যান্য গল্পকারদের থেকে ভাষা প্রয়োগে, রূপক-প্রতীকের ব্যবহারে ও বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সহজেই পৃথক হয়ে যান হাসান আজিজুল হক। সমকালীন ঘটনা প্রবাহই তাঁর ছোটগল্পের মূল প্রেক্ষাপট। প্রাবন্ধিক উদয়চাঁদ দাশ বলেছেন,

"হাসান আজিজুল হকের কাছেও এই কথাই পাই যে, পরিবর্তনশীল সময়কে বুঝতে বুঝতে, সমাজকে চিনতে চিনতে গল্পকার তাঁর কথনবিশ্বকেও গড়তে থাকেন।[৪]

সমকালের প্রেক্ষাপট নিয়ে লেখকের গল্প 'শকুন'। তৎকালীন অবক্ষয়িত গ্রামীণ জীবন ও মহাজনদের শোষিত রূপ এই গল্পে প্রকাশিত। গল্পটির পটভূমি রাঢ় অঞ্চল। এই গল্পের আখ্যান জুড়ে রয়েছে আহত এক শকুন। একদল গ্রামীণ রাখাল বালক ও স্কুল পড়ুয়া কিশোররা এই শকুনকে ধরতে চায়। যখন এই কাজে তারা সফল হয়েছে, তখন সেই শকুন হয়ে উঠেছে তাদের খেলার সামগ্রী। আর সেই ভয়ংকর খেলায় শকুনের মৃত্যু ঘটলে তাদের মুখে কোন আফসোসের চিহ্নও ফুটে ওঠে না! কারণ এই শকুন তাদের কাছে সুদখোর মহাজনেরই অন্য রূপ।

আসলে 'শকুন' প্রতীকধর্মী গল্প। এখানে বালকরা যেমন উচ্চ শ্রেণীর দ্বারা শোষিত তেমনি শোষণ বিনাশেও তৎপর। লেখক বালকদের দ্বারা শকুন হত্যার মাধ্যমে গ্রামের সুদখোর মহাজনদের অস্তিত্বকে ধ্বংস করতে চেয়েছেন। নিজেদেরকে সমাজের চালিকাশক্তি হিসেবে পরিচয় দেওয়া এই সুদখোররা ছেলেদের কাছে ঘৃণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শকুন যেমন ভাগাড়ে কাঁচা মাংসের গন্ধে ছোটে; তেমনি মহাজনরাও সাধারণকে ভোগ্য পণ্য করতে চায়। তাই গ্রামের মুনাফাখোর মহাজন অঘোর বোষ্টম শকুন নামধারী প্রাণী! এছাড়াও গল্পে জমিরদ্দি ও কাদু শ্যাখের রাঁঢ় বোনের প্রসঙ্গ এসেছে। যাদের অবৈধ মিলনে

সদ্যোজাত শিশু ভাগাড়ে পড়ে থাকে শকুনের খাদ্য হওয়ার জন্য। চারিদিকে দুর্ভিক্ষের দিনে এই কদর্য বাস্তবটাকে লেখক এই গল্পে তুলে ধরেছেন :

"সুদখোর মহাজনের চেহারার কথা মনে হয় ওকে দেখলেই। নইলে মহাজনকে লোকে শকুন বলে কেন। কেন মনে হয় শকুনটার বদহজম হয়েছে। যে ধূসর রঙটা দেখলেই মন দমে যায় তার সঙ্গেই এর রঙের এত মিল থাকবে কেন। প্রায় জীবন্ত, ফেলে দেওয়া যে শিশুগুলোকে গর্তে, খানা-ডোবায়, তেঁতুলতলায় ছেলেরা দেখে, না বোঝার যন্ত্রণায় মন যখন হু হু করে ওঠে, তখন তাদের কচি মাংস খেতে এর এত মজা লাগে কিসের।"[৫]

'তৃষ্ণা' গল্পে লেখক রুক্ষ বাস্তবকে উপস্থাপিত করেছেন। এক সীমাহীন ক্ষুধার স্বরূপ চিত্রিত হয়েছে গল্পের চরিত্র বাশেদের মধ্য দিয়ে। অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠা বাশেদের জঠরে অপরিসীম খাদ্যের আকাঙ্ক্ষা। সেইজন্যে এই ক্ষিদে মেটাতে সে ধানের শীষ কুড়িয়ে আনে, মাছ ধরে, আবার কখনও চুরি করতে সে দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু কৈশোর থেকে যখন সে যৌবনের দিকে পা বাড়ল, তখন তার সমস্ত লাবণ্য ঝরে গিয়ে একটা বেমানান আকৃতির রূপ নিল। এর সঙ্গে তার ক্ষুধাও বেড়ে গেল। ফলত গ্রামে তার পরিচয় হলো 'অদা বাচেদ', 'অবং' প্রভৃতি নামে। এই নামগুলো থেকেই বোঝা যায় বাস্তবের দারিদ্র্যতা বাশেদের ক্ষুধা কখনও নিবৃত্তি করতে পারবে না। সেইজন্য তাকে পেট ভরে খেয়েই মরতে হল।

ছ'য়ের দশকের পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ সমাজের এক বাস্তব জীবনকেই লেখক এই গল্পে তুলে ধরেছেন। যখন গ্রামে সংকট ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছিল, যখন সকলে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিল; তখন 'তৃষ্ণা' নামক গল্প লেখা লেখকের শ্রেয় মনে হয়েছে। সেজন্যই তো তিনি বাশেদের সঙ্গে দারিদ্র্যকৃষ্ট সমগ্র জনগোষ্ঠীর অপরিমেয় ক্ষুধা-তৃষ্ণার বিষয়টিও উপস্থাপিত করেছেন। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান মানুষের প্রাথমিক চাওয়া হলেও এই নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর কাছে খাদ্যের থেকে প্রিয় জিনিস আর নেই। লেখক চূড়ান্ত সত্যকে তুলে ধরেন এইভাবে—

"সব কটি মানুষ ব্যস্ত। একটা আদিম কাজে ব্যস্ত। আর ওরস মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ একটা জৈবিক প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই জান্তব ভোজনপর্ব শেষ করতে চায়। রান্না হয়ে গেলেই গোগ্রাসে আকণ্ঠ খেতে হবে, চূড়ান্ত খেতে হবে।"[৬]

১৯৪৭ সালের দেশভাগ এবং তার পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যাকে প্রেক্ষিত করে লেখকের গল্প 'উত্তরবসন্তে'। এখানে দেশভাগের ফলে ভারতের বর্ধমান জেলা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের চলে আসা একটি মুসলিম পরিবারের অসহায়তা চিত্রিত হয়েছে। পরিবারের অংশ বাবা-মা, তিন ভাই ও দুই বোন ছিল। কিন্তু লিপি নামক বোনটি আত্মহননের পথ বেছে নেয়, কারণ দেশভাগের ফলে তার প্রেমিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ সে সহ্য করতে পারিনি। এই গল্পে একদিকে উদ্বাস্তু হয়ে যাবার যন্ত্রণা, অন্যদিকে পরিবারের সদস্যদের অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু এক হতাশার জীবনকে ইঙ্গিত করেছে।

এই কারণে বেঁচে থাকাটাই এখন এই পরিবারের কাছে দুর্বিষহ যন্ত্রণা। লিপির বাবা-মায়ের

জীবন 'জীর্ণ ন্যাকড়ার' মত হয়ে গেছে। বর্তমানে কোন কিছুই তাদের চেনা নেই নতুন জায়গায়। মানুষ, বাড়ি ও পরিবেশ সবকিছুই তাদের কাছে অচেনা ও অন্ধকারময়। তাদের পরিচয় এখন 'রিফিউজি'। নিজের মাতৃভূমিতে যে প্রাকৃতিক পরিবেশের সৌন্দর্য ছিল, তা এখানে ম্রিয়মাণ। পুরনো স্মৃতি তাদের কাছে ধরা দেয় এইভাবে—

"বর্ধমানের পুরনো জেলা শহরটার লাল রোদের কথা মনে পড়ে। কিন্তু তখন সেই ভাঙা বিশাল বাড়িগুলোর ওপর, লাল সুরকি ঢালা সরু রাস্তাগুলোতে আর একটু পশ্চিমে জনবিরল দিঘিটার কালো পানিতে কি আশ্চর্যভাবেই না লাল রোদ পড়ত। সেই রোদ আর কোনোদিন দেখবে না বাণী।"[৭]

লেখকের বাড়িও ছিল বর্ধমানে। তাকেও পূর্ব বাংলায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলে আসতে হয়েছিল। এই গল্পে সেই বেদনার, সেই বাস্তবেরই প্রকাশ ঘটেছে। দাঙ্গা ও দেশভাগ মিটে যাবার পরেও সাধারণ মানুষরা কীভাবে তাদের স্বাভাবিক জীবন-যাপন থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়—এই গল্প তারই ক্ষতচিহ্ন।

দেশভাগের ফলে বহু সাধারণ মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পড়েছিল। যার ফলে তারা নিজেদের দেশ ত্যাগ করে পূর্ব বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদেরকে অসহায়ভাবে অন্য স্থানে চলে যেতে হয়েছিল। সেইজন্য তারা নতুন দেশে নাগরিক নয়, রিফিউজি হিসাবে পরিচয় পেয়েছিল! অর্থাৎ এই পরিচয়ে তাদেরকে বাঁচতে হলে লড়াই করতে হবে প্রতি পদক্ষেপেই। লেখকের 'মারী' গল্পটি ছিন্নমূল মানুষের বেঁচে থাকারই লড়াই।

গল্পের ঘটনাগুলো আবর্তিত হয়েছে একটি স্কুলের মধ্যে। যেখানে প্রায় চারশো রিফিউজি ঠাঁই নিয়েছে। তবে সেখানে মতলেব ও নফরের মত ব্যক্তিরা সেই বাস্তুহারা মানুষদের খাদ্য ও দুধ সরবরাহ করার কাজে অব্যাহত। কিন্তু সকলেই খাবার পায় না এই দুর্দিনে। কারণ, এক শ্রেণীর মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা খাদ্য সামগ্রী মজুত করে রাখতে চায়। এখানে লেখক বুভুক্ষু অসহায়দের আর্তি তুলে ধরেন:

"অজস্র শিশু চিৎকার করে, দুধ, দুধ, দুধ। ছেলেগুলো চিৎকার করতে থাকে, বিকেলের ছায়া দ্রুত নেমে আসে। মানুষগুলো অন্ধকারের মধ্যে কালো রেখার মতো নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, আকাশে ধোঁয়া জমাট বেঁধে স্থির হয়ে আছে, বিশ্রী গন্ধ ছাড়ছে একটা। হঠাৎ বমির উৎকট আওয়াজ এলো।"[৮]

তিন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও নৃশংসতা হয়েছিল। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে ঢাকায় গণহত্যা চালানোর পর যুদ্ধ শুরু হলে বাংলাদেশে বহু বেসামরিক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর নির্দেশনায় যুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশকে হত্যা করা হয়েছিল। হাসান আজিজুল হকের সাহিত্যে এই মুক্তিযুদ্ধ এবং বিজয় পরবর্তী নানা

ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। প্রত্যাশা, প্রাপ্তি ও আশাভঙ্গ—এসব কিছুর মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল তাঁকে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই সাহিত্য নির্মিত হয়েছে গল্প-উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে প্রশাসনিক শাসন, বিপন্ন মানুষের রক্তক্ষরণ, সমাজের অসঙ্গতি-সবকিছুই লেখক তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গত, 'একাত্তর: করতলে ছিন্নমাথা' গ্রন্থে তিনি সেই সময়ের বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন :

"যে পাকিস্তানি বর্বরেরা এই রক্ত ঝরাচ্ছিল, রক্তের দাম সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। শহরের নিরাপদ ঘাঁটিগুলো থেকে গানবোটে কামান, বন্দুক সাজিয়ে তারা বাংলাদেশের নদী-নালা-খাল-বিল বেয়ে গ্রামে-গঞ্জে ঢুকতো আর মানুষের রক্তের বন্যা বইয়ে দিতো। গ্রাম ঘেরাও করে তারা নিরস্ত্র মানুষকে তাড়িয়ে এক জায়গায় এনে জমা করতো, তারপর তাদের হত্যা করতো।"[৯]

'ভূষণের একদিন' মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হবার সময়কার গল্প। এখানে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে বাঙালির যুদ্ধ বেধে যাওয়ার ঘটনা বর্ণিত। গল্পের প্রধান চরিত্র ভূষণ। সে একজন সাধারণ চাষী। তার এতদিনকার জীবনে চাষাবাদ ছাড়া অন্য কিছুই করেনি। অতীতে তার পূর্বপুরুষ বিত্তশালী ছিল বটে, কিন্তু বর্তমানে ভূষণের অবস্থা একদম নিম্নমানের। সেইজন্য তাকে বেড়া বাঁধার কাজে মল্লিক বাড়িতে যেতে হয়। সেখানেই সে খবর পায় পাকিস্তান আর থাকছে না, বাঙালিদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আচমকা যুদ্ধের এই খবর পেয়ে সে অবাক হয়েছে। তাই তার উদ্দেশ্যে এক আগুন্তুক বলেছে—"তোমরা ভয় পেলে কোন কাজই হবে না। তোমাদের অস্ত্র ধরতে হবে।"[১০]

সাধারণ দিনমজুর সে। তাই তাকে জীবিকার সন্ধানে ঘুরতে হয়। এমনি একদিনে ভূষণ হঠাত দেখতে পায় পাকিস্তানি সৈন্যরা নামছে। তারা অতর্কিতে সাধারণ মানুষদের গুলি করে হত্যা করছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেউই নিস্তার পাচ্ছে না সৈন্যদের হাত থেকে। ভূষণ এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড যখন দাঁড়িয়ে লক্ষ করছিল, ঠিক সেইসময় তার ছেলে ও তাকে নৃশংসভাবে নিহত করে পাশবিক শক্তিধারীরা। গল্পকার মুক্তিযুদ্ধের চিত্রটি যেন একটিমাত্র গল্পের মাধ্যমে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন—

"একভাবে কটকটকট শব্দ চলতেই থাকে। এখন বস্তার উপর বস্তার মতো মানুষের উপর মানুষ স্তূপীকৃত হয়—কেউ প্রবল বেগে হাত-পা নাড়ে, কারো চোখের পাতাটি শুধু কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে যায়।"[১১]

'নামহীন গোত্রহীন' গল্পে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের পাশবিকতার নারকীয় রূপটি ধরা পড়েছে। যুদ্ধের সেই ভয়াবহ সময়ে বাড়িছাড়া বহু মানুষ নিজেদের নাম পরিচয় ভুলে অতীত সম্পর্কের টানে নিজেদেরই ভিটেতে ফিরে আসছিল। গল্পে বর্ণিত নামহীন পথচারী লোকটিও বিকেলের ট্রেন থেকে নেমে অন্ধকার পথ ধরে তার বাড়িতে ফিরছিল। সেইসময় সে দেখেছে সৈন্যদের ভয়ে রাস্তার নিস্তব্ধতার চিত্র, জ্বলন্ত আগুন আর স্ত্রীলোকের গোঙানির আওয়াজ। তার কাছে মনে হয়েছে সমস্ত দেশটি যেন রাতারাতি বধ্যভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

এ ধরনের পরিবেশে নামহীন লোকটি বাড়ির কাছে পৌঁছালো। সেখানে স্ত্রী মমতা ও ছেলেকে চারিদিকে খুঁজেও যখন সাড়া পায়নি; তখন লোকটি মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করে—ছেলের পাঁজরের হাড় ও হাতের অস্থি এবং স্ত্রীর করোটি। এরপরে আরও কিছু পাবার প্রত্যাশায় সে বেশি করে মাটি কুপিয়ে যেতে থাকে। এই নামহীন লোকটির বাড়িটি যেন সমগ্র বাংলাদেশের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। লেখক সেই মাটি খুঁড়ে স্বজন খোঁজার চিত্রটি দেখিয়েছেন এইভাবে—

"মমতা—লোকটা বলল। বলে সেটা পাশে নামিয়ে রেখে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে মাটি খুঁড়তে লেগে গেল। পৃথিবীর ভিতরটা নাড়িভুঁড়িসুদ্ধ সে বাইরে বের করে আনবে।"[১২]

মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে পাকিস্তানি বাহিনীরা সমস্ত বাংলাদেশ জুড়ে অসংখ্য কনসেনট্রেশন ক্যাম্প গড়ে তুলেছিল। সেই ক্যাম্পে বহু সাধারণকে ধরে এনে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল। তারই ছবি 'রফি' গল্প। রফি সৎ ও পরিশ্রমী নেতা। লেখাপড়া না করলেও দেশের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা রয়েছে। এই আদর্শ থেকে সে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু এই দেশভক্ত নেতাকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে শাসকরা। সেই নারকীয় দৃশ্য লেখক গল্পে উপস্থাপন করেছেন—

"সন্ধে হয়ে এসেছিলো। রফির মাথাটা কেটে নেওয়া হলো। রাজাকারদের মধ্যে ছিলো একজন কসাই, সেই-ই নাকি কেটেছিলো রফির মাথা। তারপর সেই কর্তিত মুণ্ডু ছাই-ছাই অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হাটের বিমূঢ় জনতাকে দেখাতে দেখাতে নিয়ে আসা হলো বাজারের চৌরাস্তার মোড়ে।"[১৩]

লেখক তাঁর গল্পে বাস্তবের এই মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বকেই শুধু তুলে ধরেননি, তাদের আশাহত জীবনকেও নিজের হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। একজন লেখকের কাজ শুধু লিখে যাওয়া নয়, বরং প্রতিটি মুহূর্তে স্বদেশ ও স্বজাতির সুস্থ সংস্কৃতি ও জাতীয়তার পক্ষে দাঁড়ানো অন্যতম প্রধান কাজ। হাসান আজিজুল হক প্রগতিশীল, আধুনিক, গণতান্ত্রিক উদার সংস্কৃতিবান সভ্য রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর পক্ষে লড়াই করাকে নিজের কর্তব্য বলে মনে করতেন। সাহিত্যকে তিনি হাতিয়ার করেছিলেন। ভোগবাদী সমাজে মানুষ নানা বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে। তবে তার আড়ালে থাকা সাধারণ মানুষের জীবনের গল্পগুলোকেই লেখক সাহিত্যের পাতায় তুলে ধরেছেন। সেখানে এক নির্ভীক জীবন সত্যই প্রকাশ পেয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১। হাসান আজিজুল হক, 'চালচিত্রের খুঁটিনাটি', দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা ১০৪

২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'লেখকের কথা', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ১৯৫৭, পৃষ্ঠা ১২

৩। হাসান আজিজুল হক, 'এই পুরাতন আখরগুলি', ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা ৪৮
৪। উদয়চাঁদ দাশ, 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলা ছোটগল্পে শৈলীর রূপান্তর', তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, ছোটগল্প শারদীয় ১৪১২, পৃষ্ঠা ১০৮
৫। হাসান আজিজুল হক, 'শকুন', গল্পসমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা ১৫
৬। হাসান আজিজুল হক, 'তৃষ্ণা', গল্পসমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা ২৫
৭। হাসান আজিজুল হক, 'উত্তরবসন্তে', গল্পসমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা ৭২
৮। হাসান আজিজুল হক, 'মারী', গল্পসমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা ১৬৯
৯। হাসান আজিজুল হক, 'একাত্তর: করতলে ছিন্নমাথা', সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ১৬
১০। হাসান আজিজুল হক, 'ভূষণের একদিন', গল্পসমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা ২৪৫
১১। তদেব, পৃষ্ঠা ২৪৯
১২। হাসান আজিজুল হক, 'নামহীন গোত্রহীন', গল্পসমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা ২৫৮
১৩। হাসান আজিজুল হক, 'রফি', হাসান আজিজুল হক ও অনিল আচার্য সম্পাদিত, 'আধুনিক বাংলা গল্প ১', অনুষ্টুপ, মার্চ ২০০৯, পৃষ্ঠা ৩০

সং গ্রা ম মা হা ত

দেশভাগ ও ক্ষয়িষ্ণু মানবতার দলিল : 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ'

ষাটের দশকে আর্বিভূত বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন হাসান আজিজুল হক (২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ — ১৫ নভেম্বর ২০২১ খ্রি:)। 'আগুনপাখি' (২০০৬) উপন্যাসের স্রষ্টা হিসেবে যাঁর প্রধান পরিচয়। তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক , ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার আর অন্যদিকে শিশুসাহিত্যিক, আত্মজীবনীকার এবং গ্রন্থসম্পাদক হিসেবে পরিচিত। তবে গদ্যশিল্পী হিসেবে ছোটগল্পে তাঁর অবদান অনন্য। যে গল্পের মধ্যে তিনি জীবনসংগ্রামে লিপ্ত মানুষের জীবনকথা তুলে ধরেছেন। 'শকুন' , 'তৃষ্ণা', 'উত্তরবসন্তে', 'প্রথম প্রহর', 'পরবাসী', 'আমৃত্যু', 'আজীবন', 'ফেরা', 'অচিন পাখি', 'মা-মেয়ের সংসার', 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' প্রভৃতি ছোটগল্পে তার পরিচয় যথেষ্ট। তিনি অনেকগুলি গল্প লেখেন, যেগুলি কয়েকটি গল্পগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। যথা — 'সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য' (১৯৬৪), 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' (১৯৬৭), 'জীবন ঘষে আগুন' (১৯৭৩), 'নামহীন গোত্রহীন' (১৯৭৫), 'পাতালে হাসপাতালে' (১৯৮১) প্রভৃতি। এই সমস্ত গল্পগ্রন্থের মধ্যে দ্বিতীয় সংকলনের শিরোনামে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ'। এ ছাড়া এই গল্পগ্রন্থের অন্যান্য গল্পগুলি হল — 'পরবাসী', 'সারাদুপুর', 'উটপাখি', 'সুখের সন্ধানে' প্রভৃতি। 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পটি ১৯৬৬ সালে লেখা হলেও, এর কাহিনি ১৯৪৭ সালের দেশভাগ। দেশভাগের ফলে যে দুর্যোগ ও ব্যক্তিগত সংকটমুহূর্ত তৈরি হয়, তার একটি মানবিক মানচিত্রের সঙ্গে এই গল্পগুলিতে আমাদের পরিচয় ঘটে।

সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার যবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং বড়ো হয়ে উঠেন। এই গ্রামের স্কুলে স্কুলফাইনাল পাশ করে ১৯৫৪ সালে তিনি পূর্ববঙ্গের খুলনায় চলে আসেন। পরবর্তী সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক হন। জন্মস্থান রাঢ়বঙ্গ ছেড়ে পূর্ববঙ্গে লেখক স্বয়ং এসেছিলেন বলে, তাঁর অনেক লেখায় নিজস্ব জীবন অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হয়েছে। এছাড়া তাঁর লেখার মধ্যে এসেছে দেশভাগ, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন সংগ্রাম, অর্থনৈতিক দুরাবস্থা, যৌন লালসা, মানবতার অবক্ষয় ইত্যাদি বিষয়। বলা যায়, চোখের সামনে তিনি যা দেখেছেন, মানুষের যে মর্মবেদনা অনুভব করেছেন, সে বিষয় নিয়েই গল্প লিখেছেন। তাই তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন — "আমি বানিয়ে গল্প লিখতে পারি না, বাস্তবতার চোখে যা দেখি তাই দিয়ে গল্প বানানোর চেষ্টা করি।"[১] এই বাস্তব সমাজভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে করবী 'আত্মজা ও একটি গাছ' গল্পটি লেখক রচনা করেন। যেখানে দেশভাগের ফলস্বরূপ অর্থনৈতিক দুরাবস্থা এবং মানবতার অবক্ষয় চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

দেশভাগ ও ক্ষয়িষ্ণু মানবতার দলিল : 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ'

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের তিনটি ধারা, যার সময়কাল হল- ক। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ খ্রি, খ। ১৯৭১ থেকে ১৯৮৭ খ্রি, গ। ১৯৮৭ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত। প্রথম পর্বের রচনায় দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকারবোধ থেকে গণআন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ স্পষ্ট। দ্বিতীয় পর্বে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ভাব প্রকট। আর তৃতীয় পর্বে মানবিক চেতনায় সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক জীবনচিত্র স্পষ্ট। আলোচ্য গল্পের বিষয় প্রথম পর্বের প্রেক্ষাপটে লেখা। দেশভাগের কালপর্বে এক সন্ধ্যাকালীন পরিবেশে গল্পের সূচনা। দেশভাগের ফলে যে দুর্যোগ ও ব্যক্তিগত সংকটমুহূর্ত তৈরি হয় তার একটি মানবিক মানচিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি ঘটে। ঋণ শোধ করতে না পেরে বৃদ্ধ কেশো-বুড়ো দুটো টাকার বিনিময়ে নিজের মেয়েকে তুলে দেয় সুহাস, ফেকুদের মতো বগাটে ছেলেদের হাতে। যেখানে তীব্র অভাব ও ক্ষুধার মুখে সব সামাজিক বা ধর্মীয় অনুশাসন ফুঁৎকারে উড়ে যায়। আত্মজার (যার প্রতীক করবী গাছ) যন্ত্রণাদগ্ধ অবস্থাকে ভুলে থাকার জন্যই বুড়োর এই এক নিজস্ব গল্পের অবতারণ।

এক নির্দয় শীতকালে গল্পের সূচনা। রাতের ঠাণ্ডায় সকলে কাবু, চাঁদ উঠেছে নারকেল গাছের মাথায় আর চাঁদের আলোয় বড়গঞ্জের রাস্তার মোড়ে রাহাত খানের বাড়ির টিনের চাল ঝকমক করছে। এই সময়েই কানুর মায়ের কুঁড়েঘরের সামনে এক শিয়াল ডেকে ওঠে। এই শিয়াল হল লোভী, স্বার্থপর, আত্মসুখ পরায়ণ, বগাটে মানবের প্রতীক। শিয়াল এসে মুরগি শিকার করে নিয়ে পালায়। মুমূর্ষু মুরগি ডানা ঝাঁপটায় কিন্তু রক্ষা পায় না। বাড়ির লোক তাড়া করে, কিন্তু কোন খোঁজ পায় না। গল্পের প্রথমে এমনি ভাবে এক শিয়ালের মুখে মুরগি শিকারের চিত্রকল্পে পকেটমার ফেকু, নাপিত সুহাস ও ইনামের জীবন চিত্রিত হয়েছে। এই তিন বগাটের মধ্য দিয়ে লেখক অসামাজিক অস্থির এক সময়কে তুলে ধরেছেন। গল্পে চরিত্রগুলির কথা সামঞ্জস্যহীন। সুহাসের ছোট মামার বিয়ের বরযাত্রী যাওয়ার গল্প, ফেকুর পকেটমারের গল্প ও ইনামের স্কুল ত্যাগের গল্প — এই তিনটি গল্প মিলে, খাপছাড়া ভাবে কাহিনি নির্মিত হয়েছে।

চরিত্রগুলোর পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন— "সুহাস হাসল, বিড়ির ধোঁয়ায় কালো দাঁতগুলো প্রায় মুখের বাইরে চলে এলো।" নেশাখোর, আড্ডাবাজ, কর্মহীন এই ছেলেরা রাতের অন্ধকারে মেয়ে শিকারে তৎপর থাকে। তাদের ভাবনার মধ্যে আর কিছু থাকে না। তার সংকেত দিতে গিয়ে গল্পকার লেখেন—"উনুনের আগুন দপ করে জ্বলে উঠলে খাঁদের সুন্দর সুন্দর মেয়েদের মুখ একবারের জন্যে ঝলসে উঠল।" এই সুন্দর মেয়েদের অর্থের বিনিময়ে ভোগ করাই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এরা পড়াশোনা করতো না, স্কুলে যেত না। জীবনে চলার পথে শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতো না। শুধুমাত্র চাকরি পাওয়া—এটিই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করতো। কিন্তু তা পাওয়া যে সহজ ছিল না, সে কথাও তাদের কথাবার্তায় স্পষ্ট। তাই, সুহাস যখন ইনামকে চাকরি করার কথা

জিজ্ঞাস করে, তার উত্তরে ইনাম বলেছে—"হয়, চাকরি গাছে ফলতিছে!" এমনি ভাবেই জীবনের খণ্ডচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। ইনাম তার স্কুল জীবনের কথা স্মরণ করেছে, মাস্টার তারাপদ বাবুর কথা বলেছে। এরপর সুহাস সিগারেট খেয়ে খেয়ে তার ছোট মামার বিয়ের বরযাত্রী যাবার গল্প বলেছে—মধুমতী নদী যাত্রার কথা, মামার চেহারার বর্ণনা, বিয়ের সম্বন্ধ, পাত্রীর খোঁজ, পাত্রীর কাকার সঙ্গে ঝগড়া, বিয়ের দিন পাঞ্জাবি ভাড়া করা ইত্যাদি বহু বিষয়। যার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের বিলাসিতার চিত্র বর্ণিত হয়েছে। যার অন্য দিকে আছে অর্থনৈতিক দুরাবস্থার চিত্র।

রাহাত খানের বাড়ির চাল আর দেখা যায় না। চাঁদমণির বাড়ির কিছুটা দূরে মুরগির ক্ষত-বিক্ষত দেহ দেখা যায়। বর্তমান সময় পরিস্থিতিতে নারী শিকারের চিত্র এখানে স্পষ্ট। এইজন্য চাঁদমণির বাড়ির বুড়িটা পিদিম জ্বেলে সারারাত পাহারা দেয়। কিন্তু শীতের রাতে গায়ে দেবার কাঁথা নেই। "এই রকম জীবন চলতে থাকে।" ফেকুরা নিজেদের দুষ্কর্মের পথে আবার এগিয়ে চলে। অন্ধকার পথে কোন এক লতা চাবুক মেরে বাধা দেয়, কিন্তু তারা বিরত হয় না। তাদের কুকর্ম সকলেই জেনে গেছে, মাঝে মাঝে বড়দের কাছে যে চড় থাপ্পড় খায়, সে কথাও বলেছে। তবে টাকার অভাব সব সময় তাদের চিন্তিত রাখতো, সে কথাও গল্পকার বলেছে—" টাকার কথা শুনে ইনাম অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ল।" কারণ, তারা পকেটমার করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। এদের দুবেলা খাবারের অভাবও ছিল , কিন্তু বিলাসিতা কোন অংশে কম ছিল না। সারা সময় আড্ডা মারে, গল্প করে, গান গাই 'তুমি যে আমার জীবনে এসেছ' আর দুষ্কর্মের চিন্তা করে। এই সব যে সমাজ পছন্দ করতো না, প্রতিবাদ সকলেই করতো। প্রতীক হিসেবে লেখক কুকুরের চিৎকার তুলেছেন — "ভিটে থেকে একটা কুকুর উঠে এসেছে — ক্ষীণ চিৎকার করার চেষ্টা করছে।" সামান্য প্রাণীরাও এই সমস্ত মানুষদের যে ঘৃণ্য চোখে প্রতিবাদ করতো কুকুরের পাছা দোলানিতেই তার প্রমাণ। জীবনের মূল্য, শিক্ষার মূল্য এরা বুঝতো না। তাই লেখাপড়া নিয়ে ইনাম বলে—"লেহাপড়ার মুহি পেচ্ছাব।"

এই সমস্ত মানুষগুলোর জীবনে ভালো ভাব নেই। সমস্ত মানবিকতা উৎচ্ছৃঙ্খলতায় চাপা পড়ে গেছে। জড়তা আর প্রাণহীনতা জড়িয়ে আছে এদের। এই জীবনাচরণকে বিড়ালের জ্বলজ্বল চোখেও কটাক্ষ করে। সুহাস আর ফেকুর কথা থেকে জানা যায়, সেনদের কথা, যারা 'পঞ্চাশের' সময় দেশ ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু তাদের বাড়িটি রয়ে গেছে। দেশভাগের সময়কালে এমনি বহু মানুষ ভিটে ছাড়া হয়েছিল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে ভেঙে পড়েছিল, সে কথাও গল্পে রয়েছে। এই দুর্বলতাকে সুযোগ লাগাতো সুহাসের মতো ছেলেরা। রাতের অন্ধকারে তারা বেরিয়ে পড়তো, যে লোকের বাড়িতে সুন্দরী মেয়ে থাকতো, সেখানে ঘুরঘুর করতো। এক রাত্রে ডাক্তার বাবুর বাড়ির সামনে উপস্থিত হয়। টাকার বিনিময়ে শারীরিক সুখ লাভের প্রত্যাশায়। তার জন্য এরা টাকা চুরি করতো, সুহাসের

কথাতেই তা স্পষ্ট, "ট্যাহা দুডো আছে মোড়ে, দাদার পহেটথে মারিছি, মাত্তর দুডো ট্যাহা।" এই টাকার প্রত্যাশায় গৃহকর্তা মান- সম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে এদের বাড়িতে আশ্রয় দিত। মেয়ের জীবন প্রতীক করবী গাছটার কাছে এসে দাঁড়ায়, গাছটির একটি ডাল ঝটকানি দিয়ে প্রতিবাদ করে। তবুও কিছু টাকার আশায় ঐ বগাটে ছেলেদের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে বাধ্য হয়। ঘুমের মধ্যে কেবল বাড়ির মুরগিগুলো কঁ কঁ করে প্রতিবাদ জানায়।

বুড়ো জীবন নিয়ে হতাশ। শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত। তাই আক্ষেপের সুরে বলেন "মরে গেলেই তো হয় এখন, কি বলো তোমরা ?" বুড়ির উপর সমস্ত দায় দিয়ে সে জীবন ছাড়তে চায়। আর এই বখাটে ছেলেদের উপর বাড়ির সমস্ত দায়িত্ব দিতে চায়, কারণ এরাই সবসময় আসবে, অর্থ জোগাবে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে বুড়োর মুখ বহুরূপী হয়ে উঠে। সুহাস ভেবেছে, "বুড়োটা খুন করবেনে মনে হতিছে আমার।" কিছুক্ষণ পরে আবার বুড়ো বলে, "এখানে না খেয়ে মারা যেতাম তোমরা না থাকলে বাবারা!" বড় মেয়ে রুকুকে দেখিয়ে দেয়, তার হাতে চা খেতে বলে। কিন্তু তারা চা খেতে চায় না। তাদের শুধু চাই , শারীরিক সুখ। অবশ্য, তার সমস্ত ব্যবস্থা বুড়ো করে দেয়। বুড়ো তার বিনিময়ে চাদরে মোড়া নোট কেবল পাই। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে, কাঁপতে কাঁপতে বলে এখানে এসে 'করবী গাছ' লাগানোর কথা। তবে এই গাছ লাগানো উদ্দেশ্য ফুল নয়, বিচির জন্য গাছ লাগানো হয়, কারণ "চমৎকার বিষ হয় করবী ফুলের বিচিতে।" এই কথা বলার পরেই কান্নায় বুড়োর মুখ চোখের জলে ভেসে যায়।

এই কান্না, এই চোখের জল অভাব পীড়িত সমস্ত সমাজের। অর্থের অভাব যেখানে পিতৃ হৃদয়ের বাৎসল্য প্রেম ভেঙে দেয়। সমাজে হতাশা, গ্লানি আর অনৈতিকতা কীভাবে মানবতাকে ধ্বংস করেছিল, এই গল্প তার প্রমাণ। দেশভাগের পর, ভিটে মাটি ছেড়ে যারা কোন রকমে সংসার টিকিয়ে রেখেছিল, তাদের কাছে জীবন রক্ষা করাই বড়ো দায় হয়ে উঠেছিল। সেখানে মানবিকতা ক্ষয়িষ্ণু হয়েছিল। নিজের কন্যাকে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করতেও এই সমাজ বাধ্য করেছিল। তার অন্যতম দলিল এই গল্পটি।

'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পগ্রন্থের 'পরবাসী' গল্পেও গৃহহীন-ছিন্নমূল মানুষের কথা আছে। ১৯৬৪ সালে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে ভয়ংকর দাঙ্গা হয়। বিশেষ করে, খুলনার খালিশপুরের দাঙ্গা ছিল ভয়ংকর। এই দাঙ্গার প্রেক্ষাপটেই গল্পটি রচিত। কারণ, সে সময় বহু মানুষ গৃহহীন হয়ে পরবাসী হয়েছিল। অনেকের সংসার তছনছ আর বিপন্ন হয়েছিল। তবুও মানুষ লড়াই করেছে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে। তারা নিজের দেশকে কখনো ভুলতে পারেনি। এ যেন গল্পকার নিজের জীবনের কথাকেই তুলে ধরেছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র ওয়াজিদ যেন গল্পকার নিজে। যে সাম্প্রদায়িক মূলক কথা বলতে গিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের হাতে নিহত হয়েছে। অন্য এক চরিত্র বশির, যে চোখের সামনে নিজের স্ত্রী-সন্তানের মৃত্যু দেখেছে। ফলস্বরূপ তাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। বশির

যখন পালিয়ে আসে, ঠিক তখন দেখে এক ধুতিপরা লোক পিছন দিক থেকে আসছে। বশির কুড়ুল হাতে তাকে আক্রমণ করে। সীমান্ত রক্ষীদের টর্চের আলোতে রক্তাক্ত লোকটিকে দেখে বশির ওয়াজিদকে দেখতে পায়। এরপর বশির সমস্ত বিভেদ ভুলে গিয়ে মানবিক হয়ে ওঠে। ধর্মের মোহজাল ছিন্ন করে মনুষ্যত্ব বোধে জাগ্রত হয়।

এই দাঙ্গাপীড়িত মানুষের জীবন নিয়েই লেখা অপর একটি গল্প হল 'মারী'। ছয়ের দশকের দ্বিতীয় পর্বে লেখা এই গল্পে উদ্বাস্তু জীবন সমস্যাকেই তুলে ধরা হয়েছে। লেখক নিজের জীবনাভিজ্ঞতার আলোকে এই গল্পে রিফিউজি জীবনকথা তুলে ধরেছেন। এখানের নায়ক আসলে "অধঃপতিত অবক্ষয়িত সমাজের রূপচিত্র, যা পাঠকদের অনিবার্যভাবে টেনে নেয় বিষাদ গভীর গহ্বরে।" 'সুখের সন্ধানে' শীর্ষক গল্পটির বিষয়ও মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবন কথা। বাঙালি ঘরের বিবাহিত কুমকুমের পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যেও না পাওয়ার এক দীর্ঘ বেদনা এই গল্পের মূল বিষয়। মনস্তাত্ত্বিক এ গল্পটিতে বাঙালি নারীদের মনের কথাকে লেখক টেনে বের করেছেন। 'সারা দুপুর' গল্পটিও স্বতন্ত্র। কিশোর মনস্তত্ত্বের এক আত্মঘাতী ভাব গল্পে ফুটে উঠেছে। আর 'উটপাখি' গল্পে লেখক সমকালীন জীবন ও মৃত্যুর দর্শনকে তুলে ধরেছেন।

এই ভাবেই গল্পকার বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য রেখে মানবজীবনের বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতাকে গল্পের ফ্রেমে এনেছেন। যেখানে দেশভাগের ফলে ছিন্নমূল মানুষের করুণ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষ ভাবে এসেছে আর্থিক দুরাবস্থা ও নারী লাঞ্ছনার কথা। যেখানে মানবতা বারে বারে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। সমকালীন নেশাখোর যুব সমাজের কর্মহীনতা, শিক্ষাহীনতা ও চরিত্রহীনতা গল্পগুলিতে স্পষ্ট। প্রতিটি গল্পে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে লেখক ব্যক্তিগত জীবনকে প্রতিভাত করেছেন। দেশভাগের ফলস্বরূপ মানবিকতার যে ক্ষয়রোগ ধরেছিল, তার বাস্তব দলিল হল 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পগ্রন্থটি। এই গ্রন্থের জন্যই লেখক বাংলা ছোটগল্পের ভুবনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১। শ্রেষ্ঠ গল্প, হাসান আজিজুল হক, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা ২০০৮।
২। পঞ্চাশটি গল্প, হাসান আজিজুল হক, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ, কলকাতা।
৩। আত্মজা ও একটি করবী গাছ, হাসান আজিজুল হক, মুক্ত ধারা, ঢাকা, ১৯৬৭।
৪। বাংলা ছোটগল্পে দেশবিভাগ, সানজিদা আখতার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০২।
৫। হাসান আজিজুল হকের গল্পের সমাজবাস্তবতা, আবু জাফর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬।

অমিত মুর্মু

হাসান আজিজুল হকের গল্পে নারী-চেতনা : উত্তরণের ছবি

বাংলা সাহিত্যজগতে হাসান আজিজুল হক একজন উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিক। জন্মেছিলেন অবিভক্ত বাংলায়, কিন্তু পরবর্তীতে লেখককে চলে যেতে হয় পূর্ব বাংলায়। যার কারণে তার সাহিত্যকর্মে উঠে এসেছে এপার বাংলা ও ওপার বাংলার মানুষের জীবন চিত্র। স্বাভাবিকভাবেই তিনি দেখেছেন দেশভাগ—যার ফলে তৈরি হওয়া সংকট লেখককে বিচলিত করেছিল। তাঁর এইসব অভিজ্ঞতা রূপ পেয়েছে ছোটগল্পে এবং পরবর্তী সময়ে উপন্যাসেও। বস্তুত সমাজের বিকার, ক্ষমতাবানদের লোভ এবং অর্থশক্তির কাছে দারিদ্রের অসহায় আত্মসমর্পণ; একরকম এক নগ্ন সমাজ বাস্তবতার সামনে পাঠককে দাঁড় করিয়ে দেন হাসান আজিজুল হক। তাঁর গল্পে উঠে আসতে দেখি সমাজের শোষিত মানুষের হাহাকারকে। তাই নিম্নবর্গের মানুষের শোষণ, অন্যায় নিপীড়ন, দারিদ্র্যের যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষের মুখে প্রতিবাদের ভাষা ধারণ করলেন লেখক। তাঁর ছোটগল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে এই উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের বিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, রাজনীতি এবং ধর্ম; গল্পে উঠে এসেছে নিম্নবর্গের জীবনের পূর্ণরূপ, কৃষি পোশাকে অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ অন্যায় বাধা সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেলে প্রতিবাদে ফিরে পড়ার মধ্যে দিয়ে। নিম্নবর্গের মানুষ নীরবে সবই সহ্য করবে এমন নয় তাদের প্রতিবাদী মনোভাবও রয়েছে যার গভীর প্রকাশ ঘটাবেই নানা আচরণকে অবলম্বন করে।

উচ্চবর্গের নির্মাণের খোলসটা কোন ঐতিহাসিক নয়, প্রকৃত অর্থে খসিয়ে দিতে পারেন একজন স্বার্থহীন দায়বদ্ধ সাহিত্যে স্রষ্টা। হাজার হাজার ইতিহাসের দলিল যা পারে না একটি সাহিত্য স্রষ্টা কিন্তু নিম্নবর্গের ক্ষেত নির্মাণের ক্ষেত্রে তা সহজ সম্ভব করে তুলতে পারে। হাসান আজিজুল হকের সাহিত্য ঠিক তাই করেছেন, তাঁর ছোটগল্পে নিম্নবর্গের পাওয়া না পাওয়া, দারিদ্র্য, শোষণ, প্রতিবাদ বেশ জোরালো। আর এগুলির ফলস্বরূপ বা বলা ভালো এগুলিকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ঘটনা কার্যকারণ সূত্রে ঘটেছে সেগুলোরই বাস্তব রূপায়ণ আমরা তার গল্পে দেখতে পায়।

হাসান আজিজুল হকের গল্পে নারীর আত্মপ্রত্যয়ী রূপ লক্ষণীয়। তিনি কামনা করেছেন নারীর স্বাধীনতা। ইতিহাস, ধর্মগ্রন্থগুলো নারীকে 'সাবজেক্টিভ' করে রেখেছে, সব ধর্মই তাদের ভোগ্যসামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করেছে। নারীর মুক্তি নেই, নেই স্বাধীনতা। যাকে তিনি প্রশ্নবিদ্ধ করেন। তাই তার গল্পে তিনি নারীকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি মনে করেন নারী আমাদের পুরুষ শাসিত সমাজের শোষিত হচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে তারা শোষিত হচ্ছে, সমাজ তাদের সম্মান নেই, তাদের ইজ্জত নেই নিরাপত্তাও নেই। তাই তার গল্পে অধিকারবোধ, নিজস্ব ভালোলাগার প্রাধান্য, সমাজের নিয়ম বহির্ভূত যৌন মিলন, তীক্ষ্ন

বুদ্ধির অধিকারী, সাহসী প্রতিবাদী হিসেবে নারীরা নির্মিত। তবে এসবের পাশে গদ বাঁধা ফ্রেমে আবদ্ধ নারীরও পরিচয় মেলে। হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে নারীর দুটি অবস্থানের কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একদিকে আছে নিম্নবর্গের আবরণযুক্ত নারী আর অন্যদিকে আছে নিম্নবর্গের আবরণমুক্ত নারী। যে নারীরা প্রচলিত সমাজ কাঠামোর নিয়ম মেনে, তার অধীনে থেকে চালিত, নিজস্ব প্রকাশ বৈচিত্র্য নেই, ব্যক্তিত্ববোধের ঘাটতি যাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বাস্তবতার সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই বা রূঢ়বাস্তব থেকে যারা পালিয়ে আসতে চায়। তাদেরকে আমরা এখানে নিম্নবর্গের আবরণযুক্ত নারী হিসেবে তুলে ধরতে চাই। অন্যদিকে সমাজের প্রচলিত কাঠামোয় নিজেকে নির্মাণ করেনি যারা। যারা নিজের ভালোলাগাকে প্রাধান্য দিয়েছে। ভেঙেছে সমাজের চাপানো নিয়ম। নিজের অধিকার সম্পর্কে যারা সচেতন, যারা এই পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য পিছপা হয়নি। শেষ অব্দি লড়াই করে গেছে। তাদেরকেই আমরা এখানে নিম্নবর্গের আবরণমুক্ত নারী হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছি।

এখানে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে লেখক এখানে নিম্নবর্গ বলতে শুধু সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়াকেই বোঝাতে চাননি। এখানে নিম্নবর্গের তাত্ত্বিক সংজ্ঞাকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন লেখক। লেখকের চোখে আর্থিক দিক থেকে বিভাজিত নিম্নবর্গের সীমানাকে অতিক্রম করে এই পুরুষ-শাসিত সমাজে শোষিত ও নিপীড়িত নারীদের চিহ্নিত করতে চেয়েছেন নিম্নবর্গ রূপে। প্রকৃত অর্থে নিম্নবর্গের সমান্তরালে তারাও নিম্নবর্গ হয়ে যাচ্ছে, যেই নারীরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত, যাদের নানানভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ শোষণ করে যাচ্ছে। আর এই বঞ্চিত নারীদেরকেই লেখক এখানে নিম্নবর্গের বলতে চেয়েছেন।

ঠিক এই ভাবেই 'মন তার শঙ্খিনী' গল্পে আমরা দেখি হামিদা সংসারের জালে বাঁধা, সমাজের অনুশাসনে বাধা। যার কারণে এই সমাজের নিয়ম-কানুন অতিক্রম করে সে তার মনের অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করতে পারে না। তার কাঙ্খিত পুরুষ শাদু সে বলতে পারে না তার মনের কথা। যতবারই সে তার মনের কথা শাদুকে বলতে চেয়েছে ততবারই সে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে নিজের মধ্যে। তাই তার মন হাজারও দুঃখের ঢেউ-এ উথাল পাথাল হলেও সে কিন্তু সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে তার মনের ভাবকে প্রকাশ করতে পারে না। তাই গল্পে আমরা দেখি

"হঠাৎ হু হু করে কেঁদে ওঠে মেয়েটি। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, আমার যে বিয়ে হয়ে গেলচে, আমার যে সোয়ামি আছে।"[১]

এসব শোনার পরেও শাদু তাকে সংসার ছেড়ে তার কাছে চলে আসতে বলে। কিন্তু কিছুতেই হামিদা এই পুরুষশাসিত সমাজের বেড়াজালকে টপকে আসতে পারে না। তার মধ্যে একটা অজানা আশঙ্কা আছে। তা সত্ত্বেও সে আসতে পারে না তার ভালবাসার মানুষটার কাছে। তাই শাদু বলে

"তাকে তো তু ভালোবাসিস না,
না
ভালো না বাসলে আর সোয়ামি কী?
আর ভালবাসলে সোয়ামি না হলেই বা কী?
ছি, উকথা বলিস না।"[২]

এই শেষ লাইনটি উচ্চারণের মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট হয় হামিদা এই সমাজের শাসনকে ভয় পায়। নিয়মকে মানতে বাধ্য হয়। তাই যখন শাদু তাকে তার স্বামীকে ছেড়ে তাকে বিবাহ করার কথা বলে। তখনই সমাজের অনুশাসন যেন তাকে এসে আঁকড়ে ধরে।

তারপরও কিন্তু শাদু বিবাহ করতে চেয়েছিল হামিদাকে। পালিয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব পর্যন্ত দিয়েছিল হামিদাকে। এতেও সে হামিদাকে রাজি করাতে পারেনি। হামিদা এর উত্তরে ব্যঙ্গের সুরে শাদুকে বলে—

"আহা রে, ওরে আমার গোঁসাই চোখ ঘুরিয়ে, কোমর দুলিয়ে একটা বিশ্রী ভঙ্গি করে উঠেছিল হামিদা, যেখানে আমার বিয়ে হচ্ছে সিখানে আমাকে কি কি গয়না দিচে জানিস। জানিস কয়টো শাড়ি দিচে? তোর আজ খেতে কাল নাই, হাড়েহাবাতে, তোর বাড়ি যেয়ে তোর মায়ের বাঁদী হবো লিকিন?"[৩]

এই ভয় হামিদাকে সারাক্ষণ তাড়া করে বেরিয়েছে। তাই এই কথাগুলি সে উচ্চারণ করতে পারে। যতবারই শাদু সব প্রথা ভেঙে হামিদাকে আপন করতে চেয়েছে ততবারই হামিদা গ্রাম্য নীতিবোধের কথা বলে শাদুকে থামিয়ে দিয়েছে। তার সাহস দেখানোর কথা আমরা এখানে পাই না। এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে হামিদা নিজের চাওয়া পাওয়া, ভালো লাগাকে প্রাধান্য দিতে পারেনি। তাইতো হামিদা বলে—

"ছি, উ কথা বলিস না। সোয়ামি সব সোমায়েই সোয়ামি।"[৪]

ঠিক এর বিপরীত একটি প্রতিক্রিয়া গল্পের শেষে এসে পাওয়া যায়। লেখক যেন এই চমকটাই পাঠকের জন্য সাজিয়ে রেখেছিলেন খুব যত্ন করে। গল্পের শেষে দেখি হামিদা প্রকৃতই ভালোবেসেছিল শাদুকে। কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে, সমাজের ভয়ে, নিজের পরিবারের কথা ভেবে সাহস করে শাদুকে বলতে পারেনি কোনদিন যে, তাকে ভালোবাসে সমানভাবে সেও। হামিদা পারেনি তার মনের কথা শুনতে। যার কারণে অপমানিত হতে হয়েছে শাদুকে গোটা পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে স্বামীর অবর্তমানে গর্ভবতী হওয়ার অপমান থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সে আশ্রয় নেয় এক ছলনার। যার শিকার হয় শাদু। যেখানে দেখি শাদু সেই অপমান, অপবাদকে মুখ বুজে সহ্য করে গেছে। আর এই অপমান, অপবাদকে সহ্য করে নেওয়ার ঘটনায় যার বুক সব থেকে পোড়ে, যার কষ্ট সবার থেকে বেশি সে হলো হামিদা। তাই তার স্বামীকে নিয়ে যখন শ্বশুর বাড়িতে চলে যাওয়ার মুহূর্তে শাদুর সঙ্গে দেখা করতে আসে তখন, তার গলা দিয়ে সেই আক্ষেপের,

অভিমানের সুর ভেসে ওঠে; আর প্রমাণ করে দিয়ে যায় শাদুর প্রতি তার ভালোবাসাকেও। হামিদা বলে,

"আজ যেচি আমি সোয়ামির বাড়ি, তোর ছেলে রইল আমার প্যাটে। খানিকটো শোধ দেলোম"[৫]

আবার অন্যদিকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে দুই বোন দুই সহোদরা তারা নিজেদের স্বামীদের বিরুদ্ধে, ছেলেদের বিরুদ্ধে কোন কথাই বলতে পারে না। তারা প্রতিবাদ করলে হয়তো তাদের সিঁথির সিঁদুর বেঁচে যেত। কিন্তু তারা যে সমাজে নারী হয়ে জন্মেছে তাই তাদের পাপ। তাই স্বামীর উপর কথা বলতে পারেনি। এই প্রতিবাদ করতে না পারার মানসিকতা নিয়ে তারা বড়ো হয়েছে। তাই গল্পের শেষে তারা বিধবা হয়েছে। নরখাদকের হাতে তাদের সম্মান নষ্ট হয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা একটা আওয়াজ পর্যন্ত তোলেনি। এই অত্যাচারকে, নিপীড়নকে একপ্রকার শোষণকে তারা মুখ বুজে মেনে নিয়েছে। দুই বোনের স্বামী দুটি বিপরীত রাজনৈতিক মতাদর্শের সমর্থক হওয়ায় তাদের মধ্যে দেখা দেয় সংঘর্ষ। একই রকম ভাবেই তাদের দুই পুত্রের মধ্যেও দুই বিপরীত রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে বৈরিতা তৈরি হয়। যার ফলে তাদের দুই বোনের সংসারে নেমে আসে দুঃখের দিন। আর এই ফলস্বরূপ দুই বোন বিধবা হয়, পতিহারা হয়। তাই লেখক বলেন—

"এখন তারা দুই বোন কি করবে? এই দুই মা কি করবে? তাদের দেশ নেই, সমাজ নেই, মানুষ নেই, মানুষকে ভালোবাসার অধিকার নেই, ঘৃণা করারও অধিকার নেই, তাদের স্বামী নেই, পুত্র নেই, যদিও থাকেও তাতে কিছু মাত্র অধিকার নেই। তারা রাঁধে বাড়ে, স্বামীপুত্রকে খাওয়ায়, নিজেরা খায় কি খায় না। তারা আদেশ করে না, আদেশ মানে। তবু মানুষ যে তারা, কেমন করে দূরে থাকে, স্বামী মরবে, পুত মরবে, পথিক কঠিন কষ্ট, অতি তীব্র বিষ তাদের দেহে যতটা ধরে তার চেয়ে বেশি জোর করে ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের মুখ সেলাই করে দেওয়া হবে, কিন্তু মরবার অধিকার তাদের দেওয়া হবে না।"[৬]

স্বাভাবিকভাবেই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তারা হিন্দু মুসলিম এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার। তাই এই যুদ্ধে তারা স্বামী পুত্র হারিয়ে এখন সর্বস্বান্ত। তাদের দেশ নেই, তাদের কোনো অধিকার নেই, তাদের স্বামী এবং সন্তানের প্রতি হওয়া অন্যায় অত্যাচার মুখ বুঝে সব সহ্য করে গেছে। তারা তাদের সন্তান ও স্বামীদের এই মারণ যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে বলতেও যেন বুকের মধ্যে সাহস খুঁজে পায়নি। তাদের একমাত্র পাপ যে, তারা এই সমাজে নারী হয়ে জন্মেছে। তাই পুরুষের ওপর নারীর কথা বলার অধিকার নেই। বড় বোন রাহেলা ভয় পায় পুরুষজাতিকে। তার পুত্র রাহেলিল্লাহ যখন একটি হিন্দু মেয়েকে জোর করে ধরে নিয়ে আসে এবং তাকে বিয়ে করবে বলে ঘরে তালা বন্দী করে রাখে তখনও রাহেলা একজন নারী হয়ে, একজন মা হয়ে তার সন্তানকে প্রশ্ন করার সাহস পায়নি। দুই বোন তারা মেনে নেয় তাদের জীবনের সব সুখ জীবন থেকে উধাও হয়ে

গেছে, আশা-আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে গেছে। তাদের এই অসহায়তায় ভরা জীবনকে মেনে নিয়েই বাকি জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে প্রস্তুত এবং মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে দুই বোন। গল্পের শেষে এসে আমরা দেখি লেখক আমাদের বলেন এই দুই বিধবা নারীর যন্ত্রণাকাতর কাহিনী "রাহেলা নিজের হলুদ-গোলা হাঁড়িটা সামনে রেখে বসেছিল, সালেহা তখন পাগলের মতো, কখনো দুহাত কাজে লাগিয়ে হলুদ রেখায় রেখায়, লতায় পাতায়, ফুলে, ফলে, মানুষের শিশুতে, ছাগল গরু কুকুর শিয়াল, থালা-বাসন সানকীতে, ধানের গমে চালে ডালে, চাল মাপার কুনকিতে, পিতলের ঘটি বাটি-ঘড়া, চাঁদ সদাগরের নৌকা আর বেহুলার ভেলা, সাহেবালির জন্য একটি কন্যে, ধান-দূর্বা, এলাহী ভরসা, বট অশত্থের পাতা, মাছ আর হরিণ আর শিকায় রাখা হাঁড়ি সেইসব উবুড় হয়ে পড়ে তার সারা জীবন এঁকে গেল।"[৭]

অর্থাৎ লেখক বোঝাতে চাইলেন এই দুই নারীর আর কোনো আলাদা জবাব নেই এর বাইরে। এর বাইরে জীবনের অর্থ নেই তাদের কাছে, লেখক গল্পের শেষে এসে আরো যেন পাঠকের কাছে পরিষ্কার করে দিয়ে যান তাদের স্বাধীনতা নেই। এই দীর্ঘ সময়পর্বে তাদের সঙ্গে যা ঘটে গেছে তাকে তারা তাদের ভাগ্যের পরিহাস বলে মেনে নিয়েছে এবং মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করছে এই দুই বোন।

অন্যদিকে 'কোথায় ছোবল' গল্পের আখ্যান এক উকিলের বাড়িতে যাওয়াকে কেন্দ্র করে। রিক্‌শায় যাত্রা শুরু এবং এই রিক্‌সার মধ্যেই নানান ঘটনা ঘটতে থাকে যার মধ্যে দিয়ে লেখক তাঁর বার্তাকে পাঠকের মাঝে পৌঁছাতে চেয়েছেন। আর এই চলন্ত বাহনের উপরেই কিছু নর-নারীর চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরেছেন। সম্পর্কের টানাপোড়েনে তাদের মানসিক দিক উন্মোচিত হয়েছে। এখানে দেখি হামিমকে পাওয়ার জন্য ঝুমু তার সব কিছু উজাড় করে দিতে চায়। তার স্বাভিমান ত্যাগ করেও যেন ঝুমু এখানে হামিমকেই আঁকড়ে ধরতে চায়। এখানে ঝুমুর ব্যক্তিত্বহীনতাই প্রকাশ পেয়েছে। ঝুমু বলে,

"মনই দিয়ে দিতে পেরেছি, শরীর দেব সে আর বেশি কি?

বাঃ রে—মন সর্বস্ব কন্যা হামিম ভাবে। তারপর আবার শুরু করে, ধরো তারপরে আর বিয়ে হলো না কিংবা আমি বিয়ে করলাম না তখন?

তখন? ঝুমু নির্বিকারভাবে বলে, মানুষের মরতে আর কতক্ষণ লাগে?"[৮]

এই কথার মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঝুমু এখানে সেই সামাজিক নিয়ম-কানুন থেকে বেরিয়ে আসতে বা অতটাও আধুনিক হয়ে উঠতে পারেনি। যেখান থেকে সে বেরিয়ে এসে ইতিবাচকতার দিকে ইঙ্গিত করতে পারে। হামিমের কথার বিরুদ্ধে যেখানে আওয়াজ তোলার কথা ছিল সেখানে সমাজের অনুশাসনের জালে আটকে যায় ঝুমু। আবার এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে জাকিয়ার স্বীকারোক্তি আমাদেরকে গভীর সংশয়ের মধ্যে

নিক্ষেপ করে। যেখানে জাকিয়া হামিমের প্রতি দুর্বলতাকে শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করে ফেলে। কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। এখন তারা দুজনই অন্য পথের পথিক। জাকিয়া বিবাহিত আর হামিম-এর বিয়ে ঠিক হয়েছে। সামাজিকতার খাতিরে জাকিয়া হামিমকে তার মনের কথা বলতে না পারার করুণ পরিণতি এখন জাকিয়াকে কীভাবে দ্বগ্ধ করে সেটাকেই লেখক এখানে দেখাতে চেয়েছেন।

আবার এর উল্টোদিকে লেখকের কিছু গল্পে এই নিম্নবর্গের আবরণমুক্ত নারীদের অকপট স্বীকারোক্তি আমরা দেখতে পাই। যা তাদের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছুর বিরুদ্ধেই তারা কীরকমভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে। সেই অন্যায় অত্যাচার অবিচারের প্রতিবাদ জানিয়েছে। সেরকমই একটি গল্প হল 'জীবন ঘষে আগুন'—যেখানে বাগদীদের অর্থাৎ নিচুজাতের এক নারীকে আমরা দেখি যে, সমাজের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে, নিজের পেটকে, নিজের অসুস্থ স্বামীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সমাজের অনুশাসনকে, সমাজের বেড়াজালকে অতিক্রম করছে। তার কাছে সমাজের ভয়, অনুশাসনকে উপেক্ষা করে বেঁচে থাকাটাই এখন প্রধান হয়ে উঠেছে। তাই রাতের অন্ধকারে তথাকথিত শিক্ষিত উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের এক যুবক যখন তাকে টাকার লোভ দেখিয়ে তার শরীরকে ভোগ করতে চায়, তখন সে নারী তাকে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন বানে জর্জরিত করতে থাকে। সে জানে তার কাছে বেঁচে থাকার অর্থ কী। বেঁচে থাকতে হলে তাকে রোজকার করতে হবে। তাকে সমাজে টিকে থাকতে হলে তার শরীরকে টিকিয়ে রাখতে হবে, নিজের মর্যাদাকে বিক্রি করে দিয়ে নিজের জীবনকে বাঁচাতে চেয়েছে এই কালী। তাই দেখি অকপটে তাকে প্রশ্ন করে—

"আমরা দ্যাখো শুয়োর খাই—কী বলো, শুয়োর খেয়ে থাহি মোরা, তাবাদে ধরে গিয়ে আমরা যমের অরুচি লিচুজাত। লিচু কাজকর্মো করি, জাত বেবসা ছেড়েছি গঁ, আর মোরা জেলে লই, চাষবাস ধরেছি একন। ই সবই তো ছোট কাজ, লয়? একন মোদের পেটে ভাতও নাই, পরনে কাপড় নাই। ছোট জেতার সবেতেই দোষ। তবে একটোতে বোধায় দোষ নাই—কি বলো বাবু?

কিসে দোষ নাই?

ছোট জেতের মিয়েতে দোষ নাই। ঠিক কথা লয়, বাবু। মিয়েগুলো খায় না দায় না তোবু তাদের গতর হয় ধাড়ি শুয়োরের মতো লয়? ভারী মজার কতা বটে!"[৯]

এখানে রাতের অন্ধকারে এই অসহায় নারীটি ঘন্টাবাবুকে ব্যঙ্গের তীরে বিদ্ধ করতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে। তার বিবেক আছে বলেই, সে বিদ্রোহী বলেই তাকে এই ধরনের প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করতে পেরেছে কালী। তাই কালির বাড়ি যাওয়ার রাস্তার মাঝেই ঘণ্টাবাবু যখন তার হাত ধরতে যায় ঠিক তখনই প্রতিবাদ করে উঠেছিল। লেখক সেটির বর্ণনা আমাদেরকে দিচ্ছেন এইভাবে—"হাতটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এই ভাবে যে বাবুর কাঁধের কাছে একটি খিঁচ ধরা

ব্যথা বিঁধেছিল...সেই সঙ্গে তপ্ত বাক্য ঢ্যামনা মিন্‌সে ঘরের আগে মোর গায়ে হাত দিলে ভালো হবে না বলছি।"[১০]

একজন অসহায় নারী যে কিনা শুধু মাত্র বেঁচে থাকার জন্যই এই কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছে। তা সত্ত্বেও কিন্তু তার আত্মমর্যাদায় একটুও খামতি দেখা যায়নি। তাই রাস্তায় তার হাত ধরলে সে বিষাক্ত সাপের মতো ফণা তুলে প্রতিরোধ করে। এই জোর জবরদস্তিকে কালী কোনোমতেই প্রশ্রয় দেয়নি। গল্পের শেষে এসে দেখি, যে ঘরে কালি এসে ওঠে সেই ঘরের এক কোণে তার স্বামী শয্যাশায়ী। এখান থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সে বাস্তব সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবগত। কারণ আবেগ দিয়ে পেট চলে না। বেঁচে থাকার জন্য লাগবে অর্থ, খাদ্য ও বাসস্থান, তাই সে সমাজের নিয়ম-কানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে টাকা রোজগারের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই করেছে।

অন্যদিকে 'পাবলিক সার্ভেন্ট' গল্পে শায়েলার গলায় প্রতিবাদের সুর চড়তে দেখি। সে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে দাঁড়িয়ে একজন পুরুষের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে। তার মধ্যে আর সেই ভয় বা সমাজ কী বলবে সেটা আর কাজ করছে না। শায়েলা এখানে একজন আত্মমর্যাদা সম্পূর্ণা নারী। তাই সে তার দাবি নিয়ে, প্রশ্ন নিয়ে নিজের স্বামীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার স্বামী অর্থাৎ মামুনকে সে বলে

"স্ত্রীর সম্মান বলে তোমার কাছে কিছু নেই। আমি সেটা ভালো জানি। তোমার নিজের সম্মানও তোমার কাছে এতটুকু নেই। একটা কেন্নো বা একটা গিরগিটির সঙ্গেও তোমার তুলনা চলে না, সেটা সারা দেশের কেউ না জানলেও আমি জানি। ছ্যাকড়া গাড়ির গাড়োয়ান হয়ে চাবুক হাঁকডাচ্ছ, ভাবছ।"[১১]

এখানে সাহেলা পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তাদের আত্মমর্যাদায় ঘা লাগলে নিজের স্বামীকেও ছাড়ে না। পুরুষ জাতিকে সে ভয় পায় না। প্রশ্নের বাণ সে ছুঁড়ে দিতে পারে। তার মুখে এই দৃপ্ত উচ্চারণ আমরা লক্ষ্য করি। উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে তার স্বামী অবাক হয়ে যায় মামুন, তার ২২ বছরের বিবাহত জীবনে স্ত্রী শায়েলার এইরকম মূর্তি এর আগে কখনো দেখেনি। যার কারণে মামুন অবাকই হয়ে যায়। আর এই বিষয় লেখকের ভাষায় হয়ে উঠেছে—

"বিশ্বাস করা কঠিন হচ্ছে মামুনের পক্ষে যে এইসব কথা তার অতি লক্ষ্মী দেবী-দেবী চেহারার বউ তাকে শোনাচ্ছে। বাইশ বছরের বিবাহিত জীবনে যে শায়েলাকে সে চিনেছে আজ যেন তাকে খুবই নতুন মনে হচ্ছে।"[১২]

হ্যাঁ মামুনের কাছে এই শায়েলা নতুন। এই শায়েলা প্রতিবাদ করতে জানে, তার বিরুদ্ধে হওয়া অন্যায় অত্যাচারের। এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তার বিরুদ্ধে হওয়া সমস্ত রকমের নিপীড়নের বিরুদ্ধে সে আজ সামনাসামনি দাঁড়িয়েছে যার কারণে মামুন অবাকই হয়।

আবার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ঘরের মেয়েরা ঘরেই বসে থাকেনি। তারা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে সামিল হয়েছে যুদ্ধে। পুরুষের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে, তালে তাল মিলিয়ে তারা পাকিস্তানি বর্বরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এই বিদ্রোহে তারা নেমেছে বিনা দ্বিধায় নিজের ইচ্ছায়। সেরকমই আরেকটি চরিত্র হল 'আমরা অপেক্ষা করছি' গল্পের মুকুলের স্ত্রী। যেখানে মুকুলের স্ত্রী গর্ভবতী হওয়া সত্ত্বেও রুনু আর তারেকের সঙ্গে পাকিস্তানি দালালদের নিকেশ করতে গভীর রাতে বেরিয়ে পড়েছে। তার গর্ভে তখন মুকুলের সন্তান। কতটা অত্যাচার হলে সহ্যের বাঁধ ভেঙে যায় এবং এরকম অবস্থায় এক নারী তার এবং গর্ভে আর একটি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বিপ্লবীদের সাহায্য করতে। তারেক বলে "মহিলা যখন হাতের উপর ভর দিয়ে ছইয়ের ভিতরে ঢুকছিলেন, আবছা হলেও আমি বুঝতে পারলাম তাঁর নাড়াচাড়া করতে কষ্ট হচ্ছে। আমি জানতাম, কিছুদিনের মধ্যে বাচ্চা হবে তার।"[১৩]

এখানেই সে থেমে থাকেনি। শত্রুপক্ষের হঠাৎ উপস্থিতিতে বিপদসঙ্কুল নদীতে নৌকা ভাসিয়েছে। তার চোখের সামনে তার ভাইকে অত্যাচারীরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। মনের মধ্যে পাথর রেখে সেই দৃশ্য সে দেখে গেছে। তার পরেও সে পিছিয়ে আসেনি বা ভয় পেয়ে যায়নি। এখানে যেমন সে মুকুলের স্ত্রী আবার একজন জননীও। দেশের বীরাঙ্গনা হিসাবে আমাদের সামনে লেখক এই চরিত্রটিকে উপস্থিত করছেন। যে কিনা নিজের জীবন তুচ্ছ করে পুরুষের মতোই নিজের বীরত্ব দেখিয়েছে।

সুতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি হাসান আজিজুল হকের এই সমস্ত গল্পগুলিতে মূলত নারীদেরকে সামনে রেখে তার বক্তব্যকে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। একদিকে যে নারীরা সমাজের প্রচলিত প্রথাকে শিরোধার্য করে সারাজীবন অতিবাহিত করতে প্রস্তুত ঠিক তার বিপরীতে আর এক শ্রেণির নারীকে দাঁড় করিয়ে আমাদের সামনে এক দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চেয়েছেন লেখক। আর তাই অর্থনৈতিক বিবেচনায় সমাজের অবহেলিত দরিদ্র, পতিত মানুষদের সংকট, রাজনৈতিক বাস্তবতা, সামাজিক আন্তঃক্রিয়া চিত্রায়নে হাসান আজিজুল হক নিজের মুন্সিয়ানায় স্বকীয়।

তথ্যসূত্র :

১। হক, হাসান আজিজুল, 'গল্পসমগ্র ১', ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ৩৩ ২। তদেব ৩। তদেব, পৃ. ৩৫ ৪। তদেব, পৃ. ৩৭ ৫। তদেব, পৃ. ৩৯ ৬। হক, হাসান আজিজুল, 'গল্পসমগ্র ২', ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ২০২ ৭। তদেব, পৃ. ২১৬ ৮। তদেব, পৃ. ২৬৫ ৯। হক, হাসান আজিজুল, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', কলকাতা, অনুষ্টুপ, মার্চ ২০০৯, পৃ. ১৬৭ ১০। তদেব ১১। হক, হাসান আজিজুল, 'গল্পসমগ্র ২', ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ১২৫ ১২। তদেব, পৃ. ১২৫ ১৩। তদেব, পৃ. ৮৩

মা ন সী কু ই রী

রাজনৈতিক সংকটের ভিন্নরূপ : রমানাথ রায়ের 'কাঁকর' গল্প

ছোটগল্পের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যের জগতে রমানাথ রায়ের হাতেখড়ি। মানুষ তাঁর গল্প আনন্দের সঙ্গে পাঠ করুক — এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। লেখার মধ্য দিয়ে একদিকে চাপা কৌতুক আর অন্যদিকে জীবনের গভীর সত্য তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। কৌতুককে হাতিয়ার করে দুঃখের মুখোমুখি দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ রমানাথ রায়। তিনি লিখলেন —

"দুঃখের মুখোমুখি দাঁড়ানো প্রয়োজন। কিন্তু কিসের জোরে? কোন অস্ত্রে? আস্তে আস্তে বুঝলাম পরিহাস বা কৌতুকই হতে পারে সেই অস্ত্র যার আঘাতে দুঃখের ধার ভোঁতা হয়ে যায়। মারাত্মক কোনো দুঃখও হয়ে ওঠে সহনীয়।"[১]

এই স্বতন্ত্র ধারা নিয়ে সাহিত্য রচনায় নেমে পড়লেন শাস্ত্র বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ রমানাথ রায়। ঠিক যেভাবে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে, কালের নিয়মে বাঁকবদল ঘটে চলেছে, বাঁকবদলের সেই ধারায় নিজেকে ব্যতিক্রম হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন। 'এই দশক' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ষাটের দশকেই সাহিত্য সৃষ্টিতে তিনি নেমে পড়লেন। সমসাময়িক লেখকেরা যখন পূর্বসূরীদের ধারাকে অনুসরণ করে চলেছেন সেই সময় রমানাথ রায় অন্য পথের পথিক। যদিও এই পথের পথিক তিনি একা নন। শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে রমানাথ রায় ছাড়াও যাঁদের নাম জড়িয়ে রয়েছে, তাঁরা হলেন— সুব্রত সেনগুপ্ত, কল্যাণ সেন, আশীষ ঘোষ, শেখর বসু, অমল চন্দ, বলরাম বসাক, সুনীল জানা প্রমুখ। তবে এই আন্দোলনের মূল কর্ণধার ছিলেন রমানাথ রায়।

আমাদের এদেশীয় সাহিত্য রচনায় কমবেশি কৌতুক লক্ষ করা গেছে যাঁদের লেখায়— বড়ু চণ্ডীদাস, মুকুন্দ চক্রবর্তী, বঙ্কিম ও ত্রৈলোক্যনাথ প্রমুখ। এছাড়াও আধুনিক কালের লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুকুমার রায় ও পরশুরামের নাম উল্লেখযোগ্য। ছোটগল্পের ইতিহাসে ষাটের দশক একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এরকম স্বতন্ত্র ধারায় ছোটগল্প নিয়ে চর্চা এই দশকেই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি হয়েছে। সেই চর্চায় নিজেকে স্বতন্ত্র আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন রমানাথ রায়। বাংলা সাহিত্যে পূর্ববর্তী লেখকদের হাত ধরে তথাকথিত যে বাস্তববাদী সাহিত্যের ধারা চলে আসছিল সেই ধারা থেকে রমানাথ রায় নিজেকে সরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল গতনুগতিক ধারায় তাঁরা লিখবেন না। তাই রমানাথ রায় বাস্তবের সঙ্গে এক ধরণের ফ্যান্টাসি মিশিয়ে নতুন ধরনের সাহিত্য রচনা করতে চাইলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বর্তমান যুগকে যদি প্রকাশ করতে হয় তাহলে এই রীতির প্রয়োগ ঘটাতে হবে। তিনি ছোট ছোট সরল বাক্যের

মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনের গভীর সত্য প্রকাশ করতে শুরু করেন। জীবনের যে গভীর রহস্য, সেই গভীর রহস্যকে তিনি উদঘাটন করতে চাইলেন। জীবনের যাবতীয় সঙ্গতি-অসঙ্গতিকে ধরতে চাইলেন। আর তাই তাঁর লেখায় ব্যঙ্গ, কৌতুক বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে লেখকের লেখা সহজ সরল মনে হলেও মোটেও সহজ নয়। তিনি দেখালেন প্রত্যেক মানুষের ভেতরে আরেকটা মানুষ রয়েছে, সেই সত্তার মুখোমুখি তিনি দাঁড়ালেন, তাকে বের করে নিয়ে আনার চেষ্টা করলেন।

একটি মানুষের ভেতরকার মানুষটিকে তুলে ধরার জন্যই তিনি আশ্রয় নিলেন নতুন রচনা রীতি। তাই তাঁর লেখার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল চাপা কৌতুক। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁর লেখা পড়ে আমাদের ঠোঁটের কোণে ঈষৎ চাপা হাসি ফুটে ওঠে ঠিকই, কিন্তু পরক্ষণেই যদি সেই বিষয়টির ওপর অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলেই আসল রহস্য উদঘাটিত হয়। তিনি উপলব্ধি করেন, শুধুমাত্র দুঃখ কষ্টের গল্প পড়তে পড়তে কেমন যেন দুঃখ কষ্টের জোয়ারে ভেসে চলেছি আমরা প্রত্যেকেই। অথচ আমাদের নিজেদের জীবনের গভীরে যে দুঃখ জমাট বাঁধতে থাকে তাকে কেউ অস্বীকার করতে পারি না অথচ সেই দুঃখের জোয়ার নিয়েই জীবনের শেষ পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে যেতে হয়। কারণ সুখ- দুঃখের সমন্বয়ের মিলিত রূপই হল জীবন। কোনো একটাকে আমরা বেছে নিতে পারি না। বেঁচে থাকার জন্য রমানাথ রায় এই দুঃখময় জীবনকে অস্বীকার না করে তাকে পরিহাস করে বেঁচে থাকতে চাইলেন। আর তাই তাঁর গল্পের মধ্যে একটা চাপা কৌতুক প্রকাশ পেতে থাকল। এখানেই রমানাথ রায়ের বিশিষ্টতা।

রমানাথ রায়ের লেখা এরকমই একটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প হল 'কাঁকর'। গল্পটি ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থের একটি অন্যতম গল্প। লেখকের গল্পসমগ্র গল্পগ্রন্থের প্রথম খণ্ডতেই স্থান পেয়েছে এই গল্পটি। সাহিত্যিকদের দৃষ্টি পড়ে সমাজব্যবস্থার পরিকাঠামোর ওপরে। যখনই সেই পরিকাঠামোর অসামঞ্জস্যতা তাঁরা লক্ষ করেন ঠিক তখনই তাঁরা আঘাত হানে। গল্প বোনে, কবিতা লেখে ইত্যাদি। সেই অসামঞ্জস্যতার কোনো সমাধান করে দেওয়ার জন্য তাঁরা দায়বদ্ধ নন ঠিকই তবে কলম ধরার দায় কোনো অংশে কম বড় দায় নয়। সেই অসামঞ্জস্যতায় আঘাত করতে রমানাথ রায় বেছে নিলেন কৌতুক। তাঁর বেশির ভাগ গল্প উপন্যাসের মূল বৈশিষ্ট্য এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ। তাঁর 'কাঁকর' গল্পটি এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে রচিত। গল্পটি শুরু হয়েছে এইভাবে— হরিবাবুর কলকাতায় জন্ম। তিনি রেশনের চাল খেয়েই বড়ো হয়েছেন। কাঁকর ছাড়া তিনি এখন আর ভাত খেতে পারেন না। কারণ ছোটবেলা থেকে তিনি কাঁকর মিশ্রিত চাল খেয়েই বড়ো হয়েছেন। ভাতের সঙ্গে কাঁকর না পেলে হরি বাবু জানান, তাঁর নাকি পাকস্থলী তৃপ্ত হয় না। মেজাজও খিটখিটে হয়ে যায়। এই কথাগুলো পড়লে পাঠকের ঠোঁটের কোণায় এক চাপা হাসি ফুটে উঠবে। কিন্তু পরক্ষণেই হরিবাবু ও হরিবাবুর মতো সাধারণ মানুষের কথা মাথায় এলেই বুঝতে

পারবেন, এ আসলে লেখকের বিদ্রুপ। সাধারণ মানুষ দুর্নীতির শিকার। একসময় দুর্নীতিতে স্বীকার হতে হতে তারা এভাবেই অভ্যস্ত হয়ে যায়।

হরিবাবুও এই অভ্যাস থেকে বেরোতে পারলেন না। একদিন তাঁর স্ত্রী কাঁকর ছাড়া ভাত খেতে দিলে তিনি চিৎকার করতে শুরু করেন। কাঁকর ছাড়া তিনি ভাত খাবেন না। তিনি ঠিক করলেন যেভাবেই হোক তাঁকে কাঁকর জোগাড় করতেই হবে। এক বন্ধুর পরামর্শে তিনি কাঁকরের বদলে পাথরকুচি নিয়ে আসেন। সেই পাথরকুচি বাড়ির কারও পছন্দ হল না কিন্তু হরিবাবু খেতে বাধ্য। কারণ লেখক জানিয়েছেন—"হরিবাবু পয়সা খরচ করে পাথরকুচি কিনে এনেছিলেন। তাই ফেলতে পারলেন না।"[২]

ঠিক একইরকমভাবে যে চাল হয়তো সাধারণ মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত থাকে না কিন্তু তাঁদের খেতে হয়। সেই রেশন তাদের একমাত্র খাদ্য সংস্থান। তারা বাধ্য, কারণ সাধারণ মানুষ তা পয়সা খরচ করে কেনে। তাই যেভাবেই হোক তাদের খেতে হবে, ক্ষুধা নিবারণের জন্য। হরিবাবুও তাই খেয়ে ফেলেন। কিন্তু তিনি ঠিক করেন যেভাবেই হোক কাঁকর তাঁকে জোগাড় করতেই হবে। তিনি রেশনের দোকানে খবর নেন। কিন্তু কোনো উপায় হয় না। খাদ্যমন্ত্রীর কাছেও যান। গিয়ে দেখেন, ঠিক সেই সময় খাদ্যমন্ত্রীও কাঁকর খাচ্ছিলেন। সমস্যার কথা জানালে খাদ্যমন্ত্রী বললেন, এখন বাড়ানো সম্ভব নয়। বললেন—

"কারণ, এটা শুধু আজ একা আপনার সমস্যা নয়, এটা জাতীয় সমস্যা। আর তার মোকাবিলা সেভাবেই করতে হবে।"[৩]

এই প্রসঙ্গে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যে দুর্নীতি ও কালোবাজারি তা নিয়ে ১৯৫০ সালে লিখিত রাজশেখর বসুর প্রবন্ধ 'ভেজাল ও নকল' এর কথা স্মরণে আসে—

"রেশনের আটায় ভুসির পরিমাণ অত্যধিক। কোথা থেকে তা আসে? চালের সঙ্গে অনেক সময় এতো পাথর কুচি আর ভুসি পাওয়া যায় যে তাকে স্বাভাবিক বলা চলে না। এই ভেজাল কোথায় দেওয়া হয় তার খবর সরকারী কর্তারা নিশ্চয় রাখেন। তাঁরা কি প্রতিকারে অসমর্থ, না ওজন বাড়ানোর জন্যই ভেজালে আপত্তি করেন না?"[৪]

আজ স্বাধীনতার এত বছর পেরিয়েও কি মানুষ সেই সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়েছে? রাজশেখর বসু সামাজিক সচেতনতার কথা মাথায় রেখেই এই প্রবন্ধ লিখেছেন। এতদিনে এই সংস্কার সমাধান হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু সেই দুর্নীতি থেকে দেশ বা দেশের মানুষ কি মুক্তি পেয়েছে? 'কাঁকর' গল্পে লেখক তাই একে জাতীয় সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সত্যিই তো! এই সমস্যার কথা সাধারণ মানুষ কাকে গিয়ে বলবে? এই সমস্যা তো জাতীয় দিবসের মতো মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। এই সমস্যা নিয়েই সাধারণ মানুষদের থাকতে হবে। সমস্যা জাতীয় এবং চিরকালীন। খাদ্যমন্ত্রী উপায় হিসেবে আন্দোলনে নেমে পড়ার কথা বললেন। আন্দোলনই নেমে পড়লে হয়তো এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। হরিবাবু মনে মনে বলেন —

"জনসংখ্যা বেড়েছে। অথচ কাঁকরের পরিমান বাড়বে না, তা হয় না। বিশ বছর আগে চালে যে পরিমাণ কাঁকর থাকত এখনও তাই রেখে দেওয়া হয়েছে। এটা খুব অন্যায়। এর বিরুদ্ধে সত্যি কিছু করা উচিত। চুপ করে বসে থাকা উচিত নয়।"[৫]

মানুষ কি সেই গতানুগতিক ধারা থেকে বেরোতে পেরেছে? সত্যিই এর কোনো সুরাহা নেই, এই দুর্গম পথ থেকে মানুষের নিস্তার নেই। একইভাবে সেই রামপ্রসাদের সুরে আমাদের বলতেই হয় —'মা আমায় ঘুরাবি কত কলুর চোখ ঢাকা বলদের মতো।'[৬]

হরিবাবু আবার একদিন খাদ্যমন্ত্রীর কাছে যান। গিয়েই দেখেন খাদ্যমন্ত্রী কাঁকর খাচ্ছেন। হরিবাবু জানান, তিনি মরতে বসেছেন অখাদ্য পাথরকুচি খেয়ে, তারও কাঁকর চাই। কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। তিনি বললেন— "আপনি খাদ্যমন্ত্রী বলে নিয়মিত কাঁকর খেতে না পাওয়ার কষ্ট বুঝতে পারছেন না।"[৭]

এই কথাটিতে হরিবাবু যেন সপাটে এক চড় মারলেন সেই খাদ্যমন্ত্রীর গালে। সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার কষ্ট নেতা মন্ত্রীরা কোনোকালই বুঝতে পারেননি। তাঁরা সাধারণ মানুষের কথা ভাবেন না। তাই কাঁকর খেতে না পাওয়ার কষ্টও বুঝে উঠতে পারছেন না। হরিবাবুকে দিয়েই লেখক মন্ত্রীর দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। খাদ্যমন্ত্রীই আবার বলেন এখন আন্দোলনের কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে তিনি ফুড কর্পোরেশনের অফিসে বড়োকর্তার সঙ্গে দেখা করে ভিআইপি কোটা থেকে আপাতত হরিবাবুর জন্য এক মাসের কাঁকর ব্যবস্থা করে দেন। অবাক হতে হয় এই মন্ত্রীর বুদ্ধিবৃত্তি দেখে। আসলে তাঁরা সাধারণ মানুষকে বোঝার চেষ্টাই করেননি কোনোদিন। সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ বা বিদ্রূপ বুঝতে পারবেন সেরকম বোধ বুদ্ধিও তাঁদের নেই।

আসলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে নেতা মন্ত্রীদের কোনোদিনই কোনো যোগাযোগ থাকে না। একটা মানুষ কাঁকর খেতে চাইছে, তাঁকে কাঁকর দেওয়া হচ্ছে! হয়তো সচেতন নেতা বা মন্ত্রী থাকলে সেই খাদ্যমন্ত্রী বুঝতে পারতেন। এটা তাঁকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে। অর্থাৎ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক বা যোগাযোগ ভাল না হওয়ায় তাঁরা সূক্ষ্ম বোধ বুদ্ধি সম্পন্ন হননা। আর তাই হয়তো খাদ্যমন্ত্রী, হরিবাবুর বিদ্রূপ বুঝে উঠতে পারেননি। হয়তো বা বুঝতে পেরেও বুঝতে চাইছেন না। হরিবাবুর কথা সাধারণ মানুষের আর্তনাদ বলেই মনে হয়, তিনি বলেন— "আমরা আপনার কাছে কিছু চাই না। শুধু আমাদের কথা একটু ভাবুন। আমাদের মুখের দিকে একটু তাকান।"[৮]

কেন আজকে দাঁড়িয়েও রমানাথ রায়কে লিখতে হল হরিবাবুর কথা? হরিবাবুর মতো সাধারণ মানুষদের কথা? কারণ সাধারণ মানুষের দিকে ফিরে তাকানোর সময় নেই নেতা মন্ত্রীদের। যেখানে অনেক আগেই রাজশেখর বসু শাসকগোষ্ঠীর এই দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—"খাদ্য সম্বন্ধে সাধারণকে নিশ্চিন্ত করা সরকারের অবশ্য কর্তব্য।"[৯]

এই মাসে হরিবাবুর কাঁকরের ব্যবস্থা হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু পরের মাসে তার কি

হবে! এই কথা স্মরণ করে হরিবাবু চিন্তিত। বড়কর্তা জানিয়ে দেন—"কেন্দ্র থেকে প্রত্যেক রাজ্যে নাকি কাঁকর তৈরির কারখানা খোলা হবে।"[১০]

এ খবর পাকা খবর কি না, জানতে চান হরিবাবু। কিন্তু এ নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেন বড়কর্তা। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে হরিবাবু 'কাঁকর' হাতে বাড়ি ফিরলেন। হরিবাবুর মুখে হাসি। আসলে নেতা মন্ত্রীদের মুখোশ লেখক ছিঁড়ে ফেলে দিতে চেয়েছেন। বলা ভালো, ছিঁড়ে ফেলেছেন। যে চাইবে কেবল তার জন্য মন্ত্রী কাঁকরের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন, কিন্তু সবার জন্য কাঁকরের পরিমাণ বাড়াতে পারবেন না! লেখক কাঁকরের রূপকে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা রেশন বারস্থায় ঘৃণ্য শোষণের চিত্রটিকেই তুলে ধরেছেন গল্পের মধ্যে। যে সমস্ত মানুষ রেশনের চাল খেয়ে আসছেন, তারা জানেন তাদের এই কাঁকর মেশানো চালই সবদিন খেতে হবে। এভাবেই অভ্যাসের দাসে পরিণত হয়েছেন মানুষজন। তাই তো কাঁকর পাওয়ার কথাতে বা কাঁকর তৈরির কারখানার খবর পেয়ে খুশি হয়েছেন হরিবাবু। সত্যিই কি তিনি খুশি হয়েছেন? যেভাবে গল্পে আমরা হরি বাবুকে খুশি হতে দেখি, পাথরের টুকরো খাওয়ার জন্য কি মানুষ সত্যিই এরকম খুশি হতে পারে? এ আসলে পরিহাস! যে পরিহাস নামক হাতিয়ার হরি বাবু তথা সাধারণ মানুষের জীবনে অগ্রসরের পথকে সুগম করে তুলতে পারে।

বড়োকর্তার কাছ থেকে এই মাসের নিয়ে আসা কাঁকর পরিষ্কার করতে বসলেন হরিবাবুর স্ত্রী। সেই কাঁকর ভালো করে পরিষ্কার করেন গিন্নি, কারণ কাঁকরের মধ্যে ছিল— আরশোলার ডিম, টিকটিকির লেজ, মরা চামচিকে, দুশো গ্রামের মতো চালের ধুলো আর চালের ক্ষুদে। পাঠক এখানেই বুঝতে পারবেন, রেশনের চালের মধ্যে এগুলো থাকে! নাকি কাঁকরের মধ্যে এগুলো থাকে! একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে রেখে দিয়েছেন লেখক। সমাধান পাঠকের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন। লেখক গল্পের মধ্যে কাঁকর কিভাবে সাধারণ মানুষের জীবনে একটা অভ্যেসে পরিণত হয়েছে তাই এক আলাদা দৃষ্টি দিয়ে পাঠক-সমাজকে দেখিয়ে দিয়েছেন।

কাঁকর নিয়ে আসার পর, হরিবাবু সেই কাঁকর দেখে লোভ সামলাতে পারলেন না। ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রী-সহ সকলেই কাঁকর খেয়ে দেখলেন, এই কাঁকর অত্যন্ত সুমিষ্ট। হরিবাবু এই কাঁকর একাই খেতে চাইলেন। কাউকে না দিয়ে তিনি ঠিক করলেন একটু একটু করে একমাসে একাই খেয়ে ফেলবেন। কিন্তু দেখা গেল প্রায় দু ঘণ্টার মধ্যে দুই কিলো কাঁকর খেয়ে শেষ করে ফেলেছেন। বদহজম হয়ে শেষমেশ হরিবাবু মারা গেলেন। হরি বাবুর মৃত্যুতে গল্পের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। এই বদহজম, বা মৃত্যু — দুটোই রূপক। লেখক বলতে চেয়েছেন, হরিবাবু আসলে মারা যাচ্ছেন দুর্নীতিতে। অর্থাৎ দুর্নীতি কিভাবে মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রাকে নিচে নামিয়ে দিতে পারে তারই উজ্জ্বল উদাহরণ এই গল্পটি। সাধারণ মানুষের চাওয়া পাওয়া নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। সাধারণ মানুষ

কি পেলে তারা খুশি, আর কি না পেলে তারা দুঃখিত এসব বোঝার শক্তি তাদের নেই। ভোটকেন্দ্রিক যে বোধবুদ্ধি প্রয়োজন সেটুকুই তাঁদের সম্বল। এই গল্পে শাসকগোষ্ঠীর সূক্ষ্ম বোধ বুদ্ধি অভাব লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে দেখা যায়—

"হরিবাবুর মৃত্যুর একমাস পর কাগজের খবরে ছাপানো হয়—রেশনের চালে কাঁকরের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য সারাদেশের বিভিন্ন জায়গায় কাঁকর তৈরির কারখানা খোলা হবে। এর জন্য প্রায় সাতান্ন কোটি টাকা খরচ হবে।"[১১]

হরিবাবুর স্ত্রী এই খবর দেখে খুব কষ্ট পেলেন। মনে মনে তিনি ভাবলেন— "লোকটা বেঁচে থাকলে আজ কত খুশি হত! লোকটা কাঁকর খেতে বড়ো ভালবাসত।"[১২]

এইভাবেই গল্পের ইতি টেনেছেন লেখক রমানাথ রায়। গল্পের শেষেও লেখক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির থেকে এতটুকুও সরে আসেননি। তিনি শাসকগোষ্ঠীর খামখেয়ালিপনাকে তুলে ধরলেন। কাঁকরের জন্য আবার কারখানা! হয়তো লেখক দেখাতে চাইলেন সাধারণ মানুষ যেহেতু এই দুর্নীতিতেই খুশি হয়ে আছেন তাই তারা আরও বেশি করে এই দুর্নীতি করতে শুরু করেছেন। সাধারণ মানুষ যেভাবে বেঁচে আছেন, হয়তো আগামীদিনেও এভাবেই বেঁচে থাকবেন। লেখক তাঁর 'ব্ল্যাক হিউমার' প্রবন্ধে বলেছেন—"সাহিত্যে ব্ল্যাক হিউমার বলতে বোঝায় এমন এক হাস্যরস যা সুখকর নয়, এ এক তিক্ত বিষণ হাস্যরস।"[১৩]

হরিবাবুর মৃত্যু পাঠককে কখনও আনন্দ দিতে পারে না। হরিবাবুর মৃত্যু গল্পে এক বিষণতার ছায়া নিয়ে আসে। ব্ল্যাক হিউমারকেই হয়তো প্রকাশ করতে চেয়েছেন লেখক। গল্পের মধ্যে কাঁকর চাওয়ার অধিকার নিয়ে হরিবাবুর ছোটাছুটি পাঠকের মুখে হাসি নিয়ে এলেও কিন্তু এই হাসি ক্ষণিকের।

মানুষের বর্তমান জীবন এখন আর কোনো স্বাভাবিক নিয়মে চলে না। সমস্যায় জর্জরিত এই জীবন। মানুষ কি তাহলে এই ভয়াবহ সমস্যার ভয়ে ভীত হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, নাকি চোখের জল ফেলতে থাকবে? লেখক বললেন, না! এইভাবে বাঁচলে মানুষ জীবনে বেঁচে থাকার আনন্দ পাবে না। দিনের পর দিন জীবনের প্রতি তারা আস্থা হারিয়ে ফেলবে। আর তাই তিনি কৌতুকে মোড়া এই ভয়াবহ জীবনের কথা এমনভাবে তুলে ধরেছেন যাতে এই জীবন থেকে মানুষের আস্থা না হারিয়ে যায়। জীবনের মাঝখানে এসে তাদের যেন এই জীবনকে দুর্বিষহ না মনে হয়, অসহনীয় না মনে হয়। এই দুঃখ কষ্টে জর্জরিত জীবনকে যেন তাঁরা হাসতে হাসতে বরণ করে নেয়। কারণ দুঃখ কষ্টের মধ্যে বেঁচে থাকাতে জীবনকে অভিশাপ বলে মনে হবে। তাই বেঁচে থাকতে হলে আনন্দের সঙ্গেই বেঁচে থাকতে হবে। রমানাথ রায় তাঁর বেশিরভাগ গল্প উপন্যাসের মধ্য দিয়ে এই ধরনের কৌতুককেই হাতিয়ার করে নিয়েছেন — যা দুঃখের ধারকে ভোঁতা করে দেয়, আমাদের নতুনভাবে বাঁচতে শেখায়।

তথ্যসূত্র :

১। রমানাথ রায়, ‘আমার কথা’, গল্পসমগ্র, প্রথম খণ্ড, বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা: ১২

২। তদেব, পৃষ্ঠা: ১৬৩

৩। তদেব, পৃষ্ঠা: ১৬৫

৪। রাজশেখর বসু, প্রবন্ধাবলী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৫৯, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১৩০

৫। রমানাথ রায়, গল্পসমগ্র, প্রথম খণ্ড, বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা: ১৬৫

৬। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, শাক্ত পদাবলী, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, দে’জ পাবলিশিং,পৃষ্ঠা—১৮১.

৭। রমানাথ রায়, গল্পসমগ্র, প্রথম খণ্ড, বাণীশিল্প প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা: ১৬৫

৮। তদেব, পৃষ্ঠা: ১৬৫

৯। রাজশেখর বসু, প্রবন্ধাবলী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৫৯, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১৩০

১০। রমানাথ রায়, গল্পসমগ্র, প্রথম খণ্ড, বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা: ১৬৬

১১। তদেব, পৃষ্ঠা: ১৬৮

১২। তদেব, পৃষ্ঠা: ১৬৮

১৩। রমানাথ রায়, প্রবন্ধ সমগ্র, বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৬, পৃষ্ঠা: ৭১

শাঁওলী মিশ্র

রমানাথ রায়ের ছোটোগল্প : শাস্ত্রবিরোধিতার উদবর্তন ও আধুনিকতায় পদার্পণ

বিশ শতকের ছয়ের দশকে তরুণ বাঙালি লেখকেরা বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক রীতির পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আন্দোলনগুলি মূলত ষাটের দশকে শুরু হলেও তার আভাস কিন্তু আগে থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। তা স্পষ্ট রূপে দেখা গেল বিমল করের 'ছোটগল্প: নতুন রীতি' (১৯৫৮-১৯৫৯)কে কেন্দ্র করে। এরপরে একে একে 'হাংরি জেনারেশন' (১৯৬১), 'শ্রুতি' (১৯৬৫) আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন গুলির সমসাময়িক কালে বাংলা ছোটোগল্পের গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন হল শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন। এই আন্দোলনের মুখপত্র ছিল 'এই দশক' পত্রিকা। ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে 'এই দশক' প্রথম প্রকাশিত হয়। যার সম্পাদক ছিলেন লেখক রমানাথ রায়। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত মোট নটি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। আবার ১৯৬৬ সালের মার্চে 'এই দশক' পুনঃ প্রকাশিত হতে শুরু করে। প্রথমদিকে পত্রিকাটি ছিল ত্রৈমাসিক। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত 'এই দশকে'র মোট ২৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।

'এই দশক' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কয়েকজন নবীন লেখক ও নতুন রীতির গল্পের সাথে পরিচয় ঘটে পাঠকের। পত্রিকাটির প্রকাশকাল থেকে রমানাথ রায় সহ আরও চারজন এই পত্রিকার সাথে যুক্ত দেখেছেন। তাঁরা হলেন সুব্রত সেনগুপ্ত, শেখর বসু, কল্যাণ সেন ও আশিস ঘোষ। 'এই দশকে'র প্রায় প্রতিটি সংখ্যাতেই কিছু না কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে তিনি কখনো লিখেছেন ছোটোগল্প, কখনো প্রবন্ধ আবার কখনো পাঠকের মনে জেগে ওঠা শাস্ত্রবিরোধী লেখা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। রমানাথ রায়ের লেখার জগতে প্রবেশ ঘটে গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। 'এই দশক' পত্রিকাতে শাস্ত্রবিরোধী ছোটোগল্প নামে একটি সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল। তাতে যে বক্তব্য ছিল তা এই পাঁচজন লেখকের যৌথ হিসেবে প্রকাশিত হলেও পরে রমানাথ রায় তা নিজের নামে প্রকাশ করেন। এখানে লেখা হয়েছিল—

"সময় হয়েছে যা কিছু পুরনো তাকে বর্জন করার, সময় হয়েছে যা কিছু নতুন তার জন্য প্রস্তুত হবার। আলমারি থেকে সব বই নামিয়ে ফেলো। আমাদের জন্য এবার একে একে তাক গুলো খালি করে দাও। তথাকথিত মহৎ উপন্যাস এবং গল্পগুলোকে তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্কে পুরে ফেলো। ওগুলো আর দরকার নেই। ওগুলো এখন আবেদনহীন ও বিরক্তিকর। মনে রেখো আর্তোর সেই বিখ্যাত উক্তি : Masterpieces of the past are good for the past– not good for us."[১]

এই সাহসী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তাঁদের আন্দোলন সম্পর্কে পাঠককে জানিয়েছিলেন

শাস্ত্রবিরোধী লেখকেরা। তাঁরা অস্বীকার করেছিলেন প্রথাগতকে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজেদের বক্তব্য। তাঁরা বলেছিলেন—"ছোটোগল্প আজ থেকে সমস্ত শর্তের বিরুদ্ধে। সমালোচকের সমস্ত সংজ্ঞার বেড়ি ভেঙে সে বেরিয়ে এসেছে। ছোটগল্প এখন কবিতার মতোই স্বাধীন ও মুক্ত। আমরা যা লিখব তাই ছোটগল্প।"[২]

'এই দশক' পত্রিকার পঞ্চম সংকলনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে রমনাথ রায়ের লেখা 'খোলাচোখ এবং শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এখানে তিনি সমস্ত সংস্কারকে বর্জন করে খোলা চোখে সবকিছু দেখতে অনুরোধ করেছেন। এখানে শাস্ত্র বিরোধিতার দশটি বিধির কথা বলা হয়েছিল। সেগুলি হল—

১) শিল্পের রাজ্য থেকে সমস্ত তত্ত্ব ও দর্শনের আমুল উৎখাত।

২) যা কিছু এতকাল ছিল গম্ভীর এবং যুক্তিপূর্ণ তাই হাস্যকর।

৩) শিল্প ও সাহিত্যের শাস্ত্রসম্মত পথকে বর্জন করতে হবে, শিল্পের ইতিহাস আঙ্গিকের বিবর্তনের ইতিহাস।

৪) জীবন সম্পর্কে কোনও রকমের স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ধারণা করা বা মত দেওয়ার আমরা বিরোধী।

৬) পরীক্ষামূলক সাহিত্য কথাটা নির্বোধদের উক্তি। সাহিত্য আর যাই হোক

৫) সৎ অসৎ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পাপ পুণ্য ইত্যাদি ধারণা রীতিমতো সংস্কারচ্ছন্ন এবং বিরক্তিকর। এইসব শব্দগুলো আমাদের কাছে এখন একেবারে অর্থহীন।

৭) মহৎ সাহিত্য বা চিরকালের সাহিত্য বলে কোনও সাহিত্য নেই। সব সাহিত্যই নিজের কালের এবং যুগের।

৮) গল্প এবং উপন্যাস থেকে পারিবারিক সামাজিক রাজনৈতিক ঐতিহাসিক বা আঞ্চলিক সমস্যা, মনস্তত্ত্ব, প্রেম বা অপ্রেম, ভাবুকতা এবং বুদ্ধিমত্তাকে বর্জন করতে হবে।

৯) সাহিত্য থেকে সেকেলে কার্যকারণবাদকে ছুঁড়ে ফেলা হোক।

১০) সাহিত্য দীর্ঘদিনের সংস্কার ও প্রশংসা থেকে মুক্ত হোক।[৩]

এইভাবে শাস্ত্রবিরোধীরা 'এই দশকে'র পাতায় বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখে শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন ও সাহিত্য সম্পর্কে পাঠককে অবগত করার চেষ্টা করেন। এখানে রমানাথ রায় প্রচলিত সাহিত্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্যের নিয়ম নীতিগুলিকে বর্ণনা করেছেন।

এবার আসি লেখক রমানাথ রায়ের ছোটোগল্প রচনার সূত্রপাত প্রসঙ্গে। রমনাথ রায় সচেতনভাবে লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন ১৯৬২ কি ১৯৬৩ সাল নাগাদ। তখন যে সমস্যাটি তাঁকে মূলত ঘিরে ধরেছিল তা হল সাহিত্যে বাস্তবতা। তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেছেন বারবার—"কোনটা বাস্তব? কোনটা অবাস্তব? কোনটা সত্যি? কোনটা মিথ্যে? একজন কৃষকের সমস্যাকে তুলে ধরলেই বাস্তব হবে, আর আমার নিজের সমস্যাকে তুলে ধরলে অবাস্তব

হবে কেন? কোন যুক্তিতে? আমার কাছে আমার সমস্যা যতখানি তীব্র ও বাস্তব, একজন কৃষকের সমস্যা কি ততখানি তীব্র ও বাস্তব? কখনই নয়। যদি বলি, হ্যাঁ, তাহলে সেটা হবে ভন্ডামি।"[৪]

ষাটের দশকে যিনি নাম যশ লাভ করার চেষ্টায় প্রলুব্ধ না হয়ে সত্যনিষ্ঠ ভাবনাকে অকপটে স্বীকার করে লেখালেখির জগতে পদার্পণ করেছিলেন তিনি হলেন রমানাথ রায়। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ক্ষত ও অন্যান্য গল্প' (১৯৬৪)।

এখানে বাস্তব জীবন ও স্বপ্নের জগতের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতে চাইলেন লেখক রমানাথ রায়। দুঃখ ও একাকীত্ব ক্রমশ ঘিরে ধরতে চাইছিল তাকে। তিনি অনুভব করলেন দুঃখ হতাশা যন্ত্রণায় জীবন কাটানোর থেকে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ানোর প্রয়োজন। বাস্তবকে পরিহাস করে বেঁচে থাকলে জীবনের পথ মসৃণ হবে। তাই তিনি বলেন—"১৯৬৪ কি ১৯৬৫ সাল থেকে আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে। আমি আবিষ্কার করি বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাস্তবকে পরিহাস করতে না পারলে বাঁচা যাবে না।. দুঃখের হাতে একটা অসহায় দুর্বল প্রাণীর মতো বেঁচে থেকে লাভ নেই। দুঃখের মুখোমুখি দাঁড়ানো প্রয়োজন।"[৫] কীভাবে দুঃখের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকবে মানুষ তার রাস্তাও তিনি বাতলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—"পরিহাস বা কৌতুকই হতে পারে সেই অস্ত্র যার আঘাতে দুঃখের ধার ভোঁতা হয়ে যায়, মারাত্মক কোন দুঃখও হয়ে ওঠে সহনীয়।"[৬] এই ভাবনা ও আদর্শ নিয়ে সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করেন ছোটোগল্পকার রমানাথ রায়।

বর্তমানে ছোটগল্পকার রমানাথ রায়ের লেখা ছয় খণ্ডে গল্প সমগ্র প্রকাশিত হয়েছে বাণীশিল্প থেকে। এই খন্ডগুলিতে প্রায় আড়াইশো গল্প রয়েছে। আমৃত্যু তিনি পাঠকের গল্প পাঠের চাহিদা পূরণ শুধু নয় স্বাদ বদল ঘটিয়েছেন বারে বারে। প্রথমদিকের গল্পগুলি নিয়ে পাঠকের অনেক প্রশ্ন তৈরি হলেও পরবর্তীতে যে তাঁরা নতুন রসের সন্ধান পেয়েছেন তা স্বীকার করতেই হয়। যে শাস্ত্রবিরোধী গল্পগুলিকে উপস্থাপন করে তাঁর সাহিত্য জগতে প্রবেশ ও সাহিত্যে শাস্ত্রবিরোধিতার উদবর্তন ঘটলো তা আমরা প্রথমে দেখে নেব। তাঁর দ্বিতীয় গল্প গ্রন্থ হল—'বলার আছে' (১৯৭৩)। এই গ্রন্থে প্রকাশিত নাম শীর্ষক গল্প বলার আছে যেটি 'এই দশক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে) প্রকাশিত হয়। গল্পটি একটি প্রথাবিরোধী গল্প হিসেবে এই দশকের পাতায় ছাপা হয়েছিল। গল্পটি পাঠ করলে দেখা যাবে সারা গল্প জুড়ে লেখক কিছু বলতে চান, বলার প্রবল প্রচেষ্টা চলতে থাকে সবকিছুই বিরুদ্ধে। বলার জন্য যা যা প্রয়োজন কিছুই নেই মানুষটির কাছে কিন্তু যা আছে তা হলো বলার ঐকান্তিক ইচ্ছে। গল্পটি পাঠ করলে দেখা যাবে—

"আমার কিছু বলার আছে
বলতে গেলে একটা উঁচু টুলের দরকার

ভালো গলার দরকার
আমার উঁচু টুল নেই
আমার ভাল গলা নেই
টুল ধার দিয়েছি কেউ দেয়নি
ভাঙ্গা গলা ঠিক করার চেষ্টা করেছি পারিনি
অথচ আমাকে বলতে হবে বলার আছে
আমি বলব..”[৭]

কোন কাহিনীর অবতারণা না করেই শুরু হয়েছে গল্পটি, সারা গল্প জুড়ে কোথাও কোন ছেদ-যতির ব্যবহার নেই। এখানে কথক আমি তথা রমানাথ কিছু কথা বলতে চেয়েছেন কিন্তু বলার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা কোনটাই তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধতার বিষয়ে কথা বলতে চান বলার তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় গল্পের শুরুতেই তিনি বলতে চান—“আমি বলব বিরুদ্ধে সবার বিরুদ্ধে সব কিছুর বিরুদ্ধে গাছের পাতা গজানোর বিরুদ্ধে ঝরে পড়ার বিরুদ্ধে যৌবনের বিরুদ্ধে বার্ধক্যের বিরুদ্ধে. তোমার বিরুদ্ধে আমার বিরুদ্ধে সকলের বিরুদ্ধে।”[৮]

বলার প্রবল আগ্রহ থাকলেও প্রচুর প্রতিবন্ধকতা এসে ঘিরে ধরে তাঁকে, বলতে চাওয়ার আবেগ কাটিয়ে বলা হয় না আর কিছুই। এই ভাবেই বিষণ্ণতার মধ্যে আত্মপ্রকাশের উপায় খুঁজতে থাকেন লেখক। রমানাথ রায়ের লেখা এই পর্যায়ের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ গল্প হল ‘বিশ্রাম’, ‘সংকেত’, ‘কোকো’, ‘কান্না’, ‘দিনের শেষে’, ‘গোগা’ ইত্যাদি। রমানাথ রায়ের বাল্যকালের নিবিড় উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে ‘গোগা’ গল্পটিতে। গোগা তাঁর কাছে বাল্যকালের স্মৃতি রোমন্থন, তিনি গোগার গন্ধ পান, এক নস্টালজিক আবেশে হারিয়ে যান লেখক। তিনি গোগার কথা বলার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল। গোগার কথা লিখতে গিয়ে তিনি বলেন—“মাঝে মাঝে কিসের গন্ধ ভেসে আসে। ফুলের না। পাতার না। কোন গাছের না। ঠিক রোগার মত। রোগা মানে সেই কবে কার. আমার গোগার কথা মনে পড়ে। আমি প্রতিদিন গোগার কথা ভাবি।”[৯] লেখকের ক্লান্ত অবসরে গোগা তাঁর কাছে আশ্রয় হয়ে ওঠে। জীবনের দীর্ঘ পথ চলার পরেও কৈশোরের গোগা তার কাছে শান্তির নীর হয়ে ওঠে, গোয়ার কথা শোনার কেউ না থাকলেও বলার আগ্রহ থেকে যায় যদিও গোগা আজ বিস্মৃতির পথে। তবুও গোগা হয়ে ওঠে লেখকের কাছে শান্তির আশ্রয়।

সত্তরের দশকের শেষ থেকে রমানাথ রায় আবার লিখতে শুরু করেন প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকাগুলিতে, ৮০ দশক থেকে তা আরো বৃদ্ধি পায়। তিনি সাহিত্য রচনা শুরুর কালে যে পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন তা থেকে অনেকাংশে সরে এসেও শাস্ত্রবিরোধী ভাবধারা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। বলা যেতে পারে বাদ দিয়ে নয় খানিকটা সরে এসেছেন

পরবর্তীকালে। তাঁর পরবর্তীকালে লেখা গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম হলো— ‘কাঁকর’, ‘একটি ঘরোয়া গল্প’, ‘নমস্কার ভালোবাসা’, ‘দেবদাস ও পার্বতী’, ‘বউ রান্না করে’, ‘রামরতন সরণি’, ‘হিন্দু বাবুর কপাল’ ইত্যাদি।

রমানাথ রায়ের লেখা ‘কাঁকর’ গল্পটি একটি অসাধারণ ব্যঙ্গাত্মক গল্প। এখানে তিনি রেশনের দুর্নীতিকে খুবই ব্যঙ্গাত্মকভাবে বর্ণনা করেছেন। গল্পটি পাঠ করলে বোঝা যাবে মধ্যবিত্ত জীবনের কত দুঃখজনক সত্য কথা তিনি সাধারণ কথা বলার মত করেই বলে দিতে পারেন। একজন মধ্যবিত্ত মানুষ যার নাম হরিবাবু, রেশনের চাল খেয়ে বড় হয়ে উঠেছেন তিনি। এখন ভাতের বদলে কাঁকর খেতেই বেশি পছন্দ করেন। ভাত থাক না থাক কাঁকর তার চাই। ভাতে কাঁকড় নিয়ে সবার মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ করে দেখা যায় যে ভাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাঁকর থাকছে না। রেশনের চালে কাঁকরের যোগান কম। লোকটি অধৈর্য হয়ে কাঁকরের খোঁজ করতে থাকে। সে রেশনের দোকানে ছুটে চায় কিন্তু দোকানের কিছু করার থাকে না। তিনি ফুট কর্পোরেশনের বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করেন, তিনিও বলেন যে উনার কিছু করার নেই। এবার তিনি একে একে বহুজনের সাথে দেখা করে চালে কাঁকর বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তিনি খাদ্য মন্ত্রীর কাছেও সেই অনুরোধ জানান। খাদ্যমন্ত্রী তাকে খানিকটা কাঁকড়ের ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু কাপড়ের চিরস্থায়ী সমাধানের কোন রাস্তা পাওয়া যায় না। কিন্তু কর্পোরেশনের অফিস থেকে যেটুকু কাকর পাওয়া গেছিল সেগুলোই একসাথে বেশি খাওয়ার কারণে হরিবাবু মারা গেলেন। তাঁর মারা যাওয়ার পরে খবরের কাগজে ছাপা হল যে, দেশের বিভিন্ন জায়গায় কাঁকর তৈরির জন্য কারখানা খোলা হবে। মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন যন্ত্রণার অত্যন্ত নিপুন ছবি লেখক রমানাথ রায় তাঁর এই গল্পে ব্যাঙ্গাত্মকভাবে তুলে ধরেছেন পাঠকের কাছে।

রমানাথ রায়ের লেখনীতে অত্যন্ত সাদামাটা ঢঙে লেখা একটি অসাধারণ গল্প হল ‘নমস্কার ভালোবাসা’। গল্পটি শুরু হয়েছে দুই বন্ধু ও দুই বান্ধবীর প্রেম ও দাম্পত্য জীবনের পরিণতিকে কেন্দ্র করে। চরিত্রের নাম নিয়ে লেখক তেমন ভাবিত নন তিনি নাম দিয়েছেন রাম ও সত্য দুই বন্ধু এবং সীতা ও সাবিত্রী দুই বান্ধবী। কোন কাহিনীর অবতারণা না করে, দাম্পত্য জীবনের বিস্তৃত বর্ণনা ছাড়াই তিনি বলেন, অবিশ্বাস, হতাশা ব্যর্থতা চরিত্রগুলির স্বপ্ন পূরণের বাসনা কোন কিছুই তেমন প্রকট হয় না গল্প জুড়ে। গল্পের শেষে ব্যর্থ প্রেমের পরিণতির কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন—“এই গল্পের লেখক যদি বঙ্কিমচন্দ্র হতেন তাহলে সীতা ও সাবিত্রী মোটেই এইভাবে রেহাই পেত না। রাম ও সত্য তাদের পাপীয়সি! বলে সম্বোধন করে গুলি করে মারত। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এদের গুলি করে মারতেন না তবে তিনি রাম সত্যকে সংসারের সীমা থেকে বিশ্ব সংসারের অসীমতার মধ্যে নিয়ে যেতেন। আর শরৎচন্দ্র রাম ও সত্যকে পুরুষ মানুষ বলে কাশীতে না পাঠালেও তাদের দুরগামী কোন ট্রেনে তুলে দিতেন। কিন্তু হায়!

যুগ বদলে গেছে। মানুষ বদলে গেছে। মানুষ এখন দুঃখ পেতে ভালোবাসে না। দুঃখ নিয়ে মজা করতে ভালোবাসে।"[১০] রমানাথ রায়ের জীবন ভাবনা এবং গল্পের উপস্থাপন সাধারন হয়েও অসাধারণ হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে।

বিশ্বায়ন কীভাবে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব ফেলেছে তারই একটি অসাধারণ বর্ণনা আছে লেখা 'শাঁখের করাত' গল্পে। খুব অল্প আয়াসে কোন বিলাসিতা না করে জীবন অতিবাহিত করতে চাওয়া একজন মানুষকে কিভাবে বিশ্বায়ন তার নিজের বিশ্বে থাকতে দিচ্ছে না সে কথাই এখানে তুলে ধরেছেন রমানাথ রায়। মোবাইল ফোনের অযাচিত ইনকামিং কল গল্পের নায়ক তিলুকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশ্ব বাজারের অর্থনৈতিক প্রভুত্বের দাপট সহ্য করতে হয় তারই বর্ণনা আছে এই গল্পে।

লেখক জীবনের শুরুতে রমানাথ রায় যে শাস্ত্রবিরোধী গল্প রচনার মাধ্যমে সাহিত্য জগতে অনুপ্রবেশ করেছিলেন পরবর্তীকালের গল্পগুলিতে দেখা যাচ্ছে তা থেকে তিনি সরে এসেছেন অনেকখানি। কিন্তু বাংলা ছোটোগল্পের নতুন ফর্ম তৈরির ক্ষেত্রে রমানাথ রায়ের অবদান অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র :

১. উত্তম দাস, হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, (জানুয়ারি ২০০২) মহাদিগন্ত, পৃষ্ঠা ১০১
২. রমানাথ রায়, প্রবন্ধ সমগ্র, (জানুয়ারী ২০১৬) বাণীশিল্প, পৃষ্ঠা- ৫৪
৩. সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা গল্প আন্দোলন, (আগস্ট ২০১৮) গাঙচিল, পৃষ্ঠা ৬৩
৪. রমানাথ রায়, গল্প সমগ্র (প্রথম খন্ড) দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৫, বাণীশিল্প, আমার কথা, পৃষ্ঠা-১১
৫. তদেব। পৃষ্ঠা ১৩
৬. তদেব। পৃষ্ঠা ১৩
৭. তদেব। পৃষ্ঠা ২৯
৮. তদেব। পৃষ্ঠা ২৯
৯. তদেব। পৃষ্ঠা ৩৯
১০. তদেব। পৃষ্ঠা ১০৩

সৌ ম্য ব্র ত ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

সত্তরের সীমানা ও সম্ভাবনা : সুবিমল মিশ্রের গল্প

লাগাতার প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা করতে গিয়ে যিনি নিজেই প্রতিষ্ঠান বিরোধীদের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হয়ে গিয়েছেন, তিনি সুবিমল মিশ্র। কেবল প্রতিষ্ঠান নয়, বরাবরই প্রতিষ্ঠারও বিরোধী ছিলেন তিনি। শেষ বয়সে অবশ্য সুবিমল নিজেকে প্রতিষ্ঠান বিরোধী বলতেও অস্বস্তি বোধ করতেন। আসলে সস্তা সাফল্যের আপেক্ষিকতায় আস্থা ছিল না তাঁর কোনদিনই। সিরিয়াস পাঠকের কাছে সুবিমল শুরু থেকেই সমাদৃত। আর পরে পরে গাল-গল্পে বুঁদ হয়ে থাকা বাঙালি পাঠকের কাছে তিনি ভয়ংকর নতুন! প্রতিভার জোরে সুবিমল আজ তৈরি করে নিতে পেরেছেন নিজস্ব পাঠক সমাজ। দিব্যি বিকোবে বুঝে ইদানিং প্রতিষ্ঠানও সমীহ করছে তাঁকে। এদিকে সুবিমল বলেছেন, "প্রত্যেকেই সফলতা খোঁজ করে, আমি খোঁজ করি অন্য কিছুর। আমার জীবনের প্রধান ব্যাপার হল হয়ে-ওঠা, হয়ে-ওঠার চেষ্টা। এই 'চেষ্টা' শব্দটির ওপর আমি বিশেষ ভাবে জোর দিতে চাই। জীবনের শেষক্ষণটি পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভাবে সক্রিয় থাকা, সম্পূর্ণ ভাবে দায়িত্ববান হওয়া, নিরন্তর বিরূপ সমালোচনা- কোনো কিছু হয়নি... কোনো কিছু হচ্ছে না সুবিমল এক ধরনের স্ট্যানট দেওয়া ছাড়া- এ ধরনের মতামতের ঝুঁকি নেওয়া এবং অবশ্যই স্থির লক্ষ্যে নিজের কাজ করে যাওয়া।... সফলতা এলে আমি ভয় পাই। কারণ নতুন কিছু করলে সফলতা সংগে সংগে আসে না। আমি যদি সফলতা পাই তার মানে হল আমি এমন কিছু করছি যা তত নতুন নয়।"[১]

শুরু থেকেই কি সম্পূর্ণ নতুন ছিলেন সুবিমল মিশ্র? সত্তরেই কি তত নতুন ছিল তাঁর সাহিত্য? পঞ্চাশের শেষ দিকে গতানুগতিক বাংলা ছোটগল্পের খোলনলচে বদলে দিতে এগিয়ে এসেছিলেন বিমল কর। তাঁর নেতৃত্বে কামু-সার্ত্র কিংবা জয়েসের ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে 'ছোটগল্প: নূতন রীতি'তে সম্পূর্ণ নতুন চিন্তা-চেতনার গল্প লিখেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, কমলকুমার মজুমদার, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির গুপ্ত প্রমুখ। ছয়ের দশকের শুরুর দিকেই হৈ হৈ করে হাজির হয়েছিলেন হাংরি জেনারেশন। বাসুদেব দাশগুপ্তের 'রন্ধনশালা', 'রতনপুর', 'বমন রহস্য' কিংবা সুভাষ ঘোষের 'হাঁসেদের প্রতি', 'রেড রোড', 'যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট' পড়ে রীতিমতো নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন পাঠক। আবার ষাটের মাঝামাঝি 'এই দশক' পত্রিকাকে ঘিরে শুরু হয়েছিল শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলন। সাহিত্যের সমস্ত শর্তের বিরুদ্ধে গিয়ে সর্বাত্মক স্বাধীনতা উপভোগের মধ্য দিয়ে অন্তরাত্মার জটিল রহস্যময় অনুভবের কথা ছোটগল্পে তুলে আনতে একজোট হয়েছিলেন রমানাথ রায়, সুব্রত সেনগুপ্ত, আশিস ঘোষ, শেখর বসু, কল্যাণ সেন, অমল চন্দ, বলরাম বসাক, সুনীল জানা প্রমুখ। শুরু হয়েছিল গল্পহীন গল্প লেখার প্রবণতা। বিষয় এবং শৈলী নিয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই হাংরি কিংবা শাস্ত্রবিরোধীরা

গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন নতুন গল্প রচনার প্রেক্ষাপট। কলকাতা থেকে বেশ কিছুটা দূরে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে সত্তরের শুরুতেই সংঘটিত হয়েছিল নিমসাহিত্য আন্দোলন। না-সাহিত্য, অল্প- সাহিত্য, তিক্ত-বিরক্ত সাহিত্য নিম সাহিত্য! আসলে এইসব আন্দোলন গড়ে উঠছিল মূলত স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের গভীর আর্থ-সমাজ-রাজনৈতিক অবক্ষয়ে অসহায় যাপনের বাধ্যতা থেকে। সুবিমল লিখতে এসেছেন এই আবহে। কোনও সাহিত্য আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ না করেও লেখা নিয়ে এগিয়েছেন একই পথে।

সত্তরের সামান্য আগে সাহিত্য রচনায় হাত দেন সুবিমল। বিক্ষিপ্তভাবে আটষট্টি, ঊনসত্তরে হাতেগোনা গুটিকয় গল্প বেরোয় এখান-ওখান। অশ্লীলতার অভিযোগে গল্প ফিরিয়েও দেন অনেকেই। 'হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি' গল্পটিই যেমন লেখকের কাছে ফিরে এসেছিল 'পরিচয়' সহ অন্যান্য পত্রিকা দপ্তর থেকে। কিন্তু প্রথম থেকেই সুবিমলের নন- কম্প্রোমাইজিং অ্যাটিটিউড, খাঁটি প্রতিষ্ঠান বিরোধী লেখক হয়ে ওঠার ইচ্ছে! পরিচিত, বহু বিক্রিত, বিখ্যাত সব পত্রিকার সংসর্গ এড়িয়ে প্রকৃত অর্থেই তিনি লিটিল তথা ছোটপত্রিকায় লেখা ছাপিয়েছেন শুরু থেকেই। সাতের দশক জুড়ে 'চিল', 'বোবাযুদ্ধ', 'একাল', 'স্থানাঙ্ক', 'সত্তর দশক', 'কবিপত্র', 'ক্রান্তিকাল', 'বিজ্ঞাপন', 'বিজ্ঞাপন পর্ব' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় গল্প লিখেছেন তিনি।

একাত্তরে এগারোটি গল্প নিয়ে নিজেই বের করেছেন প্রথম বই 'হারাণ মাঝির বিধবা বউয়ের মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি' (জুন, ১৯৭১)। চুয়াত্তরে সতেরোটি গল্প নিয়ে সংকলিত হয়েছে তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'নাঙা হাড় জেগে উঠছে'। তৃতীয় বই 'দু-তিনটে উদোম বাচ্চা ছুটোছুটি করচে লেবেলক্রসিং বরাবর' আশিতে বেরোলেও গ্রন্থবদ্ধ উনিশটি গল্প বিভিন্ন লিটিল ম্যাগাজিনে বেরিয়েছে সত্তরের শেষদিকে। যতটা নতুন তিনি হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন, এক দশকে এতগুলি গল্পে তা কি পেরেছিলেন সুবিমল? এ প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজার প্রয়াস থাকবে আলোচ্য প্রবন্ধে।

প্রথম গল্প গ্রন্থেই চমকে দিয়েছিলেন সুবিমল! পরের দুটিতেও চমক কম ছিল না। ক্রমে সুবিমল হয়ে উঠছিলেন; তাঁর সেই প্রত্যাশিত 'হয়ে-ওঠা'! বিষয়ে- বিন্যাসে- নামকরণে তিনটি গ্রন্থের কমবেশি প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই তাঁর অভিনব চিন্তা চেতনার প্রকাশ পাঠককে অবাক করেছে। প্রচ্ছদে প্রকাশনায় তিনটি বইতেই তিনি বেশ নতুন। অন্তত গতানুগতিক গল্প পাঠে অভ্যস্ত সনাতন পাঠকের কাছে তো রীতিমতো অস্বস্তিকর! প্রথম এক দশকের এই গল্পগুলিতে পাঠককে চির চেনা পথে এগোতে দেন না সুবিমল। পরিচিত পাঠাভ্যাসে অনবরত আঘাত করতে থাকেন। ডিস্টার্ব করতে থাকেন পাঠকের চেতনায়। অধিকাংশ গল্পই দিতে পারেনা নির্ঝঞ্ঝাট পাঠসুখ। আসলে অন্তর্গত আবেগকে অস্বীকার করতে চাননি তিনি। বোঝাযায় গভীর অনুধ্যানে অন্তর্লীন বাস্তবকে আবিষ্কার করে গল্পে গল্পে তাকেই এঁকে ফেলার অঙ্গীকার করেছেন লেখক! প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকে দেখেছেন বহু কৌণিক

দৃষ্টিতে। গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তার মূলে আঘাত করেছেন, ভেঙেছেন। সেক্সকে যতটা সাহসী ভাবে নিতে পাঠক প্রস্তুত, তাঁর গল্পে তার চেয়ে বেশ কয়েকধাপ এগিয়ে গিয়েছেন। তোয়াক্কা করেননি পাঠকের ছেঁদো সেন্টিমেন্টের!

সুতরাং কেবল সত্তরে নয়, সো-কল্ড সফলতা তিনি পাননি, পেতেও চাননি কোনদিন। পসরা সাজিয়ে বসেননি আনন্দবাজারে বা যেসব বাজারে সাহিত্যকে পণ্য বানিয়ে বেচে দেওয়া হয়! প্রতিষ্ঠানের পণ্য-মানসিকতার প্রতি বিষোদ্গার করেছেন আজীবন। লিটিল ম্যাগাজিনের লেখক তিনি। নিজের পয়সায় বই ছেপেছেন, বিক্রি করেছেন নিজেই। তাঁর সাহিত্য দর্শন অন্তত বাংলা সাহিত্যে অনেকটাই আনকোরা। তাঁর প্রিয় বাঙালি ঋত্বিককুমার ঘটক। ভাষাকে আক্রমণ করে সেই ভাষাকেই জ্যান্ত করে তোলার জাদুকর কমলকুমার মজুমদার তাঁর প্রিয় লেখক আর বলাটাকে অর্থাৎ স্টাইলটাকেই যিনি বিষয় করে তুলেছেন সেই জঁ লুক গোদার তাঁর প্রিয় মানুষ—এই অকপট স্বীকারোক্তি সুবিমলের।[২] মহৎ সাহিত্য নির্মাণের মোহ কখনই পেয়ে বসেনি তাঁকে। জনপ্রিয় সাহিত্যের ছিটেফোঁটা উপাদান তাঁর গল্প খুঁটেখুঁটে পড়েও আবিষ্কার করতে পারবেন না পাঠক কিংবা গবেষক!

আপাদমস্তক রাজনীতি-সচেতন সুবিমল মিশ্রের সুগভীর জীবনবোধ থেকে উঠে এসেছে গল্প। আজীবন তিনি আস্থা রেখেছেন বামপন্থায়। মাও-সে-তুং এর মতোই বিশ্বাস করেছেন কোন সৃষ্টিই রাজনীতি নিরপেক্ষ হতে পারে না। স্বপ্ন দেখেছেন, "এমন একটা দিন আসবে গরিব মানুষের হাতে থাকবে ক্ষমতা, দুবেলা দুমুঠো ভাত জুটবে সবার— সবাই অন্তত পেট পুরে খেতে পাবে, বন্ধ হয়ে যাবে মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার-অনাচার আরও কত কী.."[৩]। সত্যিটা কী তাও দেখেছেন চোখের সামনে! দেখেছেন শ্রেণিশোষণের বীভৎস রূপ। লিখে ফেলেছেন 'হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি'। অনিবার্য হয়ে উঠেছে এমনতর উপস্থাপন! এ গল্পে জাদু বাস্তবতার যথাযথ প্রয়োগে প্রকৃত বাস্তবকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। পাঠককে বিষয়ের বিস্তর গভীরে পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন অন্য পথে।

এ গল্প যতখানি হারাণ মাঝির, ততখানি তার বিধবা বৌয়ের আর ঠিক ততখানিই সোনার গান্ধীমূর্তির। সাম্যবাদী কথাকার এ গল্পে সাব-অলটার্নদের পাশে দাঁড়িয়েছেন গভীর দরদে। গভীরতর ঘৃণায় হ্যাঁচকা মেরে খুলে দিয়েছেন আঁট হয়ে বসা উচ্চবর্গের মুখোশ। হারাণরা বাঁচতে পারে না বুর্জোয়াদের বানিয়ে তোলা অদ্ভুতুড়ে সামাজিক সিস্টেমে। জমিতে লাঙল চষা নিয়ে জমিদারের সঙ্গে বিবাদের জেরে খুন হয়ে যায় হারাণ। মারা যাওয়ার আগে আক্ষেপ করে সে বলত, "খানকির ব্যাটারা খেয়ে পরে কিচুতে বেঁচে থাকতি দিল না"[৪]। আর সেই দুমুঠো খাওয়ার জন্যই হারাণের বিধবা বাইশবছরী অসহায় বৌটাকে তথাকথিত সভ্য সমাজ বারেবারে টেনে নিয়ে গেছে অতল অন্ধকারে। সেই সমাজই আবার অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে অন্তঃসত্ত্বা বিধবার আত্মহত্যা! গল্পকার লিখছেন, "গভর্মেন্টের

হিসেব অনুযায়ী এবছর পশ্চিমবংগ খাদ্যশস্যে উদ্বৃত্ত রাজ্য। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এক ভাষণে বলিয়াছেন, আমাদের দেশের একটি লোককেও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হইয়্যা দ্যাট ইজ না খাইয়া মরিতে দিব না।”[৫] এহেন প্রতিবেদন আর প্রতিশ্রুতিকে পাশ কাটিয়ে গল্পকার হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়াকে এগিয়ে দিয়েছেন কালিঘাটের পবিত্র গঙ্গার দিকে। মড়া ভেসে ভেসে যত এগিয়েছে সমান্তরালে উচ্চবর্গের উপর সুবিমল মারাত্মক ঘৃণা আর ব্যাঙ্গের অস্ত্রে আক্রমণ শানিয়েছেন। পদে পদে তৈরি করেছেন নিজেকে চিনে নেওয়ার সুযোগ।

আলোচ্য গল্পে দেখানো হয়েছে দুটি খবর ছড়িয়ে পড়েছে শহরময়। এক. আমেরিকা ঘোষণা করেছে ময়দানের মিটিংয়ের হাঙ্গামায় পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে ভেঙে যাওয়া গান্ধীর স্ট্যাচুটির পরিবর্তে তারা অচিরেই পাঠিয়ে দেবে একটি সোনার গান্ধীমূর্তি। দুই. যত্রতত্র দেখা মিলছে হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়ার। বামুনপাড়ার জমিদারবুড়ো থেকে শহরের মেয়র, বিখ্যাত জননেতা থেকে ট্রাম কনডাকটার যেখানে সেখানে দেখছেন হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়াটিকে। দেখা যাচ্ছে গণ্যমান্যদের ঘরের চৌকির নিচে, আলমারির পেছনে, খাবার ঘরের মেঝেতে, কলতলার অন্ধকারে! আতঙ্কে অস্থির সকলে। দুটি খবরেই তৈরি হয়েছে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা। গল্পকার সিনেমাটিক গদ্যে পাঠকের সামনে এনে হাজির করেছেন একের পর এক দৃশ্য। দৃশ্যগুলিকেও জুড়েছেন দারুণ দক্ষতায়। পাঠকের মনে উস্কে দিয়েছেন হরেক প্রশ্নের সম্ভাবনা। সোনার গান্ধীমূর্তি কি সমূহ উজ্জ্বলতা দিয়ে ঢেকে দিতে পারবে এ অন্ধকার? মূর্তি প্রতিস্থাপনের আড়ম্বরে আড়াল করা যাবে বুর্জোয়াদের বুকের রক্ত হিম করে দেওয়া হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়াটিকে? বহমান কাল ধরে উচ্চবিত্ত তার যাবতীয় অসংগতি ঢাকা দিয়ে দিতে পারবে? সারাজীবন ব্রাত্যই থেকে যাবে সাব-অলট্রার্ন?

একজন প্রকৃত বামপন্থী মানুষ খেয়াল করেছেন কেমন করে ক্ষমতার কাছে নতজানু হতে বাধ্য হচ্ছে তৃতীয় বিশ্ব। ক্ষমতার আস্ফালন আর আগ্রাসনে চরম অবহেলিত হচ্ছে নিম্নবর্গের ন্যূনতম চাহিদা। কথা মতো এক সকালে আমেরিকান বিমানে উড়ে এসেছে সোনার গান্ধীমূর্তি। রাষ্ট্র যন্ত্রের মাতব্বররা অপরিসীম আগ্রহে অপেক্ষা করছেন মূর্তিটিকে প্রত্যক্ষ এবং স্পর্শ করার জন্য। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় উন্মোচিত হতে চলেছে গান্ধীমূর্তি। সেই সম্ভ্রমপূর্ণ মুহূর্তেও হারাণের দেড় বছরের অনাথ বাচ্চাটির কান্না শোনা যাচ্ছে। কাঠের বাক্সের ডালা খোলা হলে সমবেত জনতা সবিস্ময়ে দেখলেন সোনার গান্ধীমূর্তি নয়, বাক্সের উপর শোয়ানো রয়েছে হারাণ মাঝির বিধবা বউয়ের গলিত মড়াটি। সুবিমল উচ্চবিত্ত চেতনার কোশে কোশে চিমটে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন সোনার গান্ধী মূর্তির নাগাল পেতে গেলে সমাজের এই পচনশীলতার পরিচর্যা করতে হবে সবার আগে।

অনুভূতির সততা আর উপস্থাপনের স্বচ্ছতায় লেখকের আলোচ্য গল্পটি প্রচলিত বাংলা ছোটগল্পের পরিচিত পরিমণ্ডল থেকে এক সম্ভ্রান্ত উচ্চতায় অবস্থান করেছে। ‘বাগানের

ঘোড়ানিমের গাছে দেখনচাচা থাকতেন' গল্পটিও তো তাই। এ গল্পের চমক কেবল আস্ত একটা বাক্যকে নাম হিসেবে ব্যবহার করায় নয়, গল্পটির বিষয়ের বিশেষত্বে বিষম খেতেই হয় গতানুগতিক গল্প পাঠে অভ্যস্ত পাঠককে! আপাতভাবে অদ্ভুতুড়ে আজগুবি কাহিনির মায়াজাল বলে মনে হলেও এ গল্পে কথাশিল্পী প্রয়োজন আর প্রিয়জনের, অভীপ্সা আর অভিপ্রায়ের, আদিম প্রবৃত্তি আর উৎকট প্রবণতার দ্যাখনদারি সমীকরণকে এক হাত নিয়েছেন। গল্পের একদিকে আছে দেখনচাচা, অন্যদিকে আমজনতা। নিরপেক্ষ অবস্থানে দাঁড়িয়ে তিনি আলো ফেলেছেন দুপক্ষেরই ব্যভিচারী মনে। সঙ্গোপনে বেড়ে ওঠা অপরাধকে আড়াল করতে চাননি কোনও অজুহাতে।

গৌর মন্ডলের পরিপূর্ণ যুবতী বৌ মনোরমাকে কলেরার কালো দিনে যে দেখনচাচা মাতৃস্নেহে শুশ্রূষা করে ফিরিয়ে এনেছিলেন জীবনের আলোতে, তিনিই আবার তার কাছে রতি যাঞ্ছা করেছেন অকপটে। অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে খসিয়ে দিয়েছেন যুবতী মনোরমার বুকের কাপড়। দেখনচাচার এহেন চরিত্রহীনতায় ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন সমবেত জনতা। চরিত্রবান গ্রামবাসীরা খোলামকুচি-ঠিল-ইঁট ইত্যাদি অস্ত্রে একেবারে ঘায়েল করে অপরাধীর রক্তাক্ত নিথর দেহটাকে ফেলে দিয়ে এসেছেন গ্রামের বাইরে নদীর ধারে। তারপর? গল্পের শেষে সুবিমল মিশ্র ছড়িয়ে দিয়েছেন এক সুগভীর ব্যঞ্জনা। লিখেছেন, "পরের দিন গ্রামের সমস্ত চরিত্রবান লোক দেখল যেখানে যেখানে দেখনচাচার রক্ত পড়েছিল সেখানে সেখানে এক-একটা ঘোড়ানিমের গাছ জন্মে গেছে। সকাল বেলার সতেজ আলোবাতাসে সেই সব নিমগাছের কচি পাতায় কাঁপ ধরেছে।"[৬] যে প্রবৃত্তি মানুষের স্বাভাবিক স্বতোৎসারিত, কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিষেধাজ্ঞা দিয়েই যে তাকে প্রশমিত করা যায় না সেকথাই এ গল্পে পরিষ্কার করেছেন গল্পকার।

অনুভূতির এতখানি স্বচ্ছতা নিয়ে এভাবেই গল্প বলতে পছন্দ করেন সুবিমল মিশ্র। পদে পদে পাঠকের চেতনায় আঘাত করতে করতে গল্প নিয়ে এগিয়ে চলেন। আরাম কেদারায় গা এলিয়ে অবসর যাপনের সঙ্গী হতে পারেনা তাঁর গল্প। সুবিমল বারেবারেই বলেছেন কোনও কারণেই অর্ধমনস্ক মানসিকতা প্রার্থী নন তিনি। তিনি চান পাঠকের পূর্ণ মনোযোগ। প্রশংসার পরোয়া তিনি করেননি কোনদিন। তাঁর কথায়—"আমি তেমন কোন লেখা লিখতে চাই না যা পড়ে লোকে আমার পিঠ চাপড়ে বলবে, বাহা বেড়ে সাহিত্য করেছো তো হে ছোকরা, আমি চাই লোকে আমার লেখা পড়ে আমার মুখে থুতু দিক, আঙুল দেখিয়ে বলুক,—এই সেই লোক যে উপদংশ-সর্বস্ব এই সভ্যতার ঘাগুলো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দিনের আলোর মতো খোলাখুলি করে দিয়েছে। লোকে দেখুক নিজের অবস্থা নিজেরাই— দেখে শিউরে উঠুক, চিন্তা করুক তার সেই ভেক সামাজিক অবস্থানের কথা—সেখানে থেকে শুরু হবে ওলটপালট যা আসবে মানুষের চিন্তার ক্ষমতা দখল থেকে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল থেকে নয়। আমি চাই মানুষকে উপলব্ধির সেই স্তরে

পৌঁছে দিতে যখন সে নিজেই নিজের অবস্থানকে ভাঙতে শুরু করবে।"[৭] 'পার্ক স্ট্রিটের ট্রাফিক পোস্টে হলুদ রঙ', 'শেয়ালদা স্টেশন ও কপালকুণ্ডলা', 'সভ্যতার অ্যামবাসাডার ফেমিনাইন টাওয়েল সহযোগে', 'ছুরি', 'পারীজাতক' প্রভৃতি প্রথম গল্পগ্রন্থের প্রায় প্রতিটি গল্পই পড়তে হয় সজাগ সতর্ক মন নিয়ে। পাঠ শেষে পৌঁছে যেতে হয় অভিনব অভিজ্ঞতায়, জেগে ওঠে নতুন উপলব্ধি। কখনও বা অনুভবী পাঠককে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বদলে নিতে হয় নিজের অবস্থান। কথাসাহিত্যিক হিসাবে এখানেই তাঁর স্বতন্ত্র অবস্থান।

ভাবা যায় গ্রাহক ফর্ম ছেপে, ৭০-৮০ জন গ্রাহক জোগাড় করে সেই পাঠক সমবায়ের টাকায় সুবিমল মিশ্র প্রকাশ করেন দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'নাঙা হাড় জেগে উঠছে' (১৯৭৪)! ঠোঙার কাগজে কভার এবং কভারে ছাপা সাহসী শ্লোগান, "যে ডাঁশটি আপনার রক্ত খেয়ে তেলালো/ বইটির শক্ত পাটাতন দিয়ে তাকে আঘাত করুন/ সে তার হাড় মাস আর রক্তের ছিটকিনি সুদ্ধ/ তার অবস্থানেই পিষে যাক"![৮] তিনি কি সুররিয়ালিস্ট? অ্যানার্কিস্ট? বড় বেশি অ্যাবসার্ড? আসলে স্বাধীনতার কিঞ্চিৎ আগে জন্মে (জন্ম: ১৯৪৩) শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে সুবিমল যুবক হয়েছেন যে অস্থির সময়ে, পুরো সময়টা ধরেই তো সুস্থির সুস্থিতির স্বপ্ন দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে নতুন ভারতবর্ষ। স্বাধীন দেশের কাছে উপহার পাওয়া অপরিসীম হতাশা আর অবসাদ থেকেই প্রচলিতের প্রতি প্রথাগতের বিরুদ্ধে তাঁর মনে জন্ম নিয়েছিল এতখানি বীতরাগ। তাই তিনি গল্পে গল্পে সভ্যতার ঘাগুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দিনের আলোর মতো খোলাখুলি করে দিতে চেয়েছেন। '১৯৭৪-এ মানুষের তৈরি এই দুর্ভিক্ষের দিনে প্রকাশিত'- বইটির প্রকাশের ক্ষণ এভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়ে সুবিমল প্রথমেই বুঝিয়ে দিয়েছেন পাঠককে কোন বিপন্ন বাস্তবের মুখোমুখি করবেন তিনি।

'নাঙা হাড় জেগে উঠছে' এই নাম গল্পটিতে তো বটেই, এ গ্রন্থের কমবেশি সব গল্পেই সত্তরের অস্থির সময়ে রাষ্ট্রের উদাসীনতা, অপদার্থতাকে বুদ্ধিদীপ্ত ভঙ্গিতে আক্রমণ করেছেন, ভন্ডামিকে চিনতে শিখিয়েছেন চোখে আঙুল দিয়ে। নগ্ন করেছেন তথাকথিত সভ্যতার বিকৃতিকে। সচেতন নাগরিক হিসেবে অসুখী সময়ের অভিঘাতে বিপন্ন হয়েছেন, কিন্তু কখনও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েননি। তাই আক্রমণ শানিয়েছেন নিরন্তর। 'ময়দানে টাকার গাছ', 'ব্যবসায়ীগণ! সত্বর বকেয়া জমা দিন', 'ধারাবিবরণী-৭১', '৭২-এর ডিসেম্বরের এক বিকেল', 'বিপ্লবের দিকে ৩৬ ফুট', 'বাবুমশায় মজা করুন', 'আপনি যখন স্বপ্নে বিভোর কোল্ড ক্রিম তখন আপনার ত্বকের গভীরে কাজ করে', 'মূলত সংবাদই কাব্য' প্রভৃতি গল্পে সুচিন্তিতভাবে তিনি বস্তাপচা সমাজ ব্যবস্থা এবং মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের গোড়ায় আঘাত করেছেন। ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান। প্রকৃত বামপন্থী বলেই সত্তরে লেখা তাঁর এই গল্পগুলি সৌখিন হয়ে উঠতে পারেনি। ছাপমারা মার্কসবাদী সাহিত্যের মতো কোনও মেকানিক্যাল পথে গল্পগুলিতে শেষ পর্যন্ত তিনি আশাবাদের কথা শোনাননি। পাঠককে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন রকমারি ধান্দাবাজি! ভেঙেছেন, সর্বতোভাবে ভাঙতে চেয়েছেন

যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা গোলগাল মধ্যবিত্ত চিন্তা চেতনাকে। বোঝাযায় 'বুর্জোয়া কাগজ যেভাবে চিন্তার-স্বাধীনতায়- বিশ্বাসী লেখকদের ব্যবহার করে' র মতো গল্পে তিনি অকপট হতে বাধ্য হয়েছেন। এই বাধ্যতা আসলে তাঁর কাছে অনিবার্যতা।

সুবিমল মিশ্র বিশ্বাস করতেন যাকে ধরে নেওয়া হয়েছে ঠিক বলে তাকেই বেশি করে পরীক্ষা করা দরকার। জর্জ ক্রিস্তফ লিখতেনবের্ক-এর এই আপ্তবাক্যকে প্রচ্ছদে ব্যবহার করে ১৯৮০র মার্চে তিনি প্রকাশ করেছেন তৃতীয় গল্পগ্রন্থ 'দু-তিনটে উদোম বাচ্চা ছুটোছুটি করছে লেবেল-ক্রসিং বরাবর'। দু'একটি বাদে এ গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পই লেখা হয়েছে সত্তরে। গল্পগুলিতে সুবিমল সেই কাঙ্ক্ষিত 'হয়ে ওঠা'র পথে অনেকটাই এগিয়ে এসেছেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় গ্রন্থের গল্পগুলিতেই তিনি শৈলী নিয়ে বিস্তর পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়েছিলেন। তৃতীয় বইটিতে পাঠক পেয়ে যাবেন সুবিমলের একেবারে নিজস্ব শৈলীর সন্ধান!

'দু-তিনটে উদোম বাচ্চা ছুটোছুটি করছে লেবেল-ক্রসিং বরাবর' গল্পে সংবাদ পরিবেশনের ভঙ্গিতে অনর্গল কথার স্রোতে ভেসে উঠেছে সত্তরের ভারতবর্ষের মুখ। সে মুখকে যারা ম্লান করে রেখেছে, জীবন-শিল্পী যথারীতি তাদের চিনিয়ে দিয়েছেন। সভ্যতার মুখে আলো ফেলে দেখিয়ে দিয়েছেন কালো স্পট। আলোচ্য গল্পে আখ্যানের অ আ ক খ খুঁজে না পাওয়া গেলেও পাঠক খুঁজে পাবেন নিজেকে। 'আসুন, ভারতবর্ষ দেখে যান', 'আঃ- ছাড়ুন!', 'ফুটদেড়েক এক পরিত্যক্ত জায়গায়' কিংবা 'এখন ঈশ্বরই একমাত্র জীবিত আছেন'- এর মতো গল্পগুলিতেও প্রায় একই কাজ করেছেন। কতকগুলি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে পাঠককে বুঝে নিতে দিয়েছেন নিজের অবস্থান। সময় প্রতিটি গল্পেই এসেছে খুব স্পষ্টভাবে। সুবিমল সেই সময়ের সীমানা আর সম্ভাবনাকেও চিহ্নিত করেছেন। গল্পে গল্পে পাঠকে ভাবিয়েছেন, ভাবতে বাধ্য করেছেন।

লেখক স্বয়ং লিখেছিলেন, "এতদিনে প্রকাশ-পদ্ধতির একটা ছাঁদ তৈরি হয়ে গেছে যা আমার কাছে অত্যন্ত জলো, সেন্টিমেন্টাল এবং নাকি সুরের প্যানপ্যানানির মতো লাগে; আমি কলম দিয়ে মানুষকে বিদ্ধ করতে চাই, বিদ্ধ করার ভঙ্গি আমাকে খুঁজে নিতে হয় নিজের মতন করে, ব্যাপারটা সাহিত্যটাহিত্য গোছের কিছু হয়ে উঠছে কিনা এ নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।"[৯] পাঠক মাত্রেই জানেন এই উচ্চারিত আদর্শের পথেই তিনি এগিয়ে গিয়েছেন। অনায়াসে উপেক্ষা করতে পেরেছেন বিরূপ সমালোচনা। ষাট-সত্তরের সাহিত্য আন্দোলন নিশ্চয়ই তাঁকে প্রভাবিত করেছিল, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সেসব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না থেকে তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন আস্ত একটি আন্দোলন! অচিরেই খুঁজে নিয়েছিলেন নিজস্ব ভঙ্গি। উইলিয়াম বারোজের কাট-আপ পদ্ধতি বরাবরই প্রিয় ছিল সুবিমলের এবং গল্পে তিনি তা প্রয়োগও করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। অনেক গল্পেই বাস্তবের তথ্য আর কল্পনার সত্যকে সুন্দরভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর প্রিয় মানুষ জঁ লুক গোদারের মতো করে। গল্পে আস্ত বিজ্ঞাপন ছেপেছেন, আবার কখনও একাধিক বিজ্ঞাপন পাশাপাশি বা

বিক্ষিপ্ত ভাবে ছেপে সেখান থেকেই তৈরি করেছেন গল্প সম্ভাবনা! কখনও শ্লোগানকে করে তুলেছেন গল্পের ভিত। গল্পের মাঝে কোনও শব্দ, শব্দবন্ধ, বাক্য বা বাক্যাংশকে বড় হরফে ছেপে বা পুনরাবৃত্তি করে সংশ্লিষ্ট শব্দ বা বাক্যটিকে পাঠকের কাছে বিশেষ গুরুত্বে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। এমনই হরেক নতুনত্বে শুরু থেকেই সুবিমল মিশ্র সাহিত্যের বাঁধাধরা সীমানা টপকে নতুন সম্ভাবনায় উজ্জ্বল।

তথ্যসূত্র :

১। সুবিমল মিশ্র, বই সংগ্রহ-১ (অ্যান্টি-গল্পসংগ্রহ), গাঙচিল, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃষ্ঠা- ৭।

২। সুবিমল মিশ্র, আত্মজীবনীর খসড়া, বাঘের বাচ্চা-১ (সুবিমল সংখ্যা), বইমেলা ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১১।

৩। সুবিমল মিশ্রের সাক্ষাৎকার, উলটো দূরবীন পত্রিকার বইমেলা সংখ্যা ২০১২তে প্রকাশিত। সংগৃহীত- বাঘের বাচ্চা-১ (সুবিমল সংখ্যা), বইমেলা ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৭৯।

৪। সুবিমল মিশ্র, হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি, বই সংগ্রহ -১ (অ্যান্টি-গল্পসংগ্রহ), গাঙচিল, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃষ্ঠা- ১৯।

৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯।

৬। সুবিমল মিশ্র, বাগানের ঘোড়ানিমের গাছে দেখন চাচা থাকতেন, বই সংগ্রহ -১ (অ্যান্টি-গল্পসংগ্রহ), ২০১৮, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৫।

৭। বিজ্ঞাপন পর্ব পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকার, সংগৃহীত- সুবিমল মিশ্র, বই সংগ্রহ -১ (অ্যান্টি-গল্পসংগ্রহ), ২০১৮, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৮২।

৮। প্রচ্ছদ, সুবিমল মিশ্র, নাঙা হাড় জেগে উঠছে, সংগৃহীত- সুবিমল মিশ্র, বই সংগ্রহ -১ (অ্যান্টি-গল্পসংগ্রহ), ২০১৮, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৫।

৯। লেখা সম্পর্কে, সুবিমল মিশ্র, বই সংগ্রহ -১(অ্যান্টি-গল্পসংগ্রহ), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮২।

সু মি ত চ্যা টা র্জ্জী

প্রতিবাদের আলোকে সুবিমল মিশ্রের ছোটগল্প

বিশ শতকের ষাটের দশকের শেষ দিকে বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় এক স্বকীয় ব্যক্তিত্ব সুবিমল মিশ্রের আবির্ভাব। তাঁর জন্ম ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন, কাকদ্বীপের এক প্রান্তিক গ্রামে ও মৃত্যু ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি। এই সময়ে সমাজ ও সাহিত্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা লাভ, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য আন্দোলন, হাংরি আন্দোলন, শাস্ত্র বিরোধী আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যাওয়া, নিম সাহিত্য আন্দোলন, বামফ্রন্ট সরকার গঠন ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনা ও আন্দোলন নতুন দিশা দেখিয়েছিল। এই কঠিন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই সমকালীন সাহিত্যিকেরা তাঁদের প্রতিবাদী স্বরকে লেখনীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নবারুণ ভট্টাচার্য, রমানাথ রায়, বলরাম বসাক প্রমুখ কথাসাহিত্যিক। এই ধারারই অন্যতম একজন সার্থক কথাসাহিত্যিক সুবিমল মিশ্র।

সুবিমল মিশ্রের কথাসাহিত্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জীবনের কথা, শাসকশ্রেণির পাশবিক অত্যাচার ও শোষণের চিত্র, সমস্ত রকম আগ্রাসনের বিরোধিতা, মধ্যবিত্ত মানসিকতার বিরোধিতা, প্রতিবাদী চিন্তা-চেতনার বিশেষ অভিমুখ ও প্রচলিত ধারার ছক ভাঙার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। তাঁর সমগ্র সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বিষয় হল বিরোধিতা ও প্রতিবাদ। এই প্রসঙ্গে সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য বলেছেন "সুবিমলের স্পষ্ট ও দৃঢ় বক্তব্য যদি বিশ্লেষণ করি, বুঝতে পারি অগভীর পাঠে তাঁর ক্ষোভদ্রোহ-ঘৃণা বেশি চোখে পড়লেও আসলে তিনি এক খাঁটি প্রতিবাদী দর্শন ও নন্দনের ভিত্তি তৈরি করতে চেয়েছেন।"[১] তাঁর প্রতিবাদ সমস্তরকম ক্ষমতা বা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। তথাকথিত সাহিত্যের প্রতিবাদী ধারা থেকে তিনি নিজেকে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। অপ্রচলিত আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তিনি মধ্যবিত্ত মানুষের মানসিকতায় আঘাত করেছেন যা তাঁর প্রতিবাদী সত্তারই নামান্তর। সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণেই তাঁর সাহিত্যে প্রতিবাদ স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। তাঁর ছোটগল্পগুলিতে প্রতিবাদী স্বর বহুরৈখিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে লিটিল ম্যাগাজিনে লেখা শুরু করলেও তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি' ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ প্রায় সাড়ে চার দশকের লেখক জীবনে তিনি ১০টি গল্পগ্রন্থে প্রায় ১০০ টির বেশি ছোটগল্প এবং প্রায় ১২ টি উপন্যাস রচনা করেছেন। তথাকথিত সুখপাঠ্য রচনা না করে পাঠক সমাজকে সৃজনশীল করতে চেয়েছিলেন এবং একইসঙ্গে তিনি তাঁর লেখাকে সমকালীন আগ্রাসনী রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার করে তুলেছেন। আলোচনার সুবিধার্থে তাঁর বহুমাত্রিক এই প্রতিবাদী স্বরকে ফুটিয়ে তুলতে আমরা চারটি ছোটগল্পকে নির্বাচন

করেছি। আলোচ্য গল্পগুলি হল ‘হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি’ (১৯৭১ খ্রি.) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত নামগল্প ‘হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি’ (জুন, ১৯৬৯ খ্রি.), ‘নাঙা হাড় জেগে উঠছে’ (১৯৭৪ খ্রি.) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত ‘ধারাবিবরণী-৭১’ (মার্চ, ১৯৭২ খ্রি.) ও ‘৭২-এর ডিসেম্বরের এক বিকেল’ (জানুয়ারি, ১৯৭৩ খ্রি.) এবং ‘বাব্বি’ (১৯৮৫ খ্রি.) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত ‘ক্যালকাটা ডেটলাইন’ (আগস্ট, ১৯৮২ খ্রি.) গল্প।

‘হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি’ গল্পে আমরা দেখতে পাই, বামুনপাড়ার জমিদারের জমিতে বর্গাদার দরিদ্র হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের করুন কাহিনি। লাঙল চষা নিয়ে জমিদারের সঙ্গে ঝামেলায় হারাণ খুন হয়। ফলে তাঁর বিধবা স্ত্রী মুড়ি বিক্রি করে দেড় বছরের রোগা ছেলেকে নিয়ে পেট চালায়। কিন্তু সমাজ তাকে বাধ্য করে বিপথে যেতে। দিনের পর দিন শোষিত হয়েছে হারাণের বিধবা বৌ। শেষে বাধ্য হয় সে আত্মহত্যা করতে। কালিঘাটের যে জলে স্নান করে মানুষ পাপ থেকে নিষ্কৃতি পায়, সেই জলেই হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া ভেসে যায়। শেয়ালেরা সেই মরার পেট ছিঁড়তে গিয়ে দেখে একটা জীবিত বাচ্চা আকাশের দিকে উঠে গিয়ে মুক্তকণ্ঠে বলছে—“তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।”[২] এখানে গল্পকার বাক্যটির ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়ার জন্য বড় হরফের ব্যবহার করেছেন। এক শিশুর জবানীতে ‘তোমারে’ শব্দের মধ্য দিয়ে গল্পকার শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া অন্যদিকে শহরের প্রায় সমস্ত জায়গায় দেখা যায়। কখনো বামুনবাড়ির জমিদার বুড়োর বাড়িতে, শহরের মেয়রের বাথরুমে, বিখ্যাত জননেতার ঘরে দুপুরের খাবার টেবিলে, কারও ঘরের চৌকির নিচে, আলমারির পিছনে, খাবার ঘরের মেঝেতে, আবার ট্রামের রাস্তার মাঝে পথ বন্ধ করে ভোর রাতে হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া পড়ে আছে। সবাই ভীত হয়ে মুখে রুমাল চিপে রাস্তা পার হয়। আরেকদিকে পার্কস্ট্রিটের মোড়ে ভেঙে যাওয়া গান্ধীমূর্তি নতুনভাবে স্থাপনের জন্য আমেরিকা থেকে বিমানে করে গান্ধীজীর সোনার মূর্তি আসে। সেই সোনার মূর্তি বাক্স থেকে বের করে রাষ্ট্রীয় প্রধান তা উন্মোচন করবেন। ঠিক সেই সময় চারিদিকের সমবেত জনতা হারাণের বিধবা বৌয়ের মড়াটিকে বাক্সটার ওপর দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়। আসলে সেই শবদেহ না সরানো পর্যন্ত সোনার গান্ধীমূর্তির নাগাল পাওয়া যাবে না। এভাবেই সমগ্র গল্পের মধ্যে গল্পকার এক জাদু বাস্তবতার আশ্রয় নিয়ে সমস্তরকম ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। জীবিত থাকতে হারাণ মাঝির বিধবা বৌ যে নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারেনি, তা তার গলিত মড়া করতে পেরেছে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে হারাণের বিধবা বৌয়ের প্রতিবাদ গল্পটিকে চরম সার্থকতা দিয়েছে। এ কেবল হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের

মড়ার প্রতিবাদ নয়, তা হয়ে উঠেছে সমগ্র বিশ্বের হাজার হাজার শোষিত, নির্যাতিত, দুর্ভিক্ষ পীড়িত, অসহায় মানুষের প্রতিবাদের স্বর।

সুবিমল মিশ্রের আরেকটি অন্যতম সাড়া জাগানো ছোটগল্প ‘ক্যালকাটা ডেটলাইন’। এই গল্পে তিনি খন্ড খন্ড ঘটনার মধ্যে এক অখন্ড প্রতিবাদের রূপ দিতে চেয়েছেন। চরিত্রের কথোপকথন রীতি, পেপার কাটিং-এর ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর প্রতিবাদী চিন্তা-চেতনারই প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। একজন চাষীর ছেলেও যে আই.এ.এস হয়ে দেশ শাসন করতে পারে, গণতন্ত্র অনুযায়ী চাষীর ছেলেরও যে দেশ শাসনের অধিকার রয়েছে সেই বার্তাটিই গল্পের ভূমিকা অংশে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন গল্পকার। আবার এই গল্পের মধ্যেই লেখক ‘নুনের জন্য খুন’ শিরোনামে একটি পেপার কাটিং-এর ব্যবহার করেছেন। সেখানে ২৭ বছরের এক নববধূকে শাশুড়ি আর দেওর পিটিয়ে খুন করেছে কেবল রান্নায় নুন বেশি হওয়ার জন্য। যার মধ্য দিয়ে লেখক তথাকথিত সমাজের নৃশংস অমানবিক চিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি সরাসরি এখানে প্রতিবাদ না করে কেবল বার্তার মধ্য দিয়ে পাঠককে নানা ভাবে ভাবিয়ে তুলেছেন যা একজন পাঠকের মধ্যে প্রতিবাদী স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। এখানেই গল্পটির মধ্যে অভিনব প্রতিবাদের ছাপ ফুটে উঠেছে।

‘ধারা বিবরণী-৭১’ গল্পে আমরা দেখতে পাই, চোখে ছানিপড়া, গায়ের চামড়া ঝুলে যাওয়া এক বৃদ্ধ বাবা তার মৃত সন্তানের হাড় খুঁজতে ব্যস্ত। ১৯৪৭ সালে তার ছেলে খুন হয়েছিল কিন্তু ১৯৭১ সালে এসেও সে তার ছেলের হাড়ের সন্ধান পায়নি। সমকালীন সমস্তরকম ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বৃদ্ধ বলেন “আমাকে মারছ কেন—কি করেছি আমি।”[৩] মাটিতে থুবড়ে পড়ে থাকা বৃদ্ধের শরীর থেকে রক্ত বয়ে যায় পথে কিন্তু তা দেখেও কেউ তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। এই স্বার্থান্বেষী অমানবিক সমাজকে অগ্রাহ্য করে “প্রকাশ্য রাস্তায় লাঠিতে ভর দিয়ে একলা এগিয়ে যেতে থাকে সেই বুড়ো।”[৪] গল্পের মধ্যে লেখক অসংখ্য খন্ড খন্ড ঘটনাকে তুলে ধরে সমকালীন টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাস্তব চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বেলেঘাটায় তিন জনকে পাইপগান দিয়ে গুলি করা হয়, বরানগরে তিন টুকরো করে কাটা ডেডবডি, নদিয়ার শান্তিপুরে পুলিশের সঙ্গে লড়াইয়ে তের জন নিহত, বড়বাজারের চোরাকারবারি অন্যদিকে চৌমাথার মোড়ে এক অন্ধ ভিখারি গান গেয়ে চলে নিজের মনের আনন্দে। এখানে লেখক সমকালের দুটি বিপরীত দিককে উন্মোচন করে একটি প্রতিবাদী পাঠক সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। গল্পকার বলেছেন—“একদিকে মানুষ খুন হয় আর অন্যদিকে কলকাতার ফুটপাথ ভরে যায় সেক্স ম্যাগাজিনে।”[৫] দিনের পর দিন মানুষ খুন হতে থাকে, তাদের রক্তের গন্ধ অন্ধকার কলকাতার বাতাসে ভেসে বেড়ায়। গল্পের প্রধান চরিত্র অসহায় বৃদ্ধের জবানিতে

লেখক জানিয়েছেন, ১৯৪৭ সালের এক রাত্রিতে যে হত্যাকাণ্ডের ধারা শুরু হয়েছিল তা আজও অব্যাহত রয়েছে। এভাবেই সমগ্র গল্পের মধ্য দিয়ে গল্পকার প্রতিবাদের একটি অভিমুখকে খুলে দিতে চেয়েছেন।

‘৭২-এর ডিসেম্বরের এক বিকেল’ গল্পে আমরা দেখতে পাই, ১৯৭২ সালে ডিসেম্বর মাসের এক বিকেলে চৌরঙ্গি ও লেলিন সরণির চৌমাথায় দুটি ষাঁড় তুমুল ঝগড়ায় মত্ত। বাস, ট্যাক্সি, ট্রাম, প্রাইভেটকার-সহ কলকাতার ব্যস্ত জনতাকে অতর্কিতে থামিয়ে দিয়েছে এই দুটি ষাঁড়। পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ষাঁড় দুটিকে শান্ত করতে পারে নি। অন্যদিকে এই ঘটনা বিধাননগরে অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রীর গরিবি হঠাও অধিবেশনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। যার ফলে মুখ্যমন্ত্রী ও রাষ্ট্রমন্ত্রী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতে বাধ্য হয়। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন—“আমাদের গরিবি হঠানোর কর্মসূচি বানচাল করতে এরা আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে বিভেদ আনতে চাইছে।”[৬] আবার রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন—“ষাঁড় দুটো আসল ষাঁড় নয়—কম্যুনিস্ট উগ্রপন্থীরা ষাঁড় হয়ে আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে একটা গোলমাল বাধাতে চাইছ।”[৭] স্বার্থান্বেষী শাসকশ্রেণি তাদের স্বার্থকে চরিতার্থ করতে শেষ পর্যন্ত পুলিশকে দিয়ে ষাঁড় দুটিকে গুলি করতে নির্দেশ দেয়। এই নিরপরাধ প্রাণী দুটি সমকালীন রাজনীতির স্বীকার হয়েছে। এখানে গল্পকার এক নির্মম হত্যালীলার বাস্তব চিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। অপরদিকে একদল মধ্যবিত্ত মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ এই নৃশংস হত্যালীলা দেখে আনন্দ অনুভব করে। সমগ্র গল্পের মধ্য দিয়ে লেখক এভাবেই তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন ঘটনা অবতারণার মধ্য দিয়ে শাসকদলের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

সুবিমল মিশ্রের বিরোধী সত্তার মধ্য দিয়েই আমরা তাঁর প্রতিবাদী স্বরটিকে চিনে নিতে পারি। তাঁর গল্পে প্রতিবাদের অভিমুখ সমাজের সমস্তরকম কৃত্রিমতা ও মুখোশগুলিকে নির্মমভাবে ভেঙে ফেলতে চেয়েছে। গল্পের মধ্যে তিনি সরাসরি কোনো প্রতিবাদ করেননি, কিন্তু পরোক্ষভাবে আমরা সমাজের এই অস্পৃশ্য অন্ধকারময় দিকটিকে উপলব্ধি করতে পারি। শোষণ, অত্যাচার, নির্মম হত্যা, রাজনৈতিক অরাজকতাকে নিটোলভাবে তুলে ধরে লেখক সমাজের বাস্তব সমস্যাটিকে স্পষ্টভাবে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন এবং পাঠক নিজের বিচার বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনা করে সেই সমস্যার সমাধান করতে পারেন। এভাবেই সুবিমল মিশ্র তাঁর ছোটগল্পগুলিতে সার্থকভাবে প্রতিবাদের বীজ বপন করেছেন।

তথ্যসূত্র :

১। তপোধীর ভট্টাচার্য, ‘সুবিমল মিশ্র: তাঁর দ্রোহ-যন্ত্রণা-বিস্ফোরণ’, আদ্যশ্রাদ্ধ, ডানা, কলকাতা ৭০০১২৩, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা : ২০১২, পৃ. ২০

২। সুবিমল মিশ্র, বইসংগ্রহ১, 'হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি', গাঙচিল, কলকাতা৭০০১১১, প্রথম গাঙচিল সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১২, চতুর্থ মুদ্রণ : নভেম্বর ২০২১, পৃ. ১৯
৩। সুবিমল মিশ্র, বইসংগ্রহ ১, 'ধারাবিবরণী-৭১', গাঙচিল, কলকাতা৭০০১১১, প্রথম গাঙচিল সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১২, চতুর্থ মুদ্রণ : নভেম্বর ২০২১, পৃ. ১১৯
৪। প্রাগুক্ত, পৃ ১১৯
৫। সুবিমল মিশ্র, বইসংগ্রহ১, 'ধারাবিবরণী-৭১', গাঙচিল, কলকাতা৭০০১১১, প্রথম গাঙচিল সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১২, চতুর্থ মুদ্রণ : নভেম্বর ২০২১, পৃ. ১২০
৬। সুবিমল মিশ্র, বইসংগ্রহ১, '৭২-এর ডিসেম্বরের এক বিকেল', গাঙচিল, কলকাতা৭০০১১১, প্রথম গাঙচিল সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১২, চতুর্থ মুদ্রণ : নভেম্বর ২০২১, পৃ. ১২৭
৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

আকরগ্রন্থ :

১। সুবিমল মিশ্র, বইসংগ্রহ১, গাঙচিল, কলকাতা ৭০০১১১, প্রথম গাঙচিল সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১২, চতুর্থ মুদ্রণ : নভেম্বর ২০২১
২। সুবিমল মিশ্র, বইসংগ্রহ ৪, গাঙচিল, কলকাতা ৭০০১১১, প্রথম গাঙচিল সংস্করণ : জুলাই ২০১৪, দ্বিতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০২৩

উ জ্জ্ব ল প্রা মা ণি ক

নবারুণের গল্প : "বড়লোকের গাড়ির টায়ার/ফুটো করে লাগাও ফায়ার..."

বাংলা সাহিত্যে নবারুণ শুধু একটা নাম নয়, আগুন পাখি। তিনি বাংলা সাহিত্যের সশস্ত্র ও বিপজ্জনক যোদ্ধা। তাঁর আদর্শ জর্জরিত, নিখাদ অনির্বাণ দুটি চোখ শুধু বিদ্রোহের মশাল খুঁজেছে। দলদাস নয়, লোভহীন, অস্তিত্ব বিপন্নতার এক স্বপ্নহীন ধূসর চরিত্র নবারুণ। তাঁকে ভেতর থেকে ছোঁয়া যায় না, বাইরে থেকেও যায় কি? ডাকনাম বাপ্পা, নীরব মুক্তো সন্ধানী এক বিজন বালক। জগুবাজারের দশ বাই দশের ঘুপচিতে ছিল তাঁর সাধনক্ষেত্র। মা বিখ্যাত লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী আর বাবা প্রতিভাশীল নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য্য। তবু পিতা-মাতার কৌলীন্যের বিন্দুমাত্র অহমিকা প্রদর্শন ছিল না। বরং তাঁদের বৈবাহিক সম্পর্কের বিচ্ছেদে মাতৃস্নেহহীন অযত্নের জীবন কেটেছে বাপ্পার। শৈশবে বাবার চোখে যে শ্রেণিহীন সাম্যবাদের স্বপ্ন দেখেছিলেন তাকেই লালন করেছেন আজীবন। ছোটবেলা থেকেই সাংঘাতিক বহেমিয়ান ছেলেটা আসলে মেনস্ট্রিম থেকে একেবারে বাইপাশে হেঁটেছেন। তথাকথিত বাস্তবতার ঘাড়ে হাগু-মুতু করে এক অন্য স্পিরিচুয়ালিটিতে হারবার্ট, 'ফ্যাতাড়ুকে' নিয়ে গিয়েছেন প্রথা-বিরোধের পথে। মৃদু অনুচ্চারিত হাসি ও টুকরো টুকরো বাক্যে প্রতিবাদ শানিত হয়েছে তাঁর কলমে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, উজ্জ্বল একরোখা দুটি চোখ রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে উগরে দিয়েছে তীব্র ঘৃণা,

> "গাঁড় মারি তোর মোটরগাড়ির
> গাঁড় মারি তোর শপিং মলের
> বুঝবি যখন আসবে তেড়ে
> ন্যাঙ্গটো মজুর সাবান কলের
>
> পেটমোটাদের ফাটবে খুলি
> ফাটবে মাইন চতুর্দিকে
> গলায় ফিতে নেংটি বেড়াল
> তার বরাতেই ছিঁড়বে শিকে" -কবি পুরন্দর ভাট

ছয় ও সাতের দশক, পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে ক্রান্তিকালীন পর্ব। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানান ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত একটা সময়। রাজনৈতিক ময়দানেও এক জটিল ঘূর্ণাবর্তের আবহ। ৬৪-তে সিপিআই ভেঙে সিপিআই(এম)এর গঠন, ৬৭-তে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন এবং এই বছরই নকশালবাড়িতে জোতদার বিরোধী কৃষকদের উপর পুলিশের গুলি চলল। সূচিত হল পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে রাজনৈতিক 'অ্যাকশন'। ব্যাপক গণ-আন্দোলন। প্রতিবাদের আগুন নকশাল বাড়ি থেকে পৌঁছে গেল শহর কলকাতার

কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, চৌরাস্তার মোড়ে। আতঙ্ক-অন্তর্ঘাত-সংঘর্ষ-অস্থিরতার বারুদের স্তূপে উদযাপন হল সত্তরের। বন্দুকেরগুলির বিরুদ্ধে পালটা গুলির আঘাতে সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখল অনেক প্রগতিশীল মানুষ। সংসদীয় রাজনীতির অন্দরে থাকার কারণে সেদিন সিপিআই(এম)ও মুখ ফিরিয়ে নিল ভূমিহীন কৃষকের পক্ষ থেকে। পার্টিতে দেখা গেল আবারও ভাঙন। ১৯৬৯ সাল, সিপিআই (এম) ভেঙে গড়ে উঠল সিপআই (এম,এল)। জন্ম নিল চূড়ান্ত সমাজতান্ত্রিক একটি কমিউনিস্ট দল। যাঁরা তাঁদের ট্যাগ লাইনে ঘোষণা করল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ বিরোধী ম্যানিফেস্টো,

"আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে জনযুদ্ধ হল শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে কৃষক শ্রেণির যুদ্ধ। আমাদের জনযুদ্ধের রণনীতি হল, কমরেড লিন পিয়াও ঠিক যেমনটি দেখিয়েছেন কৃষক জনতার উপর আস্থা রাখা, ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলা, লেগে থেকে সশস্ত্র লড়াই চালানো, শহরগুলিকে ঘিরে ফেলে শেষকালে সেগুলি দখল করে নেবার জন্য গ্রামাঞ্চলকে ব্যবহার করা।"

কিন্তু শেষপর্যন্ত গণমুক্তি ফৌজের অতি-নাশকতামূলক কার্যকলাপ ও ভুল রণনীতি মানুষকে সঠিক দিশা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। কয়লাখনির জাতীয়করণ, ইন্দিরা গান্ধীর ২০ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচির ঘোষণা-ক্ষুব্ধ আমজনতার মনে চিঁড়ে ভেজাতে পারেনি। ৭৫-এর অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থার ঘোষণার বিরূপফল দেখা গেল ৭৭-র বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে। রাজ্যে সিপিআই (এম)-এর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার এবং কেন্দ্রে গঠিত হল অ-কংগ্রেসি সরকার। কিন্তু আসল পরিবর্তন এল কই! সময়ের অন্তঃস্বরে তারাও মিশে গেল পুঁজিবাদের মোহ ও নব্য-উদারনীতির আস্ফালনে। নিম্নবর্গীয় মানুষজনের উপর রাষ্ট্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের পরম্পরাটি অব্যাহতই রইল।

এমনই এক দ্রোহকালে নবারুণ ভট্টাচার্য(১৯৪৮-১৯১৪) বাংলা সাহিত্যে নিয়ে এলেন প্রতিবিপ্লবের পসরা। একরাশ নৈরাশ্য বুকে নিয়ে সেদিন অন্য অনেকের মতো তিনি কলম ধরলেন মাকর্সবাদের দিনবদলের তত্ত্ব গায়ে মেখে। নৈর্ব্যক্তিক স্বরে তুলে আনলেন সর্বহারাদের প্রতিবাদ-ক্ষোভ-জ্বালা-অন্তর্দাহকে। ক্ষয়ে যাওয়া সমাজের বুকে, পালটে যাওয়া দক্ষিণপন্থীর বিপরীতে উড়িয়ে দিলেন হালাল ঝান্ডা। ১৯৬৮তে 'পরিচয়' পত্রিকায় 'ভাসান' নামে প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হল তাঁর। যদিও প্রথম গল্পসংকলন 'হালাল ঝান্ডা' বেরিয়েছিল অনেকটা পরে, ১৯৮৭-তে। তারপর ক্রমপ্রকাশিত কয়েকটি গল্প সংকলন; 'নবারুণ ভট্টাচার্যের ছোটগল্প'(১৯৯৬), 'অন্ধবেড়াল'(২০০১), 'ফ্যাতাড়ুর বোম্বাচাক'(২০০১), 'ফ্যাতাড়ুর বোম্বাচাক ও অন্যান্য'(২০০৪) এবং 'শ্রেষ্ঠগল্প'(২০১০)।

'ভাসান' গল্পটি উত্তমপুরুষের বয়ানে মৃত মানুষের অন্তর্কথন। লোকচক্ষুর আড়ালে মৃত্যু হয়েছে পাগলটির। মৃত্যুর পরে বোঝা গেল পাগলিটি তাকে ভালোবেসে আঁকড়ে রাখতে চায়। সে এখন মৃতদেহের মাধ্যমেই কথা বলে, চিন্তা করে। অথচ লোক সম্মুখে

যার বেঁচে থাকার কোন মাহাত্ম্য ছিল না, মরে গিয়েও কোন হাহুতাশ থাকার কথা নয়; নিম্নবর্গের সবচেয়ে নিচু সোপানে টিকে থাকা আধা-মানুষের একজন। লেখক সেই মৃত মানুষটিকেই গল্পের ভাষ্য করায় পাঠকের অবাক হওয়ারই কথা! কিন্তু গল্পের অন্তর্বয়ানে বিস্ফোরণ ঘটে যখন মৃত মানুষটি নিজের মৃত্যুর বর্ণনা দেয়,

"পার্কের বাসিন্দা ডেঁও পিঁপিড়েরা মহানন্দে আমার উপর নাচানাচি করিতে লাগিল। আমার তখন দিব্যকর্ণ লাভ হইয়াছে। শুনিলাম তাহারা দীর্ঘদিন মনুষ্যচক্ষু খায় নাই। "কী আনন্দ, কী আনন্দ। তাহাদের নাচানাচির মধ্যে কয়েকটি বুদ্ধিমান পিঁপিড়া তাহাদের বাকি দলবলকে ডাকতে গেল। দীর্ঘদিন পূর্বে এই মাঠেই আমি একটি মিটিং শুনিয়াছিলাম। লাল পতাকার উপরে কাস্তে-হাতুড়ি আঁকা ছিল। লোকটি কী সব বলিতেছিল সকলের খাইবার দাবি।...সেই প্রথমবারের লোকটির কথা এখনও আমার মনে আছে। সে থাকিলে সুখী হইত পিঁপিড়ারা অন্তত তাহার কথামতো কাজ করিতেছে।...পিঁপড়াদের ন্যায় আমিও বলিলাম, "কী আনন্দ! কী আনন্দ!" পিঁপড়ারা তাহাদের কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। আমার ডান চক্ষু এবং বাঁ চক্ষুর মধ্যে যে একটি গোপন পথ আছে তাহা আমি জানিতাম না। ডেঁওর দল এক চোখ দিয়া ঢুকিয়া অন্য চোখ দিয়া বাহির হইতেছিল। পথটি কিছুক্ষণ বাদে পুরনো হইয়া যাওয়ায় তাহারা নাক ও কান, কান ও চোখ ইত্যাদি নূতন নূতন পথ খুঁজিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।"

পিঁপড়েদের কাছ থেকে খবর পেল মাঠের ইঁদুর। ইঁদুরদের কাছ থেকে কুকুর। শেষে দেখি পুলিশ এসে কালো গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল নগ্ন দেহ। গড়-গড় শব্দে গাড়ি চলল। আর ততক্ষণে মনে হল যে সে পাগলিকে বড় ভালোবাসে। ভাতঘুম দিতে দিতে অনায়াসে সাবলীল ভাবে এ গল্প পড়ে ফেলা যায় না। বার বার থামতে হয়। লেখক এরকমই কিম্ভূত! আনন্দ দেওয়ার জন্য বা আনন্দ নেওয়ার জন্য তিনি লেখেননি। কাহিনি অর্থে গল্প রচনা তাঁর কাছে নিছকই বানানো এবং আত্মপ্রতারণায় পূর্ণ। লেখা তাঁর কাছে ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে বিস্ফোরণের ঝুঁকি প্রবল। নিচুতলার বাস্তবতাকে বেআব্রু, অন্ধকার, শ্লীল-অশ্লীল বিবেচনা না করেই উপস্থাপন করেন তিনি। যা পাঠককে বিচলিত করে, অস্বস্তিতে ফেলে। নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দেয় না। আসলে লেখকও চান তাঁর পাঠক মধ্যবর্গীয় প্রাতিষ্ঠানিকতা থেকে বেরিয়ে এসে দুঃসময়ের কেল্লা-দখলকে অনিবার্য করে তুলুক।

১৯৭০ সালে 'সপ্তাহ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'স্টিমাররোল' গল্পটিও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমশক্তির স্পর্ধিত প্রত্যাঘাত। সারিবন্দি গাড়িগুলোর উপর বুড়ো আর তার স্টিমাররোল যখন দাপিয়ে বেড়ায় তখন খুব সূক্ষ্মভাবে চিরলাঞ্ছিতজনের মনে নিউটনের বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়াটি সক্রিয় হয়ে ওঠে। যদিও অবধারিতভাবেই রাষ্ট্র তার নৃশংসতাকে জারি রাখে। গাড়ি মালিকরা ঠিক ক্ষতিপূরণ পেয়ে যায়, কিন্তু অতিমানবিক দুঃসাহসের কারণে বুড়ো

স্টিমারচালকের কপলে জোটে বিদেশী অর্থপুষ্ট নচ্ছার ডাকাতের তকমা। গল্পের শুরুতে যে রোদতপ্ত মে মাসের দাবদাহের বর্ণনা আছে তা প্রকৃতপক্ষে শোষণক্লান্ত নিম্নবর্গের দহনেরই ইঙ্গিত দেয়;

"রোদ্দুরটা ভীষণ একরোখা আর জমাট, ধূলিকণাদের চেপে ধরে রেখেছে রাস্তার গায়ে, গরম আর চিটচিটে পিচের মধ্যে আটকে যাচ্ছে অনিচ্ছাসত্ত্বেও, নরম পিচে জোড়া জোড়া থাবার দাগ ফেলে ফেলে ছায়ার দিকে সে এগিয়ে এল। ঘোলা জলের গর্তগুলো শুকিয়ে গেছে আঁচে, পাতলা বালি চিকিকে মিহি পলিমাটি চিত্তির-বিত্তির হয়ে ফেটে ফেটে নানাবিধ রেখা ও সূক্ষ্ম ফাটলে নর্দমার গা বরাবর জমে আছে, শুকনো সিগারেটের টুকরো, লজেন্সের মোড়ক, কুটোকাটা সবাই ভেসে যেতে যেতে ধমক খেয়ে থেমে গেছে।"

এই গল্পহীন গল্পে শুরু থেকেই পাঠক এক অপ্রত্যাশিত মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিলেন। এই বুঝি বোমাটা ফাটবে! গল্পকার একটু একটু করে বারুদের স্তূপ বানিয়েছেন যাতে ঠিক মুহূর্তে বিস্ফোরণটি জরালো হয়। স্টিমার চালকের তীব্র ক্ষুধা আর বার্ধক্যের কারণে শরীরে জোর কমে যায়, দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ হতে থাকে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে নিত্যদিনের শ্রম-শাসনের ক্রোধ ও শ্রেণি-ঘৃণা জমতে থাকে। এক ব্রহ্মমুহূর্তে অদ্ভুত ইচ্ছা জাগে তার- 'জরদ্গাব বিশাল বিকট যন্ত্রটাকে লেলিয়ে দেবার'। মুহূর্তের মধ্যেই স্টিমাররোলার বড়লোকের গাড়ির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুমড়ে-মুচড়ে সব এক হয়ে যায়। গল্পের কথাবয়ানে ফুটে ওঠে এক নতুন পৃথিবী নির্মাণের প্রত্যয়,

"স্টিমরোলারটা যুদ্ধের আনন্দে থরথর করে কাঁপছে, ধাক্কার জোরে বুড়োরও লেগেছে হাতে আর পিঠে কিন্তু রক্তের মধ্যে এখনও ঘোড়ার টগবগ দৌড় আর মুখ উপচে গড়িয়ে পড়ছে তাচ্ছিল্যের হাসি। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে শত্তুরের সঙ্গে। পাগলা হাতির মতো স্টিমরোলার আক্রমণ করার আগে পেছিয়ে এল, তারপর আবার দ্বিগুণ জোরে এগিয়ে এল তোবড়ানো সাদা গাড়িটার দিকে। দলা মোচড়ানো সাদা গাড়িটা ছিটকে উঠে এল সামনে, একটু থেমে রইলো, তারপর উল্টে চার চাকা ওপরে তুলে আছড়ে পড়লো। যুদ্ধের শেষ নেই। ধোঁয়ার মধ্যে বিস্ফোরণের শব্দ আর ফুলকি। তাই হোক, আগুন-টাগুন ছিটক্কোক। গাড়িগুলো পরের পর তছনছ হতে থাকলো।"

এরপর প্রাতিষ্ঠানিক প্রভুরা যে সমস্ত বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গকে পায়ের নিচে পিষে ফেলবে তা আর নতুন কী! তবু মধ্যবিত্ত মন বাঁচার রসদ খুঁজে পেতে চায়। লড়াইয়ের রসদ খুঁজে নিতে চায়। তারা প্রতিনিয়তই ভাঙছে, মরছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে তবু উচ্চবিত্তের 'সফিস্টিকেশনকে' পরোয়া করছে না। অসম লড়াইয়ের উদযাপন চলছে নিরন্তর।

মধ্যবিত্তমেদুর পৃথিবীকে নিরবচ্ছিন্ন নির্মমতায় বিদ্ধ করে যায় নবারুণের গল্প। ১৯৭১ সালে 'সাহিত্যপত্র'-এ প্রকাশিত তেমনি একটি গল্প 'খোঁচড়'। দুর্বলচিত্তের পাঠক এই বয়ান নিতে পারে না, গা গুলিয়ে যায়। গল্পে আছে এক অদ্ভুত সিরিয়াল কিলার যে প্রশাসনের

হয়ে কাজ করে। যার শার্টের কলারটা শেষ হবার কাছে ঘাড় আর পিঠের মাঝামাঝি ইঞ্চি দুয়েক জায়গা জুড়ে একটা চুলকানির অসুখ। চর্মরোগ বললে একে ভুল বলা হবে। এটি আসলে কিলার সিগন্যালিং। কাউকে খুন করার আগে ঘাড়ের ইনফেকশন বাড়ে, জায়গাটা ভিজে দাগড়া হয়ে ফুলে ওঠে। সে বুঝতে পারে লাশ ফেলার সময় এসেছে। পুলিশ তাকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে যায় কালীতলা যুবক সমিতির জলসায়। খবর ছিল জলসায় গান শুনতে এসেছে নকশালকর্মী গৌতম বিশ্বাস। লোকটা ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায়,

"রিভলভারটা প্রায় পেটের সঙ্গে ঠেকিয়ে ট্রিগার টানে...ব্লব... ছেলেটার বিস্ফারিত চোখ... সাইলেন্সারে গুম হয়ে যাওয়া আওয়াজ...ওয়াকছেলেটার পেট থেকে রক্ত ছিটকোয়.. মুখটা হাঁ করা... বাতাস উগরোয়... হাঁটু ভেঙে সামনে এগিয়ে আসে... চোখদুটো সহসা আঘাতে বিস্ময়ে বোবা...ওর মুখ থেকে লালা পড়ছে... ছেলেটো যেন ওকে ছুঁতে আসে...না পেরে উল্টে হাঁটু গেড়ে শরীরটা পড়ে...ও এক পা সরে আসে তারপর খুলির নিচে গলায় রিভলভারের মুখটা ঠেকিয়ে গুলি করে BOL ব্লব শরীরটা ছিটকে যায়... লালা টানার অশ্লীল শব্দ... হাতদুটো একটু কাঁপে... চারপাশে চিৎকার... ফিকে একটু কর্ডাইট আর রক্তের গন্ধ... আলোগুলো দুলছে...লোক দৌড়োয়... চিৎকার....সমস্ত আলোগুলো একটা জ্বলন্ত গোলক তৈরি করেছিল... টগবগ করতে করতে আলোগুলো আলাদা হয়ে ফিয়ে যায়... শব্দ... কানের ওপর টিকটিকিটার শিকার আছড়ানোর শব্দ...রক্ত মেখে ওলটপালট করে... লোকের পায়ে জড়িয়ে যায়। মুখটা মাটিতে ঘষে-হাটা টানটান হয়... থেমে যায়..."

গুলির শব্দ কেউ পায় না ঠিকই, কিন্তু রক্তাক্ত দেহটা জলসার উত্তেজনাকে মুহূর্তে স্তব্ধ করে দেয়। সমিতির ছেলেরা জলসা থামিয়ে দেওয়ার কথা ভাবে। পুলিশের কড়া নির্দেশ আসে গান থামানো চলবে না। জলসা চলবে। দুজন প্লেনড্রেসের পুলিশ একজন একটা হাত আর একজন একটা পা ধরে ছেলেটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে যায়। রক্তাক্ত খোলা মুখটি তখনো যেন প্রতিরোধের কথা বলে। হাতের আঙুলগুলো তখনো মাটিতে দাগ কেটে যাচ্ছে—বিপ্লবেরই শ্লোগান লিখে যাচ্ছে। এমন একটি হৃদয় বিদারক ঘটনার পরেও প্রসাশনিক নির্দেশে মাইকটা বাজাতে হয়। চালিয়ে যেতে হয় আনন্দ —উচ্ছ্বাস। পরে থাকে একপাটি চটি আর জমাটবাঁধা রক্ত। মানুষকে এভাবেই যন্ত্র বানায় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদীর দল। এভাবেই সদর্পে দাপিয়ে বেড়ায় খোঁচড়েরা। মানে গুপ্ত ঘাতকেরা। নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষগুলোর মার্ডার হয়ে যাওয়া আদতে রাষ্ট্রের সুশাসনকে চ্যালেঞ্জ জানানো।

মানুষমর্জির প্রাণময় জগৎটাও তাঁর গল্পে সমাদরে ঠাঁই পেয়েছে। 'অন্ধ বেড়াল' গল্পের বেড়ালটা সত্যিসত্যি হয়তো অন্ধছিল। নদীর ধারে এক হোটেলের অন্ধকার কোণে তার আশ্রয়। বেড়ালটা সেখানে থাকতো মাছের কাঁটা, লেজ, কানকো খেতে পেত বলে। এক বিধবা বউ নদী পেরিয়ে আসে নিত্যদিন। সারাদিনে দুটি এঁটোকাঁটা, ভাত পায়। তার ছেলেদুটি বিবস্ত্র অবস্থায় পড়ে থাকে। অন্ধবেড়াল সব টের পায়। কারা এল, কারা গেল।

গল্পের আখ্যানভাগ হঠাৎ করে পালটে যায়। লেখক গল্পকে অন্য ফর্ম্যাট চালনা করেন। বিলেতে জন্মের পর কয়েকটি বেড়াল ছনার চোখ সেলাই করে দিয়ে তাদের অন্ধত্বের উপর পারিপার্শ্বিক প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। কাজ শেষ হলে তাদের মেরে ফেলা হয়। এই দুটি প্রসঙ্গকে এক করে তুলেছে মানুষের নিষ্ঠুরতা। গল্পের শেষে দেখা যায় নদী ভাঙনের সংকেত পেয়ে মালিক আগে ভাগেই হাঁড়ি, কড়াই নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। পড়ে থাকে পোড়া বাড়িটা আর অন্ধ বেড়াল। অন্ধবেড়ালটা হয়ত নদী ভাঙনের তলায় ভাসে যাবে। মানুষের অন্তরের এই নিদারুণ নিষ্পৃহ নিষ্ঠুরতয় গল্প শেষ হয়।

শুধু মানুষই সব পৃথিবীতে, মানবেতর প্রাণিদের কোন দাম নেই এই একবগগা মাকর্সবাদী ধারণা থেকে সরে এসেছিলেন কথাকার। তাঁর 'লুব্ধক' উপন্যাসে শহর শাসন করেছে কুকুরেরা, 'কাঙাল মালসাট'-এ উড়ে আসে যত দণ্ডবায়স বা দাঁড়কাক। তাঁর গল্পে এমন মানুষ আসে যে উড়তে পারে আবার পেট্রল খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে। আসলে পেট্রল দিয়ে আগুন নেভানোর স্বপ্ন একজন কম্যুনিস্ট কী করে দেখবেন? একজন 'অ্যানার্কিস্ট'ই পারেন। নবারুণ যথার্থ অর্থে 'অ্যানার্কিস্ট', যিনি দিনবদলের স্বপ্ন দেখান।

তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোর কাজে ও কথায় যে বিক্ষোভ ও প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার প্রকাশ পাচ্ছে তার অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটটি বোঝার প্রয়োজন রয়েছে। ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত 'শ্রেষ্ঠগল্প'-এর ভূমিকায় লেখক বলেছেন,

"যে দশকে মানুষের এগিয়ে চলার, শোষণমুক্তি ও সমাজব্যবস্থা পালটানোর মডেল পুঁজি ও প্রতিক্রিয়ার আঘাতে ও বামপন্থীদের আবশ্যিক আত্মসমীক্ষার অভাবের কারণে অনেকটাই তছনছ হয়ে গেছে। যে শতক সবচেয়ে আশা জাগিয়েছিল সেই শতক শেষ হচ্ছে অবসাদে, বিষাদে, যন্ত্রণাজর্জর অবস্থায়। আমি দৈনন্দিনতায়, প্রত্যহ, নিকটে ও দূরে, নিয়ত যা দেখতে পাই তা হল পরতে পরতে, স্তরে স্তরে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন বর্গের ওপর চাপিয়ে দেওয়া শোষণ, নতুনতর ঔপনিবেশিকতা ও সংস্কৃতি-সাম্রাজ্যবাদের অমানুষীকরণের দেখা না দেখা হাতকড়া ও চোখভুলোনো ঠুলির ভার। সামন্ততন্ত্র বা পুঁজিবাদের বালক বয়সের প্রত্যক্ষ নিষ্ঠুরতার চেয়েও এ যেন অধিকতর মারাত্মক, জঘন্য ও অপমানজনক। কিন্তু চূড়ান্ত নিরিখে এই বাস্তবকে আমি চিরস্থায়ী বলে মানি না। বাস্তবকে পালটাতে হবে। হবেই। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় চেতনা তৈরি করার ক্ষেত্রে সাহিত্যের অবশ্যই একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। শুধু আমার দেশ বা উন্নয়নশীল ও গরিব অন্যান্য দেশ নয়, গোটা দুনিয়ার মানুষকে এক নিষ্ঠুর 'ভুলা মাসানের পাকে' ফেলে দেওয়া হয়েছে। এই অপদেবতাকে আমি ঘৃণা করি ও তার নিঃশর্ত মৃত্যু চাই।"

নব্বইয়ের গোড়ার দিকে আর্থিক-উদারীকরণের হাওয়া পাশচাত্যদেশের মতোই ভারতের গায়ে এসে লাগল। উন্নয়ণ ও অগ্রগতির মডেলটি বিশ্বায়নকে নতুন করে চিনিয়ে দিতে চাইল। তৈরি হল ইমারতের পর ইমারত। আলোকসজ্জা মিছিলে ভোগীদের উল্লাস। যদিও

প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত। ফটকবন্ধ আবাসনের মতো যেখানে গেটপাশ লাগবে। তৈরি হল শপিং মল যাদের গাড়ি আছে অবাদে তাদেরই যাতায়ত। এমনই সব নিয়ম-বিধি, সামাজিক-অর্থনৈতিক তারতম্যে সাধারণ মানুষের পিলসুজের তলার অন্ধকারে দিন যাপন। জীবনের এই অন্ধকার, ক্লেদ আর অবস্থাবদলের সম্ভাবনা নিয়ে সার্বিক নৈরাশ্য থেকেই 'ফ্যাতাড়ু'দের জন্ম।

বাদুড়ের মতো একদল মানুষ যারা উড়তে পারে। যারা তথাকথিত মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন, বহিরাগত, প্রতিষ্ঠিত দল বা গোষ্ঠীর বাইরে। আর্থিক সামর্থ্য সীমিত হওয়ার কারণে কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাদের হাতছানি দিচ্ছে না। দুর্গন্ধভরা নাগরিক ক্লেদ জমে আছে তাদের মনে। তাই উড়ন্ত সব ফ্যাতাড়ুর দল সুভদ্র সমাজের বুকে নিক্ষেপ করে ঘৃণ্যতম রেচন পদার্থগুলি। লেখকের 'শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থে'র শেষ গল্প 'ফ্যাতাড়ু'। ১৯৯৫ সালের রাত, 'ফিনফিনে পাঞ্জাবি পরা, ফরসা রোগা, কলপ করা কুচকুচে ঘাড় ঢাকা চুল, টিকালো নাক' ডি, এস ডিরেকটর স্পেশাল সম্পূর্ণ দাঁত বিহীন মদনের খপ্পরে পড়লেন। মদের ঠেকে তাদের আলাপ। সেই থকে মদন আর ডি, এস দীক্ষা নিলেন —'ফ্যাঁত ফ্যাঁত সাঁই সাঁই' গুহ্যমন্ত্রে। তারা পার্টি মিটিং ভণ্ডুল করে, টেলিভিশনের তার কেটে দেয়, অন্যের মূল্যবান সামগ্রী নষ্ট করে। সেদিন ছিল ফ্যাতাড়ুদের 'ফ্লোটেল' আক্রমণের প্রোগ্রাম;

"—ফ্লোটেল?

—হ্যাঁ, গঙ্গাবক্ষে চালু হয়েছে না ফ্লোটেল-ওপরে মেমমাগী নাচে, বড়লোকরা ফূর্তি করে, গানবাজনা, খানাপিনা হয়, জানো না?

—জানি না আবার? শুনেছিলুম তো শেয়ার ছাড়বে এন আর আই মালিক।

—আবার সেই শেয়ার? আজ হল অপারেশন ফ্লোটেল অর্থাৎ ভাসমান হোটেলেহানা।

—সেই ভ্যামপায়ার মাছেদের মতো?

—না, না, খুনজখম নয়। ভয় দেখানো। নোংরা করা। ভণ্ডুল করে দেওয়া। এতেই তো মজা।"

এক কথায় তারা ঝামেলা পাকানোর অস্তাদ। অনির্বাপিত প্রতিহিংসার আগুনকে চরিতার্থ করতেই ফ্যাতাড়ুরা এ কাজ বেছে নিয়েছে। 'কবি সম্মেলনে ফ্যাতাড়ু' গল্পে কবি পুরন্দর ভাটের সঙ্গে যোগাযোগ হয় মদন-ডি. এস. জুটির। সে অবশ্যই ফ্যাতাড়ুদের একজন। নানা চোখে জীবনকে দেখে। তীব্র ব্যঙ্গের চোখে রিয়েলিটিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। এই যে ফ্যাতাড়ুরা এরা কিন্তু প্রত্যেকেই রেবেল। সোসাইটির বিভিন্ন জায়গায় ঝামেলা পাকানোই এদের কাজ। তাদের কথায—'কিছু দেখি না মোরা, শুনি আর খাই। ওই একটাই কাজ, ঝামেলা পাকাই'। এটা এক অর্থে সিম্বল অব ডিসেন্ট। নবারুণ তথ্য ও কল্পনাকে কাজে লাগিয়ে উড়ন্ত মানুষ অর্থাৎ ফ্যাতাড়ু বর্গের সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত নন, তাঁকে একটা রাজনৈতিক অভিমুখ দিলেন। এই অভিমুখের নাম 'অন্তর্ঘাত'। মুখবন্ধে নবারুণের উক্তি "..নিরন্তর যে

প্রতিহিংসার আগুন আমাদের মধ্যে কখনো ধিকি ধিকি, কখনো ধুক ধুক করেই চলেছে, যা কেলিয়ে পড়লেও নিভতে পারে না, তা অনেকটা চরিতার্থ করার পথ ফ্যাতাড়ুরা আমাদের দেখিয়েছে।” মদন যেমন ‘নতুন’ ফ্যাতাড়ু ডি এস-কে বলেছে “-ড্যামেজ। পরলেই ড্যামেজ করো। এইটা মাথায় থাকতে হবে। এরকম যারা করে তাদের আমরা রিক্রুট করি।”-এই ড্যামেজ করার অভিযান ফ্যাতাড়ু বাহিনীকে ঘিরে তৈরি করে এক বিকল্প বাস্তব—যা “সূক্ষ্ম অথচ অমোঘ, আর রহস্যের, জাদুবাস্তবতার মোড়কে অনবদ্য।” ফ্যাতাড়ুমন্ত্রে দীক্ষার আসল যজ্ঞটা শুরু হয়েছিল ‘হারবার্ট’-এ। ১৯৬৯ সালে আশুতোষ কলেজে জিওলজি নিয়ে পড়তে আসা বিনু-র হাত ধরে। নকশাল আন্দোলনে বিনুর মৃত্যুর পর তার আধখ্যাপা কাকা ‘হারবার্ট’ এক অলৌকিক স্বপ্নের দৌলতে সেই অনাগত ঝড়-জাগানিয়া মন্ত্র পেয়ে যায় নিজের অগোচরেই—

“হারবার্ট হদিশ পাচ্ছে। এবার তাকে দাপাতে হবে। বিনুর সময় এসেছিল। এবার তার সময়। সব লন্ডভন্ড করে দিতে হবে। নকড়াছকড়া করে ফাঁৎরাফাই করে বিশ্ব সংসারে একটা তান্ডব লাগিয়ে দিতে হবে।”

সেই অলৌকিক বার্তা পেয়ে হারবার্ট-এর ম্যাজিক্যাল তান্ডব “মৃতের সহিত কথোপকথন” এবং বিনুর রেখে যাওয়া ডিনামাইট স্টিক থেকে শ্মশানবিধ্বংসী বিস্ফোরণ। এই প্রসেসটার মধ্যে একটা রিয়েল-আনরিয়েল এলিমেন্ট মিশে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে লেখকের অভিমত,

“আসলে লেখকের হাতে ম্যাজিশিয়ানের মতো ট্রিকস থাকা দরকার। যেমন, ‘হারবার্ট’-এ শেষপর্যন্ত চুল্লিটা যে ফাটবে এটা তো আমি আগে বুঝতে দেব না, আমি আনএক্সপেক্টেডটাকে খুঁজব, কারণ এটা একটা শর্ট সার্কিটের জায়গা। আর এই গোটা পরিকল্পনাটা সলিডলি গ্রাউন্ডেড অন রিয়ালিটি। সত্যিই একসময়ে মৃতদেহের সঙ্গে তোশক পোড়ানো চালু হয়েছিল শ্মশানে, কিছুদিন পরে অবশ্য বন্ধও হয়ে গেল। আমি চালু করতেও বলি নি, বন্ধ করতেও বলিনি। কিন্তু যে ক-বছর চালু ছিল, তার মধ্যে কোনো একটা তোশকের সঙ্গে কয়েকটা ডিনামাইট স্টিক কি ঢুকে যেতে পারে না চুল্লির ভেতরে?”

স্থিতাবস্থা, বড়লোকেদের বদমাইশি আর সহ্য হয় না লেখকের। কিন্তু কিছু করতেও পারেন না। তাই চারটে ফ্যাতাড়ু ঠুকিয়ে দেন। যাদের সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে আপমানিত মানুষদের রিভেঞ্জ নেওয়ার আনন্দ আছে। বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, মিছিলে যারা পা মেলাবে তাদের সঙ্গে থাকবে ফ্যাতাড়ুরা। মারার খেতে খেতে যারা মার খাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়বে তাদের হাত ধরবে ফ্যাতাড়ুরা।

নবারুণের চরিত্রদের মুখের ভাষা তাঁর সাহিত্যকে আলাদা করেছে। ব্যতিক্রমী করেছে। ভাষাকে রক্তহীন, অযৌন প্লাস্টিকগন্ধী করে তুলতে তিনি কখনই চাননি। সুরজিত সেনের কথায় “বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে কতিপয় লেখক তাঁদের লেখায় ভাষাসন্ত্রাস ছড়িয়েছেন নবারুণ ভট্টাচার্য তাঁদের অন্যতম। যে ভাষাসন্ত্রাসে বাংলা সাহিত্যের সাজানো ড্রয়িং রুমটা

তছনছ। সাধারণ বাংলা গল্প উপন্যাসে যে খোকা গদ্যভাষার কলাকাকলি চলে, নবারুণের অঙ্গুঠাছাপ দেওয়া ভাষাটি তার উপর আর ডিক্স- এর মতো ফেটে পড়ে।"

চারিপাশের ভ্রষ্ট ন্যায়-নীতি যখন সভ্যতার পোশাক খুলে ফেলে আমানবিক হয়ে উঠছে তখন সভ্য-ভব্য-মার্জিত ভাষায় আর প্রতিবাদ টেঁকে না। ভণ্ডামির বিরুদ্ধে গালিগালাজের ঝড় তুলতে হয়। তাতে ক্ষোভ আর অভিযোগের স্বর আরও জরালো হয়। লেখক সেটা পেরেছেন। সেই কারণেই হয়তো নব্য-উদারনীতির জমানায় দিনবদলের গান গেয়েছেন। আর আম-আদমির বেঁচে থাকার উড়ন মন্তর হয়ে উঠেছে—ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই

গ্রন্থপঞ্জী :

১। বিপিন চন্দ্র, 'রাজ্য-রাজনীতি; পশ্চিমবঙ্গ ও জম্মু-কাশ্মীর', আনন্দ, কলকাতা।
২। নির্মল ঘোষ, 'নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য', করুণা প্রাকশনী, কলকাতা-৯, ২০১৬।
৩। নবারুণ ভট্টাচার্যের ছোটগল্প, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন, জানুয়ারি ১৯৯৬।
৪। নবারুণ ভট্টাচার্য, 'শ্রেষ্ঠগল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩।
৫। নবারুণ ভট্টাচার্য, 'ফ্যাতাড়ুর বোম্বাচাক ও অন্যান্য', সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৮।
৬। ডার্করুম, সম্পাদক- অভীক ভট্টাচার্য, ২০১৮।
৭। নবারুণ ভট্টাচার্য, 'কথাবার্তা', ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫।
৮। বিনির্মাণ ২১, বিষয়- নবারুণ, জানুয়ারি, ২০২০।

ন ব নী তা ব সু

মনোজ চাকলাদারের গল্প : শূন্যপথে জীবনের গান

কথাকার মনোজ চাকলাদারের গল্পরচনার কাল ১৯৮৫ থেকে ২০০৯। এই সময়পর্বে পুঁজিবাদ মানুষকে নিঃস্ব, নিঃসঙ্গ করে তোলার এক মত্ত খেলায় মেতে উঠেছে। ছন্নছাড়া মানুষ তখন অস্থির, মুনাফা সৃষ্টির যন্ত্রের ক্রীড়নক। পচা গলা নষ্ট পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়ে উত্তর-প্রজন্ম খুঁজে চলেছে আত্মসুখের উত্তর। সর্বব্যাপী এক শূন্যতার চরাচর। অসংলগ্ন ও অব্যবস্থিত জীবনের হাহাকারের গান তখন শুধু ক্ষতির স্বরলিপি হয়ে উঠে আসে। ব্যক্তিগত-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-দার্শনিক-বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাতে, বিচিত্র বিষয়বস্তুর বিন্যাসে গড়ে ওঠে জীবনের কথকতা, তাঁর গল্পের বিশ্ব। তিনি খুব যত্ন করে সমাজের, সময়ের অন্তস্রোতকে চিহ্নিত করেছেন। আধিপত্যবাদের বিস্তার মানুষের সামাজিক অন্ধতার প্রেক্ষিত হিসাবে তাঁর গল্পে খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। কারুণ্য-বিষাদ, জীবন-মৃত্যু, সংশয়-শ্লেষ, তিক্ততা-যন্ত্রণা-আর্তি তাঁর গল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। পারস্পরিক অবিশ্বাস ও অনৈতিকতার ছায়ায় মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তিনি জানেন, যুগ বদলায়, মানুষের চরিত্র পালটায়। তাঁর বাচনের উপস্থাপনায় প্রচ্ছন্ন থাকে বহ্মান সময়, সময়ের আত্মবিনাশী অনাড়ষ্ট ক্ষিপ্র গতি এবং গল্পকারের নিজস্ব বীক্ষার গূঢ় ইশারা ও একাধিক ধ্বংসের সতর্কীকরণ। তিনি সমাজমন, মানুষের মন ও সময়ের দহনকে ছুঁয়ে অতীত থেকে ফিরতে চেয়েছেন ক্ষতাক্ত বর্তমানে, অনাগত ভবিষ্যতে। তাঁর গল্পে পাই, জীবনের মধ্যে প্রতিনিয়ত ওঠা-পড়া যার সমান্তরালে বয়ে যায় জীবন-জীবনকাল-জীবনজিজ্ঞাসা- জীবনবোধ। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবনের আলো খুঁজে পাওয়ার আনন্দ বা হারিয়ে যাওয়ার বিষাদের দ্বিরালাপ রচনা করেন তিনি। কথাকার মনোজ চাকলাদার ভাঙাচোরা জীবনের সান্নিধ্যে উঠে আসা অভিজ্ঞান, কুহকী মায়ায় আক্রান্ত সমাজে বিপদের অশনি-সংকেত, কীটদষ্ট মানুষ ও মরচে পড়া মনুষ্যত্বকে গল্পভুবনের অন্দরে একাত্ম করে দেখালেন। 'প্রমিতের মৃত্যু বিলাস', 'মৃত মানুষের পাশে থাকি', 'সবুজ ঘোড়া', 'জয়ন্ত আকাশে উড়ছে', 'মা উড়ে যাচ্ছে' প্রভৃতি গল্প সামাজিক মানুষের ভিড় থেকে খুঁজে আনে শূন্যতা-বিষাদ ও দহনের নানা বিন্যাস, বিপন্নতার অমোঘ ইতিবৃত্ত।

তাঁর গল্পের বয়ানের প্রথমেই লক্ষ করা যায় শহরজীবনের নৈর্ব্যক্তিক নিঃসঙ্গতা। শব্দের বিন্যাসে ধরা পড়ে জীবন যেন কাছে থেকেও দূরে। তাঁর অধিকাংশ গল্পের ক্যানভাসে ফুটে ওঠে জীবনের প্রতি নিবিড় দীর্ঘশ্বাস। তাঁর গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্র যেন জীবন-প্রতীক। যে জীবনে স্নেহ-প্রেম-মায়া-মমতার স্থান কেবল মৃত্যুকে জড়িয়ে নির্মিত। তাঁর গল্পের নির্মাণে মৃত্যুর প্রাধান্য। বাস্তব পৃথিবীর ধূসর সময়ে মানুষ আলো-পথ হারায়, জীবনের

জয়গান শুনতে পায় না তাদের চলনপথ। নির্মম কাটাকুটির জালে অবরুদ্ধ থেকে যায় প্রেম-ভালোবাসা-চাওয়া-পাওয়া-স্বপ্নের চিহ্নগুলি। তিনি খুঁজে দেন বাস্তব ও ঐন্দ্রজালিক বাস্তবের চতুষ্কোণে জীবনের, সময়ের যন্ত্রণাকে। এই ভাবনার প্রকাশে বারংবার উঠে আসে মৃত্যুদ্যোতনাবাহী প্রতীক। গণ্ডিবদ্ধ জীবনের যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ নির্মিত হয় শব্দের বুনোটে, রঙে ও রেখার। গল্পে নানা উপমার উপস্থিতি সত্তার আলো ও অন্ধকারের প্রকাশকে তীব্রতর করে তোলে। তাই তাঁর গল্পের পাঠ শেষ হলেও যে অমীমাংসিত উপসংহার থাকে সেখান থেকে শুরু হয় আরেক পাঠের বিনির্মাণ প্রক্রিয়া।

২

'প্রমিতের মৃত্যুবিলাস' গল্পে একটি দীর্ঘশ্বাসময় পরত আছে। কালো শ্লেটরঙা আকাশের শূন্যতা, অর্জুন-মেহগনি, রাধাচূড়ার রূপকথার আশ্বাস কিংবা সাদা মন্দিরফুলের বিবর্ণতাকে নিয়ে ঘরহীন প্রমিত সল্টলেকে বাড়ির পর বাড়ি দেখতে থাকে, তার স্বপ্ন একটি সাজানো গোছানো সুন্দর বাড়িতে তার মৃত্যু হবে। তার ইচ্ছা, "একেক দিন একেক রকম বাড়িতে থাকত, বড় বৈচিত্র্যময় বাস হত" তার। সে দেখে জীর্ণ নগরে বিবর্ণ জীবনধারণ করে মানুষ। বিলাসপূর্ণ বাড়িতে থেকেও "মানুষের মুখে অদ্ভুত বিষণ্ণতা, নির্জনতা ককিয়ে উঠছে মুখে।" তার মনে হয়, বোবা পৃথিবীর বোবা মানুষগুলিকে ঢেকে দেবে মৃত্যুর প্রচ্ছায়া, প্রমিত ভয় পায় আবার শৌখিন জীবন আনন্দ দেয় তাকে। সে ভাবে 'সুন্দর বাড়িতে মরেও আনন্দ।' এই মৃত্যুতে বোধহয় কোনো অ-সুখ নেই, নেই আছড়ে পড়া অসহায়তাও। এভাবে চলতে চলতে প্রমিতের সাক্ষাৎ হয় প্রমিতের সঙ্গে কিংবা নিজের সঙ্গে নিজের। সুন্দর করে সাজানো বাড়ির দোতলায় উঠে আসে ঘরহীন প্রমিত আরেক প্রমিতের ঘরে। ড্রয়িংরুমে মৃত্যুর সাধ জাগে তার। প্রাসাদোপম বাড়ির মালিক প্রমিতের ড্রয়িংরুমে পড়ে থাকে ঘরহীন প্রমিতের মৃতদেহ। 'প্রমিত বসে প্রমিতকে দেখতে থাকে।' নিশ্ছিদ্র শূন্যতা ও শ্বাসহীন নিরন্ধ্র বাস্তবের গল্পত্ব বিধৃত হয়। কথাকার ক্ষণিকের জন্য পাঠককে নিয়ে যান শ্বাসরুদ্ধ পরিস্থিতিতে, যেখানে রাষ্ট্রহীন মানুষ প্রমিত মৃত্যু দিয়ে রাষ্ট্রের বৈষম্যনীতিকে চিহ্নিত করে দিয়ে যায়। **Have** আর **Have's not** এর জান্তব অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে কথাকার লেখেন, শ্লেটরঙা মেঘে অঝোরে বৃষ্টি নামে। প্রমিতের বাস বৃষ্টিতে চলতে থাকে। প্রমিত বৃষ্টিতে ভেজে, রঙিন বৃষ্টি, কমলা বৃষ্টি। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে প্রমিত ক্রমাগত বাড়ি পালটায়, পালটাতে থাকে চরিত্র। ট্র্যাজিক কারুণ্যের অন্তরালে শ্লেষে বিদ্ধ হয় আমাদের মন ও বোধির জগৎ।

আরেকটি গল্প 'মৃত মানুষের পাশে থাকি'র অর্চিষ্মান শহরজীবনের কলুষময় বাতাবরণে খুঁজে ফেরে জীবনের অনন্ত গন্ধ। টুকরো টুকরো মৃত্যুর দৃশ্য জীবনের সদর্থক ভাষ্য হয়ে ওঠে। তাই সে কখনও অফিসে যাওয়ার পথে অথবা অফিস থেকে ফেরবার পথে ঘুরে ঘুরে মৃত বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। একেক দিন একেক বাড়ি তার গন্তব্য। মৃত বাড়ির

নির্জনতা বা নিঃসঙ্গতা অর্চিষ্মানকে স্বস্তি দেয়। অফিস ফেরতার পথে অর্চিষ্মান শোকমিছিলে যোগ দেয়। সে জানে না কার জন্য শোকমিছিল, এরা কেউই তার পরিচিত নয়। সে পায়ে পায়ে হেঁটে যায় মৃত বাড়িতে। মৃত বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষকে সে প্রত্যক্ষ করে, উপলব্ধি করে মৃতব্যক্তির প্রতি কারোর কোনো মমতা নেই। অথচ প্রত্যেকেই "কত সময় ব্যয় করছে ওর পেছনে। কেমন তাদের মুখ চোখ ছলছল।" বাড়ি ফেরে অর্চিষ্মান। যথাপ্রাপ্ত জীবনের শোষণ-বঞ্চনা তাকে কষ্ট দেয়। সে আবার শোনে এক সুরেলা কান্না, মৃত বাড়ির কান্না। কান্নার সুর ধরে মাঝরাতে পৌঁছে যায় বস্তির ঘরে। সে নিবিড়ভাবে দেখে, মৃত ব্যক্তির ফ্যাকাশে মুখ, গভীর গহ্বরে গাল, চোখ দুটো শূন্য। সে উপলব্ধি করে, এই মৃত ব্যক্তির জন্য তার স্ত্রীর কান্না ভালোবাসার, স্বার্থহীনতার। সে বাস্তবতাকে খোঁজে, মৃত ব্যক্তির বিপন্ন ঘরে রাষ্ট্রযন্ত্র ও আর্থ-রাজনৈতিক সমাজের ছলনা-বৈষম্য-নীতি-মালিন্য চোখে পড়ে। অর্চিষ্মান বেরিয়ে আসে। এবার অর্চিষ্মান ঠিক করে শ্মশানে যাবে। ময়দানের পথ পেরিয়ে শ্মশানে যাওয়ার সময় লক্ষ্য করে নিঃশব্দ পড়ে থাকা মৃত কাকের দেহ, তাকে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য কাক, প্রত্যেকের চোখে যেন দার্শনিকভাব, পারস্পরিক বন্ধুতার নিবিড়তা। শ্মশানে এসে পৌঁছায় অর্চিষ্মান। একের পর এক মৃতদেহ, শবদাহ, জ্বলন্ত চিতা থেকে উঠে আসা ধোঁয়া, প্রিয়জনদের কান্না সবই প্রত্যক্ষ করে। এভাবে পরের দিন আবারও আরেকটি মৃতবাড়িতে যায়। মানুষের সমাগম তাকে আনন্দ দেয়। বান্ধবহীন পৃথিবীতে এভাবে পাশে থাকার মনোভাব হয়তো বা অর্চিষ্মানকে সুখ দেয়। যাপিত জীবনের বাস্তবতা থেকে অন্য এক বাস্তবতার সন্ধানে পাড়ি দেয় অর্চিষ্মান। আর তাই মৃতের পাশে মানুষের অবিচল সততা কিংবা মৃতের পাশে মানুষের ভালোবাসার কথা বলা যেন নিবিড় জীবনসম্পৃক্ত চলনের চিহ্ন হয়ে ওঠে। মৃত্যু যখন নৈঃশব্দের ছায়াঞ্চল তৈরি করে, তখন জীবন জীবনকেই নতুন করে আবিষ্কার করে চলে। জীবন-মৃত্যুর এই প্রায়োগিক অভিব্যক্তির ভিতরেই কথাকার জীবনাকাঙ্ক্ষার নিবিড়তাকে মিশিয়ে দেন।

তাঁর 'সবুজ ঘোড়া' গল্প যেন বাস্তবের ভিতরে রূপকথার গল্প বলে। ব্যক্তির ভিতরে রাষ্ট্র ছড়িয়ে দিচ্ছে অদৃশ্য, অমোঘ মায়াজাল যে জালে মানুষ ধ্বস্ত হচ্ছে, বিপন্ন হচ্ছে— এরই সময়চিহ্নিত বয়ান 'সবুজ ঘোড়া'র রূপকল্পে কথাকার নির্মাণ করেছেন। উত্তমপুরুষের বয়ানে কথাকার লিখছেন, প্রবল বৃষ্টির রাতে টকটক শব্দে কথকের ঘুম ভেঙে যায়। কথক দেখেন সবুজ ঘোড়া কান পেতে কী যেন শুনছে। কথকের বাবা এস্রাজ বাজাচ্ছেন, মা গান গাইছেন। এক অদ্ভুত তন্ময়তা তাঁদের মধ্যে। তাঁদের পরনের বস্ত্র উড়ে যাচ্ছে, বাবা-মা সবুজ ঘোড়ার পিঠে উঠে উঠোন পেরিয়ে মাঠে নামেন, মাঠ পেরিয়ে অসীম শূন্যতায় মিলিয়ে যান। বৃষ্টি থেমে যায়। কথক উঠোনের দিকে তাকিয়ে দেখেন উঠোন শুকনো, ভোরের আলো নেমে এসেছে, মা উঠোন ঝাঁট দিচ্ছেন। আবারও রাত হয়, বৃষ্টি নামে, সবুজ ঘোড়া আসে, মা-বাবার সুরেলা মূর্ছনায় চরাচর ভেসে যায়, সবুজ ঘোড়া বিলীন হয়।

আবারও নতুন দিনের শুরু হয়। রোজ রাতে কথক লক্ষ্যহীন এলোমেলো ভাবনায় অনুভব করেন চোখের সামনে প্রতিদিন যা ভাঙছে, নতুন নির্যাসে আবার তা গড়েও উঠছে। কিন্তু কথকের জীবন আর নিরাপদ নয়। সবুজ ঘোড়া ছাড়াও একে একে জড়ো হচ্ছে বাদামি, কালো, সাদা ঘোড়া। সাদা ঘোড়ায় সওয়ার নৃপতি সুলভ একজন। কথক আতঙ্কিত হন, শিউরে ওঠেন, অনিশ্চিত জীবনের মোহে ভেঙে পড়েন। উদ্ভট অলৌকিকতায় আক্রান্ত হন তিনি। ঘোড়ার সবুজাভ শুষে নেয় অস্তিত্বের সজীবতাকে। গল্পের প্রথম চারটি পরিচ্ছেদে আপাত ঐন্দ্রজালিক বর্ণনার পরে বয়ানের ধরন আচমকা পাল্টে যায়। পণ্যায়ন, বিশ্বায়নের প্রতিকারহীন দাপটে ছিঁড়ে যায় ইন্দ্রজাল। বেরিয়ে পড়ে ইমারতের নিরেট আবহ, প্রমোটাররা প্লট তোলে, মাঠ ভরে যায় ফ্ল্যাটে, কথকের একের পর এক স্বপ্ন ধ্বংস হয়। জ্যোৎস্না মরে যায়, সুর ওঠে না, বাতাসে ফুলের গন্ধ ছড়ায় না। মা-বাবা চিরকালের জন্য চলে যান, যৌবন থেকে কথক পৌঁছে যান প্রৌঢ়ত্বে। তবু ‘সবুজ ঘোড়া’র ‘সবুজ’ বিবর্ণ হয় না। সমাজের ভাঙা-গড়ার ক্ষয়িষ্ণু খেলায় কথক খুঁজে নেন জীবনকে ছেঁকে বেঁচে থাকার গভীর সুর। সময়ের লজ্জাহীন বিকারে কিংবা বহুমাত্রিক আত্মহননের চোরাবালিতে ডুবতে থাকা মানুষের কাছে ‘সবুজ ঘোড়া’ যেন জীবনীয় বোধ- পারাপারহীন উত্তরণের প্রতীক- “ভেসে আসছে গান। ভেসে আসছে এস্রাজের সুর। টগবগ টগবগ করে ছুটে আসছে ঘোড়া। সবুজ ঘোড়া কি? আবার মিলিয়ে যাচ্ছে সব। মিলিয়ে যাচ্ছে”। - এভাবেই তো হাজারো সবুজ প্রত্যাশা নিয়ে সমস্ত বিভ্রান্তির মধ্যেও মানুষ জীবনের মশাল জ্বালিয়ে রাখে।

উত্তমপুরুষের ঢঙে বর্ণিত আরেকটি গল্প ‘রাবণ ও তার ভালবাসা’য় নিষ্ঠুর প্রাণহীন সমাজের অন্দরে কথক তার নিজস্ব সংকট, শূন্যতা কিংবা ভালোবাসার চেতনাপ্রবাহে ভাসমান সত্তা নিয়ে উপস্থিত হন। জন্মাবার পর না কাঁদার জন্য কথক হয়ে যান রাবণ বা কোনো অশুভ বোধের ধারক। বাবাকে দেখে অঝোরে কান্না কিংবা জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু বিপর্যয়-দিদির মৃত্যু, সহপাঠীর মৃত্যু, বাবা-মা’র মৃত্যু জীবনের আশ্চর্য সব কল্পনাকে শুষে নিয়ে অশুভ কোনো সংকেত হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। অস্তিত্বের নানা সংশয় অতিক্রম করে কথক একদিন চাকরি জুটিয়ে ফেলেন। কিন্তু পাঠক কথক তাঁর জীবনের রসদ খুঁজে পান বইয়ে। চাকরির প্রতিযোগিতা তাঁর বুকের ভিতর অস্বস্তি তৈরি করে, একসময় বুকে ব্যথা অনুভব করেন। বুকের ব্যথা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ডাক্তার, ওষুধ, ইনভেস্টিগেশন সব হয়। কিন্তু অ-সুখ নির্ণীত হয় না। জীবনের ভাষাহীন অন্ধকারে কথক তলিয়ে যেতে থাকেন। নিজেকে ভালো রাখার প্রতিষেধক তাঁর অজানা। ‘এনজাইটি নিউরোসিস’ -এ আক্রান্ত কথক জীবনের দহন ক্লান্ত পরিসরে শোকের মতো জীবনকে দেখেন। রাষ্ট্র, সমাজ, সময় তাঁর জীবনের আকাঙ্ক্ষা শূন্যে মিলিয়ে দেয়। নির্জনতায়, একাকীত্বে কিংবা অন্যকে খুশি করার জন্য নিবেদিত কথক ভালোবাসার গল্পে খুঁজে পান জীবনের উত্তাপ। চাকরি ছেড়ে পৃথিবীর মানুষের জন্য তিনি গল্প লিখতে শুরু করেন, তিনি নতুন মানুষ হয়ে ওঠেন।

রিক্ততা ও অবসানের পরও তিনি অস্তিত্বের অন্তর্বর্তী শূন্যতাকে কাটিয়ে ওঠেন, হৃদয়কে সজীব করে জেগে ওঠেন। ব্যঞ্জনাদীপ্ত, সংকেতঋদ্ধ গল্পভাষা থেকে এভাবেই পাঠক খুঁজে পান উত্তরণের ইশারা। এখানেও কথাকার নিঃশেষিত মনন-মূল্যবোধকে নিঃসঙ্গতার করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করেন।

'জয়ন্ত আকাশে উড়ছে' গল্পে জয়ন্তের আকাঙ্ক্ষার অফিসে হিমচাদরে ঢাকা আদর শরীর ভরিয়ে দেয়, আইভিলতা গাছ, মিষ্টি গন্ধ, সরোদের ধ্বনি তাকে নিয়ে যায় জ্যোৎস্নামাখা রোদে ভেজা চুপকথার জগতে। মায়াময় পরিবেশ যেন জাদুবাস্তবতায় ভরা। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষার সময়কাল নির্দিষ্ট, শুরু হয় বাস্তবের সঙ্গে লড়াই। ঝুল-পড়া দরজা, রংচটা টিনের পার্টিশন, বাথরুমের দুর্গন্ধে তার মোহভঙ্গ হয়। ভাঁটা পড়ে কল্পনার প্রবাহে। তিক্ত হয় জীবনঘনিষ্ঠ উপলব্ধির লাবণ্য। জয়ন্ত কাজ করে, ভালোবেসে না হলেও সময়ে কাজ শেষ করে। কিন্তু বসের রুক্ষ ব্যবহার তাকে সংকুচিত করে, স্বপ্নকে তিলে তিলে মারে। অপমানের কালো রং গড়িয়ে পড়ে জীবনের উপর। উপেক্ষা সজোরে ধাক্কা মারে মনের ঘরে। একসময় জয়ন্তের কাজ চলে যায়। জয়ন্ত শিরদাঁড়া বিক্রি করতে পারে না, বিকিয়ে দিতে পারে না নিজের অস্তিত্বকে। কষ্ট নিয়েও একমুঠো স্বপ্নের কুঞ্জবনে সে উড়তে থাকে। সংসারের সব ঋণ শোধ হলে সে উড়ে যাবে সুদূর স্বপ্ননীল আকাশে কিংবা নির্বাসিত নির্জন গোপন অন্ধকারে। কথাকার এখানেও মানুষের হিম দুঃখ ও জীবনের প্রতি গহিন ভালোবাসার কথা সংকেতে ব্যবহার করেন। জীবনের পুঞ্জীভূত ক্লেদ ও বিপন্ন সারল্য সমান্তরালে গল্পের বয়ানে অনবদ্য রূপ গ্রহণ করে।

'মা উড়ে যাচ্ছে' গল্পটিকে মূল্যবোধহীন সময়ের গল্প বলা যায়। কারণ ক্ষয়িষ্ণু সময়ের অন্তঃসারহীন সমাজের প্রতিনিধি গল্পের চরিত্ররা। কথক লেখেন, নিজের জন্মের কথা, জন্মাবার পর বাবার আত্মহত্যার কথা, মায়ের কথা ও রিক্ত জীবনের কথা। কথাকার পচনশীল সমাজের রিক্ততার ছবিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য কথকের মায়ের পরিবর্তনকে আঁকলেন। ধবধবে সাদা বিছানায় সাদা পোশাক পরিহিতা মায়ের বিছানা হঠাৎ করেই সবুজ হয় কিংবা সবুজের রঙ ফিকে হয়। বিছানার রং পাল্টায়-কখনও গোলাপি, নীল, হলুদ, বেগুনি, কমলা; কখনও পালটায় গন্ধ- গন্ধরাজ, শিউলি, হাসনুহানা, রজনীগন্ধা জুঁই; পালটায় পুরুষও। প্রহরে প্রহরে রঙ বদলায় মানুষ। ভোগবাদ সম্পর্কের শরীরে বাঘনখ বিঁধিয়ে দেয়। মা-ছেলের সম্পর্ক দূর থেকে দূরতর হয়। গুমোট সম্পর্কে প্রাণ দিতে মা-ছেলে বেড়াতেও যায়। সম্পর্কের দীর্ণতায় হয়তো ভালোবাসার কুহক ছড়ায়, জ্যোৎস্না ভেজা পথে হেঁটে হেঁটে হলুদ প্রজাপতির ডানায় ভর করে মা শূন্যে ভাসতে থাকেন, আমাদের সঙ্গে থাকা ফানুস আকাশে ওড়ে- শূন্যের উদ্যানে উধাও হয়। কথাকার অবক্ষয়ের মারিবীজ রোপণ করেন। তাঁর গল্পে বাস্তবতা-কুহক বাস্তবতার সঙ্গে ভাষাভাবনা ও জীবনভাবনা অবিচ্ছেদ্য রূপে ধরা পড়ে।

গভীর রাত, অন্ধকার ক্রমশ প্রলম্বিত অন্ধকারে, শান্তা (কইমাছ, কইমাছগুলো) কেঁদে ওঠে, ঘুম ভেঙে যায়, কাঁটার তীক্ষ্মতায় হাত জ্বালা করে। মোমের আলোয় দেখতে পায় ঘরের মধ্যে কইমাছ, অসংখ্য কইমাছ ঝাঁকে ঝাঁকে আসে। মেঝেতে, বিছানায় আঁশটে গন্ধ। অলৌকিক কইমাছে শান্তাদের জীবন নষ্ট, ধ্বস্ত। সুরাহা মেলে না। স্বপ্নমাছে তাদের হৃদয় কম্পমান, বিদীর্ণ হৃদয় নিয়ে শান্তা ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে। স্বপ্ন মরতে থাকে। ক্রমে ক্লান্ত শান্তার শরীর হয় স্থির, শীতল। চোখে-মুখে উঠে আসে জীবন্ত কইমাছ। শূন্যতায় ভেসে গেলে কইমাছ বেরিয়ে যায়। শান্তার সত্তাকে ঘিরে রাখে শূন্যের পরিধি। জীবনের অপ্রাপ্তি, শূন্যতার পাশে যেন কইমাছের রূপকল্প বিপ্রতীপ অবয়ব নিয়ে আসে। সময়ের দীনতায় গল্পকারের এই বিবরণ বীভৎস হয়ে ওঠে।

কথাকার নিঃসঙ্গতায় খোঁজেন 'জীবনের সব লেনদেন'। মানুষ যখন সময়ের, সভ্যতার আগ্রাসী বিস্তারে পথ হারায়, তাঁর লেখায় জীবন সেখানে খুঁজে ফেরে নক্ষত্রের গান, অকাল শ্রাবণ কিংবা মিহি সুতোয় বোনা রঙিন ভালোবাসার স্বপ্ন।

৩

শহরের ভিতর আরেকটা শহর, মানুষের ভিতর আরেকটা মানুষ। যে জীবন আমরা ধারণ করি, সমাজের- সময়ের ঘষা দাগ লাগে তাতে। ফুটে ওঠে জীবনের যাপনচিহ্ন। কথাকার মনোজ চাকলাদারের গল্পে ছড়িয়ে ছিটিয়ে লেগে থাকে রাজনীতি, মানবিক সম্পর্ক, শূন্যতা, মানুষের বিষণ্ণ অবকাশযাপন, জীবিত মানুষের ছায়াশরীর ও পোশাকহীন বাস্তবের ছবি।

তাঁর 'একশো বিয়াল্লিশ' গল্পটি রাজনৈতিক চেতনায় সম্পৃক্ত। গল্পে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গের এক বহ্নিমান সময়। বৃদ্ধ কথকের বাচনে ফুটে ওঠে পৌরসমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের দ্বিবাচনিক সম্পর্কের আঁতের কথা। বৃদ্ধ কথকের বড়ো ছেলে খোকা পার্টি পলিটিকসে বয়ে যায়, কমরেড উমাপতি রায়ের খুনকে কেন্দ্র করে তাদের জীবন দগদগে ঘায়ের মতো হয়ে যায়। খোকা পালায়, ফিরেও আসে কালো ও শীর্ণ হয়ে। খোকা জীবনের ছন্দে ফিরতে চায়, বাঁচতে চায়। বৃদ্ধ কথক বাবা তাকে লুকিয়ে রাখতে চান। একশো চল্লিশ খুনের সাক্ষী খোকা। আরও দুটো খুন করতে চায়—একশো বিয়াল্লিশ সংখ্যা যেন তীক্ষ্ম দাগ হয়ে বসতে চায়। আদ্যন্ত ঘুণধরা সমাজের বিকৃত ফাঁদে পড়া খোকারা অন্ধকারের ভিতর মিলিয়ে যায়। শূন্যতার অঙ্কে শায়িত হয় প্রেম-ভালোবাসা-সুখ-স্নেহ সবকিছুই।

কথাকার মনোজ চাকলাদার নিপুণভাবে রাজনৈতিক সর্বস্বতার চাপে ক্লিষ্ট মানুষের-সমাজের বিভিন্ন অনুপুঙ্খগুলি প্রতিস্থাপিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, হালকা চালে জীবনকে দেখতে দেখতে, আমরা এক সার্বিক জীবন-বিপর্যয়ের, অপচয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ক্ষমতার দূষণে বর্তমান পৃথিবীর বাতাসে এখন দূষিত রাজনীতির পচা শেকড়ের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। রাজনীতির শিকার হাত-পা কোমড়-শিরদাঁড়া ভাঙা একদল মানুষ যারা পার্টির নির্দেশে বোমা বাঁধতে, মানুষ মারতে সিদ্ধহস্ত। 'পতঙ্গ' এই অর্থে

রাজনৈতিক অসাড়তার গল্প। মানকে-গজু-ভজু-টুপে এরা রাজনৈতিক সন্ত্রাসের চিহ্ন।এদের অস্তিত্ব ততদিন, যতদিন রাজনীতির শীর্ষনেতা তাদের মাথায় হাত রেখে স্বার্থসিদ্ধি করে। স্বার্থে টান পড়লেই কারোর দেহ গুলিতে ঝাঁঝরা হয়, কিংবা মাথার খুলি উড়ে যায়। আবার নতুন করে বলির শিকার খুঁজতে হয়, টুপেদের পিঠে পতঙ্গের পাখা গজায়। ফরফর করে ওড়ে, জিন্দাবাদের কালো ধোঁয়ায় আবার রঙিন রাজপাট নির্মিত হয়, পুরানো ছুরি ধারালো হয়ে ওঠে আর রাতদুপুরে শরীর ছিন্নভিন্ন হয়। যেখানে রাজনীতি কীটদষ্ট, পারিবারিক জীবন নিরুদ্দিষ্ট সেখানে গাঢ়তর হয় অন্ধকার। দেশের, সমাজের মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে দেশকে, সমাজকে স্বার্থসর্বস্বতার চোরাবালিতে ডুবতে দেখেন কথাকার। তাই তাঁর গল্পে শোনা যায় মননের অধঃপতনের শব্দ, হাঙররূপী মানুষের বীভৎস দাপট।

অস্তিত্ব ছটফট করে নিঃসঙ্গতায়, দহনের বিষবাষ্পে পুড়ছে অন্তরমহল, জীবনের ধারাপাতে শুধুই কান্না- তবু একে অপরের প্রতি অবিচ্ছিন্ন সমানুভূতি নিয়ে বাঁচতে চায় ‘ভাতারের স্বপ্ন ও সাদা থান অথবা আকাশ’ গল্পের আপি। আপির যৌবন নেই, শরীরের ভ্যাপসা সিন্দুকে যৌনতার গন্ধ নেই। তবু সে ভাতার খোঁজে। বয়সে বড়ো কিংবা ছোট যেকোনও ভাতার আপির জীবনে সুর তোলে। কিছুদিন সংসার সংসার খেলা চলে, সাদা থান লাল হয়, আবার লাল শাড়ি বিবর্ণ হয়ে সাদা থান রূপে ঝুলতে থাকে। আপির জীবনের খোলা অলিন্দে কেতো সুখী বাতাসের বিলি কাটে। কিন্তু এও তো ক্ষণস্থায়ী। কেতো না বলে ছেড়ে যায় তাকে, যেমন গিয়েছিল এর আগের ভাতাররা। আপি কষ্ট পায়, ভালোবাসার আর্তিতে হাহাকার করে। তারপর কোনও একদিন রাতের অন্ধকারে গহন নিরুদ্দেশের পথে আপিও হারিয়ে যায় নতুন বসত গড়বে বলে। ক্লান্তিহীন ধারাবাহিক ভোগচাহিদা জীবনের ব-দ্বীপ পেরিয়ে যায়। এত যন্ত্রণা, এত ক্ষয়, এত ভাঙন মানুষের বিবেককে পঙ্গু করে দেয়। কথাকার এখানেও ভাঙা জীবনের, ভোকাট্টা ঘুড়ির মতো জীবনের নিঃসঙ্গতার কথকতা করে যান। বর্ণনার লোকায়ত সৌন্দর্য, নিরুচ্চার অন্তঃস্বরের বিন্যাস তাঁর গল্পকে অন্যমাত্রা দেয়।

‘মেঘ, মেঘময়ী’ গল্পের কথক ও সুনু প্রেম-প্রেমহীনতা এবং ক্ষয়-বেদনার মাঝে এঁকে দিতে পারে ভালাবাসার, আদরের চিহ্ন। এই আকাঙ্ক্ষা মানুষের জীবনীশক্তি। তাই তো কথক দীর্ঘ বছরের ব্যবধানেও সুনু অর্থাৎ মেঘময়ীকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে যান। সংসারী মেঘময়ী, একাকী মেঘময়ী কথকের ভালোবাসার রূপকথা ছুঁয়ে থাকে। মনের বলগা ছেড়ে দিলেও এক হতে পারবে না মেঘ, মেঘময়ী। তাদের আয়োজনহীন মধ্য বয়েস ডুব দেয় শূন্যতায়। তবু মাঝে মাঝে কথকের মনে হয় ভালোবাসার অনিবার্যতায় ফিরবে মেঘময়ী। টেলিফোন বাজে, নিরুত্তর মেঘময়ী, কথক অপেক্ষা করেন ভালোবাসার আর্তনাদ অন্তত একবার মেঘময়ী শুনুক দূর থেকে। মানবিক সম্পর্কের বিন্যাস, জীবনের বিচিত্র পরিসরের উন্মেষণ, শূন্যতা থেকে শূন্যতায় প্রত্যাবর্তন ও সময়বিচ্ছিন্ন জীবনের পরিসরটুকু যেন

যাপনের সম্বল নিয়ে পড়ে থাকে।

তাঁর গল্পবিশ্বে বাস্তব চরিত্র প্রতীক মণ্ডিত হয়ে কল্পকাহিনির কল্পিত মানুষে পরিণত হয়। তাঁর অনুভূতিপূর্ণ মন ও শিল্পিত ভাষা গল্পকাঠামোর প্রধান ভিত। তিনি প্রত্যেক গল্পে কথকের প্রচ্ছন্নে থেকে বিবৃতকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। মধ্যবিত্ত অস্তিত্ববোধের এক প্রতীকী ক্রিয়ার প্রতিভূ হয়ে ওঠে 'আমি' সত্তা। 'আমি'র বাচনভঙ্গীতে গল্পের সংলাপবৃত্তে থাকে এক নীরবতা, যেখানে চেতনানিমগ্ন মানুষের অন্তর্বাস্তবতা- বহির্বাস্তবতার দ্বান্দ্বিকতা সমন্বয়ীসূচক রূপে উপস্থাপিত হয়। কোলাজধর্মী সংমিশ্রণে প্রাত্যহিক সম্পর্কের অভিঘাত তাঁর গল্পের মূল বিন্দু। 'বীরপুরুষ' গল্পের কথকের অস্থিরতা, বিপন্নতাকে তিনি ধরতে চেয়েছেন এক অদ্ভুত কোলাজধর্মী কাহিনির ঘূর্ণাবর্তে। কথকের ভাবনার মধ্যে উঠে আসে বিচ্ছিন্ন সময়ের পোকা। পোকা সারা দেহে ঘোরে, মাথায় ওঠে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, জীবন-জীবিকার আপাত সংঘাত, আত্মিক সংকট, অসুখী দাম্পত্যের বিকারকে বাড়িয়ে দেয়। কথক কাপুরুষ হতে চান, তাঁর স্তব্ধ, ধীর পাণ্ডুলিপির মতো শরীরের পাশে 'মরা চাঁদ' শুয়ে থাকে, তাঁর বৌ রাত নামলে 'শুকনো ডালপালা নিয়ে ঘরে ঢোকে, কোনো পাতা নেই, ফুল নেই'। ছত্রাক শরীরকে গ্রাস করে, গ্রাস করে শরীরের আস্ত দুপুর। তাঁর বৌ দুঃখ শুষে নিত একাকী নির্জনতায়। শেকড় ছড়িয়ে দিত মাটিতে, সে যেন স্বপ্নগাছ, জ্যোৎস্নায় উড়ছে তার স্বপ্নদেহ। সে রূপকথা জানে। তার পেটের ভিতর বিমূঢ়, বিমূর্ত সময় নড়াচড়া করে। শরীরের ভিতর শরীর ধীরে ধীরে নীল, স্থির হয়। বৌ কষ্ট পায়। আর কথক আকাশের তারা খুঁটে খুঁটে স্বপ্ন বানায়, নীল হলুদ সবুজ লালের সমারোহে দেহে জোনাকিরা জ্বলে ওঠে, রক্তে মৌতাত জমে। কথক শুনতে পান যৌনতার ভাষ্য, দুরন্ত ঘোড়ার ছোটার শব্দ। দেখতে পান 'সব উদ্ভিদ সবুজ হয়ে যায়'। ফুল ফোটে। নতুন করে জীবন খুঁজে পান। গল্পটিতে চরিত্রের বর্তমান কালের ভাবনার স্রোতে কখনও অতীত, কখনও ভবিষ্যৎ মূর্ত হয়ে ওঠে। মূর্ত হয় মিথ-পুরাণ। বোহেমিয়ান সমাজ, সময়ের দূষণ, যৌনতা কিংবা মৃত্যু আমাদের মনে-শরীরে—বিধিবহির্ভূত কামনায়, কামনার পিচ্ছিলতায় গোপন পাকে জড়িয়ে যেতে থাকে। কথাকারের শব্দ ব্যবহারে রঙের প্রায়োগিক বিন্যাস গল্পকে অন্য মাত্রা দান করে। এই রঙেই তিনি কল্পনাকে উদ্দীপিত ও সময়কে প্রসারিত করে দিয়েছেন।

৪

মনোজ চাকলাদারের 'গল্পসমগ্র ১'-এ বাহান্নটি গল্প আছে। এর মধ্যে থেকে যেসব গল্প আলোচিত হল, তাছাড়াও আরও অনেক গল্প আছে যা আলোচনার দাবি রাখে।. বৃহৎ কথায় প্রবেশ করবার পরিসর পাওয়া না গেলেও প্রত্যেকটি গল্প যে সময়ের আকর এবং কথাকার মনোজ চাকলাদার যে প্রত্যয়ী স্বপ্নদ্রষ্টার মতো উত্তর-প্রজন্মের পাঠকের কাছে সমসময়ের বার্তা পৌঁছে দিতে চাইলেন বর্ণনার নিপুণতায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কথাকার মনোজ চাকলাদারের গল্পে নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছেদ, শূন্যতা ও মৃত্যু এক পুনরাবৃত্ত

স্বর। কখনও কখনও তা মনোটোনাস। প্রত্যেকটি গল্প যত এগোয়, পাঠক বুঝে নেন, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক রক্তপাত, ক্ষোভ, ব্যথা, বিষণ্ণতার পাহাড়। তাঁর গল্পের বাস্তব রিক্ত। গল্পের চরিত্ররা পঙ্গু রুগ্ন সমাজের অন্ধকার নিয়েই আলোকিত। কথাকার যেন নিঃসঙ্গ চেতনার ঘরে বসে প্রতারক সময়ের নিষ্পেষণে পিষ্ট মানুষের কথা বলে যাচ্ছেন। কথকের আড়ালে তিনি বিরামহীন যন্ত্রণার দাবানলে পুড়ছেন-ভাঙছেন-গড়ছেন। তিনি লক্ষ করছেন, সমাজের প্রতিটি স্তরে মানুষ ও অমানুষ হয়ে ওঠার অলিগলিকে, প্রতিকারহীন লাঞ্ছনার চিহ্নগুলিকে, ব্যাদিত শূন্যতার গহ্বরকে। তিনি ইশারায়, শব্দ প্রয়োগে, তির্যকতায় সমাজের, সময়ের অনুপুঙ্খগুলি থেকে খুঁড়ে বের করছেন পৃথিবীর গভীরতর অসুখ ও অসুখের সম্ভাবনাকে। সময়ের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে দেখছেন স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা, সহ্য করছেন জীবনপ্রবহমানতায় গরলের আস্বাদ, লিখেছেন ভোগ-ক্ষুধার ইতরতার জান্তব পৃথিবীর ইতিহাসকে ও আঁকছেন গভীর বিষাদযাত্রার গতিপথকে। তবু কথাকার একমনে চেয়ে আছেন সবুজ পৃথিবীর দিকে, প্রত্যয় রাখছেন পৃথিবীর মানুষের প্রতি। পৃথিবীকে সুস্থ-সুর করে তোলার তন্ময়তায়, স্বপ্নবিভোরতায় তিনি চাইছেন ভালোবাসাকে, বেঁচে থাকার অদম্য স্পৃহাকে। তাই প্রত্যেক গল্পের শেষে আকাশের নীলিমায় উড়ে যাওয়া যেন ভালোবাসার-পূর্ণতার-আশাবাদের-বিশালতার বার্তা নিয়ে আসে। তাঁর গল্প কল্প-বাস্তবে উত্তরণের সোপান হয়ে অন্য এক অনুভূতির জগতে পাঠককে নিয়ে যায়। ক্ষয়িষ্ণু জীবন ও সময়ের বুক চিরে আলতো করে জীবনের সার্থকতাকে তুলে এনে নতুন জীবনের অর্থ খুঁজে দেয় প্রতিনিয়ত মুহূর্তকথাকে শুষে নেবে বলে। এভাবে তাঁর গোটা গল্প-ভুবন নব্বইয়ের দশকের মূল প্রবাহ থেকে সরে না এসে নিজস্ব ওমকে ধারণ করে থাকে। নিঃসঙ্গতা দিকশূন্যপুরে উড়ান দেয়। গল্পে একের পর এক ঘটনা দৃশ্যপরম্পরার জন্ম দেয়, বাস্তব-পরাবাস্তব, অনুরাগ-বীতরাগ, নিরাশা-আশা, জীবন-মৃত্যু — এক অতীন্দ্রিয় মায়ায় বিলীন হয়ে যায়।

গ্রন্থঋণ :

১. গল্পসমগ্র, মনোজ চাকলাদার, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪১৭।